হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সপ্তদশ ভাগ।

১৩১৬ সালের বৈশাখ হইতে ১৩১৬ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত

দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে

সত্ত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

Printed by N. Dutt,

at the Janma Bhumi press,

39, Manick Bose's Ghat Street.

CALCUTTA.

1910

বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।] [ডাঃ মাঃ ।৶০ ছয় আনা

জন্মভূমির সপ্তদশ বর্ষের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সপ্তদশ ভাগ।

১৩১৬ সালের বৈশাখ হইতে ১৩১৬ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত
দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে
সত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

Printed by N. Dutt,
at the Janma Bhumi press,
39, Manick Bose's Ghat Street.
CALCUTTA.

1910

বার্ষিক মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।] [ডাঃ মাঃ ।৵৹ ছয় আনা

জন্মভূমির সপ্তদশ বর্ষের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।



"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৭শ বর্ষ। ১৩১৬ সাল, বৈশাখ। ১ম সংখ্যা।

বর্ষ-প্রবেশ।

জগদীশ্বর প্রসাদাৎ "জন্মভূমি" অদ্য ষোড়শবর্ষ অতিক্রম করিয়া সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। জন্মভূমির পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়া অবধি আমরা সাধ্যমত যত্নে ইহার সেবা করিয়া আসিতেছি। পাঠক মহাশয়গণের মনোরঞ্জনার্থ, বাগ্‌বাদিনী সরস্বতী দেবীর আরাধনার্থ দেহ, মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, কর্ত্তব্যপালনে আলস্য অবহেলা অথবা ত্রুটি করিয়া জ্ঞান-কৃত অপরাধে অপরাধী হই নাই। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিচারক সহৃদয় পাঠক-মহাশয়েরা। বর্ত্তমান-বর্ষে সমান শ্রমে সমান যত্নে, অকুণ্ঠিত-ভাবে এই ব্রত পরিপালন করিব, এই আমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প। সহায় আপনারা, ভরসা জগদীশ্বর।

হে অখিলপতি বিশ্বনিয়ন্তা বিপদ্-ভঞ্জন-মধুসূদন! করযোড়ে ভক্তিভাবে তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করি। দুরদৃষ্ট-বশে গত বর্ষে উপর্য্যুপরি নানা বিঘ্ন বাধায় আমরা জড়িত হইয়া ছিলাম; হে বিঘ্নবিনাশন! ভবদীয় কৃপাবলে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জন্মভূমির সেবায় সতত আমরা নিযুক্ত রহিয়াছি। হে সর্ব্বান্তর্যামী বিঘ্নবিনাশন! কৃপা কর, পুনরায় যেন আমাদিগকে কোনরূপ বিঘ্ন পিশাচের বিষ-দৃষ্টিতে পতিত হইতে না হয়, এইমাত্র প্রার্থনা। হে করুণাময়! তোমার করুণার ছায়ায় নিরাপদে অবস্থান করিয়া, বাগীশ্বরীর শ্রীচরণ সেবা করিয়া সংকল্পিত ব্রত পালনে যাহাতে আমরা পাঠকমণ্ডলীর চিত্তরঞ্জন করিতে পারি, হে সর্ব্বশক্তিমান! দয়া করিয়া সেই শক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন:—

নমি তব পদ-যুগে করুণানিলয়!
বাঞ্ছা-কল্প-তরু তুমি বিশ্বের আশ্রয়॥
বাসনা পুরাও দেব! এই ভিক্ষা মাগি।
কদাচ না হই যেন অপযশ-ভাগি॥
তোমার যশের-ধাম এ ভব সংসার।
কর-পুটে শ্রীচরণে করি নমস্কার॥

—:o:—

ধর্ম্মদাস।

লেখক—নাট্যাচার্য্য, শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

ভুবনমোহনের পিতা মৃত্যুর সময় তাঁহার প্রতিবাসী ধনাঢ্য বন্ধু ধর্ম্মদাস বাবুকে তাঁহার সামান্য সম্পত্তির একজিকিউটার করিয়া যান। ধর্ম্মদাস বাবুর বাড়ীর নিকটেই ভুবনের বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে কিঞ্চিৎ জমিও ধর্ম্মদাস বাবুর রেওতি জমির সংলগ্ন ছিল। ভুবনের বাপ কিছু কোম্পানির কাগজ রাখিয়াও যান, এই সম্পত্তির আয়ে ভুবন দুখে-সুখে মানুষ হইতে পারিত। কিন্তু তাহাতে ব্যাঘাত ঘটিল। ভুবনের বাপের মৃত্যুর পরই কে এক ব্যক্তি একজিকিউটার ধর্ম্ম-দাস বাবুর নামে উকীলের চিঠি দিল, যে, ভুবনের বাপ তাহার দশ হাজার টাকা ধারে। উকীলের চিঠি পাইয়া ধর্ম্মদাস বাবু ক্রোধে অধীর, তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আমি জীবিত থাকিতে নাবালকের বিষয় ফাঁকি দিয়া লইবে, তাহা কদাচ হইবে না।" মকর্দ্দমা বাধিল, তিন চারি বৎসর মকর্দ্দমার পর হাইকোর্টে

প্রমাণ হইল যে, ভুবনের বাপের দেনা নয়। মকর্দ্দমা জিত হইল বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি নালিশ করিয়াছিল, সে নিঃস্ব, তাহার নিকট খরচা আদায় হইল না। এ দিকে মকর্দ্দমা খরচায় ভুবনের বাপের কোম্পানির কাগজ গেল। বাড়ী ও বাড়ীর নিকটস্থ জমি উকিলের খরচায় বিকাইল। বাড়ী ও জমি ধর্ম্মদাস বাবু কিনিয়া রাখিলেন, কেননা ভুবনের পৈত্রিক সম্পত্তি ভুবন মানুষ হইয়া যগুপি, যে টাকায় ধর্ম্মদাস বাবু কিনিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু করিয়া শোধ করিতে পারে, এমন কি দুই পাঁচশো টাকা ছাড়িয়া দিয়া ভুবনকে সে সম্পত্তি পুনরর্পণ করিবেন। ভুবন ধর্ম্মদাস বাবুর আশ্রয়েই রহিলেন। বন্ধুর পুত্র কোথায় যাইবে, ধর্ম্মদাস বাবুই মানুষ করিবেন। কিন্তু ভুবন মানুষ হইবার ছেলে নয়। ধর্ম্মদাস বাবু অল্পদিনেই তাহা বুঝিলেন, ভুবনের লেখাপড়া হইবে না, তবে আর মিছা স্কুলের মাহিয়ানা দিয়া ফল কি? কাছে রাখিয়াই কাজকর্ম্ম শিখাইবেন। একে তো বয়াটে ছেলে, তাহার উপর পাছে বয়িয়া যায়, এ নিমিত্ত ভাল কাপড় চোপড় দিতেন না, সদাসর্ব্বদা দাবে রাখিতেন, চাকর-বাকরের সহিত এটা সেটা ফরমাস খাটাইয়া পরীক্ষা করিতেন, যদি কোনও রূপে কাজ শিখে। এইরূপে ছয় বৎসর কাটিল। ভুবনের বয়স এখন বৎসর ষোল। ভুবন অতি সুশ্রী, একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রতি পূজায় তাঁহার বাটীতে থিয়েটার দিতেন। সেই থিয়েটার তিনিই বসাইতেন, ভুবনকে সুশ্রী দেখিয়া তাঁহার দলে নিলেন। ভুবন থিয়েটারের কার্য্য শীঘ্রই শিখিল। ধর্ম্মদাস বাবুর বাড়ী ছাড়িয়া সেই থিয়েটারের কর্ত্তার বাড়ীতে রহিল। ধর্ম্মদাস বাবু খুব রাগিলেন, কিন্তু ভুবনের থিয়েটারের মুনিব বাবুও তো যে সে লোক নয়, ধর্ম্মদাস বাবু গায়ের রাগ গায়েতেই সহ্য করিলেন। ভুবন থিয়েটারের অভিনেতৃগণকে সাজাইতে বিশেষ পটু হইল। এরূপ সাজাইত যে যাহাকে সাজাইত, তাহাকে কেহ চিনিতে পারিত না, ভুবন ক্রমে একজন নিপুণ বহুরূপী হইল। সুন্দর পরচুলা তৈয়ারী করিতে পারিত। এখন ভুবন থিয়েটারের কাজের লোক।

ক্রমে ভুবন একটী সাধারণ রঙ্গালয়ের সাজঘরের কাজ পাইল। ধর্ম্মদাস বাবুর বাড়ীর মেয়েদের থিয়েটার দেখিবার বড়ই সখ, থিয়েটার দেখাইতে অনেক টাকা ব্যয় হয়। একদিন ধর্ম্মদাস বাবু ভুবনকে দেখিয়া তাহার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, আর আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তুই থিয়েটারে থাক্‌তে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে, মেয়েদের থিয়েটার দেখাতে হয়! আহা তোর বাপের সঙ্গে আমার কত বন্ধুতা ছিল। তা দু' একখানা পাশ টাস্ এনে দিতে পারিস নে ?"

দেয়। ধর্ম্মদাস বাবুর বাড়ীতে ভুবনের যাতায়াত চলিল। ধর্ম্মদাস বাবুর শরীরে তো রাগ স্থায়ী হয় না, ভুবনকে আবার আদর করেন। এইরূপে কিছুদিন যায়। দিন কতক ভুবন আর আসে না। ভুবনের থিয়েটারে নূতন বহি হইয়াছে—বড় জাঁকের। ভুবনের খোঁজ পড়িল; দুই চারিদিন ডাকাডাকির পর ভুবন আসিল, ধর্ম্মদাস বাবু আদরের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেনরে ভুবন, আস্‌সিস্ নি কেন?

ভুবন। আজ্ঞে মনে বড় দুঃখ হয়েছে।

ধর্ম্মদাস। কেনরে?

ভুবন। বলিল, আজ্ঞে আমার মাথায় টাক পড়ছে, আমায় থিয়েটার ছাড়তে হবে, সকলে আমায় ঠাট্টা করে। ভুবনের মাথায় চাদর বাঁধা ছিল, চাদর খোলায় ধর্ম্মদাস বাবু দেখিলেন, যে সত্যই ভুবনের মাথার সুন্দর চুলগুলি উঠিয়া গিয়াছে, মাথার চারিধারে চুল আছে, আর সমস্ত মাথায়ই টাক। ধর্ম্মদাসবাবু অনেক সান্ত্বনা বাক্য দিলেন, "বেটাছেলে দোষ কি।" কিন্তু ভুবনের মন সান্ত্বনা মানিল না। সে বলিল,"দেশে থাকিব না, বিবাগী হয়ে চলিয়া যাইব।" আভাসে বলিল, থিয়েটারে গিয়ে বয়াটে হইয়াছে কি না, যে অভিনেত্রীরা আদর করিত, তাহারা ঘৃণা করে। মনের দুঃখে কোথায় চলিয়া যাইবে। তাহার পর দুই-তিন মাস আর ভুবনের সাক্ষাৎ নাই। ধর্ম্মদাস বাবু সন্ধান লইলেন, ভুবন আর থিয়েটারেও যায় না। একদিন ভুবন আসিয়া হঠাৎ উপস্থিত। ভুবনের আমোদ ধরে না। নমস্কার করিয়া বলিলেন. "মহাশয় প্রতিশ্রুত আছেন যে, আমার পৈত্রিক বাড়ী ও জমি যাহা কিনিয়াছেন, তাহা আমি টাকা দিতে পারিলে পুনরর্পণ করিবেন। অবশ্যই পঞ্চাশ যাইট হাজার টাকা খরচ করেছেন, আমি সে সমস্ত টাকা মায় সুদ আপনাকে দিতেছি, আপনি আমাকে আমার সম্পত্তি দিন।" ধর্ম্মদাস বাবু অবাক্, দুই তিন মাসের মধ্যে এত টাকা কোথায় পাইল! জিজ্ঞাসা করিলেন, এতটাকা কিরূপে রোজগার করিলি? ভুবন উত্তর করিল, "রোজগার করি নাই,—করিব।" ধর্ম্মদাস বাবু ভাবিলেন, ছোঁড়া পাগল হইয়াছে। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে রোজগার করিলি?" ভুবন অদ্ভুত গল্প বলিল,—"মহাশয় জানেন, আমি মনের দুঃখে নানা কারণে দেশ ছাড়িয়া যাই। নানা স্থান ভ্রমণ করি, সকলেই টাকের উপর দৃষ্টি করে, ঘৃণায় ভাবিলাম, এ প্রাণ রাখিব না। আমি জলে ঝাঁপ দিব ভাবিতেছি, এমন সময় একজন সন্ন্যাসী আসিয়া, আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "আরে মূর্খ, তুই কি নিমিত্ত মরিতে যাইতেছিস্? আমি তোরে ঔষধ শিখাইয়া দিতেছি, এক পক্ষের মধ্যে তোর মস্তকের কেশ যেরূপ ছিল, সেইরূপ

হইবে। আর সে ঔষধ বেচিয়া তুই ধন কুবের হইবি।" ধর্ম্মদাস বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ঔষধটা কি ?" ভুবন পকেট হইতে একশিশি তৈল বাহির করিয়া বলিল,—"এজ্ঞে এই তেল।" ধর্ম্মদাসবাবু বিশ্বাস করিলেন না; বলিলেন, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুই টাকা দিতে পারিস, আমি তোর সম্পত্তি ফিরিয়া দিব।" ভুবন জিজ্ঞাসা করিল,—"কত টাকা ?" ধর্ম্মদাস বাবু বলিলেন—'লাখ টাকা।' মহা আনন্দে ভুবন চলিয়া গেল।

ইহার দুই মাস পরে ভুবন ধর্ম্মদাস বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। সবিস্ময়ে ধর্ম্মদাস বাবু দেখিলেন, ভুবনের মস্তকের কেশ পূর্ব্ববৎ হইয়াছে। হাতে কতক-গুলি কাগজ, আহ্লাদের সহিত ভুবন দেখাইতেছে,-জার্ম্মানি হইতে চিঠি আসিয়াছে, আমেরিকা হইতে চিঠি আসিয়াছে, ফ্রান্স হইতে চিঠি আসিয়াছে, তেলের মসলা বলিয়া দিলে ভুবনকে কেহ দুই লাখ, কেহ তিন লাখ টাকা দিতে প্রস্তুত। ধর্ম্মদাস বাবু অবাক্! জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত টাকা দিয়া তাহারা মসলা জানিতে চাহে কেন ?" ভুবন বলিল, "আরে মশায়, ক্রোর ক্রোর টাকা রোজগার করিবে। আমি কারুকে দিতাম না, আপনি বেচ্‌বো মনে করিয়া ছিলুম, কিন্তু পৈত্রিক বাড়ীর আমার বড় লোভ। আমি শীঘ্র যাহাতে মহাশয়কে টাকা দিয়া আমার বাড়ী লইতে পারি, সেই জন্ত আমি, যে বেশী টাকা দিবে, তাকে তেলের মশলা বলিয়া দিব।" ধর্ম্মদাস বাবু আশীর্ব্বাদের ছলে ভুবনের মাথায় হাত দিয়া চুল টানিয়া দেখিলেন, পরচুলা নয়। বলিলেন, "চিঠিপত্রগুলো আমায় দিয়ে যা, আমি দেখিব, ছেলে মানুষ—না ঠকিস্।" ভুবন চিঠিপত্র রাখিয়া চলিয়া গেল। তিন চারি দিন পরে আবার ধর্ম্মদাস বাবু টেলিগ্রাফ্ করিয়া জানিয়াছেন, এক খানি চিঠিও জাল নয়। ধর্ম্মদাস বাবুর বড়ই লোভ হইল। ভুবনের নিকট মসলা জানিতে পারিলে তিনিই তো রোজগার করিতে পারেন। ভুবনকে বলিলেন, "আর অন্তকে কেন বেচ্‌বি, আমাকেই বোলে দে না!" ভুবন কুণ্ঠিত হইল। ধর্ম্মদাস বাবু বলিলেন,—"শোন্ না—শোন্ না, আমি বাড়ী-তোর বিষয় সম্পত্তি সব ছেড়ে দিচ্চি।" ভুবন বলিল,—"মশায়, সে যো নাই।

ধর্ম্ম। কেন—কেন— কি হয়েছে ?

ভুবন। সে সব থাক্ মশায়, আপনি শুনে দুঃখিত হবেন।

ধর্ম্ম। বল্—বল্— কি বল্ ?

ভুবন। সন্ন্যাসী মানা করে দিয়েছে, যে, কদাচ ধর্ম্মদাস বাবুকে বেচো না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—'কেন ?' সে বল্লে কি জানেন মশায়,—আপনি এক

জনকে দিয়ে মিছে নালিশ করে আমাদের বিষয় বেচে নিয়েছেন। আমি বল্লুম সন্ন্যাসী ঠাকুর, কখনো না, আমার অসহায় বাল্যকালে তিনি অন্ন দিয়া আমায় প্রতিপালন করেছেন। ধর্ম্মদাস বাবু তো-ধর্ম্মদাস বাবু! তাহাতে সন্ন্যাসী উত্তর করলেন,—'আচ্ছা তুই পরীক্ষা কর্,—ধর্ম্মদাস বাবু যদি তোর সমস্ত সম্পত্তি তোরে ফিরিয়ে দিয়ে লিখে দেন,—যে আমি এক্‌জিকিউটার ছিলাম। ভুবন বয়াটে হয়ে যায়, তাই এতদিন বিষয় দিই নাই, এখন মানুষ মুনুষ হয়ে এসেছে, আমি তার সম্পত্তি তাকে প্রত্যার্পণ করলুম। যদি সত্যই ধর্ম্মদাস বাবু, ধর্ম্মদাস বাবু হন, এই যদি তোমায় লিখে দেন, তা-হলে তুমি তারে দিও।' আমি তর্ক করলুম,—মশায়, তিনি ৫০।৬০ হাজার টাকা খরচ করে বাড়ী ঘরদোর করেছেন, এমন অন্যায় কথা বল্লে হবে কেন?' এই না মশায় সন্ন্যাসী চক্ষু দুটো লাল করে, আমি ভাবলুম বুঝি আমায় ভস্ম করবে, বল্লে, এ না করলে যদি তুই ধর্ম্মদাসকে তেলের মশলা বলিস্, মুখে রক্ত উঠে মরবি। দিন মশায়, কাগজ পত্র দিন, আর তো বেশী দর পাচ্চি না, ঐ তিন লাখ টাকাতেই বেচি।

এ কথা শুনিয়া ধর্ম্মদাস বাবু একটু চিন্তান্বিত হইলেন। সেই সময় একজন ধনাঢ্য বিধবা ধর্ম্মদাস বাবুকে তাঁহার সম্পত্তি তদারক করিবার ভার দিতে চায়, কিন্তু নানা লোকে নানা ভাংচি দেয়, বিশেষ ভুবনের সম্পত্তি লওয়ায় পাড়ায় তাঁহার বিশেষ নিন্দা রটিয়াছে। ভুবনের সম্পত্তি যদি ঐরূপে ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে লোকের নিন্দা আর বিধবা মানিবে না। আর কেশের তৈল লইয়া তো তিনি অপরির্য্যাপ্ত রোজগার করিবেন। ধর্ম্মদাস বাবু বলিলেন, আচ্ছা সন্ন্যাসী যেরূপ বলে আমি সেইরূপই করিব, তাহা হইলে আমায় দিবি?"

ভুবন। মশায়, আর লাখ খানিক টাকা দিতে হবে।

ধর্ম্ম। না না, অত নয়, তোরে হাজার পঞ্চাশেক দেবো।

ভুবন। মশায় প্রতিপালক, আপনার অনুরোধ কিরূপে ছাড়াব,—তাই করবেন।

ধর্ম্ম। তবে দেখ্, আমি উকীল এনে সব লেখাপড়া করি?

ভুবন। তা করুন।

ধর্ম্ম। কিন্তু দেখ্, আমি যে তেলের মসলা জেনে নিয়ে তোর বিষয় ফিরিয়ে দিয়েছি, একথা কারুকে বল্‌তে পারবিনি।

ভুবন। আপনি যদি মানা করেন, আমি কেমন করে বলবো!

ধর্ম্ম। দেখিস্—খবরদার।

ভুবন দিব্য করিয়া স্বীকার পাইল, এ কথা সে কাহাকেও বলিবে না। আর তৈলের কথা অন্য কেহ জানেও না। কাকেই বা বল্‌বো, কে অত দর দিয়া নেবে। আপনি মুরুব্বি, আপনাকে এসেই বলেছি। ভালমন্দ কি কর্‌বো না কর্‌বো, সে আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে আর কার সঙ্গে কর্‌বো বলুন?

ধর্ম্ম। বেশ বেশ, তা হলে আমি লেখাপড়া সব ঠিক করি?

ভুবন। যে আজ্ঞে।

দুইদিন পরে ধর্ম্মদাস বাবু ভুবনকে ডাকাইলেন, ভুবনও তাঁর এক বাল্যবন্ধু এটর্নীকে সঙ্গে করিয়া আসিল। লেখাপড়া সব ঠিক, ভুবন দলিল পাইল, রেজিষ্টারী করা দলিল ভুবনের এটর্নী লইয়া যাইল। অন্দরের এক নিরিবিলি ঘরে ভুবন তৈল তৈয়ারী করিল। ধর্ম্মদাস বাবু কিরূপ তৈল তৈয়ারী করিতে হয় শিখিলেন। শুঁকিয়া দেখিলেন, ভুবনের হাতে-যে তেলের শিশি দেখিয়াছিলেন, সে তৈলেরও যেরূপ গন্ধ, ইহারও সেইরূপ। মালমসলাও শিখিয়াছেন। ভুবন চলিয়া গেল। ধর্ম্মদাস বাবুও তেলের শিশি লইয়া গাড়ীতে বাহির হইলেন।

চারি পাঁচদিন পরে একদিন ভুবন ধর্ম্মদাস বাবুর অবিদ্যার বাড়ী গিয়া উপস্থিত। সেখানে সেই মাগী ধর্ম্মদাসকে আগাগোড়া ঝাঁটাপেটা করিতেছে। ধর্ম্মদাস বাবু তেল মাখিয়া সিঁথের কাছে একটু টাক পড়িয়াছিল, তাতে চুল হওয়া দূরে থাক্, যে চুল ছিল, তাহা উঠিয়া গিয়াছে। এই নিমিত্তই ধর্ম্মদাস বাবুর শাসন হইতেছিল। ভুবন যাইয়া বলিল, "মশায় সে সন্ন্যাসী বেটা বড় পাজী, এই দেখুন আমার মাথায় আবার পূর্ব্ববৎ টাক পড়িয়া গিয়েছে। ক্রোধে ধর্ম্মদাস বাবু ভুবনকে ধরিতে গেলেন, ভুবনের মাথায় হাত দেওয়ায় একটা টাকের পরচুলা ধর্ম্মদাস বাবুর হাতে আসিল। ভুবনের মাথায় যেমন চুল তেমনি। ভুবন আর দুইটা পরচুলা ফেলিয়া দিল। একটির উপর যেন টাকের উপর ছোট ছোট চুল, আর একটীতে তাহা অপেক্ষা বড় চুল। ভুবন বলিল, 'মহাশয় মাথায় এই তিন তিন খানা ছাল উঠে পূর্ব্ববৎ প্রায় হইয়াছে। এ কেশ তৈলের মসলা যাহা আপনি আমার নিকট শিখিয়াছেন, সে কথা আমি কাহাকেও বলিব না, একথা আপনাকে আমি আবার দিব্য করিয়া বলিতেছি।' এই বলিয়া ভুবন হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। শুনা যায়, কোনও অজ্ঞানিত কারণে বিধবাও তাহার সম্পত্তি তদারকের ভার ধর্ম্মদাস বাবুকে দেন নাই।

চন্দ্রালোকে।

লেখক—শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার ঠাকুর এম, এ,

যখন প্রদোষের রক্তিমচ্ছটা নিশার আঁধারে মিশিতে ছিল, যখন প্রকৃতি দেবী সমস্ত দিনের নিদাঘে পরিতপ্তা হইয়া, প্রদোষে নিস্কৃতিলাভ সূচক নিশ্বাস বায়ু ত্যাগ করিতেছিলেন, যখন প্রদোষ ও নিশার সংঘর্ষে নিশা-দেবীর জয়লাভ হইয়া, তৎসূচক বিজয় পতাকা পূর্ণচন্দ্ররূপে প্রদোষ-কালীন রক্তিম-রাগরঞ্জিত নীলাকাশ-স্থিত দণ্ডে হাসিতে হাসিতে-উড্ডীন হইতে ছিল, সেই সময়ে সংসার কোলাহল সম্পীড়িত জনৈকমানব সিন্ধুতীরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া, নিকটস্থ বালুকা রাশির উপর বসিবার নিমিত্ত এক সুন্দর কক্ষে আসিয়া উপনীত হইলেন। প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় শোভা তাঁহাকে সমস্ত শোক তাপ ও অধ্বক্লম ভুলাইয়া দিয়াছিল। ক্রমে শায়িত হইয়া নিদ্রাদেবীর সুকোমল সুখস্পর্শে আপ্যায়িত হইয়া, জীব জগৎ ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল যেন, তিনি স্থূল দেহের ভিতর আর আবদ্ধ নহেন; চিরকালের বন্দী যখন ছাড়া পাইয়াছে জানিতে পারে, তাহার যেমন মনের ভাব হয়, আমাদিগের বদ্ধ মানবেরও তখন সেইরূপ ভাব উপস্থিত হইল। সম্মুখে জলরাশির লাস্যলীলা উপরে চন্দ্র কিরণের লহরী; উভয়ের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার বোধ হইল, যেন তিনি আপনিই ক্রমে উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছেন। চন্দ্রকরকে অবলম্বন করাই তাঁহার পক্ষে সঙ্গত বোধ হইল। তিনি তাহা অবলম্বন করিয়া ক্রমে চন্দ্রলোকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চন্দ্রলোকে উপনীত হইলে, শশাঙ্করাজ তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলে, তিনি বলিলেন, "শশাঙ্ক রাজ! তুমি পুরুষ কি স্ত্রী, তাহা কি জানিতে চাহি। প্রতীচ্যকবিগণ তোমাকে স্ত্রীরূপে প্রসিদ্ধ করিয়া থাকেন, ও তোমাকে জলপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করেন, তুমি কি তাহাই? তোমার চক্ষু কি জলেভরা তাহা তো দেখিতে পাইতেছি না। প্রাচ্যকবিগণ তোমাকে কুমুদিনী নায়ক বলিয়া থাকেন। তুমি তাঁহাদিগের মতে পুরুষ পুঙ্গব। কুমুদিনী তোমার জন্য সারাদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া শুকাইয়া থাকে, তুমি তাহার নয়ন তারা। সত্য সত্যই কি তুমি তাহাই? কিন্তু তোমার পুরুষাকারের লক্ষণ কৈ? তোমার মুখ তো,—

As smooth as Hebe's unrazored lips.

তবে তুমি কি পুরুষ নহ? শশাঙ্ক উত্তর করিলেন, শুন জীব, যে, যেরূপ ভাবে আমাকে দেখে, আমি তাহার পক্ষে তাহাই।

কবিদিগের চক্ষে আমি উদয় পর্ব্বতে উদয় হই, ও, অস্তাচলে অস্ত যাই। আমার এখনকার রূপ কোন এক বিখ্যাত কবি এই রূপে বর্ণনা করিয়াছেন:—

"উদয়গূঢ় শশাঙ্কমরীচিভি
স্তমসিদূরতরং প্রতি সারিতে।
অলক সংযমনাদি লোচনে
হরতি বো হরি বাহনদিঙ্‌মুখং ॥"

মহাকবি বায়রণ বলিয়াছেন ;—

The moon is up, and yet it is not night.
Sunset divides the sky with her,
... ... Heaven is free
From clouds, but of all colours seems to be
Melted to one vast Iris of the west
Where the may joins the Past Eternity
while on the other hand meak dians erett
Flows through the azure air—an
is lond of the blest.

এইরূপ ভিন্ন কবির রুচি অনুসারে আমার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দেখিতে পাইবে। কুমুদিনী আমার জন্য পাগলিনী বটে। আবার দেখ, মানব জাতির মধ্যে বিরহিনীরা আমাকে চায় না। দর্শনকার জলদ গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন, "চন্দ্রচন্দন রোলম্বরুতাদ্যুদ্দীপনংমতং।"

কিন্তু আবার দেখ মানব নায়িকা যখন নায়ককে পায় তখন আমিই আবার তাহাদের পরম সোহাগের বস্তু।

"পাদাস্ত এব শশিনঃ সুখয়ন্তি গাত্রং।
বাণাস্ত এবমদনস্য মমানুকূলাঃ ॥"

কিন্তু আমি নিজে জানি না আমি কাহার পক্ষে ভাল ও কাহার পক্ষে মন্দ। আমি কাহার পক্ষে স্ত্রী ও কাহার পক্ষে পুরুষ ;—আমি জগতের নিয়মের বশে আপনার Duty বা কর্ত্তব্য পালন করিতেছি, সুখই বা দুঃখইবা হউক কিছু দেখিয়া আমার মন কর্ত্তব্য পন্থা হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। এই বলিয়া ভগবান শশাঙ্ক আমাদের বদ্ধজীবকে বলিলেন, জীব নিকটে আইস।—জীব নিকটে আসিয়া দেখেন, সুন্দর অট্টালিকা। চারিদিক ফুলের সৌরভে দিঙ্‌মণ্ডল পূরিত হইয়াছে। মনুষ্যগণ আনন্দে বিভোর। বীণার মধুর নিক্কণে কর্ণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইতেছে। হাবে ভাবে সবই মনোহর। শশাঙ্করাজ জিজ্ঞাসিলেন, কি দেখিতেছ ? জীব উত্তর করিল, এমন সুন্দর দৃশ্য কখনও চক্ষে দেখি নাই। বুঝি বা ইহা কল্পনারও অতীত। চন্দ্রদেব উত্তর করিলেন, এই দিকে আইস। জীব আসিলেন, দেখিলেন চন্দ্রালোকে

উদ্ভাসিত এক কুটীর কক্ষে অপরূপ রূপলাবণ্যযুতা সুন্দরী; সুন্দরী অনিন্দিতা বটে, কিন্তু বিষাদে শীর্ণ দেহা, বিলাপই তাহার অঙ্গের ভূষণ-পরিদেবনে দিঙমণ্ডল মুখরিত করিতেছে, তাহার জীবন সর্ব্বস্ব ধন পতিদেবতা আজ কয়েক দিন হইল তাহাকে ত্যাগ করিয়া অমর ধামে যাত্রা করিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে জীব দেখিলেন যে, অন্য দিকে এক পাগলিনী মাতা তাহার চিরপলায়িত পুত্রের জন্য পরিতাপ করিতেছেন। এসব দৃশ্য দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে জীব কহিলেন, "চন্দ্রদেব এ সকল দৃশ্য আর দেখিতে পারিব না। নিজে জ্বালায় দগ্ধ হইয়া সুশীতল সিন্ধু বারির নিক্ষেপে ও তত্ত্বথ সমীরণে আপ্যায়িত হইতে ছিলাম। তোমার কোমল কর স্পর্শে আমার নিজের জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া ছিলাম। সুখে লঘুতর দেহে তোমার লোকে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসিয়া পড়িলাম। এখন এ আবার কি? দুঃখ কি কোথায়ও আমার সঙ্গ ছাড়িবে না। চন্দ্রদেব উত্তর করিলেন, "জীব! শুন দুঃখ মনে; দুঃখ কোথাও নাই অথচ সর্ব্বত্র বিদ্যমান। দুঃখের সার্ব্বজনীনতা যেমন, প্রসিদ্ধ, জ্ঞানীর চক্ষে দুঃখ রাহিত্যও তেমনি প্রসিদ্ধ। তোমার মত হৃদয় লইয়া কাজ করিতে হইলে, আমি এতদিন জীবিত থাকিতাম না। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে একাল পর্য্যন্ত দুঃখ দেখিয়া আমার মুখমণ্ডল মলিন বটে, কিন্তু কতই দুঃখ দেখিলাম! এখনও মরি নাই। বুঝি বা ভ্রান্ত মানব সেই নিমিত্তই আমাকে যক্ষ্মারোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। আমার দুঃখ দেখারও অবসান নাই ও দুঃখ ঘুচাইবারও ক্ষমতা নাই। বর্ত্তমান কালের কয়েকটী ছবি দেখিলে, অতীতের ছবি কয়েকটী দেখিবে কি? জীব বলিলেন, অতীতের ছবি এখন কিরূপে দেখিব? চন্দ্রদেব বলিলেন বিশ্বের নিয়ম এই যে, এখানে কোন দৃশ্য বা কোন কিছুই নষ্ট হয় না। যে দিন আচ্ছাদ সরোবর তীর চন্দ্রাতপের দারুণ পীড়া জীব জগতে অনুভূত হইয়াছিল, সেদিন এখনও বর্ত্তমান দেখিতে পাইবে? অথবা, যে দিন চন্দ্রালোক সাহায্যে সহৃদয় ভ্রাতা সোদরার অনর্থকারীদিগকে সন্ধান করিতে ছিলেন, তাহারও দৃশ্য এখনও বর্ত্তমান, মহাকবি মিল্টন যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ, ও নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিয়া লও সেই ছবি এই কিনা:—

Unmuffle, ye faint stars ; and thou fair moon,
That wontot to love's the traveller's benison
Stoops thy pare visage through on amber cloud
And disin her it chaos the reisgns here
In double nigbt of darkness and of shade

Comus.

চন্দ্রদেব কহিলেন, "এই দিকে আইস। জীব দেখেন অশোক বনে, জানকী দেবী চন্দ্রালোকে মুহ্যমান, হা হতোহস্মি তাঁহার বুলি;

ক্ষিতিক্ষমা পুষ্করসন্নিভেক্ষণা
যা রক্ষিতা রাঘবলক্ষ্মণাভ্যাং।
সা রাক্ষসীভির্বিকৃতেক্ষণাভিঃ
সংরক্ষ্যতেসংপ্রতিবৃক্ষমূলে॥
হিমহতনলিনীবনষ্টশোভা
ব্যসনযৎপরয়ানিপীড্যমানা
সহচররহিতেব চক্রবাকী
জনকসুতা কৃপণাংদশাংপ্রপন্না॥"

এদিকে জ্যোৎস্না জালে রাবণপুরী উদ্ভাসিতা। সরোবরে হংসেরন্যায় নভঃ সরোবরে "পোপ্লূয় মানং সরসীব হং সং" দ্যুতি ধারণ করিয়া চন্দ্রদেব বিরাজ করিতেছেন। সে চন্দ্রের শোভা বর্ণনাতীত আদি কবি তাঁহার বর্ণনায় হার মানিয়াছেন।

"যাভাতিলক্ষ্মীর্ভুবিমন্দরস্থা
যথা প্রদোষেষু চ সাগরস্থা।
তথৈব তোয়েষু চ পুষ্করস্থা
ররাজ সাচারু নিশাচরস্থা॥
হংসোযথা রাজতপঞ্জরস্থঃ;
সিংহোযথা মন্দরকন্দরস্থঃ।
বীরোযথা গর্ব্বিত কুঞ্জরস্থঃ
চন্দ্রোহপি বভ্র জাতথাম্বরস্থঃ॥

এইত গেল প্রাকৃতিক শোভা। রাবণ পুরীরও শোভা অনির্ব্বচনীয়। তথায় জ্যোৎস্না জাল বিধৌত নানাবিধ পুষ্পক রথ বিরাজ করিতেছে। অভিসারিকাগণ বৃক্ষতলে প্রেমালাপ করিতেছে, হর্ম্যে হর্ম্যে, কক্ষে কক্ষে, মোহন দৃশ্য কোথায় বা

স্ত্রিয়োজ্বলন্তীস্ত্রপয়োপগূঢ়া
নিশীথকালে রমণোপগূঢ়া।
দদর্শকাঞ্চিৎ প্রমদোপগূঢ়া
যথাবিহঙ্গাবিহগোপগূঢ়া॥

অঙ্কাঃপুনর্ষ্যত লোপবিষ্টা
স্তত্রপ্রিয়াঙ্কেষু সুখোপবিষ্টাঃ।
ভক্তঃপরাধর্ম্মপরানিবিষ্টঃ।
দদর্শধীমান মদনোপবিষ্টাঃ।।”

এই সকল দৃশ্য দেখিয়া জীব কহিলেন, চন্দ্রদেব তুমি পরম বিসদৃশতার অবতার বটে। সত্যই কি তোমার উন্মাদিনী শক্তি আছে, যাহার বলে তুমি সকলকে মাতাও, নিজে কিন্তু স্থির থাক। চন্দ্রদেব উত্তরিলেন, একদিন এইরূপ বাসন্তী রজনী যোগে মহাকবি সেক্ষপীয়রের চক্ষে পরীরাজ্যের রাণী টিটানিয়া দেবী গর্দ্দভ মুণ্ড ধারী বটমের সহিত প্রেমালাপ করিয়াছিলেন, ও প্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়া কবিবরের কোন নায়িকা এইরূপ মোহন রজনীযোগে বলিয়াছিল—

“Methinks the moon olooks with a watory eye”

আমার কিরণের প্রভাব শুনিবে কি?—

“দুগ্ধাতুগ্ধধিয়া গবাংবিধতে কুম্ভানধোবল্লবাঃ।
কর্ণে কৈরবশঙ্কয়া কুবলয়ং কুর্ব্বন্তিকান্তা অপি।।
কর্কন্ধুফলমুচ্চিনোতি শবরীমুক্তাফলাকাঙ্খয়া।
সান্দ্রাচন্দ্রমসো নকস্তকুরুতেচিত্তভ্রমং চন্দ্রিকা।।”

আমার জ্যোৎস্নার এমনি প্রভাব যে গোপগণ জ্যোৎস্নালোকে বিহ্বমানা গাভীদিগের দুগ্ধ ক্ষরণ হইতেছে আশঙ্কা করিয়া গাভীর তলদেশে ভাণ্ড স্থাপন করে, ও নিষাদ কন্যকাগণ জ্যোৎস্নাজালে উদ্ভাসিত বদরীফল সমূহকে মুক্তাফল ভ্রমে উত্তোলন করে। প্রাচ্য দেশীয় কবিদিগের চক্ষে যে আমার এইরূপ ক্ষমতা বর্ণিত হইতেছে। প্রতীচ্য কবিগণও বলিয়াছেন।

Soon will the moon and all her stars be here!
A smiling light proclaims her on yon hill,
My heart forgets all thought of human ill,
And man seems happy as his place of birth.
All things that yield him joy my spirit fill
With kindred joy! and even his humblest mirth
Seems at this peaceful hour to beautify the earth.

জীব কহিলেন, চন্দ্রদেব, যাঁহার এতদূর ক্ষমতা, তিনি পুরুষ ভিন্ন আর কিছু নহেন;—আপনার ক্ষমতা শুধু মানবের মনোরাজ্যে আবদ্ধ নহে, জ্যোতিষী-দিগের মতে, তাহাদিগের ভাগ্যেরও আপনি বিধাতা। শুধু তাহাই নহে, জড়জগতে আপনার ক্ষমতা অপ্রতিহত, তাহা না হইলে সিন্ধু আপনার কিরণ প্রভাবে উজ্জ্বল হইতেন না। কবি বলিয়াছেন।—

“ইতঃস্তুতিঃ কা খলুচন্দ্রিকায়াঃ
যদব্ধিমপ্যুত্তরলীকরোতি।।”

এতদূর ক্ষমতাবান হইয়াও আপনি বিনাড়ম্বরে স্বকার্য্য সাধন করেন ইহাই বিচিত্র। চন্দ্রদেব উত্তর করিলেন, ক্ষমতা থাকিলেই যে তাহার জাহির করিতে হইবে এরূপ আমার স্বভাব ধর্ম্ম নহে। দেখ আদি কাল হইতে, সোম দেবতার স্তোত্র বেদাদিতে দেখিতে পাইবে, কিন্তু সে সকল শুনিয়া আমার গর্ব্বা-হঙ্কার কিছুই হয় না। যেখানে দ্বন্দ্ব, সেখানে আমি নাই। যখন সূর্য্যদেব আসিয়া নভোমণ্ডলে, স্বীয় প্রখর রশ্মিজাল বিস্তার করেন, তখন তারাগণ সহিত আমি এক পার্শ্বে লুকাইয়া থাকি;—রাহু আমাকে আক্রমণ করেন, কিন্তু আমি বাধা দিই নাই, সেই নিমিত্ত এ কাল পর্য্যন্ত, স্বভানু আমাকে কবলিত করিতে পারে নাই, জানিবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শক্তি ক্ষয় হয়। তাহার ফল বিনাশ। যে জীব এই মহা-বাক্যের অর্থগ্রহ করিয়াছে, সেই প্রকৃত রূপে দীর্ঘকাল জীবন্ত থাকে। তোমা-দিগের সংসারে বাধা বিপত্তি প্রতি পদে পদে, কিন্তু যে জীব বাধা বিপত্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া "প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়ে না পরাজিতা" এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া চলে, সেই উত্তরকালে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। জীব কহিলেন, চন্দ্রদেব! তোমার মৃদুরশ্মির গুণ-গ্রামের প্রভাব খরতরকরধারী সূর্য্যদেবের অপেক্ষা কিছু কম নহে, সত্য বটে সূর্য্যদেব না থাকিলে, জগত লয় পাইবে, কিন্তু তোমা সম্বন্ধে তাহাই। সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি সোমরূপে ওষধি সকলের পোষণ করেন। ওষধিই জগতের প্রাণ "পুষ্ণামিচৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমোভূত্বারসাত্মক।"

অতএব তোমাকে প্রণাম করি, এক্ষণে শরীর মন আপ্যায়িত হইয়াছে স্বধামে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। কোনপথে যাইব দেখাইয়া দিন, চলিয়া যাই। চন্দ্রদেব কহিলেন, "যেপথে আসিয়াছ সেই পথেই যাইবে" জীব তাহাই করিলেন," নিদ্রাভঙ্গে দেখেন যে সমুদ্রতীরস্থ যে কক্ষে নিদ্রিত হইয়াছিলেন, সেইখানেই আছেন

গীত—

সোহিনী,—ঝাঁপতাল।—

দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু কর-দান।
ভুলনা চরণে রেখ, তোমাতে সঁপেছি প্রাণ॥
নররূপে অবতরি, কতলীলা কর হরি।
লীলাময় তবলীলা কে করিবে পরিমাণ॥
শাঁসিয়া দুর্জ্জনগণে, দানব দৈত্যদলনে,
মহিমা প্রকাশ কর, সাধুগণে পরিত্রাণ॥
ব্রজগোষ্ঠে গোচারণে, রুক্মিণে রাখালগণে,
ধেনু সনে বনে বনে, রাধাগুণ কর গান॥
বৃন্দাবনে গিরিধর অধরে মুরলী ধর, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর,
ক্ষণে হও অন্তর্ধ্যান॥
সত্ত্ব রজ তমো তুমি, ব্যাপিয়াছ বিশ্বভূমি,
কাতরে ডাকি হে আমি, কর প্রভু পরিত্রাণ।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ



স্বর্গীয় দ্বারকানাথ সেন।

প্রলয়কাল ব্যতীত চন্দ্রপাত হয় না, অকালে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ জগতের-চন্দ্রপাত হইয়াছে! মহামহোপাধ্যায় অদ্বিতীয় কবিরাজ মহাত্মা দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহাশয় ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। গত ২৯শে মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি দশম ঘটিকার সময় কলিকাতার ভাগীরথী তীরে তাঁহার অমূল্য জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে! আয়ুর্ব্বেদ সংসার অন্ধকার হইল। শাস্ত্রজ্ঞ সু-পণ্ডিত কবিরাজ বলিয়া গৌরব করা যায়, এমন মহামহিম কবিরাজ আর রহিল না! দেশের মহা দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। মহা-মহা শঙ্কট পীড়ায় কবিরাজ মহাশয় আহুত হইলে তাঁহার দর্শন মাত্রেই রোগীগণ যেন অর্দ্ধেক রোগমুক্ত হইল, এইরূপ ধ্রুব বিশ্বাস করিত। ব্যবসার অনুরোধে ক্ষণকাল মাত্র বিদ্যুতের ন্যায় রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া, জীব দেখিয়া, পেট টিপিয়া, দর্শনী গ্রহণ করিয়াই তিনি বিদায় হইতেন না, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত রোগীর শয্যার নিকটে শান্তভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া, বিশেষরূপে রোগীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, অভিনিবেশ পূর্ব্বক সুস্থির কর্ণে রোগের যাবতীয় লক্ষণ শ্রবণ করিয়া, বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক উপযুক্ত

ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন; জীবনের আশা নাই, তাহা বুঝিতে পারিয়াও কদাচ রোগীর সাক্ষাতে অথবা পরিজন-বর্গের নিকটে বিমর্ষ-বদনে হতাশ বাক্য উচ্চারণ করিতেন না; প্রফুল্ল বদনে সকলকেই অভয়দান করিতেন; রোগ শয্যার নিকটে তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিলে সকলেরই জ্ঞান হইত. যেন স্বর্গ হইতে সাক্ষাত সুরবৈদ্য ধন্বন্তরিদেব আবির্ভূত হইয়াছেন। হায়, হায় হায়! তাদৃশ দেবোপম কবিরাজ আর আমরা দেখিতে পাইব না! একটি মহাপুরুষের তীরোধানে কত কাল পরে আবার তৎ-তুল্য আর একটি মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, কেহই তাহা নির্ণয় করিয়া বলিতে পারেন না; জগতের ইতিহাসেও তাহার পরিচয় অল্প। কবিরাজ দ্বারকানাথের বিয়োগে সমগ্র ভারতবর্ষ শোকাভিভূত হইয়াছেন; আমরা গভীর শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি।

১২৫১ সালের বৈশাখ মাসে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খান্দার পাড়া গ্রামে দ্বারকানাথ জন্ম গ্রহণ করেন।

দ্বারকানাথ জননীর অষ্টম গর্ভের সন্তান; সচরাচর অষ্টম গর্ভের সন্তানেরা স্বাভাবিক প্রতিভাবলে ইহ-সংসারে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করেন; কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন তৎপ্রমাণে মূর্ত্তিমান প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। শাস্ত্র জ্ঞানে তাঁহার উপাধি হইয়াছিল কবিরত্ন; বাস্তবিক তিনি একটি মহারত্ন ছিলেন; ভাগ্যদোষে আমরা সেই মহারত্ন হারাইয়াছি!

বঙ্গের বৈদ্যকুলে পূর্ব্ব বঙ্গের শক্তি গোত্রীয় বৈদ্য মহাশয়েরা—কুলেমানে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ; কবিরাজ দ্বারকানাথ সেই মহাবংশ সম্ভূত। এই বংশে মহামহোপাধ্যায় অভিরাম কবীন্দ্রের উদ্ভব হইয়াছিল, তিনি রাজা সীতারাম রায়ের প্রধান সভাপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার পুত্র দুর্গাদাস শিরোমণি শাস্ত্র বিশারদ বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন।

কবিরাজ দ্বারকানাথ কবিরত্নের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ সুপ্রসিদ্ধ শঙ্কর সেন, একজন মহারথী অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার একটি ছাত্র স্বনামখ্যাত গোপাল কর। "রসেন্দ্রসার সংগ্রহ" নামক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ সেই গোপাল করের প্রণীত।

কবিরাজ মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত টোলে অধ্যয়ন করিয়া বঙ্গের অনেকগুলি কবিরাজ সুচিকিৎসক নামে যশোস্বী হইয়াছেন। কুমারটুলির বিখ্যাত কবিরাজ স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেনের পিতা নীলাম্বরসেন মহাশয়, দ্বারকানাথের পিতামহের ছাত্র ছিলেন; পিতামহের নাম রাম সুন্দর সেন।

কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন বাল্যাবস্থায় বিক্রমপুরের টোলে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া তৎপরে মুর্শিদাবাদের সুবিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাধরসেনের চতুষ্পাঠিতে

ন্যায় শাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র, উপনিষদও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া তিনি ১২৮১ সালে কলিকাতায় আইসেন; এই ৩৫ বৎসর কাল এ প্রদেশে চিকিৎসা করিয়া সর্ব্বজনের প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন। কেবল বঙ্গদেশে নহে, ভারতের নানা স্থানে সুচিকিৎসা গুণে তাঁহার সু-নাম চির-স্মরনীয় হইয়া আছে। মিবারের মহারাণার একটি পুত্র গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলে মহারাণা বাহাদুর "ভারতবর্ষের আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ সর্ব্ব-প্রধান চিকিৎসককে" তথায় প্রেরণের নিমিত্ত ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টেকে এক অনুরোধ পত্র প্রেরণ করেন, গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে অদ্বিতীয় আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয়কেই নির্ব্বাচন করিয়া রাজ-স্থানের মিবার রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপনাকার্য্যেও কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল, তাঁহার নিকটে শিক্ষা লাভ করিয়া বহুতর ছাত্র ভারতের বহু স্থানে চিকিৎসা ব্যবসায়ে যশোলাভ করিতেছেন। মাদ্রাজ, বোম্বাই, হায়দরাবাদ, মহারাষ্ট্র, জয়পুর, মুলতান, লাহোর, দিল্লী ও রত্নাগিরী প্রভৃতি স্থানে তাঁহার অনেক ছাত্র আছে।

শাস্ত্রজ্ঞতা ও সুচিকিৎসার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া যথার্থ সৎগুণের পুরস্কার স্বরূপ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বগুণান্বিত পণ্ডিত দ্বারকানাথ কবিরত্ন মহাশয়কে স্বগৌরবে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। মহা-মহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ কবিরত্ন মহাশয় কেবল সুচিকিৎসা গৌরবে গৌরবান্বিত, এমন নহে, তিনি সুকবি, দার্শনিক, অলঙ্কারিক, নৈয়ায়িক, ও বৈয়া-করণ ছিলেন; স্মৃতি শাস্ত্রেও তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল। সম্প্রতি তিনি সুশ্রুত গ্রন্থের একখানি টীকা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয়, তাহা সমাপ্ত হইল না; জীবনে কুলাইল না!

মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ কবিরত্ন মহাশয় অকাতরে দান ধর্ম্মে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার সমস্ত দানই সাত্ত্বিক; যাঁহারা দান প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারা ভিন্ন অপর কেহ তাহা জানিতে পারিত না। নিয়ত পর উপকারে তাঁহার অক্ষুণ্ণ মতি ছিল, পরের উপকার করিবার অবসর পাইলেই তিনি সহৃদয়তা গুণে অগ্রসর হইতেন; পুত্র তুল্য স্নেহে ছাত্রগণকে প্রতিপালন ও শিক্ষা প্রদান করিতেন; বিবিধ সৎকার্য্যে অসঙ্কচে মুক্ত হস্ত ছিলেন, উপার্জ্জন যথেষ্ট ছিল, কিন্তু অর্থ সঞ্চয়ে তাঁহার স্পৃহা ছিল না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতি তাঁহার বিশেষ সমাদর ছিল; অবকাশ

কালে তিনি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সমব্যবসায়ী চিকিৎসকগণের সহিত শাস্ত্রালাপ ও সদালাপ করিয়া চিত্ত সন্তোষ উপভোগ করিতেন; সমাজিক ব্যবহারে তিনি সদালাপী-মিষ্টভাষী-নিরহঙ্কার অমায়িক ও মিত্র বৎসল ছিলেন; তাঁহার ঔদার্য্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান আছে; গাম্ভির্য্যের সহিত তাঁহার বদনমণ্ডল নিরন্তর প্রফুল্ল থাকিত। ৬৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল, এ বয়সেও তাঁহার মুখ মণ্ডলে সুন্দর যৌবনশ্রী পরীলক্ষিত হইত; এই প্রবন্ধের শিরোভাগে তাঁহার যে চিত্র মূর্ত্তি প্রকটিত হইল, পাঠকমহাশয়েরা তাহাতেই তাঁহার প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন করিবেন।

এইস্থলে আর একটি বিষয় উল্লেখ যোগ্য। এতৎনগরে যাঁহারা ইংরাজী চিকিৎসা বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত, ইংরাজী চিকিৎসার-পক্ষপাতী, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উদার প্রকৃতি, তাঁহারাও কবিরাজ দ্বারকানাথের গুণের যথেষ্ট আদর করিতেন। একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, সুকীয়া ষ্ট্রীটের গবর্ণমেণ্ট হাঁসপাতালের ভার প্রাপ্ত রেসিডেণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত ডাক্তার ক্ষীরোদ কুমার দত্ত এম, বি, মহাশয়, যে সকল পুরাতন জটিল রোগীর চিকিৎসায় এলোপ্যাথি ঔষধের বিফলতা অনুভব করিতেন, সেই স্থলে পরামর্শ গ্রহণার্থ কবিরাজ দ্বারকানাথকে আহ্বাণ করিতেন। কবিরাজ মহাশয়ের সুব্যবস্থা গুণে সেই সকল রোগীর আশানুরূপ উপকার হইত। স্থূল কথায় আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি. এলোপ্যাথিক চিকিৎসক হইলেও ডাক্তার ক্ষীরোদ কুমার আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসার আন্তরিক পক্ষপাতী; বহু দর্শন প্রভাবে তিনি আয়ুর্ব্বেদোক্তি চিকিৎসার সুফল পরিজ্ঞাত হইয়াছেন।

নবাগত সভ্যতা ও বিলাসিতার কোন অঙ্গ এই মহানুভব কবিরাজ মহাশয়ের কোন অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই। পরিচ্ছদে কোন প্রকার জাঁকজমক কিংবা বিশেষ পারিপাট্য ছিল না; সেই চিরপরিচিত সাদা ধুতি, মোটা চাদর, চটিজুতা, তিনি বরাবর বজায় রাখিয়া ছিলেন। বাহ্যাড়ম্বরকে তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে ঘৃণা করিতেন। গরীবের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট দয়া ছিল; মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তিনি যেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের আলয়ে দর্শনী গ্রহণ করিতেন না, সমব্যবসায়ীগণের বাটীতে যেমন বিনা ভিজিটে দর্শন দিতেন, দয়া পরবশ হইয়া সেইরূপ গরীবের নিকটেও দর্শনী লইতেন না। পণ্ডিত দ্বারকানাথ কবিরত্ন কত মহৎ গুণের কবিরাজ ছিলেন, পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্মরণ করিয়া শোকার্ণবে ভাসিতেছেন।

ছয় সাত মাস পূর্ব্বে কবিরাজ মহাশয়ের সামান্য জ্বর ও উদরাময় হইয়াছিল, বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত তিনি গত ভাদ্র মাসে বারাণসী ধামে গমন করিয়া ছিলেন, তথায় কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থতা অনুভব করেন, কিন্তু উদরী রোগের লক্ষণ দৃষ্ট হয়; ১৬ই মাঘ তারিখে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন; এখানে দিন দিন সেই রোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ডাক্তার কবিরাজেরা আসন্ন মৃত্যুর কোন লক্ষণ অনুভব করিতে পারেন নাই। ২৮শে মাঘ বুধবার রজনীতে দু-একটা উপসর্গ উপস্থিত হওয়াতে ডাক্তারেরা আহুত হইয়াছিলেন, কবিরাজ মহাশয় স্বয়ং নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলেন, "আর কেন ডাক্তার, আমি ইংরাজী ঔষধ খাইব না, আমাকে মকর-ধ্বজ দাও; আমার সময় নিকট হইয়াছে।" মকরধ্বজ সেবন করান হইয়াছিল, বুধবারের রাত্রি সেই ভাবে কাটিয়াছিল, পরদিন বেলা নবম ঘটিকার সময় তীরস্থ করা হয়, রাত্রি দশম ঘটিকার সময় তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়াছে, তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, পবিত্র চন্দন কাষ্ঠে ঘৃত সংযোগে তাঁহার পুণ্যময় দেহ নিমতলার শ্মশানে ভস্মসাৎ করা হইয়াছে।

কবিরাজ মহাশয় তিনটি যোগ্য পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সেন বিদ্যাভূষণ, ইনি সংস্কৃত ভাষায় পরীক্ষা দিয়া স্বগৌরবে এম, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, মেডিকেল কলেজে শারীর-বিজ্ঞান অধ্যায়ণ করিয়াছেন, পিতার নিকটে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছেন, ইংরাজী এলোপ্যাথি মতে স্বদেশের আয়ুর্ব্বেদ মতের চিকিৎসায় ইনি পারদর্শী; চিকিৎসায় তিনি ইতিমধ্যেই দশের নিকটে যশের ভাজন হইয়াছেন। আহ্লাদের বিষয় অমায়িকতা নম্রতা ও মধুর ভাষিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহে তিনি তাঁহার পিতার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। মধ্যম পুত্রের নাম শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ সেন, ইনি এক্ষণে অধ্যায়ণ শেষ করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কনিষ্ঠ শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনাথ সেন, ইনি বর্ত্তমান বর্ষে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আমরা জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, ইহাঁরা তিন সহোদরে দীর্ঘজীবি হইয়া স্বর্গীয় পিতার গুণগৌরবে পিতার উপযুক্ত পুত্ররূপে গণনীয় হউন। সদ্‌গুণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করুন।

——:•:——

বেদে নাকি স্ত্রী ও শূদ্রজাতির অধিকার নাই ?

লেখক পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি।

প্রাচীন বিষয় আলোচনায় কি সুফল হয়, তাহা আজকাল আর কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়াস পাইতে হয় না। এক্ষণে কেবল প্রত্যক্ষ ফল দর্শাইতে পারিলেই যথেষ্ট হয়, বলিয়া এই প্রস্তাবে সেই বিষয়ের বিবৃতি হইতেছে। প্রায় সকল দেশেই উন্নতির অধঃপতনের পরে বিকৃতিসমুদায় তদ্দেশে আধিপত্য করিয়া থাকে। এদেশীয় যে সকল লোকে ইংরাজী ভাষায় চর্চ্চা রাখেন, তাঁহাদের নিকট ভিন্ন-দেশ-সংক্রান্ত ঐ প্রকার দৃষ্টান্তের কিছুমাত্রও অসদ্ভাব নাই; কিন্তু স্বদেশেও যে ঐরূপ বিস্তর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাঁহাদের তাহা জানিবার সুযোগ নাই; অবশ্যই তাহা অবগত হওয়া নিতান্ত বিধেয়—বিবেচনা করিয়া, অন্যএকটী বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

আমাদের দেশে স্মৃতি ও পুরাণ দ্বারা কত উপকার হইয়াছে, তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে গেলে, উহাদিগের দ্বারা কত অপকার হইয়াছে, তাহার তুলনা করা আবশ্যক। অন্যকার প্রস্তাবে স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারা সংঘটিত একটিমাত্র অনিষ্ট জনক বিষয়ের নির্দ্দেশ করিতেছি। স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে স্ত্রীলোক, শূদ্র ও পতিত ব্রাহ্মণের বেদ শ্রবণ করা অকর্ত্তব্য। (১) "পুরাণ"ও তদনুগামী। কিন্তু এটি নিতান্তই কৌতুকাবহ বৃত্তান্ত প্রমাণ দিবার পূর্ব্বে উদাহরণ দ্বারা একটী বিবরণ নির্দ্দেশ করা যাউক। কোন সুব্রাহ্মণ যদি কোন অন্ত্যজ-জাতীয় লোককে বলেন যে, "তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না; করিলে আমার আহারবন্ধ হইবে।" যদি তৎপরে এরূপ দৃষ্ট হয় যে, সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুরটি একাসনে বসিয়া তাহার উচ্ছিষ্ট অন্ন সচ্ছন্দ মনে ভক্ষণ করিতেছেন, তাহা যেরূপ হাস্যোৎপাদক হইয়া উঠে, উল্লিখিত "পুরাণ" সংহিতার নিষেধ বাক্যও তদ্রূপ উপহাস জনক বলিয়া প্রমাণ হয়, স্ত্রীলোককে বেদ শুনিতে নাই, এইটি "পুরাণের" ও স্মৃতির শাসন। আমরা এই প্রস্তাবে প্রদর্শন করিতেছি, স্ত্রীলোকের বেদশ্রবণ।

বেদ শ্রবণ তো সামান্য কথা, তাঁহারা তদপেক্ষা গুরুতর কার্য্যের অধিকারিণী ছিলেন। এই গুরুতর অধিকার-বেদমন্ত্ররচনা।

---

(১) "স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।"

তদর্থং "ভারতংচক্রে কৃপয়া পরয়া মুনিঃ॥ ভাগবত।

(১) বেদব্যাসপ্রণীত "সর্ব্বানুক্রম"-গ্রন্থে দৃষ্ট হইতেছে, রোমশা, বিশ্ববারা, ইন্দ্রমাতৃগণ, আম্ভৃণী বাক্, দেবজামি, অগস্ত্যপত্নী লোপমুদ্রা প্রভৃতি ভূরি ভূরি-বরারোহা, বেদমন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন! রোমশা ও বিশ্ববরা, যে, যে ঋক্ প্রণয়ন করেন, তাহার মধ্যেই "রোমশার" (২) ও "বিশ্ববারা" নাম রক্ষিত ও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; সুতরাং ইহা অপলাপ করিবার উপায় নাই। লোপা মুদ্রার ও অগস্ত্যের পরস্পর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই ঋগ্ বেদ সংহিতার মধ্যে বেদব্যাস কর্ত্তৃক সন্নিবেশিত হইয়াছে; অতএব ইহাও লোপা-মুদ্রার প্রণীত বলিয়া অখণ্ডনীয় প্রমাণ-সহকারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইন্দ্রমাতৃগণ, বাক্, দেবজামি ইত্যাদির বেদশাস্ত্র প্রণয়ন বিষয়ে বেদের সংগ্রহকর্ত্তা বেদব্যাস ও বেদের ব্যাখ্যাকার "সায়ন" মহোদয়ের কথাই প্রামাণ্য। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক যে, অদ্বৈতবাদ-মত-প্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্য ও উপনিষৎকারদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ "সোঽহং" "তত্ত্বমসি" "অহংব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি মত প্রচার করিয়া যান, তাহার মূল "বাক্" প্রণীত অষ্ট-মন্ত্র। সেই আটমন্ত্রের সাধারণ নাম দেবীসূক্ত অর্থাৎ বাক্‌দেবী-বিরচিত মন্ত্রসমষ্টি। সেই দেবীসূক্তের ভাবাকর্ষণে মার্কণ্ডেয় পুরাণঅন্তর্গত "চণ্ডীমাহাত্ম্য" পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছিল। এইটী ভারতীয় মহিলা কুলের অসাধারণ গর্ব্বের স্থল, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

(২) স্মৃতির মতে শূদ্রের বেদসংহিতাশ্রবণে অধিকার নাই। এস্থলে আমরা প্রদর্শন করিতেছি শূদ্র কেন, দাসীপুত্রেও বেদ রচনা করিয়াছেন।

(ক) কবষ নামে এক ঋষি ঋগ্বেদসংহিতার ১০ম মণ্ডলের ত্রিংশ হইতে চতুস্ত্রিংশ সূক্ত প্রণয়ন করেন, কিন্তু তিনি শূদ্র তো বটেনই, তদপেক্ষাও তাঁহার বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে। তিনি দাসী-পুত্র! কেন না, কৌষতীকী ব্রাহ্মণ গ্রন্থে তাঁহার ঐ বিষয়ের বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন সময়ে সরস্বতী নদী তীরে যজ্ঞ হইতেছিল। তথায় অন্যান্য ঋষি মুনির ন্যায় কবষও উপস্থিত ছিলেন, ঋষিরা তদুপলক্ষ্যে তাঁহাকে দাসীতনয় বলিয়া উক্ত হন, 'তুমি দাসীর সন্তান, তোমার সহিত আমরা আহার করিব না।" (৩) এতদ্দ্বারা জানা গেল, তখন জাতিভেদ আরম্ভ হইয়াছে। তিনি অতিশয় সুবিখ্যাত ছিলেন, নতুবা 'কৌষী-তীকী ব্রাহ্মণ ভিন্ন "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ" (৪) ও "ঋগ্বেদ সংহিতাতে" ও তাঁহার

(২) নামান্তর—'লোমশা"। নিয়মঃ—"ড—ল-য়ো-রভেদঃ।"—ব্যাকরণ-কারিকা।

প্রসঙ্গ, কেন দেখিতে পাইতেছি ? ঋগ্বেদসংহিতায় লিখিত আছে,— "বজ্রবাহু ইন্দ্র-শ্রুত, কবষ, বৃদ্ধ ও দ্রুহ্যুকে ক্রমান্বয়ে জলমগ্ন করিয়াছিল।" (৫) প্রসিদ্ধির অন্য কারণও আছে। "তুর"-নামক তাঁহার এক তনয়, জনমেজয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। (৬)

"কাক্ষীবান্" ঋষিও যে, দাসীর গর্ভোৎপন্ন,—তাহা দ্বৈপায়ন স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (৭)। (খ) তিনিই আবার "ঋগ্বেদ সংহিতার" (প্রথম) মণ্ডলের ১১৬ (ষোড়সাধিক শততম) হইতে ১২৬ (ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম) সূক্তের (৮) প্রণেতা কাক্ষীবানের বৃত্তান্ত নবম-মণ্ডলেও দৃষ্ট হয়। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়াও স্বজাতীয়ের নিকটে দান গ্রহণ করিতেন। 'স্মৃতির" মতে ইহা নিষিদ্ধ কার্য্য ; অথচ তাঁহার ঐ বিষয়ে অধিকার ছিল। এতদ্দ্বারা সুস্পষ্টই বোধ হইতেছে, "কবষ" অপেক্ষাও তাঁহার সমাজে অধিক ক্ষমতা ছিল। এই কাক্ষীবানের বিবরণ, মহাভারতের সভাপর্ব্বে চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে এবং অনুশাসন পর্ব্বের পঞ্চাশতধিক শততম অধ্যায়ের ত্রিংশ শ্লোকে ও পঞ্চষষ্ট্যাধিক শততম অধ্যায়ের সপ্তাধিক ত্রিংশৎ শ্লোকে উক্ত আছে। অতএব ইনি স্বনামখ্যাত এক অসামান্য ঋষি।

(গ) "রৈক্য" বর্ণাশ্রমহীন ছিলেন। তখন তাঁহার বেদ-শাস্ত্রে অধিকার ছিল ; এবং তদনুসারে তিনি লোককে জ্ঞান বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুদের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র-বেদান্ত । গ্রন্থেও ঐ বর্ণাশ্রমহীনের শাস্ত্রাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত আচারাদির অনুসরণ না করিলেও, ঈশ্বরপ্রার্থী ব্যক্তির ধর্ম্মানু

---

(৩) (৪) ২।১৯ দেখ। "দাস্যা বৈ ত্বং পুত্রোঽসি, নঃ বয়ং ত্বয়া সহ ভক্ষয়িষ্যামঃ।" [কৌষীতকি ব্রাহ্মণ।"]।

(৫) অধশ্রুতং কবষং বৃদ্ধমপ্স্বনু দ্রুহ্যুং নি বৃণগ্বজ্র বাহুঃ।"—[ঋগ্বেদসংহিতা]

(৬) "এতেনহরণ ঐন্দ্রেণ মহাভিষেকেন তুরঃ কাবষেয়ো জনমেজয়ং পারিক্ষিতমভিষিষেচ, তস্মদু জনমেজয়ঃ পারিক্ষিতঃ সমং তৎ সর্ব্বতঃ পৃথিবীং জয়ন্ পরীয়ায়।"—[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

৭ মণ্ডল। ১৮ সূক্ত। ২১ ঋক্।]

৮ পঙ্‌ক্তি। ২১ ।]

ষ্ঠানে অধিকার থাকে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে চল, আর নাই চল, ঈশ্বর আরাধনার বাসনা থাকিলেই, তাহা সিদ্ধ হইবে। (৯)

(ঘ) জানশ্রুতি রাজা শূদ্র ছিলেন, তথাপি "রৈক্য" ঋষি, তাঁহাকে বেদবাক্য দ্বারা সংবর্গ বিদ্যা উপদেশ দেন। (১০)

বাচক্নবী উল্লিখিত রৈক্যের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু ও গৃহস্থ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত এই চারি আশ্রমবহির্ভূত ছিলেন, তথাপি তিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, ও অন্যকেও জ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন।

সুস্পষ্ট রূপে যখন পরিদৃষ্ট হইল যে-শূদ্রে, দাসীপুত্রেও স্ত্রীলোকে, বেদের রচনা করিয়া গিয়াছেন, তখন পতিত ব্রাহ্মণ জাতির তাহাতে অধিকার থাকা, সপ্রমাণ করিবার প্রয়োজন নিরর্থক—ব্যর্থ—বিফল বা নিষ্ফল।

এখন পাঠক-পাঠিকারা অনুকম্পা-অনুগ্রহ-সহকারে বুঝিয়া দেখিবেন—আমাদের প্রশ্ন-মূলক সন্দর্ভ, সপ্রমাণ হইল কি না?

আমি।

লেখক, শ্রীহেমেন্দ্র নাথ সিংহ বি, এ,

ভক্তি,—কোটী জন্মের সুকৃতির ফল। আমার পূজ্যপাদ পিতামহদেব দেহত্যাগের মুহূর্ত্তে, যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া, সন্তান-সন্ততিগণকে যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত সর্ব্বোত্তম সম্পত্তি রূপে হৃদয়ে সঞ্চিত করিয়া রাখিবার যোগ্য। তাহা এই,—"যদি কোথাও পাও, তবে, কৃষ্ণভক্তি-রসভাবিতা মতিই অবশ্য ক্রয় করিও। তাহার একমাত্র মূল্য (কৃষ্ণে) লোভ,

---

(৭) "উসিক্ সংজ্ঞায়া-মঙ্গরাজস্য মহিষ্যা দাস্যাং দীর্ঘতমসোৎপাদিতঃ। কাক্ষীবানস্য সূক্তস্য ঋষিঃ।"—[সর্ব্বানুক্রম।]

(৮) ইহার মধ্যে কেবল ৩৪ (চতুস্ত্রিংশ) সূক্তটী কোন কোন মতে মুজবতের পুত্র অক্ষ ঋষির রচিত, এবং কোন কোন মতে কবষেরই প্রণীত।

(৯) "অন্তরা চাপিদ্তু-ত-দৃষ্টেঃ।"[বেদান্তসূত্র, ৩ অধ্যায়, ৪ পাদ, ৯ সূত্র।]

(১০) "স তস্মৈ হোবাচ বায়ুর্ব্বাব সংবর্গঃ * * *"—

—[ছান্দোগ্য উপনিষদ্। ৪র্থ প্রপাঠক।]

ক্ষুধা, পিপাসা, লালসা। কোটী জন্মার্জ্জিত সুকৃতি বলেও, ঐ লোভ লাভ করা যায় না।"১

কথাটী তো বুঝিলাম, কিন্তু, সে দিকে মন যায় কই? ভগবান যে কেবল জোর করিয়া মনচুরি করিয়াই সন্তুষ্ট, তাহা নহে। তিনি মনোচোর হইলেও, চান যে, আমরা নিজ ইচ্ছাতে তাঁহাকে খুজিয়া লই,—তাঁহার ইচ্ছার চরণে, নিজ ইচ্ছা বলি দি,—বিসর্জ্জন দি। তিনি চান্ না যে আমরা সংসারে অন্যের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, অন্যের সহিত একটুকু রসকৌতুকে যোগ দি।২ তিনি পার্শ্বে, নিকটে থাকিলে, আর কাহারও সহিত বাক্যালাপও করিতে দেন না?

আমার মন যায় সংসারের তব্লার চাটীর দিকে,—বাগ বাগিচা,—নাচ, গান, গাড়ি জুড়ি,—হৈ হৈ, রৈ রৈ করার দিকে। যম কিন্তু, আমি-র কেশ ধরিয়া, নচিকেতাকে(১) বুঝাইবার ছলে, সর্ব্বদাই আমাকে বুঝাইতেছেন,—"শ্রেয় ও প্রেয় বিভিন্ন। এই উভয় বিভিন্ন প্রকারে পুরুষকে আবদ্ধ করে। যে এই দুয়ের মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে, তাহার মঙ্গল হয়। আর যে প্রেয়কে (সুখকরকে, আপাত-মধুরকে) গ্রহণ করে, সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।১।

শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে আশ্রয় করে। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদিগের বিষয় সম্যক আলোচনা করিয়া পৃথক ভাবে, গ্রহণ করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে গ্রহণ করেন। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ) অভিলাষে প্রেয়কে গ্রহণ করেন। ২।

১। "কৃষ্ণ ভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপিমূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"—
রায় রামানন্দ কৃত শ্লোক। পদ্যাবলী।১২।

২। "Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the Lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the chidren, unto the third and fourth generations of them that hate me, and shewing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments."—Exodus. 20. 5.

হে নচিকেতঃ! তুমি রমণীয় ও আপাত-রমণীয় কাম্য বস্তু সমূহের চিন্তা-ত্যাগ করিয়াছ, এবং এই, বিত্তময় পথ, যাহাতে অনেক মনুষ্যই মগ্ন হইতেছে, তাহা অবলম্বন কর নাই।৩। * * *।

চিন্তাহীন ও ধনমোহে আচ্ছন্ন অবিবেকীর নিকট পরলোকের প্রয়োজনীয় উপায় প্রকাশিত হয় না। কেবল এই লোকই আছে, পরলোক নাই, এরূপ মনে করিয়া সে পুনঃ পুনঃ আমার (যমের, মৃত্যুর) অধীন হয়।৪।"

আমি মহা পেঁচে পড়িয়াছি। আমি-র কল্‌কবজা বিগড়াইলে, জীবন ক্ষেত্রটা ঠিক জরীপ কি প্রকারে করি? জরীপ যন্ত্র থিয়োডোলাইটের মত, ইহার একটী অস্থায়ী ও একটী স্থায়ী মেরামত (temporary and permanent adjustm ent) আছে। আমি অল্প বিগ্‌ড়ান সারিতে পারি। বেশী বিগ্‌ড়ান হইলে,—স্রচয়িতাকে,—কারিকরকে চাই। আমি কু-অভ্যাসের বশে চলিয়া, আমি-কে এমন বিগ্‌ড়াইয়াছি, রুগ্ন ও বিকৃতি করিয়াছি, যে শ্রেয় ও প্রেয় কি, উজ্জলভাবে দেখিতে পাই না।

দেহ যন্ত্রে তিনিই যন্ত্রী। আত্মারথে তিনিই রথী। আমি কেবল এই চেতন যন্ত্রটাকে টানিয়া লইয়া বেড়াই মাত্র! ঠিক পথে চলিবার জন্য, তিনি ভাঙ্গিয়া পিটিয়া মেরামৎ করিয়া না দিলে, আমি স্থায়ী মেরামৎ করিতে পারি না! স্থায়ী মেরামৎ তাঁহার হস্তে! তিনিই এই "চলন্তি,"—সচল মুর্ত্তে রথস্থ জগন্নাথ, পুরুষোত্তম! তাঁহাকে দেখিলে জীবন সার্থক হয়; মহানেরা বলেন।

আমি আমি আমি করি। দেখিতে দেখিতে, তো, সব ফুরাইল। দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ, মন, কিছুই প্রকৃত পক্ষে আমার রহিল না। কেহই আমার হইল না!

১।—"অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥১।
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।২।
স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ।৩।
ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্ প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে।৬।"—
কঠোপনিষৎ।২।১, ২, ৩, ৬।

কেবল ব্যবহারিক সম্বন্ধ। ভোগ দখলের সম্বন্ধ। যাহা হউক, এই ভোগ দখলের মেয়াদের সময় মধ্যে,—তামাদি হইবার পূর্ব্বে, এমন একটা কিছু কামাইয়া লইতে হয়, যাহাতে ভবিষ্যতের সংস্থান ভালরূপে হয়,—আর ভাবিতে হয় না,—আর একলা, নিঃস্ব, নিঃসহায়, বন্ধুহীন হইয়া অসীমের, অনন্তের পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে না হয়!

আমি সেই অনন্তের ইচ্ছাধীন প্রজা। অস্থায়ী প্রজা হইলেও, রাজার সঙ্গে আমির সম্বন্ধটা স্থায়ী! রাজা পিতা হইলে,—আমার,—আমাদের,—প্রজার,—সন্তানের, পিতৃধনে, পিতৃরাজ্যে কালে অধিকার হয় না কি? বুঝিলেই হইল! রাজাপ্রজা সম্বন্ধ বুঝা দূরে থাক, ও সম্বন্ধ মানিও না! মানিয়া না চলিলে,—না কাজ করিলেই, না মানা!

আমি বিন্দু। আমি শূন্য। কিন্তু আমি আছি। আমি এই অসীমেতেই হয়েছি,—অসীমেতেই স্থিত,—অসীমের দিকেই ধাবিত! চতুর্দ্দিকে অসীম বেষ্টিত হইয়া আছি,—অসীমের সঙ্গে সম্বন্ধে যুক্ত। এই আমি শূন্য, বিন্দু হইলেও, আমার ভিতরে যখন অসীমের ভাব,—অসীম রহিয়াছেন, তখন আমিও কি অসীম নহি? অসীম না হইলে, অসীমকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি কেমনে?

আমি কিছুই নহি। কিন্তু আমার মধ্যেই সব। আমার ভিতরেই প্রকৃতির অবাক চৈতন্যের সমুদায় কথার ব্যাখ্যা রহিয়াছে,—সমুদায় সঙ্কেত ও ইঙ্গিতের তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে! যাহা আমার মধ্যে নাই, তাঁহার অর্থ (আমার জন্য,) আমার বাহিরেও নাই। আমিই প্রকৃত তীর্থ। আমারই মধ্যে জেরুসালেম,—মক্কা,—মদিনা। আমারই মধ্যে গঙ্গা, যমুনা,—জর্ডন, জেমজেম্! যে স্রোতে অবগাহন করিলে, আমার আত্মা ধৌত ও বিগত-ক্লেশ হয়, তাহার উৎস,—নির্ঝর প্রবাহ এই আমি-র অন্তরে। আমারই মস্তকের,—হৃদয়ের,—জীবনের,—আত্মার অন্তরতম দেশ হইতে নিস্যন্দিত, ক্ষরিত, অমৃতধারাতে স্নাত হইয়া, আমি মৃত্যুঞ্জয় হই! সে জাহ্নবী ধারা আমার শীর্ষে,—হৃদয়ে!১ পুরুষকার যে কূপোদক খনন করিয়া বাহির করে, তাহা উদ্বেল হইয়া মহাসিন্ধুর দিকে ধায় না। স্বর্গীয় পিতামহ দেব সর্ব্বদাই বলিতেন,—

"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, সকলি মনের ভ্রম, সার কেবল গোবিন্দচরণ।" সেই আপাণিপাদ দেবতার রাসবিলাস মঞ্চ,—নিবাস ভূমি, এই আমি-রই মধ্যে!

আমি-রই মধ্যে সেই অনন্ত। আমিই সেই অনন্ত দেবের দেবালয়। আমি

আনি-রা-ভিতরে,—জীবনের উপরে, সেই দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই।

আমার দেবালয় আমিই, তিনিই। দেবালয় আর কি? দেবালয় কি?—সাধারণ লোকে দেবদেবীর মূর্ত্তি থাকিবার আলয়কেই দেবালয় নামে অভিহিত করে। ঘটে. পটে ধাতু, মৃত্তিকা বা প্রস্তরের মূর্ত্তিতেই দেবতা আছেন, মনে করিয়া, অনেকের চিত্ত সন্তুষ্ট। কিন্তু সকল দেশের ও সকল সময়ের, ভাবুক, চিন্তাশীল ও দার্শনিক মহাত্মাগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্ত্তাকে নিরাকার চিৎশক্তি বলিয়া এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এই নিরাকার বিশ্বকারিকরের আলয়কেই দেবালয় বলা যুক্তি সঙ্গত। অন্য দেবালয় মানবহস্তনির্ম্মিত, মৃত্তিকা, ইষ্টক বা প্রস্তরাদির দ্বারা গঠিত।

আমার দেবতা "অখণ্ড-সৎ-চিৎ-আনন্দময়-বিগ্রহ।" ইহাই শ্রীচৈতন্যের উক্তি। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন যে, তিনি "ওঁ সত্যং জ্ঞানং-অনন্তং" ১পরব্রহ্ম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা ইহাঁকে,—

"অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ যাঁর মধুরিমা,
ত্রিজগতে যাঁহার কেহ নাহি পায় সীমা।"

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দেবতা সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন। ঈশোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"এই জগতে যাহা কিছু আছে, সেই সমুদায়কেই পরমাত্মা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ বিষয়াসক্তি ত্যাগ বুদ্ধির দ্বারা সম্ভোগ কর। আকাঙ্ক্ষা করিও না। ধন কাহার?"২

চিন্ময়ের চিন্ময় নিকেতন,—চেতন নিকেতন প্রয়োজন,—মনোময়,—হিরণ্ময়, মন্দির দরকার। "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং" মুণ্ডকোপনিষৎ বলিতেছেন।

আধারকে আধেয় বলিয়া ভ্রম করা মানবের পক্ষে স্বাভাবিক, তাই, পৌত্তলিক বড় জাঁক্ করিয়া নিরাকারবাদীকে পরাজয় করিবার মানসে বলেন,—ঈশ্বর কোথায় নাই? ঐ মূর্ত্তিতেও তো আছেন!" হাঁ! মূর্ত্তিতেও আছেন বলিয়াই,

১। "oh ! never yet hath mortal drunk—
A draft restorative,
That welled not from the dapths of his own soul !."—
Goethe faust. Prologue in Heaven.

মূর্ত্তি ঈশ্বর নহেন। লণ্ঠনের মধ্যে বাতি আছে বলিয়াই, লণ্ঠনকে বাতি বলা সঙ্গত নহে, বা, আলোককে লণ্ঠন বলা সঙ্গত নহে। সে হিসাবে, সবই ব্রহ্ম। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" সর্ব্বময়, বিশ্বময় আমাদের দেবতার মন্দির বলিলেই আমাদের হৃদয় কৃতার্থ হয় না। কেবল ছান্দোগ্যের মত "খং ব্রহ্ম"২ বলিলেও হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। তত্ত্বদর্শী ঔপনিষদিক মহর্ষি "হৃদি হ্যেষ"৩,—"প্রাণোহ্যেষ"৪,—বলিয়া হৃদয়কে তৃপ্ত করিয়াছেন। ইনি হৃদয়ে, প্রাণে রহিয়াছেন। বৈষ্ণব ভক্ত জ্ঞানদাস ঋষিগণ অপেক্ষা ব্রহ্মকে আরও মধুরতর ও নিকট-তরভাবে অনুভব করিয়া, প্রেম বিগলিত হৃদয়ে গাহিয়াছেন,—

"প্রাণের পরাণে, প্রাণের অন্তরে,
বঁধু! তুমি সে আমার প্রাণ (আমি ?)।
তিল আধ না হেরিলে, মরমে মরিয়ে,
থাকি আমি।"

জীবের প্রাণই চিন্ময়ের মন্দির,—প্রিয় বিলাস ভবন। তিনিই প্রাণ,—প্রাণমন্দিরের জীবন্ত দেবতা। তিনি মৃত দেবতা নহেন,—মৃতেরও দেবতা নহেন,-তিনি জীবের জীবন্ত দেবতা,—তিনি জীবনের দেবতা,—জীবনস্বরূপ! তিনি কেবল অন্নময় দেহে,—চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র,—বাক্যের বাক্য, হইয়া রহিয়াছেন, তাহাও নহে। তিনি "প্রাণস্য প্রাণঃ"৫ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি কেবল প্রাণ-মন্দিরেই রহিয়াছেন। তাহা নহে। তিনি মনোময় মন্দিরে, "মনসো মনঃ"১ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে থাকিয়া বুদ্ধি যোগাইতেছেন, "ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ।"২ তিনি "জ্ঞানং" হইয়া জ্ঞানময় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত,-"যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।"৩

অতএব চক্ষু, কর্ণ, মন, হৃদয়, দেহ ও আত্মার মধ্যে ভগবানের দেবালয়। চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছার মধ্যে তাঁহার দেবালয়। প্রতি নিশ্বাসে, প্রতি চিন্তায়, প্রতি ভাবে, প্রতি ইচ্ছায়,—প্রতি কার্য্যে—প্রতি জীবনে তাঁহার নিবাস, তাঁহার দেবালয়,—ব্রহ্মমন্দির! প্রতি নয়নে, প্রতি কুসুমে, প্রতি খদ্যোতে,—প্রতি জ্যোতিষ্কে, তাঁহারই সেই প্রিয় মুখের মঙ্গলহাসি বিকসিত রহিয়াছে! প্রতি

১। ২।১।
২। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্।"১।

অণু পরমাণুতেই, তাঁহার পূর্ণ আবির্ভাব,—"বিরজ ব্রহ্মলোক,"—দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক জীবনে,—প্রত্যেক পরিবারে, তাঁহার দেবালয় প্রত্যক্ষ করিতে হইবে,—তাঁহার "দেবালয়" নির্ম্মাণ করিতে হইবে! দেবালয়ের সেবা-ইৎ, যেমন, স্বীয় মন্দিরটীকে ধৌত ও বিগতক্লেদ করিয়া রাখেন, তেমনি আমি-র হৃদয়-মন্দিরকে অশ্রুকণা দ্বারা ধৌত করিয়া, ভগবানের দেবালয়ের উপযুক্ত করিতে হইবে!

কেনোপনিষৎ বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মকে ইহলোকে জানিলে জন্ম সফল হয়,—না জানিলে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়। জ্ঞানীরা সমুদায় বস্তুতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া, ইহলোক হইতে উপরত হইয়া, অমর হয়েন।"১ আর জরা-মরণভয়সংযুক্ত জীবন লাভ করিতে হয় না! এখনকার পাঠ্য বিষয় পাঠ করিয়া, উত্তীর্ণ হইলে, আর সে পাঠশালার ভীষিকাময় রাজ্যে, পুনঃ প্রবেশ করিতে হয় না। সেই অনন্ত চিৎশক্তিকে,—তারস্থ বা যন্ত্রস্থ তড়িৎ-প্রবাহের মত, জীব মধ্যে নিরীক্ষণ করিলে, এবং আমার মধ্যে, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যন্ত্রস্থ, ঘটস্থ, ও জীবস্থ দর্শন করিলে,—অসত্যের জীবনে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত দেখিলে, জীবের জীবনের লক্ষ্য কি আর সফল হইল না?

সংসারকে ভগবৎলাভের অন্তরায় জ্ঞান করিলে চলিবে না। উহাকে ভগবানের দেবালয় মনে করিয়া, উহাকে পাপ ও মলিনতা হইতে দূরে রাখিতে হইবে। আমি-কে তাহার ব্রহ্মনিয়োজিত সেবক,—দাস, "সেবাইৎ,"—প্রহরী জ্ঞান করিতে হইবে এবং সেই বিশ্বপিতার নিত্য সেবা ও অর্চ্চনা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। যেন তাঁহার কার্য্যে ক্রটী না হয়,—বিরক্তি না হয়,—ক্লান্তি না হয়,—অমনযোগ, অবহেলা না হয়,—যেন সেবাপরাধ না হয়! আমার হৃদয়কে,—জীবনকে,—সংসারকে দেবালয় করিতে হইবে,—ব্রহ্মমন্দির করিতে

১। ছান্দোগ্য।৩।১৪।১। ২। ছান্দোগ্য।৪।১০।৫

৩। "হৃদি হেষ আত্মা।"—প্রশ্নোপনিষৎ।৩।৬।

৪। "প্রাণো হেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি।"—মুণ্ডক।৩।১।৪।

৫। কেন।২

১। কেনোউনিষৎ।২। বৃহদারণ্যক।৪।৪।১৮।

২। গায়ত্রী।

৩। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।"—মুণ্ডক।১।১।৯।

হইবে,—তবেই উহা আমি-র শান্তিনিকেতন হইবে,—নচেৎ নহে। আমার ভাষা, কবিত্ব, সঙ্গীত বা ঐশ্বর্য্যের দ্বারাই, আমার দেবালয়, ব্রহ্মমন্দির, শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয় না। যেন সংসার-সংগ্রাম-শ্রান্ত নরনারী, ইহার সুশীতল ছায়ার নিকট আসিবামাত্রেই, কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতে পারেন,—যেন এই দেবালয়ের দ্বার হইতে সংসারের অতিথি অভুক্ত ফিরিয়া না যান,—যেন আমার স্নেহাভাব বশতঃ তাঁহারা তৃষিত, অতৃপ্ত হইয়া না যান,—যেন আমার পবিত্র হৃদয়-দ্বার সর্ব্বদাই উদার ও উন্মুক্ত থাকে এবং আমিও দেখি ও সকলেই দেখে যে, আমার হৃদয়ে প্রকৃত দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে,—আমার দুঃখ-পাপে মলিন প্রাণ দেবালয়ের হিরণ্ময় আভাতে প্লাবিত হইয়াছে। যেন এই প্রকার দেবালয়ের সৌরভে ও পুষ্পনিশ্বাসে ভবমরুও আমোদিত হইয়া উঠে! এই প্রকার মন্দির স্থাপনা করাই আমার পক্ষে জীবনের সফলতা ও গৌরব! এই প্রকারে জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইলেই, আর এ জীবন যন্ত্রণার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় না। ইহাই হিন্দুগণের মতে জন্মরাহিত্যের উপায়। এত দুঃখে কষ্ট, এত পাপ তাপ ভুগিয়াও, এত মার খাইয়াও, যদি এই জীবনের পাঠটী আয়ত্ত করিতে না পারি, তবে এতকষ্ট, যন্ত্রণা ও এই জীবন কি বিফল হইল না? যত বার ও যতক্ষণ না অঙ্কটী কশা যায়, ততবার, ততক্ষণ, উহা বার বার যেমন কশিতে হয়, তেমনি, যতক্ষণ জীবন সত্যের দেবালয় না হয়, ততক্ষণ আর আমি-র আত্মার বিশ্রাম কোথায়?

এই ক্ষুদ্র জীবনে সত্যের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেই, আমার ক্ষুদ্রতা,—আমার শূন্যতা, অপদার্থতা সেই মহৎ-যশের মহিমাতে পূর্ণ হয়,—আমার জীবন অনন্ত যৌবন প্রাপ্ত হয়,—আমি আর জরা, মৃত্যু, শোক তাপের অধীন থাকি না,—আমার ঈশ্বর জীবন অনন্ত জীবনের সহিত মিশিয়া যায়,—আমি অমর হই,—অমৃতলাভ করি। তখনই বুঝিতে পারি যে, আমি ব্রহ্ম-কুমার,—অমৃতের সন্তান ও পিতৃধনে আমার সম্পূর্ণ অধিকার। এই পিতৃশক্তি অণু ও ব্রহ্মাণ্ডে,—সাধু এবং অসাধুর জীবনে সমভাবে ব্যক্ত রহিয়াছে। অণু অনন্তকে বলিতে পারেন,—"হে অনন্ত! তোমাকে যখন স্মরণ করি, তখন আমি যুবক হই,— অনন্ত যৌবন প্রাপ্ত হই,—আমি সুখী হই,—অমর হই!" কোনও শাস্ত্র, স্মৃতি, তন্ত্র, মন্ত্র, বা, মনুষ্যের মতামত আমার পিতার সহিত আমি-র সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারে না,—

১। "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।" ।১৩।

পিতামাতার ক্রোড় ও সন্তানের মধ্যে দাঁড়াইতে পারে না। তখন সমুদয় হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হয়,—সর্ব্ব সংশয় দূর হয়, সর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষয় হয়। তখনই মানব-আত্মা বলে,—"হে জ্যোতির্ময়! আমি তোমার জ্যোতিতে অন্ধ হইলাম,—আত্মহারা হইলাম!" তখনই আত্মা প্রেমানলে, পতঙ্গের ন্যায় আত্মবিসর্জ্জন দিয়া, অক্ষয়, অজর, অমর, জীবনলাভ করে।

এই এক দেবালয়। আর এক দেবালয়, তিনিই স্বয়ং। "স্বেমহিম্নি",১ তিনি বিরাজিত। ব্রহ্মকে ধারণ করিবে কে? তিনি নিজেই এই সমুদয়কে,—আকাশ ও কালকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ক্ষিতি, অপঃ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম তাঁহাকে ধারণ করিতে অক্ষম। অনন্তকে অনন্তই ধারণ করিতে পারেন। দুইটি অনন্ত কল্পনা না করিলে, অনন্তের আলয় খুজিয়া পাওয়া যায় না। তাহা হইলেই, অনন্তের অনন্তত্ব লোপ পাইল। ব্রহ্ম নিজেই নিজের উপমান। তিনি নিজেই নিজের আলয়,—আপনিই আপনার মহিমাতে বিরাজিত। তিনিই প্রকৃত ব্রহ্ম মন্দির। তিনি নিজের মহিমাতে, "অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান" হইয়া বিরাজিত এবং তাঁহাতেই সৃষ্ট আমরা সকলে হইয়াছি, রহিয়াছি, চলিয়াছি, ফিরিতেছি ও থাকিব! তিনি নিজেই নিজের কাবা,—কৈলাস,—বৈকুণ্ঠ!

তিনি সর্ব্ব বস্তুর ও বিষয়ের সমুদয় সত্তাকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি যেমন আমাতে, আমিও তেমনি তাঁহাতে রহিয়াছি, আমি যেমন তাঁহার মন্দির তিনিও তেমনি আমার মন্দির তাঁহাকে লইয়াই আমি। আমাকে লইয়াই তিনি। এই প্রকারে দেখি যে, এই বিশ্বমন্দিরে,—এই—বিশ্বেশ্বর মন্দিরে,—ব্রহ্ম ও জীবে, জীবে ও ব্রহ্মে এক নিত্য যোগযুক্ত! আহা! কি সুন্দর যোগ! কি সুন্দর দেবতা ও দেবালয়! আমরা তাঁহাকে বক্ষে ধারণা করিয়া অনন্ত হইয়া যাই, বুকটা কতই বড় হয়,—ফাটিয়া যায়! তিনি সর্ব্ব প্রকারেই অনন্ত! তাঁহার বিনয়ও অনন্ত! তাই, অনন্ত হইয়াও,—আত্মগোপন পূর্ব্বক,—শূন্য যে আমি, আমাকে এত বাড়াইয়া দিয়া, নিজে অণুর মধ্যে অণু হইয়া রহিয়াছেন! মুখোস খুলিয়া বহুরূপীকে দেখা চাই,—চেনা চাই, -ধরা চাই!!! অচেনা অজানা মুখোস দেখিয়া, পিতামাতাকে ভুলিলে চলিবে না,—ভয় করিলে চলিবে না। আমার বাসনা,—জীবন-মন্দিরের দেবতাকে, এই পিতা মাতাকে চেনা ও ধরা,—জীবনকে দেবালয় করা!

আমি দেশকালকে অতিক্রম করিতে পারি। সর্ব্বদাই জয় করিতে পারি না, তাহার কারণ, আমি আমি-কে ভুলিয়া আছি,—আমি-কে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, বলিয়া।

১। "অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং।" = কঠ।২।২০।

১। ছান্দোগ্য ।৭।২৪।১।

শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রোক্ত—
সাধারণ উপদেশ।

প্রভুপাদ পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

১। অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব দুই প্রভু আর ভক্ত।
তথাপি কৃপায় তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত॥
ব্রহ্মাদির স্ফূর্ত্তি হয় কৃষ্ণের কৃপায়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদে ভাগবতে এই গায়॥ আঃ ২।১৩ *

২। হেন কৃষ্ণচন্দ্র দুর্জ্ঞেয় অবতার।
তান কৃপা বিনে কার শক্তি জানিবার॥ ঐ।

৩। কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহার॥ আঃ২।১৪

৪। কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরিসঙ্কীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥ ঐ

৫। চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা॥
নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘ-শুক্লা-ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী॥
সর্ব্বযাত্রা মঙ্গল এ দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব্ব শুভ লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণে ভক্তি হয়—খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥
ঈশ্বরের জন্মতিথি যেহেন পবিত্র।
বৈষ্ণবেরো সেইমত তিথির চরিত্র॥ আঃ ২।২৭।

৬। যে দিনে যে দৈব তাহা হইবারে চায়। আঃ ৩।৩৬

৭। কোটি তঙ্কা দ্রব্য যদি থাকে নিজঘরে।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে॥
যে দিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয়।
কোটি যত্ন করি—তথাপিহ সিদ্ধ নয়॥ আঃ ৩।৩৭

৮। ভক্তি বিনা চৈতন্যগোসাঞি নাহি জানি। আঃ ৪।৪২

৯। আত্মাবিনে পুত্র বা কলত্র বন্ধুগণ।
গৃহহৈতে বাহির করয়ে ততক্ষণ॥

---

* পৃষ্ঠাঙ্কগুলি শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের।

অতএব পরমাত্মা সভার জীবন।
সেই পরমাত্মা এই শ্রীনন্দ-নন্দন ॥
অতএব পরমাত্মা-স্বভাব- কারণে।
কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে ॥
১০। ঈশ্বরের চিত্ত-বৃত্তি ঈশ্বর সে জানে॥ আঃ ৫।৪৯ ॥
১১। গোষ্ঠীয়ে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটি কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস॥ আঃ ৫।৪৯ ॥
১২। দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র—নিলেন কৃষ্ণ সে।
যে কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা হইব সেই সে ॥
স্বতন্ত্র জীবের তিলার্দ্ধেকো শক্তি নাঞি।
দেহেন্দ্রিয় কৃষ্ণ! সমর্পিল তোমা ঠাঞি ॥ আঃ ৫।৫০ ॥
১৩। সত্তে কৃষ্ণ গাও গিয়া পরম হরিষে।
এথাই দেখিবা কৃষ্ণ কথোক দিবসে ॥ ঐ ॥
১৪। মিশ্র বোলে—তুমি ত অবুধ বিপ্রসুতা।
হর্ত্তা কর্ত্তা পিতা কৃষ্ণ সভার রক্ষিতা ॥
জগত পোষণ করে জগতের নাথ।
'পাণ্ডিত্যে পোষয়ে' কেবা কহিল তোমাত ॥
কিবা মূর্খ কিবা পণ্ডিত—যাঁহার যেথানে।
কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ—সে হৈব আপনে ॥
কুল-বিদ্যা-আদি উপলক্ষণ সকল।
সভারে পোষয়ে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ সর্ব্ব বল ॥
সাক্ষাতেই এই কেনে না দেখ আমাত।
পড়িয়াও আমার ঘরে কেনে নাহি ভাত ॥
ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে।
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে॥
অতএব বিদ্যা-আদি না করে পোষণ।
কৃষ্ণ সে সভারে করে পোষণ পালন॥ আঃ ৫। ৫১
অনায়াসে মরণ—জীবন দৈন্য-বিনে।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয়—নহে বিদ্যা-ধনে ॥
কৃষ্ণকৃপা বিনে নহে দুঃখের মোচন।
থাকিল বা বিদ্যাকুল কোটি কোটি ধন ॥
যার গৃহে আছয়ে সকল উপভোগ।
তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোনএক রোগ ॥
কিছু বিলসিতে নারে—দুঃখে পুড়ি মরে।
যার নাহি, তাহা হৈতে দুঃখী বলি তারে ॥

এতেকে জানিহ—থাকিলেও কিছু নহে।
যারে যেন কৃষ্ণ-আজ্ঞা—সে-ই সত্য হয়ে॥
এতেকে না কর চিন্তা পুত্রপ্রতি তুমি।
কৃষ্ণ পুষিবেন পুত্র—কহিলাঙ আমি॥ আঃ ৫।৫২॥

১৫। যে করিব কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়॥ আঃ ৫।৫৪॥

১৬। যথাবিধি করি প্রভু শ্রীবিষ্ণুপূজন।
তুলসীরে জলদিয়া করেন ভোজন॥ আঃ ৬।৫৭॥

১৭। মিশ্র বোলে—কৃষ্ণ! তুমি রক্ষিত সভার।
পুত্র-প্রতি শুভ-দৃষ্টি করিবা আমার॥
যে তোমার চরণ-কমল স্মৃতি করে।
কভু বিঘ্ন না আইসে তাঁহার মন্দিরে॥
তোমার স্মরণহীন যে যে পাপস্থান।
তথায়ে ডাকিনী-ভূত-প্রেত অধিষ্ঠান॥
আমি তোর দাস প্রভু! যতেক আমার।
রাখিবা আপনে তুমি—সকল তোমার॥ আঃ৬।৫৮॥

১৮। বিষ্ণুপূজা করি তুলসীরে জল দিয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥ আঃ ৬।৬১

১৯। (প্রভুর-) ললাটে শোভয়ে ঊর্দ্ধ তিলক সুন্দর॥ আঃ ৬।৬২॥

২০। নিত্য সিদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব সকল।
তবে যে কলহ দেখ—সব কুতূহল॥
ইথে একজনের হইয়া পক্ষ যে।
অন্য জনে নিন্দা করে—ক্ষয় যায় সে॥ আঃ ৬।৭১ পৃষ্ঠা।

২১। ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার।
কিরূপে করেন কোন্ কালের বিহার॥
ঈশ্বরে সে আপনারে না জানায়ে যবে।
লক্ষ্মীও জানিতে শক্তি না ধরেন তবে॥
এই সব শাস্ত্রে বেদে পুরাণে বাখানে।
যারে তাঁর কৃপা হয়—তান জানে তানে॥—আঃ, ৭।৭৭ পৃষ্ঠা

২২। হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণ-রস।
কি করিব বিদ্যায় হইলে কালবশ॥ ঐ

২৩। সর্ব্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভৃত্য জয়।
এই তান স্বভাব সকল বেদে কয়॥ আঃ ৭।৮১॥

২৪। কেহো বোলে—হেন রূপ হেন বিদ্যা যার।
না ভজিলে কৃষ্ণ—নহে কিছু উপকার॥ আঃ ৮।৮৩॥
২৫। বিদ্যায় কি লাভ,—কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত॥
পড়ে কেনে লোক ?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে?॥ আঃ ৮।৮৩॥
২৬। প্রভুরে দেখিয়া সর্ব্ব বৈষ্ণবের গণ।
সভে বোলে—ভজ বাপ! কৃষ্ণের চরণ॥
ক্ষণেকে নাহিক বাপ! অনিত্য শরীর। আঃ ৮।৮৫॥
২৭। গঙ্গাজলে বিহার করিয়া কথোক্ষণ।
গৃহে আসি করে প্রভু শ্রীবিষ্ণুপূজন॥
তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি।
২৮। প্রভু বোলে—শ্রীধর! তুমি যে অনুক্ষণ।
'হরি হরি' বোল—তবে দুঃখ কি-কারণ?
ভোজনে বসেন গিয়া বলি 'হরি হরি'॥ আঃ ৮।৮৫॥
লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেনে তুমি।
অন্নবস্ত্রে দুঃখ পাও—কহদেখি শুনি?
শ্রীধর বোলেন—উপবাস ত না করি।
ছোট হউ বড় হউ বস্ত্র দেখ পরি॥
প্রভু বোলে—দেখিলাঙ গাঁঠি দশ-ঠাঞি।
ঘরে বোল, এই দেখিতেছি খড় নাঞি॥
দেখ এই চণ্ডী-বিষহরিরে পুজিয়া।
কে না ঘরে খায়-পরে সব নগরিয়া॥
শ্রীধর বোলেন—বিপ্র! বলিলা উত্তম।
তথাপি সভার কাল যায় একসম॥
রত্নঘরে থাকে রাজা—দিব্য খায়-পরে।
পক্ষিগণ থাকে দেখ বৃক্ষের উপরে॥
কাল পুন সভার সমান হই যায়।
সভে নিজকর্ম্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥ আঃ ৮।৮৯ পৃষ্ঠা॥
২৯। এইমত ঈশ্বরের সব শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
সবে সেবকেরে হারে—সে তাহান ধর্ম্ম॥ আঃ ৮।৯১।
৩০। কৃষ্ণ না ভজিয়ে কাল কি কার্য্যে গোঙাও?
রাত্রিদিন নিরবধি কেনে বা পড়াও?
পড়ে লোক কেনে?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে?
এতেকে সর্ব্বথা ব্যর্থ না গোঙাও কাল।
পড়িলা ত.—এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল॥ আঃ ৮।৯১॥ (ক্রমশঃ)

ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন।

(লোকান্তরে।)

দারুণ শোক সন্তপ্তচিত্তে আমরা প্রকাশ করিতেছি, জন-রঞ্জন ডাক্তারহেমচন্দ্র সেন এম, ডি, স্বীয় আত্মীয়বর্গকে এবং শত শত বন্ধুবান্ধবকে কাঁদাইয়া অকালে ইহ-সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন! চিকিৎসকের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, অক্ষুণ্ণ রূপে তৎসমস্তই তাঁহাতে ছিল। গরীব রোগীদিগকে তিনি বিশেষরূপ দয়া করিতেন; যাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাঁহাদের বাটীতে কাহারও পীড়া হইলে বিনা দর্শনীতে তিনি ব হুক্ষণ উপস্থিত থাকিয়া আবশ্যক মত সুব্যবস্থা করিতেন, পীড়া কঠিন হইলে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতেও কষ্টবোধ করিতেন না, রোগীকে অথবা রোগীর পরিবারবর্গকে হতাশ বাক্যে ভয় প্রদর্শন করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। এলোপ্যাথিক ডাক্তার, কিন্তু হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্ব্বেদের প্রতিও তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। রোগ বিশেষে সামান্য সামান্য ঔষধ ও দ্রব্য গুণ জ্ঞানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিতে তিনি বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতেন। এই জন্মভূমি পত্রিকা-গর্ভে পাঠক মহাশয়েরা তৎবিষয়ের অনেক পরিচয় পাইয়াছেন। অল্প বয়সে এম, ডি, উপাধি লাভ করিয়া, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে ও স্বাধীন চিকিৎসায় তিনি বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন।

সামাজিক বহু গুণেও ডাক্তার হেমচন্দ্র অলঙ্কৃত ছিলেন। মিষ্টভাষী, সদালাপি, বন্ধুবৎসল, এই তিনটি বিশেষণ তাঁহার প্রকৃতির উজ্জলভূষণ ছিল। যাঁহারা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে আমাদের এই উক্তির সাক্ষ্যদান করিবেন।

শিবপুর নিবাসী সদ্‌গুণশালী কবিরাজ স্বর্গীয় সূর্য্যকুমার সেন মহাশয় হেমচন্দ্রের পিতা ছিলেন, সুচিকিৎসায় ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠায় তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ছিল, হেমচন্দ্র সর্ব্বাংশে পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন।

১২৭৫ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার শিবপুর গ্রামে হেমচন্দ্রের জন্ম হয়, বর্ত্তমান ১৩১৬ সালের প্রথম মাসের (এই বৈশাখ মাসের) তৃতীয় দিবসে তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি। চল্লিশবৎসরমাত্র বয়স হইয়াছিল। এত অল্প বয়সে তিনি যেরূপ সু-নাম অর্জ্জন করিয়া গেলেন, শতবর্ষ জীবী অনেকের ভাগ্যে সেরূপ ঘটে না। হেমচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, মেডিকেল কলেজের এম, ডি। পঠদ্দশায় বর্ষে বর্ষে তিনি প্রচুর পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্যে ডাক্তার হেমচন্দ্রের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, বিবিধ সংবাদ পত্রে তিনি ভাল ভাল প্রবন্ধ লিখিতেন, চিকিৎসা সম্মিলনী নাম্নি মাসিক পত্রিকায় ডাক্তার হেমচন্দ্রের লিখিত চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধ "জন্মভূমি" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্মিলনীর পাঠকবর্গ তাহা বিশেষরূপ অবগত আছেন।

আসন্ন কালে ডাক্তার হেমচন্দ্র প্রসন্ন মনে ভগবদগীতা পাঠ ও শ্রবণ করিতে করিতে ইহ জন্মেরমত নয়ন মুদ্রিত করিয়াছেন। শ্মশানে তাঁহার পুষ্পমাল্য ভূষিত ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছে, সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ডাক্তার গণনাথ সেন এম,এ,এল,এম, এস, মহাশয় সেই বিষয়ের বিশেষ উদ্যোগী, সম্মানে ডাক্তার গণনাথ অনেক বিষয়ে মহামনা বন্ধুর উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ও স্নেহবৎসলা বৃদ্ধা জননী মহাশোকে অভিভূতা, তাঁহাদিগকে আমরা আর কি বলিয়া সান্ত্বনা করিব, অল্পজীবী ক্ষণজন্মা পুরুষ অল্পদিনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া, ঈশ্বরেচ্ছায় আশাধিক গুণ গৌরব অর্জ্জন করিয়া যোগ্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহারা যেন শোক সম্বরণ করেন। হেমবাবু একটি শিশুপুত্র ও তিনটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা আশাকরি, তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর বাবু অবিনাশচন্দ্র সেন ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন যেরূপ যত্নে হেমচন্দ্রকে মানুষ করিয়াছিলেন, হেমচন্দ্রের শিশু পুত্রটিকেও সেইরূপ স্নেহযত্নের চক্ষে দর্শন করিবেন।

—:•:—

মল্লিকা-মালা।

লেখক, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল।

সরস বসন্তাগমে কুসুমিত বনে,
একদিন সন্ধ্যাকালে প্রণয়িনী বালা ;
কহিল, "হে প্রিয়! দেখ তোমারি কারণ,
গেঁথেছি যতনে এই মল্লিকার মালা।
পর পর প্রিয়তম! পর মালা গলে,
নূতন বরের সম ফুটিবে মাধুরী ;
ছুটিয়া আসিবে গন্ধে মধুকর দলে,
গুণ্ গুণ্ গুণ্ রবে বেড়াইবে ঘুরি।

এত বলি মৃদু মন্দ হাসিতে হাসিতে
পরাইয়া দিল গলে বিনোদ মালিকা ;
"ছি ছি নাথ! নিরন্তর কি ভাবিছ চিতে।"
বলিয়া চুম্বিল মুখ প্রেয়সী বালিকা।

হায়রে অবোধ আমি ছিলাম তখন,
অমূল্য প্রণয় ধনে অবহেলা করি ;
অবিরত মত্ত ছিনু লইয়া দর্শন,
সেবিতাম বীণাপাণি দিবস সর্ব্বরী।

জগতের কোন্ বস্তু কিবা গুণ ধরে,
গ্রহগণ কি নিয়মে করিছে ভ্রমণ ;
কিরূপে জন্মিল নর ভুবন ভিতরে,
কিরূপে অসীম শূন্যে জন্মিল ভুবন।

ইত্যাদি বিষয় সদা করি আলোচনা,
ভাবিতাম বিদ্যানিধি সুখের আগার ;
হায়রে বুদ্ধির ভ্রম, ভ্রান্তি বিবেচনা,
ভুলেছিনু প্রেমরত্ন জগতের সার।

মোহিনী মল্লিকা বাসে মুগ্ধ হলো মন,
মোহিল বিনোদ-মালা নয়ন আমার ;
ভুলিলাম ক্ষণমাত্র শাস্ত্রের চিন্তন,
ক্ষণেক হইল হৃদে প্রেমের সঞ্চার।

ভাবিলাম মনে মনে, একি কুলক্ষণ ;
সামান্য পদার্থে মন ভাবে কেন সুখ ?
শাস্ত্রের চিন্তাই শুধু সুখের কারণ,
তবে কেন প্রেমে মন পতন উন্মুখ ?

অমূল্য মল্লিকা মালা প্রেম উপহার,
একে একে ফুলগুলি ফেলিনু ছিঁড়িয়া ;
(নিদয় অঙ্গুলি তোর একি ব্যবহার!)
হায়রে! ভাঙ্গিনু তাহে প্রেয়সীর হিয়া

"হায়! কি করিলে নাথ? কতই যতনে,
গাঁথিনু কুসুম মালা ভূষিতে তোমায়;
কোমল মল্লিকা-প্রাণ নাশিলে কেমনে,"
সজল নয়নে প্রিয়া কহিল আমায়।

সে অবধি প্রেয়সীর বিরস আনন,
ভুলিয়া না কয় কভু প্রণয়ের কথা;
সে মধুর হাসি মুখে খেলে না কখন,
না হেরি সে ফুল্ল মুখ পাই মনে ব্যথা।

কেবল শাস্ত্রের কথা কহে অনুক্ষণ,
ভুমিকম্প বজ্রপাত ঝড়ের কারণ,
কিরূপে জোয়ার ভাঁটা কিরূপে গ্রহণ,
পৃথিবীর তপনের মাধ্য আকর্ষণ।

কহিলাম "প্রিয়তমে! ত্যজ এই ভাব,
কোথায় পূর্ব্বের সেই প্রেম সম্ভাষণ?
কোথায় সে মধুময় সরল স্বভাব,
কোথা সে মধুর বাক্য শান্তি নিকেতন?"

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উচ্চারিলা বালা।
"হা নাথ! কোথায় মম মল্লিকার মালা?"

বীণা।

লেখক-শ্রীঅমরনাথ বসু, F. R. H. S. (LOND) M. R. A. S. E.

কেন বাজে বীণা মোর তুলিয়া ঝঙ্কার,
ওই নীল নভস্থলে,
হেরে কি নক্ষত্র দলে,
বাজিছে গো মনসাধে বীণাটী আমার?
কিম্বা হেরি শশধরে,
সুদূর অম্বরোপরে,

বাজিছে কি মধুস্বরে বীণাটী আমার ॥
কুমুদিনী হেরি শশী,
ঢলে পড়ে হাসি হাসি,
কোমল—সরসী—অঙ্গে পড়ি অনিবার ;
সরসী গো ব্যথা পেয়ে,
ঢুল ঢুল নেত্রে চেয়ে,
জানাইছে পরমেশে যাতনা তাহার।
তাই কি হেরিয়া বীণা বাজিছে আবার ॥

সমালোচনা।

শান্তি কি শান্তি ? সামাজিক নাটক। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ-নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য একটাকা। মিনার্ভা থিয়েটারে বারবার অভিনীত, দর্শক মণ্ডলীর দ্বারা বহু প্রশংসিত।

গল্পের মর্ম্ম এইরূপ যে, প্রসন্ন কুমার নামক একজন ধনাঢ্য গৃহস্থের দুইপুত্র দুইকন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুশীল বিবাহের পর অল্পদিনের মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হয়, পুত্রবধু নির্ম্মলা বালিকাবয়সে বিধবা হইয়া পুরাকালের ঋষিদের ব্যবস্থা মত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে শ্বশুরালয়ে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা থাকেন। কর্ত্তার জ্যেষ্ঠা কন্যা ভুবনমোহিনীও বিধবা হয়, প্রকাশ নামক একব্যক্তি ভুবনমোহিনীর স্বামী বেণীমাধবের বন্ধু ছিল, বেণীমাধবের ত্যজ্য সম্পত্তির অধিকারিণী হয় ভুবন মোহিনী, একজিকিউটার হয় সেই প্রকাশ বাবু। কিছুদিন পরে প্রসন্নকুমারের কনিষ্ঠা কন্যা প্রমদার বিবাহ ; সম্প্রদানের অগ্রে স্ত্রী আচারের পরেই ওলাউঠা রোগে বরের মৃত্যু, সেই রাত্রেই প্রমদা বিধবা। ওদিকে ভুবনমোহিনীর একজি-কিউটার প্রকাশ বাবু ভুবনমোহিনীকে বিলাস বাসনার দাসী করিয়া তাহার সম্পত্তি ও ধর্ম্মনষ্ট করে। এদিকে বাল-বিধবা প্রমদার বৈধব্য কষ্ট দর্শনে প্রসন্ন কুমার তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহ দিবার ইচ্ছা করেন, গৃহিণী ও দেবীরূপিণী পুত্রবধু নির্ম্মলার অমত হওয়াতে জ্যেষ্ঠা কন্যার মত গ্রহণার্থ তিনি একরাত্রে তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হন, গিয়া দেখেন, প্রকাশ ও ভুবনমোহিনী এক শয্যায় উপবিষ্ট,

ওডিকোলন ও পুষ্পগন্ধে গৃহ আমোদিত। তত রাত্রে প্রকাশ কেন সেখানে, জিজ্ঞাসা করাতে "ভুবনমোহিনীর অসুখ, ডাক্তার আসিয়াছিল, ঔষধ আনিয়াছি" আমতা আমতা করিয়া এইরূপ উত্তর দিয়া প্রকাশ পলায়ন করেন। প্রসন্নকুমারের মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হয়। প্রমদার বিবাহ দিতে তিনি কৃতসংকল্প হন, কাহার মত গ্রহণ না করিয়া ঘেঁচি নামক একজন সাহেবী ধরণের ছোকরার সঙ্গে প্রমদার বিবাহ হয়, বিলাতে গিয়া বারিষ্টারী পরীক্ষা দিতে ঘেঁচির সাধ হয়। প্রসন্ন কুমার খরচ পত্র দিয়া তাহাকে বিলাতে পাঠান, ঘেঁচি সেখানে ফৌজদারি অপরাধ করিয়া বিপদে পড়িয়াছিল, প্রসন্নকুমার সেই সংবাদ পাইয়া রাহা-খরচ দিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনেন, ঘেঁচি আসিয়া প্রমদাকে সর্ব্বদা টাকার জন্য তাড়না করে, বার বার আশা পূর্ণ না হওয়াতে তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, প্রমদা তাড়িতা হইয়া হরমণি নাম্নি একটি সচ্চরিত্রা রমণীর আশ্রয় গ্রহণ করে, লোকে জানিয়া রাখে প্রমদা মরিয়া গিয়াছে। তাহার পর ভুবনমোহিনীর ভাগ্য। প্রকাশের ঔরসে ভুবনমোহিনীর গর্ভ হয়, গর্ভপাতের জোগাড় হয়, হরমণি তাহা জানিতে পারিয়া নিষেধ করে, পূর্ণকালে সন্তান হইলে হরমণি সেই সন্তানের প্রতিপালনের ভার লয়। ঘেঁচির এক বন্ধু নির্ম্মলার সতীত্ব নাশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, কৃতকার্য্য হয় নাই, মিথ্যা খুনী মামলায় ঘেঁচির কৌশলে প্রসন্নকুমার ও নির্ম্মলা পুলিশে বন্দী হইয়াছিলেন, মিথ্যা প্রমাণ হওয়াতে খালাস পান। সেই অপমানে প্রসন্ন কুমার দুশ্চারিণী ভুবনমোহিনীকে খুন করেন, সেই ক্ষেত্রে প্রকাশ উপস্থিত হইয়া আপন দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আত্মহত্যা করে, প্রসন্নকুমারও মরেন। উপসংহারে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, আধুনিক মতে বিধবা-বিবাহের পরিণাম, বিধবা কন্যাকে সংযমে না রাখিলে পিতার পরিণাম, বিধবার বিলাসিতার পরিণাম, আর বিশ্বাস-ঘাতক বন্ধুর পরিণাম। এই সকল পরিণাম দেখাইয়া প্রসন্ন কুমারের বৈবাহিক শ্যামাপদের মুখ দিয়া নাট্যকার প্রশ্ন করিয়াছেন, শাস্তি কি শান্তি?

সামাজিক চরিত্র জ্ঞানে ও নাটক রচনার দক্ষতায় বাবু গিরিশ চন্দ্রের যেরূপ প্রসিদ্ধি, তাহার বিশেষ পরিচয় অনাবশ্যক স্থূল কথায় নাটকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।



"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৭শ বর্ষ। | ১৩১৬ সাল, জ্যৈষ্ঠ। | ২য় সংখ্যা।

ভক্তের ভগবান্।

লেখক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী।

জাগতিক উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বুঝিতে গেলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক সম্প্রদায় এক একটী চিন্ময়সত্তা অবলম্বন করিয়া আপন আপন জ্ঞান, বুদ্ধি, এবং বিচার অনুসারে, তাহাতে মহান্ ঐশ্বর্য্য আরোপ করিয়া তাঁহারই উপাসনায় নিরত আছেন। বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে এই চিন্ময় সত্তা, সচ্চিদানন্দ ঘন চিন্ময় শ্যাম তমাল দ্বিভুজ মুরলীধর যুগল রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহরূপে উপলব্ধি হয়, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে ভগবৎ-জ্ঞানে তাঁহারই উপাসনা করেন, শৈবগণ সেই

চিন্ময় সত্বাকে বিশ্বের বীজ স্বরূপ এবং বিশ্বের আত্মপুরুষ স্বরূপ অর্থাৎ সগুণ ও নিগুর্ণ জগতের একমাত্র পুরুষ স্বরূপ দেবাদিদেব মহাদেব জ্ঞান করিয়া উপাসনা করেন, শাক্তগণও এই সত্বাকে চিদানন্দময়ী বিশ্ব-জননী কালিকাদেবী বিগ্রহ স্বরূপা জ্ঞান করিয়া তাঁহারই উপাসনা করেন। শক্তি উপাসকদিগের আরাধ্য কালিকা দেবীকে, শবরূপী শিবের বক্ষোপরে প্রসন্নবদনে মহাকালের সহিত বিপরীত বিহারে রতাতুরা আছেন বলিয়া, হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। (সাধারণ দর্শকের নিকট অশ্লীলতা উদ্দীপক হইবে বলিয়া প্রকাশ্যকালিকা প্রতিমায় মহাকালের বিগ্রহ সংযোজিত থাকে না ; পরন্তু দক্ষিণাকালিকা দেবীর ধ্যানে ইহা উক্ত আছে)। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার ভগবৎ উপাসকগণ ভগবৎ বস্তুকে আপন আপন ভাবের অনুকূল এক একটী রসময় বিগ্রহ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, তাঁহার ভাবে থাকিয়া পরম পুরুষার্থ সাধন করিতেছেন। সাম্প্রদায়িক এই সমস্ত ভাবময় বিগ্রহকে ভক্তের ভগবান বলে। কিন্তু স্থির চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই সমস্ত ভক্তের ভগবান এক অপর হইতে যত প্রকার বিভিন্ন বলিয়া সাধারণ চক্ষে প্রতীয়মান হউক না কেন, স্বরূপতঃ ইহাঁরা একই। সাধকগণ দেশকাল পাত্র অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রুচি বিশিষ্ট হইয়া পড়ে, এই বিভিন্ন রুচি হইতে বিভিন্ন প্রকার ভাবে ঠাকুর বা ভক্তের ভগবান ভক্তের হৃদয় অধিকার করে। শাস্ত্রকারগণ হিন্দুশাস্ত্রের সর্ব্ব স্থানে ভক্তের-ভগবানের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

মহাপ্রলয় বা খণ্ডপ্রলয় কালের স্থিত সময় পর্য্যন্ত জীব, প্রকৃতি ও ঈশ্বরাদি সমগ্র জগতের অস্তিত্ব যখন কারণে বিলীন হইয়া যায়, বেদাদি শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, তখন এই জগতের কারণ-বীজ-স্বরূপ একটী সত্বার অস্তিত্ব থাকে। এই সত্বাকে বেদে "কূটস্থ ব্রহ্ম" বলে। ইহাতে সহজে বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম কূটস্থ হইলে তাঁহার কোন প্রকার ক্রিয়া থাকে না, এই জন্যই কূটস্থ ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয় বলা হয়। কূটস্থ ব্রহ্মের অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ মহাপ্রলয় কালে কোন জীবের বা দেবতার অস্তিত্ব থাকে না, এই জন্যই কূটস্থ ব্রহ্মবাক্য এবং মনের অতীত তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রকৃতি অর্থাৎ এই বিশ্বজগতে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ ভাবে বিরাজিত আছে, তাহার সমস্তই উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় এই তিনটী ধর্ম্ম বা গুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ এই প্রকৃতির রাজ্যে বা বিশ্ব রাজ্যের সমস্ত পদার্থকে কেহ সৃষ্টি বা উৎপাদন না করিলে কোন পদার্থ স্বয়ম্ভূ

অর্থাৎ আপন শক্তিতে উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহাই জাগতিক পদার্থের একটী গুণ; এবং এই জাগতিক পদার্থের দ্বিতীয় গুণ এই যে, তাহাদিগকে রক্ষা না করিলে কোন পদার্থ "স্থিতি" হইতে পারে না, অর্থাৎ কোন পদার্থ উৎপত্তি হইলেও রক্ষা না করিলে কারণে বিলীন হয়। জাগতিক পদার্থের তৃতীয় গুণ এই যে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম কীটানু পরমাণু হইতে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর গ্রহ উপগ্রহ-সহ সৌর-জগৎ কালেলয় অর্থাৎ কারণে বিলীন হইবেই হইবে। এইজন্য শাস্ত্রে এই পরিদৃশ্য মান জগৎরূপী প্রকৃতিকে ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এক্ষণে সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, কূটস্থ ব্রহ্ম অবস্থায় অর্থাৎ মহাপ্রলয় কালে, প্রকৃতির কোন অস্তিত্ব থাকে না, এইজন্য কূটস্থ ব্রহ্ম গুণাতীত বা নির্গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এক্ষণে বিচার করিয়া বুঝিতে গেলে বুঝা যায় যে, কূটস্থ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, বাক্য এবং মনের অতীত, সুতরাং তাঁহার কোনপ্রকার ধ্যান, ধারণা ও পূজা অসম্ভব, তাঁহার মাত্র সত্ত্বা বা অস্তিত্ব-জ্ঞান আমাদের হইতে পারে, সুতরাং তিনি "ভাবের ঠাকুর", অভাবে তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

মহাপ্রলয় বা খণ্ডপ্রলয় কাল অতীত হইবার পর, জগৎ বা প্রকৃতি সৃষ্টির পূর্ব্বে, যখন এই কূটস্থ ব্রহ্ম সক্রিয় হইয়া ইচ্ছাময় হন, অর্থাৎ তাঁহার জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়, কূটস্থ ব্রহ্মের তখনকার এই প্রকার পরিবর্ত্তিত অবস্থাকে বেদে "কারণ-শরীরী-ব্রহ্ম" বলিয়া অভিহিত করেন; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সৃষ্ট জগতে সৃষ্টির মূল-নীতি অনুসন্ধান করিতে গেলে বুঝা যায় যে, কারণের সমাবেশ না হইলে কখন কোন কার্য্য বা পদার্থের সৃষ্টি বা উৎপত্তি হয় না; তাই বেদ, ইচ্ছাময় ব্রহ্মকে কার্য্য এবং কারণের বীজ স্বরূপ, "কারণ-শরীরী-ব্রহ্ম" নামে অভিহিত করেন। দর্শন পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহাঁকে শ্রীভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষণে স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া বুঝিলে বুঝা যায় যে, এই কারণ শরীরী ব্রহ্ম কূটস্থ ব্রহ্মের রূপান্তরিত অবস্থামাত্র, বস্তুতঃ উভয়ই এক। এই কথাটা পৌরাণিক ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, "কারণ-শরীরী ব্রহ্ম" কূটস্থ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে আরও বুঝা যায় যে, কূটস্থ ব্রহ্ম যে প্রকার নির্গুণ কারণ শরীরী ব্রহ্মও তদ্রূপ নির্গুণ, কেন না, গুণময় প্রকৃতি বা জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহাঁরা বিরাজিত-আছেন। এক্ষণে এই "কারণ শরীরী-ব্রহ্মের আর একটু বিশদ ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, কারণ সকলের সমাবেশ না হইলে কখন কোন কার্য্য বা পদার্থ সৃষ্ট বা উৎপন্ন হয় না

মনে করুন, আপনি পূজা করিবার জন্য একটী পার্থিব শিব গড়িলেন। এ স্থানে "শিব" একটী কার্য্য এই কার্য্য সমাধা করিবার জন্য কয়েকটী "কারণ" সমাবেশ হইলে এ কার্য্যটী সমাধা হয়। এক্ষণে বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে যে, প্রথম উপযুক্ত মাটী বা উপাদান আবশ্যক, শিব গড়িতে জানে, এ প্রকার বুদ্ধিমান এবং কার্য্যক্ষম একজন লোক বা কর্ত্তার আবশ্যক ; শাস্ত্রানুসারে "শিবের মাটীকে উপাদান কারণ, শিব নির্ম্মাতাকে নিমিত্ত কারণ বলে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিবনির্ম্মানের উদ্দেশ্যও (পূজাকরা) একটী জন্য কারণ বলিয়া মনে রাখিতে হইবে। এই বিচারে অনায়াসে বুঝি পারা যায় যে, সৃষ্টি কার্য্যের কর্ত্তৃরা নিমিত্ত-কারণ, উপাদান-কারণ এবং ইচ্ছা বা জন্য কারণ, এই তিনটি প্রধান কারণ বীজরূপে কারণ-শরীরী-ব্রহ্মে" বা শ্রীভগবানে বিরাজিত আছে।

আবার জগৎ সৃষ্টির প্রাকালে, এই কারণ শরীরী "ব্রহ্মের" বা ইচ্ছাময় ভগবানের ইচ্ছায়, উক্ত কারণী-ভূত সৃষ্টি বীজত্রয় পরিণত হইয়া এই ত্রিগুণাত্মিকা-জগৎরূপে সপ্রকাশ হয়। বেদে এই জগৎরূপে পরিণত ব্রহ্মকে—সগুণ-ব্রহ্ম বলে। এই গুণময় ব্রহ্মের স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে একটী রাজার রাজ্য শাসন প্রণালী ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। মনে করুন, মহামহিম ভারতেশ্বর নিজে ভারত শাসনের সর্ব্বশক্তির অধিকারী হইয়া, স্বয়ং রাজ প্রাসাদে আত্মীয় স্বজনগণের সহিত পরিবেষ্টিত থাকিয়া রাজরাণী সহ, আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহার রাজ শক্তি মন্ত্রীকে আরোপ করিয়া, তাঁহাকে কতকগুলি নিয়মের অধীন রাখিয়া রাজ্য শাসন ভার তাঁহার উপর নির্ভর রাখা হইয়াছে। মন্ত্রী মহাশয়ও আবার তাঁহার প্রাপ্ত অধিকাংশ রাজশক্তি রাজপ্রতিনিধি বা বড় লাটের উপর আরোপ করিয়া তাঁহাকে কতকগুলি নিয়মের অধীন করিয়া তাঁহার উপর ভারতরাজ্যের শাসন ভার অর্পণ করিয়াছেন। বড়লাট, তাঁহার প্রাপ্ত অধিকাংশ রাজশক্তি প্রাদেশিক চারিজন ছোট লাটের উপর আরোপ করিয়া তাঁহাদিগকে কতকগুলি নিয়মের অধীনে রাখিয়া প্রাদেশিক রাজ্যশাসন ভার অর্পণ করিয়াছেন। আবার প্রাদেশিক ছোটলাটগণ তাঁহাদের অধীন জেলা সকলের ম্যাজিষ্ট্রেট দিগের উপর তাঁহাদের প্রাপ্ত রাজশক্তির কতকাংশ আরোপ করিয়া তাঁহাদিগকে কতকগুলি নিয়মের অধীনে রাখিয়া প্রত্যেক জেলার শাসন ভার অর্পণ করিয়াছেন। আবার প্রত্যেক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, তাঁহাদের প্রাপ্তরাজশক্তির কতকাংশ প্রত্যেক মহকুমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দিগের উপর আরোপ করিয়া তাঁহাদিগকে কতক গুলি

নিয়মের অধীন করিয়া রাজ্যশাসন ভার অর্পণ করিয়াছেন। এই প্রকার প্রত্যেক থানা, প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক গৃহস্থ, পরিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে রাজশক্তির অধীন করা হইয়াছে।

এক্ষণে সর্ব্বশক্তিমান বা সর্ব্ব কারণের কারণ বীজস্বরূপ কারণ-শরীরী ব্রহ্মকে চিন্ময় রাজরাজেশ্বর বা পরমেশ্বর বলিয়া বুঝ, ইহাকে কোন কোন শাস্ত্রে তুরীয় চিন্ময় পুরুষ বা নিরঞ্জন, কোন কোন শাস্ত্রে তুরীয় কৃষ্ণ বা তুরীয় পুরুষ প্রকৃতি বা চিদানন্দময় যুগল রাধাকৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করেন। আবার যখন এই "কারণ-শরীরী ব্রহ্ম" জগৎ-সৃষ্টির নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ, স্বরূপ হইয়া পুরুষ এবং প্রকৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হওতঃ এই পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে পরিণত হইয়া উৎপত্তি, স্থিতি, এবং লয়, এই ত্রিধর্ম্মাক্রান্ত বা সত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিবিধ গুণযুক্ত হইয়া, স্থাবর জঙ্গমাদিক্রমে প্রপঞ্চিক জগৎরূপে সপ্রকাশ হন, তখন তিনি সগুণ ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হন। এই গুণময় সৃষ্টিকে প্রাকৃতিক সৃষ্টি বা প্রাকৃতির রাজ্য বলে। এই রাজ্যের অধীশ্বর সত্ব, রজঃ, এবং তমঃ এই ত্রিগুণ বা ইহাদের অধিষ্টাত্রী দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং মহেশ্বর। তাহার মধ্যে প্রকৃতির সত্ব অংশ বিষ্ণু, এইজন্যই জগৎপালন কর্ত্তা বিষ্ণুই ঈশ্বর, তিনি সর্ব্ব দেবতার পরম দেবতা, বিশ্বরাজ্যের শাসন কার্য্যের বড়লাটের স্থানীয় এবং ব্রহ্মা ও মহেশ্বর, বিষ্ণুর আজ্ঞাধীন বিভাগীয় ছোটলাটের স্থানীয়। এই প্রকার ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি দেবগণ এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের কর্ম্মচারী স্থানীয় বলিয়া বুঝিবে। কর্ম্মচারীগণ নিজের ইচ্ছায় কেহ কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, পরন্তু রাজার ইচ্ছার অনুকূলে সকলকেই কার্য্য করিতে হয়।

এক্ষণে কারণ তত্ত্বের আর একটুকু বিশদ ব্যাখ্যা ভাল করিয়া বুঝা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে বিবৃত করা হইয়াছে যে, কার্য্যের উপাদান কারণ শিব গড়িবার মাটী স্থানীয়, সুতরাং জড় ধর্ম্মযুক্ত পদার্থ, কিন্তু কার্য্যের নিমিত্ত কারণ অর্থাৎ কার্য্যকারক কখন জড়পদার্থ হইতে পারে না, পরন্তু তিনি সচেতন—সজ্ঞানী পুরুষ এবং নিমিত্ত কারণ অর্থাৎ যাহার ইচ্ছায় বা যাহার আনন্দ জন্য কার্য্য হয়, তিনিও নিশ্চয়ই মূল চৈতন্য পুরুষ। এইজন্য শাস্ত্রে জগতের উপাদান কারণকে জড় ধর্ম্মযুক্ত প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রকার জগতের নিমিত্ত কারণকে চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান ও চৈতন্য ধর্ম্ম বিশিষ্ট পুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন। এবং যাঁহার ইচ্ছার জন্য বা যাঁহার সুখের জন্য বা আনন্দের জন্য এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তিনি চিদানন্দময়

শ্রীভগবান্ বা কারণ শরীরী ব্রহ্ম বা পরম পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই প্রকার ইচ্ছাময় শ্রীভগবানকে উপাসকগণ নানা ভাবে বিভক্ত করিয়া তাঁহাকে অসংখ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ভক্তিমার্গীগণকে শ্রীভগবানের এই কয়েকটী নামের এই প্রকারে ব্যাখ্যা মনে রাখিতে হইবে যথা—

১। কূটস্থ ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলিয়া বুঝ, এই পরমাত্মা, নির্ব্বিকার (অনৃদ্ধি-ভাবে) সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ অর্থাৎ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ অথচ নিষ্ক্রিয় চিৎস্বরূপ, আবার কোন কোন শাস্ত্রে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার এই চিৎ-ঐশ্বর্য্য আচ্ছাদন করিয়া, ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ কোন প্রকার বিশেষণ রহিত বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহাতে সহজ কথায় বুঝা যায়, কূটস্থ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা কর্ম্মকারের লোহাপেটা "নেহাই" নামক যন্ত্র স্বরূপ ; কেন না, দা, বঁটি, কোদাল, কুড়ালি, আদি "গড়ন" করিবার উপাদান কারণ "নেহাই" নহে, অথবা এই সমস্ত "গড়ন" গড়িবার নিমিত্ত কারণ অর্থাৎ কর্ম্মকার ও "নেহাই" নহে, এক কথায় "লোহাপেটা নেহাই" উপাদান ও নিমিত্ত এই দুই কারণের কোন কারণ নহে, অথচ নেহাই ব্যতীত কর্ম্মকারের কোন কার্য্যই হইতে পারে না। তদ্রূপ এই নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার না নিমিত্ত, না উপাদান কারণ স্বরূপ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা- ব্যতীত সৃষ্টির কোন সত্বাই সম্ভবে না।

মানুষের ক্ষমতা।

লেখক, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম, এ,

এই বিচিত্র সংসারের যেদিকে নিরীক্ষণ করা যাউক না কেন, সকল দিকেই মানুষের ক্ষমতার পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। সংসার মানুষ ছাড়া নয় বলিয়াই বোধ হয়, যেন মানুষ না হইলে সংসার অচল হইত এরূপ বোধ হয়। সভ্যতার স্রোত যেখানে যতবেশী সেইখানেই মানুষের শক্তির বিকাশ। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে এই মানবীয় ক্ষমতার সমধিক পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। যে জাতি যতই উন্নতির শিখরে আরোহণ করে সে জাতির প্রতিকার্য্যে প্রতি চেষ্টায় এবং প্রতি উদ্যমে এই ক্ষমতার সমধিক নিদর্শন দৃশ্যমান হয়। অট্টা-

লিকা বল, কল কারখানা বল, বাষ্পীয় পোত অর্ণবযান বা শকটই বল সকলের ভিতরেই এই মানবীয় ক্ষমতার অপ্রতিহত প্রসার পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞান যতই উন্নতিলাভ করিতেছে ততই মানবের এই শক্তি প্রকাশের ক্ষেত্র পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আজ যাহা মানবের আয়ত্তের ভিতর ছিল না, কল্য তাহা তাহার নিতান্ত সুখকর কার্য্য বলিয়া মনে হইতেছে, কে জানিত যে আকাশের তড়িৎ আবার আমাদের গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভৃত্যের ন্যায় আমাদের আজ্ঞাবহ হইবে ও আমাদিগকে প্রতিনিয়ত চামর ব্যজন আলোক দান প্রভৃতি কার্য্য করিয়া সেবা করিতে থাকিবে? পৌরাণিক ইতিকথায় শুনা যায় যে, রাবণ রাজার আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের ন্যায় ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের প্রভৃতি সেবা করিতেন; আমাদের সম্বন্ধে যে তাহা একদিন সম্ভব পর হইবে না, কে তাহা বলিতে পারে? একে একে নৈসর্গিক শক্তিনিচয় অবনত মস্তকে মানবের বুদ্ধি কৌশলের নিকট পরাভূত হইয়া উপস্থিত হইতেছে; ইতর প্রাণিদিগের কথা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত, দুর্দ্দান্ত হিংস্র প্রাণিগণ মানব বুদ্ধির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে ও করিতেছে, ইহা আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতেছি।

মানবের এই অসীম ক্ষমতা প্রণিধানের বিষয় বটে। কিরূপে এই সসীম জীব এই অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইতেছে তাহা কেহ ভাবিয়াছেন কি? রাবণ রাজা সম্বন্ধে শুনা যায় যে, তিনি তপস্যার প্রভাবে অমানুষিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা তপস্যার কি দেখিতেছি? পূর্ব্বকালের ন্যায় এখন একই জীবনে দশহাজার বৎসরের তপস্যার নিদর্শন কোথায় দেখিতে পাই? কিন্তু এদিকেও আবার এই সকল অমানুষিক শক্তি মানুষে দেখিলে আমাদিগের তপস্যার বিষয় চিন্তা করিতে মন স্বতই ব্যস্ত হইয়া উঠে; মানবের এই অমানুষিক শক্তি বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই; কোন এক বিখ্যাত ইউরোপীয় ভাবুক বলিয়াছেন,

"Atom as he is, his will is greater than these bruteforces; and as he rises above them, he smiles to see that nature like the old Proteus strisoues to terrify her assaivants, but yields her secrets if she be held fast and puestioned."

অর্থাৎ মানব পরমাণু সদৃশ ক্ষুদ্র হইলেও মহা ক্ষমতাশালী; নৈসর্গিক শক্তি নিচয়কে সে পরাভূত করে এবং যতই সে নিসর্গ শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করে ততই দেখিতে পায় যে প্রাচীন গ্রীকদিগের দেবতা প্রোটিউসের ন্যায় এই সকল নৈসর্গিক শক্তি নিচয় যাহারা তাহার ভয়ের কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইত, তাহারাই

আবার নিজ নিজ তথ্য তাহার নিকট অকপট চিত্তে জ্ঞাপন করিতে থাকে, কলিকালে আয়ু কম বলিয়া শাস্ত্রনির্দ্দেশ আছে বটে, কিন্তু আমাদের এখনকার তপস্যা পূর্ব্বকার তপস্যার প্রতিনিয়তই যোজিত হইতেছে, এবং তাহা হইতেই বোধ হয় এত মহৎ ফলের অবতারণা। এই তপস্যার প্রভাবেই ব্যোমযানের অধুনাতন আবিষ্ক্রিয়া সম্ভব পর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে এবং আরও কত কত উন্নতির পরিচায়ক বিষয় মানুষের বুদ্ধির নিকট প্রকটিত হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন দেখা যাউক এই তপস্যার মূলে কি নিহিত রহিয়াছে ও ফলদাতাই বা কে।

যখন মানব আপনার পানে চাহিয়া দেখে যে বিশ্বের মহান্ প্রকটিত শক্তি নিচয়ের তুলনায় সে কিছুই নয়, তখন তাহার আত্মাভিমান ঘুচিয়া যায়, তখন সে সেই সকল শক্তির সম্মুখীন হইয়া অবনত মস্তকে তাহাদিগেরই পূজায় ব্যস্ত হয়, তখন আর তাহার জীবনের গরিমা, বুদ্ধির প্রখরতা, বিজ্ঞানের সূক্ষ্মানুসন্ধিৎসা প্রভৃতি শক্তি বিলুপ্ত ও সুপ্ত প্রায় হইয়া এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকে। মানুষের এই বিরোধী শক্তিনিচয় চিরকালই ভাবুকমণ্ডলীকে বিচলিত করিয়াছে ও করিতে থাকিবে কবিবর Young বলিয়াছেন —

"How poor, how rich, how abject, how august, how complicate, how wonderful, is man."

অর্থাৎ মানব কিরূপ দরিদ্র, কিরূপ ধনী, কিরূপ হীন ও কিরূপ মহান্ তাহা বলা যায় না; মানব দুরূহ, এবং এক অত্যাশ্চর্য্যজীব সন্দেহ নাই। মানবের এই বিরুদ্ধ শক্তি মহাকবি সেক্ষপীয়রকেও বিচলিত করিয়াছে—

"What a piece of work is man! How noble is in reason; how infinite in faculties; in form and moving, how express and admirable! In action how like an ange; in apprehension how like a god; in beauty of the world paragon of animals he And yet, to me, what is this quintessence of dust?

Shakespeare.

অর্থাৎ এই মানব রূপী ধূলিকণা বিচিত্র জীব সন্দেহ নাই। সৃষ্টির মধ্যে সৌন্দর্য্যের অধিকারী, গুণপনায় অদ্বিতীয়, আকৃতিতে মহৎ, গুণে দেবতা সদৃশ, বুদ্ধিমত্তায় ঈশ্বরের সমকক্ষ; কিন্তু অপরদিকে দেখিতে গেলে ধূলিকণারও অধম মানব দুর্জ্ঞেয় বটে।

মানবের এই দুর্জ্ঞেয়তা কোথা হইতে আইসে, এই বিরোধাভাস যাহা মানবে পরিলক্ষিত হয় তাহা কিসের পরিচায়ক।

যতদিন মানব নিজ শক্তির প্রতি নিরীক্ষণ করিত ততদিন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রভাব তাহাকে অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু যেদিন হইতে তাহার আন্তর দৃষ্টি স্ফুরিয়াছে সেই দিন হইতেই তাহার অসীম ক্ষমতার অধিকারীর ভাব আপনাপনি আসিয়া জুটিয়াছে আত্ম পদার্থের অবিষ্ক্রিয়ায় দিন জগতের এক মহান্ যুগান্তর ঘটাইয়াছে—এই দেহের ভিতর আত্মা ও পরমাত্মার সহিত তাহার ঐকাত্ম্য যেদিন অনুভূত হইয়াছিল, সেদিন এক মহৎ দিন সন্দেহ নাই; এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের রাজা ও আমার 'আমি' যে একাত্মভূত এই ভাব মানুষের অসীম ক্ষমতাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া গিয়াছে যেদিন ঔপনিষদ ঋষিরা অন্তশ্চক্ষু সাহায্যে দেখিলেন:—

"অনেজদে কম্মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতিতিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতারিশ্বাদধাতি॥
তদেজতি তন্নৈজতিতাদ্দূরেতদ্বন্তিকে
তদন্তরস্যসর্ব্বস্যতদুসর্ব্বস্যাস্যবাহ্যতঃ॥

সেইদিন হইতে মানবের উন্নতির সূত্রপাত হইল। এই মহান্ ভাব ভুলিয়া যাইলেই মানবের ক্ষুদ্রতা তাহাকে অধিকার করিয়া বসে। পুরাকালে ঋষিগণ এই ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে সকল বিদ্যার অধিকারী হইয়াছিলেন। অধুনাতন জড় বিজ্ঞান যে সকল বস্তু নিচয়ের আবিষ্ক্রিয়া করিয়া মানব জাতিকে গৌরবান্বিত করিতেছে, তাহা ঋষিগণের অবিদিত ছিল না তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ইতিহাস ও সাহিত্যে পাওয়া যায়, কারণ, ব্রহ্মকে জানা হইলে আর কিছু জানিতে বাকী থাকে না শ্রুতি বলিতেছেন, "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহব্রহ্মা বিপশ্চিতা," এস্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, অধুনাতন বা প্রাচীন বৈজ্ঞানিক-দিগের মধ্যে কেহ বা জড়বাদী কেহ বা সংশয়বাদী ছিলেন; তাঁহারা কিরূপে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরূঢ় হইলেন; অনেকেই হয়ত ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার ঐকাত্ম্য স্বীকার করিতেন না! ইহার উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলাযাইতে পারে যে, এই দৃশ্যমান জগৎ ও অদৃশ্য জগৎ ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মাবলীর দ্বারা আবদ্ধ;—ঈশ্বর নিয়মের কর্ত্তা, ও নিয়মের ফলদাতা ও স্বয়ং নিয়মের বশীভূত; যদি কেহ আত্মাকে ভুলিয়া বা

তাহার দিকে না তাকাইয়া আত্মোন্নতি লাভের নিয়মাবলী অবলম্বন করে তবে তাহার চেষ্টানুরূপ ফললাভ হইতেই হইবে। অগ্নির দাহিকা শক্তি না জানিয়া যদি কেহ অগ্নিকে স্পর্শ করে অগ্নি তাহার নিজের কার্য্য স্পর্শকারী সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সমাধা করিবে স্পর্শকারীর দাহিকাশক্তি জানা থাকা বা না থাকার প্রতীক্ষা করিবে না; পরমাত্মাও সেইরূপ মানবের ব্রহ্মের সহিত তাদাত্মাই তাহার দুজ্ঞেয়ত্বের নিদান। ব্রহ্মে যে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব কবিগণ দেখিয়াছেন, মানবেও সেইরূপ বিরুদ্ধ ভাব সকল পরিলক্ষিত হয়; মানব উন্নতির সোপানে ব্রহ্মা সদৃশ অবনতির সোপানে পশুরও অধম; একই মানব-জীবনে এই বিরুদ্ধ ভাবের বিদ্যমানতা দর্শন করিয়া কবি গাহিয়াছেন—

"বজ্রাদপিকঠোরাণি
মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি
কোহিজ্ঞাতুমিচ্ছতি॥"

স্বয়ং তপস্যার ফল বিধাতা; তাহাকে জীব জানুক বা না জানুক তাহার চেষ্টার ফল দিবেনই দিবেন।

পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইল তাহা অনেকটা মানব সমষ্টির উন্নতির কথা বা মানব সমষ্টির ক্ষমতার কথা বলা হইয়াছে; এক্ষণে দেখা যাউক ব্যক্তিগত জীবনে মানব কত ক্ষমতার অধিকারী ও সেই ক্ষমতায় অনুভূতিই বা তাহার কিরূপ।

কর্ম্মবীর কর্ম্মলইয়াই ব্যস্ত থাকেন; যতদিন এই কর্ম্মের স্রোত অপ্রতিহত চলে ততদিন তাঁহার নিজের ক্ষমতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা ও অবসর থাকে না। মহাবীর নেপোলিয়ন যত দিন যুদ্ধের পর যুদ্ধে, জয়লাভ করিতেছিলেন, যখন সমগ্র ফরাসী জাতি, এমনকি সমগ্র ইউরোপ খণ্ড, তাঁহার নামে বিত্রাসিত, যখন কবির গাথায় তাঁহাকে "Trampler of her vineyards" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল, তখন তিনি কি একবারও ভাবিবার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, পরে তাঁহার কি হইবে তখন তিনি কি এক বারও ভাবিয়া ছিলেন যে একদিন বন্দিভাবে সেণ্টহেলেনার দ্বীপে চিরশত্রু ব্রিটনের তাঁবেদারীতে তাঁহার জীবন বায়ু নিঃশেষিত হইবে?—কখনই নহে-শক্তির অধিকারীদিগের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মই এই যে, তাঁহার শক্তির অন্তরালে স্থিত মহাশক্তির উপলব্ধি করিতে ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন যাই বাধা পায় তখন এদিক্, ওদিক্, চারিদিক্ নিরীক্ষণ করে ও মনে মনে বিচার

করে কোথায় আমার শক্তিপুঞ্জ পলাইল,—আর ডাকিলে আইসে না কেন? তখন যদি তাহার সৌভাগ্য ঘটে তবে পরিশেষে মহাশক্তি পাইয়া বীতরাগ শোক হয়। কিন্তু যত দিন তাহা না পায়, অশেষ কষ্টে তাহার জীবন অতিবাহিত হইতে থাকে। এই মহাশক্তি আর কিছুই নহে ইনিই পরব্রহ্ম ইহার আবরণকারী শক্তি দৈবীমায়া-এই শক্তির বলে জীব অকর্ত্তা হইয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানে মত্ত হয়।

"ইদমদ্যময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যেমনোরথং।
ইদমস্তীদমপিমে ভবিষ্যতিপুনর্দ্ধনং॥
অসৌময়াহতঃশত্রুইনিষ্যে চাপরানৃপি
ঈশ্বরোইহমহংভোগীসিদ্ধোহং বলবান্ সুখী॥"

অর্থাৎ অদ্য এইবস্তু পাইলাম কল্য ইহা পাইব, এইবস্তু আমার আছে, এই ধন আমার লাভ হইবে; এই শত্রুকে আমি নিপাত করিয়াছি অপরাপর শত্রুকেও নাশ করিব, আমিই ঈশ্বর আমিই ভোগী, আমি প্রভূত ক্ষমতাশালী ও আমিই সুখী—এই আমার আমার রবে দহী মত্ত হয়; ইহা অবিদ্যার কল্পিত মায়া। ব্যক্তিগত মানব জীবনে যেমন ঈশ্বরের ক্ষমতা প্রসার মানবসমষ্টি সম্বন্ধেও তাহাই; যে যুগে যেরূপ উন্নতি তাঁহার অভিলষিত তাহা হইবেই। মানুষ তাহা বুঝে না, মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলে 'আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা' ইত্যাদি বলিতেছে যত দিন তাহার সম্বন্ধে এই মায়ার ঘোর থাকে তত দিন সে জগতের বড় আমির কথা ভাবিতে চাহে না, "অর্থাগমো নিত্যমরোগিতাচ" অর্থাৎ প্রভূত অর্থের উপার্জ্জন ও নীরোগ শরীর যত দিন থাকে, তত দিন কেবল জীবনধারণের ভগবানে মতি হয় না।—কাঁহা হইতে অর্থ আসিতেছে, কে আমাকে নীরোগ রাখিয়াছে, অর্থাগম সময়ে বা পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ কালে কয়জন ভাবিয়া থাকেন; কিন্তু জগতের এই বড় আমি প্রতিনিয়তই চারিদিকে আত্ম পরিচয় দিতে ব্যস্ত; দৈবীমায়া ও যেমন তাঁহার স্বরূপ অভিব্যক্তির চেষ্টাও সেইরূপ তাঁহারই; তিনি চান যে জীব—

"অবিদ্যয়ামৃত্যুংতীর্ত্ব
বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"

তিনি বলিয়াছেন—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাংতরন্তি তে॥"

অর্থাৎ আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া পার হওয়া দুষ্কর; তবে আমাকে যে শরণ লয় সেই ব্যক্তিই এইমায়া অতিক্রম করিতে পারে।

কিন্তু ভগবানের শরণ লাভ বড় সোজা কথা নহে ; মন চারিদিকে রূপরসগন্ধ-স্পর্শাদিতে মত্ত তাহার এত ভোগ্য বস্তু থাকিতে সে কেন সেই দুর্দ্ধর্ষ গুহাহিত পুরুষের অনুধাবন করিবে। সে যতক্ষণ দেখিতেছে, যাহা ইচ্ছা করিতেছে তাহা পাইতেছে, ততক্ষণ সে কষ্টের পথে যাইবে কেন ? অনেকে বলেন যে বৃথা ঈশ্বর ও ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বেড়ান কাজের কথা নয়, কত লোককে দেখা যায় তাহারা ঈশ্বরও ভাবে না, 'ধর্ম্ম ধর্ম্মও, করে না, তাদের ত বেশ উন্নতি, অতএব বৃথা একটা ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের উপষ্টম্ভ ঘাড়ে চাপাইবার আবশ্যক কি ?' কিন্তু এ সকল স্থল দেখিয়া কি সাধকের এটা বুঝা উচিত নহে যে, ঈশ্বরের কতই দয়া ; আমার অপ্রিয় যদি কেহ সাধন করে আমি তাহাকে ক্লেশে ফেলিতে ও নির্য্যাতন করিতে চেষ্টা করি—ঈশ্বরের ক্ষমা অসীম, পাপী যদি ইহজগতে শাস্তি না পায় তাহার যে শাস্তি হইবে না এরূপ নহে—কাল অনন্ত, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করা উচিত। এই অনন্তের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জগতের 'মহান্ আমি' কে দেখিবার চেষ্টায় থাকা জীবের কর্ত্তব্য ; এই 'মহান্ আমি' চারিদিক "আমি আমি" রবে মুখরিত করিতেছেন, ভ্রান্তজীব এমনিই বধির যে তাহা শুনিতেছে না।

আমাদের দুষ্প্রবৃত্তি গুলি এমনই ভাবের গঠিত যে যতই তাহাদিগের উপাসনা করা যাউক না কেন, তাহাদিগের আর বিরাম হয় না ; একটা হইতে আর একটা এইরূপে পাপের পর পাপ আচরণ করা জীবের স্বভাবজ ধর্ম্ম হইয়া উঠে শেষে যদি ভগবৎ কৃপা ঘটে তবে এই মন্দের দিকের পিপাসা জীবকে পরম পদার্থের পিপাসায় পিপাসিত করে। তখন সে তাহার নিজের অক্ষমতা ও পরমব্রহ্মের ক্ষমতায় আত্মাকে ক্ষমতান্বিত বোধ করিয়া কৃতার্থ হয় ; ডেভিড বলিয়াছেন—

"The Lord is my rock, and my fortess, and my deliverer ; my God, my strength, in whom I will trust ; my buckler , and tha horn of mY salvation, and my high tower . "

অর্থাৎ ঈশ্বরই আমার দুর্গস্বরূপ ও পর্ব্বতস্বরূপ ; তিনিই আমার ত্রাণকর্ত্তা, তিনিই আমার বল , তাহাকেই আমি বিশ্বাস করি, তিনি আমার ধর্ম্মস্বরূপ ঢাল ও আমার পরিত্রাণের বজ্রভেরী ; তিনিই আমার দুর্গের প্রোচ্চ স্থান" । বাস্তবিকই ব্যক্তিগত মানব জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় আমাদের ক্ষমতা নিতান্তই অল্প ; এই সমস্ত নিজের ইচ্ছামত সাজাইয়া সংসারপাট করিতে বসিলাম পরক্ষণেই সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছার খার হইয়া গেল—

Man proposes God disposes,

মানবের ক্ষমতা খালি ইহা করিব উহা করিব কিন্তু কার্য্যের ফল কি হইবে,— আদৌ হইবে কি না, তাহাতে তাহার আধিপত্য নাই। আমরা ভগবানের ক্রীড়না, এই নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"যথাক্রীড়োপস্করাণাং
সংযোগবিগমাবিহ।
ইচ্ছয়াক্রীড়িতুঃস্যাতাং
তথৈবেশেচ্ছয়ানৃনাং॥"

অর্থাৎ ভগবান্ পুতুল খেলার মালিকের ন্যায় আমাদের ক্রীড়না করিয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, এই ভগবৎ ইচ্ছা, সাধনার বলে জীব বুঝিতে পারিলে তবে তাহার বল পঁহুছায়। ভক্ত তাঁহার কশাঘাতে কাতর হয়েন না; শ্রীভগবান্ বলিয়াছেনঃ—

যোহিমাং ভজতেনিত্যং
বিত্তংতস্যহরাম্যহং।
করোমি বন্ধুবিচ্ছেদং
শতকষ্টেণ জীবিতং॥
এষুকষ্টেষুসন্তপ্তো
যদিমাং ন পারিত্যজেৎ।
সগচ্ছেৎৎ লোকং
দেবানামপিদুর্লভং॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে নিত্য ভজনা করে তাহার ধন আমি হরণ করি, তাহার বন্ধুর সহিত বিয়োগ ঘটাই ও তাহার জীবন শতকষ্টে কষ্টান্বিত করি; এই সকল কষ্টে সন্তপ্ত হইয়াও যদি সে আমাকে পরিত্যাগ না করে তবে আমি তাহাকে দেবতার বাঞ্ছিত পদ প্রদান করিয়া থাকি, মহাকবি সেক্ষপীয়র বলিয়াছেনঃ—

"Adversitwy's like the toad that wears yet, a precions jewel in its head."

দুঃখের ভিতর সুখ খুঁজিয়া লওয়া ও প্রতি দৈনিক ঘটনাতে ঈশ্বরের প্রেম ইচ্ছা বুঝিতে পারিবার চেষ্টা থাকিলে জীবন মধুময় হয়। ব্রজ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেনঃ—

"যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহংস্তনেষু,
ভীতাঃশনৈঃ প্রিয়দধীমহি কর্কশেষু॥
তেনাটবীমটসিচেৎ ব্যথসে নকিঞ্চিৎ,
কূর্পাদিভিঃ ভ্রমতিধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥"

ভক্তও সেইরূপ বলেন যে, "প্রভু তোমার কশাঘাতে আমার কষ্ট নাই, সেই কশাঘাত করিতে তোমার হৃদয়ে ত কোন ব্যথা লাগে নাই।" মানবের ক্ষমতার অল্পত্ব জ্ঞানই তাহাকে মহৎ বলে বলীয়ান করে; কথায় বলে "বড় হবি ত ছোট্ট হ" এই তৃণাদপি সুনীচ ভাব ধারণ না করিলে সেই "মহদ্ভয়ং বজ্রসমুদ্যতং" যে লাভ করা—ব্রহ্ম উচ্চ হইতে ও উচ্চতর, কিন্তু বিচিত্রতা এই যে নিম্ন হইতে নিম্নতর না হইলে তাঁহাকে লাভ করা-যায় না। যিনি মহান তিনি নিজে আমাদের নিম্নতার সমভূমে আইসেন শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে।—

"মূকংকরোতিবাচালং
পঙ্গুংলঙ্ঘয়তেগিরিং॥"

ভগবৎ কৃপায় বোবারও বুলি ফুটে, পদবিহীন ব্যক্তি সুদুস্তর পর্ব্বত অতিক্রম করিতে পারে; এই ভগবৎ কৃপার এমনি মহিমা যে যখন মানব শক্তির ও বুদ্ধির দৌড় ফুরাইয়া যায়, যখন মানব দেখে যে আর পরিত্রাণের উপায় নাই, তখন কোন এক অতর্কিত উপায়ে পরিত্রাণ সাধন ঘটিয়া গেল; প্রত্যেক মনুষ্য জীবনে যে এরূপ ঘটনা না ঘটে, এরূপ নহে কিন্তু যাঁহাদের চক্ষু আছে দেখিবার, কর্ণ আছে শুনিবার, তাঁহারাই এই ভগবানের শক্তি দেখিয়া ও বিপদ মধ্যে তাঁহার আশ্বাস বাণী শুনিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। শ্রীভগবান সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—

"চিকীর্ষতেকর্ম্মনিচক্রপানে
র্ণপেক্ষতে তত্রসহায়সমাৎ।"

অর্থাৎ ভগবানের কোন কার্য্য অভিপ্রেত হইলে তাহা সমাধা করিতে মানুষ লোকের ন্যায় তাঁহারা সহায় সম্পত্তির আবশ্যক করে না। মানব সম্বন্ধে দার্শনিক বলেন যে আগে মনে ইচ্ছা হয়, পরে সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হয় তৎপরে চেষ্টার ফল স্বরূপ কার্য্যের অবতারণা কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে "ইচ্ছা হইল ভব-ভানু বিরাজিল" সেইইচ্ছা কি বুঝিতে পারি না বলিয়াই আমাদের দুঃখ; অনেক সময়ে আমরা যেটী ভাল মনে করি, ভগবৎ ইচ্ছায় আমাদের সম্বন্ধে সেটী মন্দ আমরা ইচ্ছার বশে পড়িয়া হা হা করিয়া মরি কিন্তু শেষে যখন সে ইচ্ছা পূর্ণ না হয় তখন ঘোর পরিতাপে Slongh of Despond নিরাশতার পঙ্ক পিণ্ডে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাই, কিন্তু যখন স্থিরজ্ঞানে কিছু দিনের পর সেই ব্যাপার পর্য্যালোচনা করি, তখন হয়ত ঈশ্বরের কৃপায় দেখিতে পাই যে, সেই ঘোর অন্ধতমঃ অন্ধকার নহে, বাস্তবিকই তাহা উজ্জ্বল আলোক; পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে সংসারী বড় মানুষেরা অনেক সময়ে নিজে সব কাজ করেন না আম-

মোক্তার দ্বারা কার্য্য সমাধা করেন। তাহাতে তাঁহাদের কার্য্যের সুশৃঙ্খলা ও নিজের কষ্টের অনেক লাঘব হয়—বিষয় কার্য্যে যদি এরূপ সুশৃঙ্খলা মানবীয় আম-মোক্তার হইতে সম্ভবে তবে আমাদের সকল কার্য্যে ভগবান্‌কে আমমোক্তার করিলে কার্য্যের আরো সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই ; শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যৎকরোসি যদশ্নাসিযজ্জুহোসিদদাসিযৎ।
যত্তপস্যসিকৌন্তেয়তৎকুরুষমদর্পনং ॥"

অর্থাৎ যাহা কিছু কর খাও হোমযাগ কর তপস্যাকর সব আমার উদ্দেশে করিবে ও আমাকে দিবে ; আমারা প্রতি নিয়ত যে সকল দেবকার্য্য বা পিতৃলোকের কার্য্য করি, তাহার অন্তে পুরোহিতমহাশয় আমাদিগকে পড়ান "এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণার্পণ মস্তু" অর্থাৎ যাহা কিছু কর্ম্ম করিলাম তাহার ফলভোক্তা আমি নহে, ভগবান্‌ই তাহার ফলভুক্ তাঁহার হইলেই আমার হইল এই ভাব হৃদয়ে আনিয়া জীব যদি সংসার ধর্ম্ম করে তবে আর তাহার দুঃখ কোথায় ? দুঃখ কাল্পনিক সুখও তাহাই-মনেই দুঃখ মনেই সুখ, অতএব মনকে নিগ্রহ করা অগ্রে কর্ত্তব্য কিন্তু সেই মনকে কিরূপে নিগ্রহ করিবে ? মন দ্বারাই মনের নিগ্রহ সম্ভবে,

"মনএবসমর্থঃসগন্মনোদৃঢ়নিগ্রহে।
অরাজাকঃসমর্থঃস্যাৎরাজনরাজসুনিগ্রহে ॥"

অতএব মনকে দৃঢ় করিয়া ঈশ্বরে সমাধান কর, "শরবৎ তন্ময়" হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হও নিরাশতার অন্ধকার ঘুচিয়া যাইবে—কারণ কেবল পার্থিব বস্তুর অন্বেষণ ও লাভই পরম লাভ নহে, পরমাত্ম লাভই মুখ্য উদ্দেশ্য বোধ থাকিলে সংসারের মলিনতা স্পর্শিবেন তখন আমরা ঋত্বিক্‌দিগের ন্যায় বলিতে পারিব—

"ওঁমধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীন সন্ত্বোষধীর্ম্মধুনক্তমুতো-ষসোমাধুমৎ পার্থিবংরজঃমধুদ্যৌরস্তুনঃ পিতামধুমান্ নো বনস্পতি মধুমানস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।

হিন্দুসমাজ জীবিত না মৃত ?

আজকাল হিন্দুর বিবাহ প্রসঙ্গ লইয়া দেশের মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। বরের দাম কমাও, বরের দাম কমাও, বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে চিৎকার উঠিয়াছে। কায়স্থ ব্রাহ্মণ জাতির জনকতক নাম লব্ধ ভদ্রলোক এক একটা পৃথক্ পৃথক্ সভা করিয়া

দাম কমাইবার পক্ষ সমর্থক লম্বা লম্বা বক্তৃতা করিতেছেন। বনের আগুণ যেমন শীঘ্র শীঘ্র জ্বলিয়া, শীঘ্র শীঘ্র ব্যাপ্ত হইয়া, শীঘ্র শীঘ্র নির্ব্বাণ হইয়া যায়, ঐরূপ সভার আগুণও সেইরূপ দেখা যাইতেছে, যেমন জ্বলিয়া উঠে, অমনি নির্ব্বাপিত হয়। সভার দিন দাবানল জ্বলে, মুরুব্বিগণের প্রতিজ্ঞারূপ শুষ্ক ইন্ধন সেই অনলে নিক্ষিপ্ত হয়, সভাভঙ্গ হইলেই সেই প্রজ্জলিত অনল আশু নির্ব্বাপিত? যতদিন আবার সভার নূতন অধিবেশন না হয়, ততদিন সে অগ্নির অবশিষ্ট অঙ্গার গুলি মাটিচাপা পড়িয়া যায়। প্রতিজ্ঞার কথা কাহারও মনে থাকে না, অগ্নিশিখার উত্তাপও কাহার গায়ে লাগে না। সমস্তই ঠাণ্ডা; অধিবেশনের ব্যবধান কালটা যথার্থই বরফের মত ঠাণ্ডা! চকমকির পাথর যেমন স্পর্শ শীতল, লৌহ যন্ত্রাগারে যেমন অগ্নি উদ্গিরণ করে, লৌহটি হস্তচ্যুত হইবামাত্র পাথর খানি যেমন শীতল, তেমনি শীতল হইয়া পড়িয়া থাকে; বিবাহ পণ নিবারণী সভার বক্তৃতার অগ্নি, ধূমও অঙ্গারের সেইরূপ পরিণাম? আমাদের অপেক্ষা যাঁহারা কিছুদূর হইতে অগ্নিশিখা দেখিতে পান, দূর হইতেই তাঁহারা দর্শন করেন, পরিণাম কেবল চিতাভস্ম!!!

সভায় সভায় বক্তৃতা আছে, ব্যক্তি বিশেষের বৈটকখানাতেও খোস-গল্পের ন্যায় আড়ম্বর আছে, মধ্যে মধ্যে দু-একখানা বাঙ্গালা খবরের কাগজেও রঙ্গরসের আলোচনা আছে; তাহাই আমরা দেখিতাম, তাহাই আমরা শুনিতাম, এখন আমাদের সৌভাগ্যবশেই হউক, কিংবা দুর্ভাগ্যবশেই হউক, সাহেব সম্পাদিত এক একখানা ইংরাজি খবরের কাগজে হিন্দু বিবাহ বাজারের দুর্ভিক্ষের ক্রন্দন উঠিতেছে, স্বাক্ষর থাকে হিন্দুর, পোষকতা থাকে সাহেবের; তাহাতেও হিন্দু-সমাজের সমাজ সংস্কারক মহাবীরগণের তিলমাত্র লজ্জার উদ্রেক হয় না! সেইজন্য আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, হিন্দু সমাজ জীবিত না মৃত?

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার লোক নাই। তাহাতেই বোধ হয়, হিন্দুসমাজ বাঁচিয়া নাই। সমাজ পতি, দলপতি, গোষ্ঠীপতি, এই সকল জমকাল উপাধি শুনা যায় কিন্তু কাহার মতে কে চলে? সকলেই স্বেচ্ছাচারী সকলেই স্ব স্ব প্রধান। সামাজিক বিবাহে যাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতেছেন, বাদ প্রতিবাদের লোকাভাব। কন্যা কর্ত্তারা বড়মানুষ হয়, বরকর্ত্তাদের সেই ইচ্ছা নিতান্ত বলবতী, ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার বাসনা আরও বলবতী; সমাজ বন্ধনের দরুন পূর্ব্বাবধি যাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহার করণ কারণ চলে না, আজকাল তাঁহাদের সঙ্গেও কুটুম্বিতা

আরম্ভ হইয়াছে, কেন না আজকাল জাতির মহিমা অপেক্ষা টাকার মহিমা বড়। কায়স্থ সমাজে শ্রেণী বিশেষে যাঁহাদের পর পর বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না, আজকাল তাঁহাদের সে বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে, তাহাও কেবল টাকার খাতিরে ধনবান বরকর্ত্তারা জাতীয় মর্য্যাদা বজায় রাখিতে চাহেন না, সমাজ মর্য্যাদাও গ্রাহ্য করেন না, উদ্‌গ্রীব হইয়া টাকার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত ; যাঁহারা বিধবা কন্যার বিবাহ দেন, যাঁহারা বিধবার পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহারা সমাজচ্যুত হইয়া থাকেন, এই প্রথা প্রচলিত ছিল, কেহ কেহ এখন তাহাও লঙ্ঘন করিতেছেন, যিনি একটি বিধবা কন্যাকে দ্বিতীয় বরে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার অন্য একটি কুমারী কন্যাকে হয়ত পুত্রবধূ করিয়া ঘরে আনিবার জন্য আর একজন বরকর্ত্তারা লালায়িত ? অর্থলোভ সমাজের এত বড় প্রবল শত্রু ! বড় মানুষের অর্থলোভ হেতু গরীব কন্যাকর্ত্তাগণ হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়াও পাত্র প্রাপ্ত হন না। কন্যাকাল অতিক্রম করিয়া কন্যা ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বর্ষে আরূঢ়া হইলেও গরীব পিতারা তাদৃশ-বয়স্কা কন্যাকে অনূঢ়া রাখিতে বাধ্য হন !

কত বয়স পর্য্যন্ত কন্যাকাল, শাস্ত্র প্রমাণে দেখা আবশ্যক। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে "অষ্টবর্ষে ভবেৎ গৌরী নববর্ষেতু রোহিণী। দশমে কন্যকা প্রাপ্তা তদূর্দ্ধং রজঃস্বলা॥" শাস্ত্র বাক্যের মর্ম্ম এই যে, রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে কন্যাকে পাত্রস্থ না করিলে কন্যার পিতার ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ নরকগামী হয়, ইহা অপেক্ষাও গুরুতর পাপের উল্লেখ আছে ; তাহা প্রকাশ করিতে হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে থাকে, কন্যার পিতৃ পুরুষ নরকস্থ হন, বরের পিতৃপুরুষ নরকে যান না এই বিশ্বাসে বরকর্ত্তারা আমোদিত থাকেন। শাস্ত্রের শাসন বাক্য এক্ষণে কি সকলে মানিয়া চলিতেছেন ? আমরা শুনিতে পাই, ইদানীং কাহারও কাহারও গৃহে বিবাহের পর এক সপ্তাহ মধ্যেই নববিবাহিতা কন্যা ঋতুমতী হইতেছে, বিবাহের পূর্ব্বে যে ঐরূপ হয় নাই, তাহারই বা প্রমাণ কে অন্বেষণ করে ? উঃ ! কি ভয়ঙ্কর পাপ আমাদের পবিত্র সমাজকে বেষ্টন করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিতেও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়, বরকর্ত্তারা এ কথাটা ভাবিয়া দেখেন কি ?

বরের মূল্য বৃদ্ধি এই পাপের হেতু। আমাদের শুনা ছিল নিম্ন জাতি বর ব্যবসায়ের সৃষ্টি কর্ত্তা, তাঁহারাই পুত্রের বিবাহে অধিক মূল্য গ্রহণ করিতেন,

সেই দুরন্ত আদর্শে ব্রাহ্মণ কায়স্থের গৃহেও সেই পাপ প্রবেশ করিয়াছে, আদর্শ পুরুষেরাও অধুনা ভুক্তভোগী হইয়া বরের মূল্য কমাইবার জন্য সভা করিতেছেন, কায়স্থ ব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁহারাও পুত্রের মূল্য কমাইবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, সভার ফলও মাথা মুণ্ড; প্রতিজ্ঞার ফলও মাথা মুণ্ড; সভা গৃহভঙ্গে সভারপ্রতিজ্ঞা অগ্নিও সঙ্গে সঙ্গে জল হইয়া যায়! এ রোগের কোন ঔষধ আছে কি?

দেখা যাইতেছে কায়স্থ সমাজেই অধিক আড়ম্বর-অধিক হুলস্থুল। সহরের সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়কে দূরে রাখিলে বুঝিতে হইবে কায়স্থ সমাজেই বড় মানুষের সংখ্যা অধিক। এই সমাজের বড় মানুষ বর কর্ত্তারাই অধিক অনর্থ ঘটাইতেছেন, তাঁহারা যত্নবান হইয়া ধর্ম্মতঃ এই অনর্থ নিবারণের উপায় না করিলে আর কেহ তাহাতে মাথা দিতে পারিবে না। কায়স্থ সমাজের পুত্রপণ নিবারণী সভায় যাঁহারা সভাপতি অথবা মুখ্যনেতা করজোড়ে তাঁহাদের প্রতি আমাদের সানুনয়ে এই নিবেদন যে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারা কায়মনোবাক্যে এই মহাপাপ নিবারণে যত্নবান হইয়া মহাপাপ হইতে সমাজটিকে রক্ষা করুন। বারান্তরে পুনরায় তাঁহাদের সহিত আমরা সাক্ষাৎ করিব। তখন যেন জিজ্ঞাসা করিতে না হয়, হিন্দুসমাজ জীবিত না মৃত?

—:•:—

প্রতিদান।

লেখক—শ্রীললিতমোহন রায়।

(১)

হৃদয়নাথ বসু মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত কোনও একটী মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে ওকালতি করেন। দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ ঐ কার্য্যে ব্যাপিত থাকিয়া ও কার্য্য ব্যপদেশে নানা স্থানে ঘুরিয়া ইহাতে সম্যক অভিজ্ঞতা ও পারদর্শীতা লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। আজ পাঁচ বৎসর এই পর্ব্বত সঙ্কুল বন্ধুর প্রদেশে পত্নী হৈমবতী চারি বৎসরের অবগণ্ড শিশু হীরালাল, বৃদ্ধা জননী এবং প্রাচীন ও একান্ত প্রভুবৎসল ভৃত্য সদয়ের মুখ চাহিয়া একরূপ সুখে দুঃখে দিনাতিপাত করিতেছেন। বৃদ্ধা জননী বৌমা অন্ত প্রাণ কিন্তু বউয়ের কিছু বাড়াবাড়ি দেখিলে কখনও কদাচিৎ মৃদু অনুযোগ করিলে, পাড়ার শতেক খোয়ারীরা তাঁহাকে বউ

কাঁটকি পদে অভিহিত করিতে ছাড়িত না (ইহা ঠাকুরমারই উক্তি)। তবে গিন্নীকে যাঁহারা চিনিতেন তাঁহারা খুব ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। হৈমবতী যথার্থ সুন্দরী ও স্বামী-সোহাগিনী। হীরু ঠাকুরমার বুকের কলিজা। ঠাকুরমা তাহাকে, বিহঙ্গম শিশুকে পক্ষপুটে আচ্ছাদিত করার ন্যায়, সততই বক্ষে চাপিয়া রাখিতেন। অল্পবয়সে হৈমবতীর উপর্য্যুপরি এক পুত্র ও এক কন্যা হইয়া বাঁচে নাই সেইজন্য ঠাকুরমা মনে করিতেন, এও বুঝি বা ফাঁকি দিয়া পলায়, সুতরাং তাঁহার এই সতর্ক কৌশল অবলম্বন। ধাত্রীর নিকট তিন কড়া কড়ি দিয়া ক্রয় করায় ঠাকুরমার নিকট "তিনকড়ি" নাম থাকিলেও খোকার রাশি অনুসারে নামই প্রচার রহিল। হৈমবতী যদি কখনও শ্বশ্রূর নিকট অনুযোগ করিতেন, যে তিনিই অপরিসীম আদর দিয়া ছেলেটার মাথা চিরকালের জন্য খাইতেছেন ত তাঁহাকে সেদিন বিশেষ রূপে লাঞ্ছিত হইতে হইত ও ফলে ঠাকুরাণীও সে দিন জল গ্রহণ না করিয়া, তুলসীতলায় পুত্র পৌত্রাদির কল্যাণ কামনায় অনর্গল মাথা খুঁড়িতেন। হৃদয় বাবুর সংসারে কোনও কোনও দিন অল্প বিস্তর এইরূপ কুরুক্ষেত্র কাণ্ডের অবতারণা হইয়া জল বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইত। সহরের অপেক্ষাকৃত কোনও বিজন পল্লীতে হৃদয় বাবুর আবাস হইলেও চাঁদের আশে পাশে নক্ষত্রের ন্যায় তাঁহার বাসাবাটীর চারিদিকে একজন সমব্যবসায়ী ও অপরাপর দুই চারি ঘর বাঙ্গালী এবং হিন্দুস্থানী ও তিন ঘর সাঁওতাল বাস করে। বাসা বাটীটি দ্বিতল। উপরে দুইখানি ও নিম্নতলে বৈঠকখানা লইয়া চারি খানি কুঠরী। বাটী খানি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন সদরের আগ্রহাতি-মধ্যে কোনও আবর্জ্জনা পড়িতে পাইত না। বাটীর পশ্চাতে একটী নাতি বৃহৎ উদ্যান ও উদ্যানে নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্পের গাছ হৃদয় বাবুরই স্বরোপিত।

(২)

বৈশাখের অপরাহ্ন অতীত হইয়াছে। অস্তাচলগামী দিনমণির রশ্মি তরু-শিরে নবীন, নধর কিশলয় দলকে সুবর্ণে সুরঞ্জিত করিতেছিল। নির্ম্মল নীলাম্বরের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তর অস্ত রবির লোহিত আভায় প্রতিফলিত হইয়া এক অলৌকিক দৃশ্য গঠিত করিয়াছিল। দিবার রুদ্র প্রভাব এখন কতকটা শান্ত। পক্ষীরা একতানে কুজন করিতে করিতে স্ব স্ব নীড়াভিমুখে ধাবিত। রাখাল বালক ধেনু চরাইয়া সানন্দ চিত্তে ও উচ্চ কণ্ঠে তান ধরিয়া শ্রান্ত ও স্বেদাপ্লুত দেহে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে করিতে দু-একটা দুষ্ট ও অবাধ্য গাভীকে দমনে রাখিতে না

পারিয়া শ্রান্তির উপর ক্লান্তির মাত্রা দ্বিগুণ সহ্য করিতেছিল। মার্ত্তণ্ডদেব অলক্ষ্যে সুদূর গিরি অন্তরালে থাকিয়া যেন এক একবার উঁকি মারিতেছেন। হৃদয় বাবু তাঁহার বৈঠকখানায় ফরাস বিস্তৃত তক্তাপোষে একটী স্থূল উপাধানে দেহ ভার সংস্থিত করিয়া এক বিভব শালী মক্কেলের সহিত এক নিগূঢ় তত্ত্বের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ছিলেন ও তৎসঙ্গে সর্ব্বক্লেশ নিবারিণী তাম্রকূটের সদ্ব্যবহার করিতে ছিলেন, এমন সময় বাহিরে অস্ফুট রোদন ধ্বনি শ্রুতি-গোচর হওয়ায় সভয়ে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, সদয় এক ধূলি-ধূসরিত অনাবৃত দেহ সাঁওতাল বালককে সঙ্গে করিয়া তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। গতরাত্রে ঐ বালকের পর্ণকুটীর অনল দেবীর উদরে আশ্রয় লইয়াছে। সদয়ের মুখে তাহার এই দুর্দ্ধর্ষ ও বিপন্ন অবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহার পরদুঃখে কাতর প্রাণ একেবারে দ্রব হইয়া গেল। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ভয় ও ভক্তির আঁধার তিনি যথার্থই হৃদয়বাবু বটে। তাহার সাহায্যার্থ আবশ্যকীয় অর্থ দিয়া এবং যথারীতি মাসিক বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া পুত্রের তত্বাবধারণ মানসে তাহাকে বাহাল করিলেন। শিক্ষাভিমানী গর্ব্বিত কুটীল মন সহজে বশীভূত হয় না, কিন্তু এই সরলদরিদ্র ও নিরক্ষর বালকের হৃদয় রাজ্য হৃদয় বাবু বিনা আয়াসেই অধিকার করিয়া ফেলিলেন। বালকের নাম কেরুয়া। বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের ঊর্দ্ধ নহে। তাহার পরিবারের মধ্যে বৃদ্ধ মাতা ও দুইটী কনিষ্ঠ সহোদর ব্যতীত অপর কেহ নাই। তাহার কুটির হৃদয় বাবুর বাটি হইতে কয়েক পদ মাত্র ব্যবধান। গৃহকার্য্যের অবসরে সদয় সেখানে বসিয়া পরিতৃপ্ত হইত ও তাহাদের সরল ও মধুর ব্যবহারে একান্ত মুগ্ধ হইয়াছিল। হৃদয় বাবুর এই অনুপম সহৃদয়তা ও বুদ্ধিমত্তায় আগন্তুকের হৃদয়ে এক অভিনব তরঙ্গ বহিয়া গেল।

(৩)

পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। নক্ষত্র বিরল নির্ম্মল নীলাকাশে তুহিন্ ধবল মেঘ খণ্ড একের পর এক করিয়া প্রশান্ত বিমান মাঝে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। নাতিশীতোষ্ণ পবনে সঞ্চালিত সুমিষ্ট ও সৌগন্ধযুক্ত কুসুমের সৌরভ সম্ভার দিক আমোদিত করিতেছে। কৌমুদীর স্নিগ্ধ রশ্মিতে নগরখানি উদ্ভাসিত ও শশধরের হেমজ্যোস্না পরিপ্লুত শ্যামল ধরণীতল ও প্রকৃতি সতির সহাস্য আনন শোকসন্তপ্ত ও অবসাদ বিজড়িত প্রাণেও বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস ও শান্তি পারাবার প্রবাহিত করিতেছে। শয়ন কক্ষের হর্ম্ম্যতলে মির্জাপুরের কারুকার্য্য খচিত

সতরঞ্জী বিছাইয়া বহুমূল্য দীপাধারের সমুজ্জল আলোকের সম্মুখে হৃদয় বাবু একটী দুরূহ ও জটীল মোকদ্দমার কাগজ পত্র দেখিতে ছিলেন, ও হীরু ভৃত্যের কবল মুক্ত করিয়া পলাইয়া প্রিতার নিকটে বসিয়া মস্তাধারের সহিত আলাপ করিতেছিল। পার্শ্বে হৈমবতী নিশানাথের প্রফুল্ল বদন অনিমেষ নয়নে দেখিতেছিলেন। তাঁহার আগুলফ লম্বিত, আলুলায়িত কুঞ্চিত ভ্রমর কৃষ্ণকেশ রাশি এখন কবরী বিন্যস্থ। তাঁহার আকর্ণ বিশ্রান্ত নেত্র যুগল অনিন্দ্য সুন্দর ও ব্রীড়াবনত আনন ও পরিমিত অঙ্গ সৌষ্টব মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্য বলিয়া প্রতীত হয়। তাঁহার নিরুপম লাবণ্যাভাসিত সুষমাময় মুখখানি শতবার দেখিয়াও হৃদয় বাবুর অতৃপ্ত বাসনা মিটিতে ছিল না, এবং এই জন্যই বোধ হয় কার্য্যে মনঃ সংযোগ করিতে পারিতে ছিলেন না। দুইটা কাজ ত এক সঙ্গে হইবার নহে। কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হৈমবতী বলিলেন—"এমনি ক'রে খেটে খেটেই প্রাণটা পাত করিবে। এক দিনও বিরাম নাই।"

হৃদয় বাবু-"তাহার উপর তোমার ন্যায় সাধ্বী ও সুন্দরী স্ত্রী না থাকিলে কি হইত বল দেখি? "তাহ'লে তোমার একটা উপায় হইত" বলিয়া নিমেষে হৈমবতীর বদনে মৃদু হাস্যের বিজলী খেলিয়া গেল। হৈমবতীর প্রতিবেশিনী ও সই-বিমলার সম্বন্ধে অনেক কথা বার্ত্তা হইল। বিমলা স্বামীসুখে বঞ্চিতা, কারণ তাহার স্বামী চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারিয়া অসৎসংসর্গে পড়িয়া বহুদিন দেশ ছাড়া হইয়াছে। সেই পর্য্যন্ত বিমলা বাপের বাড়ীতেই থাকে। গুরুজনের সেবা শুশ্রূষা ও দীনাতুরজনের দুঃখাপোনোদন করিয়া, কনিষ্টদিগের প্রতি অসীম স্নেহ পরবশ হইয়া ও বাহিক প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিয়া সুদীর্ঘ জীবনটাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিতেছিল। বিমলার একমাত্র বন্ধু হৈমবতী। সুখের সুখী ও দুঃখের দুঃখী। এমন না হইলে কাহার কাছে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে নিহিতভস্মাবৃত বহ্নির ন্যায় দারুণ মনের ব্যথা অকপট চিত্তে ব্যক্ত করিয়া হৃদয়ের বিষম গুরুভার কতকটা লঘু করা যায়। বিমলার পিতা হরিভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন ও খ্যাতনামা ডাক্তার ও হৃদয় বাবুর বিশেষ পরিচিত।

(৪)

শরতের মধ্যাহ্ন। প্রচণ্ড তপনতাপে সকলে একান্ত অধীর হইয়া ঘরের দ্বার গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া কঠিন মৃত্তিকার উপর বিনা উপাধানেই আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। কোনও প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক অঞ্চলে ব্যজন করিয়া মক্ষিকাকুল বিতাড়িত

করিতে করিতে তন্দ্রাবিষ্ট হইতেছেন। বালকের দল মার্ত্তণ্ডের করজাল উপেক্ষা করিয়া প্রাঙ্গনে বা রাস্তার উপর ছুটাছুটী করিয়া খেলা করিতেছে। বিমলাদের বাটী এক লোষ্ট্রের পথ হইলেও সহর বলিয়া হৈমবতী ডুলির সাহায্যে বিমলাদের বাটী উপস্থিত হইলেন। বিমলা সইয়ের অপেক্ষা দুই বৎসরের কনিষ্ট হইলেও উভয়ে হরি হর আত্মা। বাহকের চিৎকারে বিমলা পূজার প্রকোষ্ঠ হইতে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিল ও খোকাকে কোলে করিয়া ঘন ঘন স্নেহ চুম্বনে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল ও সইয়ের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইল। এ ঘর খানির বিশেষ পারিপাট্য না থাকিলেও বেশ পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন। খোকাও সইমার এবম্বিধ আচরণে অভ্যস্ত থাকায় অপ্রতীত হইল না। বিমলাদের বাটী দ্বিতল। উপরে দুইখানি প্রকোষ্ঠ, তন্মধ্যে একখানিতে বিমলার পিতা থাকিতেন ও অপর খানিতে বিমলা ও তাহার পিতৃস্বসা থাকিতেন। বিমলা অনেক দিন মাতার স্নেহাঙ্ক বিচ্যুত কিন্তু মাতৃসম পিসিমার অপরিসীম স্নেহ প্রযুক্ত মাতৃশোক তাহাকে স্পর্শ নাই। বিমলার পিতা সেই পর্য্যন্ত দার পরিগ্রহ করেন নাই। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সকল অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বিমলার স্বামী বিবাহের অনতিকাল পরেই দেশ ছাড়িয়া যাওয়ায় সকলেই মর্ম্মান্তিক দুঃখিত, পিসীমা বিগ্রহ মন্দিরে পূজা পাঠাইয়া, হরিরলুট দিয়া ও অনশন ব্রত যাপন করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। হৈমবতীকে একান্তে পাইয়া বিমলার রুদ্ধ উৎস আজ খুলিয়া গেল। তাহার বিষাদ প্রপীড়িত ও শীর্ণ বদন মণ্ডল দেখিয়া হৈমবতী অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বাত্যাতাড়িত তটিনীর সংক্ষুব্ধ জলরাশি যেমন বেলাভূমি বিধ্বস্ত করে তেমনি বিমলার যৌবনাঙ্কর বিকসিত হইতে না হইতে নিয়তির ঘোর আবর্ত্তনে রুধিয়া যাইতে ছিল। তাহার বাল্য চাপল্য বহুকাল অন্তর্হিত হইয়াছে, এখন গম্ভীর যমুনা প্রবাহের ন্যায় যৌবন সুলভ সকল চিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে প্রকটিত কিন্তু যৌবন তটিনীর সে উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গি নাই। পিসীমা হৈমবতীর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া ও শিষ্টাচারের প্রত্যভিবাদন করিয়া গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। হৈমবতী বিমলাকে বেগমান বক্ষে ধারণ করিয়া স্নেহাপ্লুত কণ্ঠে বলিলেন, "তুই দিন-দিন হচ্ছিস কি? তোর চেহারা দেখিলে যে চেনা যায় না।"

বিমলার নয়ন প্রান্তে অশ্রুভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল, আজ উপযুক্ত অতিথি পাইয়া সমস্ত লুটাইয়া দিয়া বলিল,—"যে জীবন স্বামী সেবা হইতে বঞ্চিত তাহাতে কি

প্রয়োজন সই? তাহার অশ্রুপূর্ণ আনন বর্ষাবারি সংস্পৃষ্ট কমলের ন্যায় ঢল ঢল করিতে ছিল, ও ললাটের শীর্ষদেশে অতর্কিত ভাবে অলক গুচ্ছ ভ্রমর কেশরের ন্যায় স্বেদ বিজড়িত।

হৈ।— একদিন সতীর প্রভাবে এমন হবে যে তোর স্বামী আদর করিয়া তোকে মাথায় করিয়া রাখিবে। তোকে চিনিতে না পারিয়া এই ভ্রমে সে পড়িয়াছে। স্বামী সঙ্গ বঞ্চিতা বিমলা মনে করিল তাহার এ কাতর মর্ম্মবেদনা কি জগদীশ্বরের কর্ণে পৌছিবে? সইয়ের কথায় তাহার ভাবান্তর হইল ও ঘোর বিপ্লবের সূত্রপাত করিল। আশার ক্ষীণরশ্মি দেখাইয়া দিল যে স্বামী তাহাকে ভুলিতে পারেন নাই ও তাঁহার স্বকৃত অপরাধের জন্য লজ্জিত হইয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহার দ্বারে একদিন উপস্থিত হইবেন।

বি।—ভাই ভগবান কি সে দিন দিবেন? আমার মনে হয় এ আশা সুদূর পরাহত।

হৈ।—নিশ্চয় দিবেন। এ অমূল্য জীবনটাকে চিন্তার প্রবল স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া কি ফল?

এইরূপ দুই সই অনেকানেক কথা হইল এবং বিমলা তাহার স্বামী প্রদত্ত সযত্নে রক্ষিত কীটদষ্ট দুই একখানি পত্র ও একখানি অস্পষ্ট ছায়াচিত্র দেখাইতে ভুলিল না, এইচিত্রে সে কখনও কখনও স্বপ্নের ছায়ার মত তাহার স্বামীকে দেখিতে পাইত।

বি।—এই আমার স্বামীর প্রথম ও শেষ উপহার।

হৈ।—বালাই শেষ কেন হইতে যাইবে।

বিশ্রমালাপে দীর্ঘ দ্বিপ্রহর অবসান হইল। অতি কষ্টে হৈমবতী বিদায় লইয়া বাটী আসিলেন।

(৫)

হৃদয় বাবু সেদিন একটা ভারি মোকদ্দমা জিতিয়া তাহারই আনন্দে ভরপূর। বিপক্ষ দলের খ্যাতনামা উকিল রাজবল্লভ বাঁড়ুয্যে তাঁহার প্রতি বড় রুক্ষ ব্যবহার করিতেন, কিন্তু তিনি সকলই স্মিতমুখে সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন। আজ তাঁহাকে কৌশলে পাইয়া বেশ দু-কথা শুনাইয়া দিলেন ও এজলাসের ভিতর ডিপুটীর সম্মুখে তাঁহাকে অপদস্থ হইতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ প্রীতও হইয়াছিলেন। মানুষ ত একেবারে দেবতা হইয়া জন্মাইতে পারে না। তাহার মক্কেল প্রচুর অর্থে

তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইল ও তৎসঙ্গে একটী কারুকার্য্য খচিত গজদন্ত নির্ম্মিত বাক্স উপহার দিতে ভুলিল না। হৃদয় বাবু বাক্স খুলিয়া দেখিলেন যে, যাহার জন্য এত অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সেই ঈপ্সিত ও প্রার্থিত বস্তু এত সহজে লাভ করা এক সর্ব্বময়ের অনুকম্পা ব্যতীত ঘটে না। কুলাঙ্গনার ব্যবহারোপযোগী নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যে বাক্সটী পূর্ণ। তাহার তীব্র সৌগন্ধ বাক্সর ডালা ভেদ করিয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছিল। এগুলির মধ্যে একটী হৈমবতীর বড় সোহাগের সামগ্রী। সে হৃদয় বাবুকে আর কোনও বস্তুর জন্য কখনও অনুযোগ করিত না, কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে সময়ে অসময়ে বিশেষ লাঞ্ছিত হইতে হইত। অদ্য তাহার প্রতিশোধ লইবার আকাঙ্ক্ষায় শীঘ্র শীঘ্র বাটী আসিয়া শুনিলেন পত্নী বাটী নাই। সুতরাং বিদ্রোহের যতটা আশঙ্কা করা গিয়াছিল তাহা ঘটিল না। তিনি বিশ্রামের পর ইজি-চেয়ার (আরাম কেদারায়) অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্রের পাতা উল্টাইতে ছিলেন ও মধ্যে মধ্যে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে গুড়গুড়িতে তাওয়া চড়ান তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে মনে করিতে ছিলেন, তাঁহার এমন দৈব বল থাকিতে যাহার প্রভাবে সুদীর্ঘ দিবসটাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া মুটার মধ্যে আনিতে পারেন ত তাঁহাকে পায় কে? এমন সময়ে হীরালাল তাহার সই-মা প্রদত্ত মৃত্তিকা রচিত একটী শার্দ্দুল ও একটী মার্জ্জার দেখাইবার নিমিত্ত ও তারিফ করিবার নিমিত্ত পিতৃসমীপে উপনীত হইল। হৃদয় বাবু তাহাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া ও খোকাকে আদর করিয়া, সান্ধ্যসমীরণ সেবনার্থ তাহাকে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। বাবু সাজিয়া হীরু অভিনব গাম্ভীর্য্যের আশ্রয় করিয়া পেরাম্বুলেটর চড়িয়া কেরুয়ার সহিত বাহির হইলেন। বেশ পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত হৈমবতী ঘরে প্রবেশ করিলে, হৃদয় বাবু পত্নীর অদর্শন জনিত ক্লেশ জানাইয়া মৃদু অনুযোগ করিলেন।

হৈমবতী অভিমান ভরে উত্তর করিল, সেই ছাড়ে না ত কি করিব। বল ত না হয় আর যাব না এবং স্বামীর প্রতি একবার বিলোল কটাক্ষ করিলেন। হৃদয় বাবুরহার হইল, তিনি বলিলেন,—"তাই কি বলছি তবে তোমার সই যদি আমার সঙ্গীটিকে লইয়া রাখেন ত আমি কি লইয়া থাকি।"

হৈ—আর রসিকতায় কাজ নাই যাও। হৃদয় বাবু আর কি স্থির থাকিতে পারেন? উভয়ের বিবাদ বিসম্বাদ আপোষে মিটিয়া গেল।

হৃ—তোমার জন্য কি এনেছি তা ত জান না? কেবল রাগই করিতে জান।

হৈ—কৈ দেখি। হৃদয় বাবু বাক্স খুলিয়া দেখাইলেন। প্রাবৃটের মেঘাচ্ছন্ন

নভোমণ্ডলে বিদ্যুদ্দামের ন্যায় হৈমবতীর অভিমান ব্যঞ্জক ম্লান বদনমণ্ডলে হাসির রেখা পরিস্ফুট হইল। এগুলি তাঁহার প্রিয় সামগ্রী এবং তাহার অংশ সইকে না দিলে তাঁহার বাসনা অপূর্ণ রহিয়া যায়। সুতরাং ইহার সহিত আরও কি কি দিয়া সইকে তত্ত্ব করা যায় তাহার উপায় অনুধাবন করিতে লাগিলেন ও দুই-জনে পরামর্শ করিয়া শীঘ্রই একটা পন্থা নিরূপণ করিয়া ফেলিলেন। সইয়ের দুরাদৃষ্ট সম্বন্ধে দুই জনের হা হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাসে কক্ষটী মুখরিত হইয়া উঠিল। এমন সময়ে খোকা বেড়াইয়া আসিল। সে ক্রমশঃ কেরুয়ার একান্ত বাধ্য ও অনুগত হইয়া উঠিয়াছিল। কেরুয়াও তাহাকে অপরিসীম স্নেহে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল ও প্রায়ই মনে করিত কি প্রকারে তাহার ঋণ পরিশোধ করিবে ও এই মুষ্টিমেয় সুখী পরিবারের প্রগাঢ় সুশীতল স্নেহের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহাদের প্রতি অজ্ঞাতসারে একান্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিল। শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর ডাকাডাকিতে হৈমবতী নীচে নামিয়া গেলেন এবং হৃদয় বাবুও বহির্ব্বাটীতে গিয়া বসিলেন।

(৬)

রবিবার আদালত বন্ধ। হৃদয় বাবু আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। খোকা পার্শ্বে খেলা করিতেছে। হৈমবতী তাম্বুল রাগ অধররঞ্জিত করিয়া ঘটনা স্থলে দর্শন দিলেন ও ডিবা পুরিয়া পান হৃদয় বাবুর নিকটে রাখিয়া গৃহমধ্যে উপ-বেশন করিলেন।

হৃ—বাবু আজ হুজুরের এত কৃপা কটাক্ষ কেন? কিছু কার্য্যোদ্ধার করিতে আছে বুঝি ?

হৈ—না তবে সই ব'লছিল, কাল তাহারা ভৈরববাবার মন্দির দেখিতে যাইবে আমাকেও সঙ্গে যেতে।

সহরের উপকণ্ঠে কোনও এক পর্ব্বত গহ্বরে এক সন্ন্যাসী বাস করেন, তাঁহার নাম ভৈরববাবা। সহরের তিন ক্রোশ উত্তরে পাহাড়টা বিরাজমান। পথ ঘাট বড়ই দুর্গম ও অটবি পূর্ণ। পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গে একটা বিগ্রহের মন্দির আছে। মা, মনসা দেবীর মূর্ত্তি ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সন্ন্যাসীই প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা সক-লেরই শ্রদ্ধার ভক্তির জিনিস। অনেকের বিশ্বাস সন্ন্যাসী তপঃ সিদ্ধ মহাপুরুষ তপস্যায় দেবতাকে সন্তুষ্ট করিলেও তাঁহাতে দাম্ভিকতা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইত। বিগ্রহ এমন জাগ্রত যে তাহার প্রতি কোনও রূপ অসম্মান প্রদর্শিত হইলে সেই পরিবারের অমঙ্গল না ঘটাইয়া ক্ষান্ত হয়েন না। এই নিমিত্ত বড় একটা কেহ সেখানে যায় না বা যাইতে ভয় পায়। হৃদয় বাবুও পত্নীকে এদুঃসাহসিক কার্য্য হইতে বিরত করিতে বিলক্ষণ প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে

না পারিয়া অগত্যা সম্মতি দিলেন। এবং বন্দোবস্ত হইল একখানি গো-যানে করিয়া আগামী কল্য সদয় ও কেরুয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবে।

হৃ—মা এখন রাজী হইবেন কি না জানি না।

হৈ—তুমি বলিলেই হইবেন।

মাতার নিকট এ বিষয় প্রস্তাব করায় তিনি আস্ফালন করিয়া উঠিলেন, এবং সুদূরাবস্থিত বিগ্রহের উদ্দেশে প্রণত হইয়া বলিলেন,—"বাপ্‌রে সেখানে কি যেতে আছে। এবং নানারূপ সংঘটিত ও অসংঘটিত অমঙ্গলের অতীত কাহিনীর নজীর দেখাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে বলিলেন, কিন্তু কোনও ফল দর্শিল না। হৃদয় বাবু বলিলেন—"মা নিতান্ত ধরেছে একবার যাক্ না।"

গৃহিণী—ধারা বিগলিত হইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন,—আমার কথা যখন শুনিবেই না তখন আমার মত লওয়া কেন? এবং তাঁহার পুত্র যে একেবারে গোল্লায় গিয়াছে তাহা বলিতেও ছাড়িলেন না।

ভারতের প্রধান সেনাপতি—



লর্ড কিচেনার।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন তারিখে আমাদের ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি লর্ডকিচেনার আয়র্লণ্ডের বেলিলংফোর্ড নামকস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর

প্রকৃত-নাম হোরেসিও হার্ব্বার্ট-কিচেনার। ইহাঁর পিতাও ইংলণ্ডের সৈনিক বিভাগের একজন উচ্চ সৈনিক কর্ম্মচারী ছিলেন; তাঁহার নাম,—লেফটেনাণ্ট কর্ণেল এইচ এইচ কিচেনার। লর্ডকিচেনার যৌবনের প্রথমেই বিলাতের উলউইচের সৈনিক-বিদ্যালয়ে সমরবিদ্যা-শিক্ষা করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে কিচেনার সর্ব্বপ্রথম সৈনিক বিভাগে চাকরী গ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি একবার ভলণ্টিয়ার হইয়া সৈনিকে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। মিশরে আরবী পাশার বিদ্রোহের সময় লেফটেনাণ্ট কিচেনার সর্ব্বপ্রথম সমর ক্ষেত্রে আসি চালনা করেন। এখান হইতেই ইহাঁর উন্নতির পথ ক্রমশঃ প্রশস্ত-তর হইতে থাকে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার নীলনদের উপত্যকায় লর্ডউলসলির সহকারি রূপে সবিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া কিচেনার লেফটেনাণ্ট কর্ণেল পদপ্রাপ্ত হন। অতঃপর সুয়াকিমের এবং সুদানের যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার বীর খ্যাতি সমগ্র জগতে প্রচারিত হয়। এই সময় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের রাজা তাঁহাকে কর্ণেল পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিচেনার যখন সুদানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার মহা সমর সংঘটিত হয়; ইহাই কুর যুদ্ধ। লর্ড-রবার্টসের সেনাদলের প্রধান হইয়া লর্ড কিচেনার দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর ক্রজি ধৃত হইলে, কিচেনারের জয়-জয়কার পড়িয়া যায়। পার্লামেণ্ট কিচেনারের অশেষ ধন্যবাদ করেন, এবং তাঁহাকে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। এই সময়ই তিনি লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে লর্ড কিচেনার ভারতের প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। প্রায় সাত বৎসর কাল এই পদে থাকিয়া, তিনি ভারতে সেনা-বিভাগের অশেষ প্রকার সংস্কার সাধন করিয়াছেন। ইহাঁর বয়স এখন ৫৯ ঊনষাট বৎসর, লর্ড কিচেনার যে খ্যাতি সম্মান ও পদগৌরব লাভ করিয়াছেন, এত অল্পদিনে আর কেহ লাভ করিতে পারেন নাই।

—:০:—

শ্রীচৈতন্য ভাগবত-প্রোক্ত—

সাধারণ উপদেশ।

৩১। মূলে যত কিছু কর্ম্ম করেন ঈশ্বরে।
সকল নিস্তার-হেতু দুঃখিত-জীবেরে॥ আঃ ৯।২৭।

৩২। তাঁহান কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।
রাজ্যপদ ছাড়ি করে ভিক্ষুকের কর্ম্ম॥

কলিযুগে তার সাক্ষী—শ্রীদবীর খাস।
রাজ্যসুখ ছাড়ি যার অরণ্যে বিলাস॥
যে বিভব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে।
পাইয়াও কৃষ্ণদাসে তাহা পরিহরে॥
তাবত রাজ্যাদি-পদ সুখ করি মানে।
ভক্তিসুখ-মহিমা যাবত নাহি জানে॥
রাজ্যাদি-সুখের কথা—সে থাকুক্ দূরে।
মোক্ষসুখ অল্প মানে কৃষ্ণ-অনুচরে॥
ঈশ্বরের শুভদৃষ্টি বিনা কিছু নহে।
অতএব ঈশ্বর-ভজন বেদে কহে॥ আঃ ৯।১০০॥

৩৩। দুঃখিত দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি।
অন্ন, বস্ত্র, কপর্দ্দক দেন গৌরহরি॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সভাকারে॥ আঃ ১০।১০২॥

৩৪। উষঃকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহকর্ম্ম।
আপনে করেন সব—সে-ই তান ধর্ম্ম॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, সুবাসিত জল।
ঈশ্বরপূজার সজ্জ করেন সকল॥
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।
ততোধিক শচীর সেবায় তান মন॥ আঃ ১০।১০৩॥

৩৫। দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥ আঃ ১০।১০৪॥

৩৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে বোলে—সে-ই ছার শোচ্যতর॥
দুইবাহু তুলি এই বলি সত্য করি।—
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডনাথ—শ্রীচৈতন্য হরি॥
যাঁর নাম স্মরণে সমস্ত-বন্ধ-ক্ষয়।
যাঁর দাস-স্মরণেও সর্ব্বত্র বিজয়॥
সকল ভুবনে দেখ যাঁর যশ গায়।
বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভু-পায়॥ আঃ ১০।১০৫॥

৩৭। সন্ধ্যা-বন্দনাদি-প্রভু করি উষঃকালে।
নমস্করি জননীরে—পড়াইতে চলে॥ আঃ ১০।১০৯॥

৩৮। ধর্ম্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্ব ধর্ম্ম।
লোক-রক্ষা লাগি কভু না লঙ্ঘেন কর্ম্ম॥ ঐ॥

৩৯। সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস।
স্ত্রী দেখিলে দূরে প্রভু হয় এক-পাশ॥ ঐ॥

৪০। সবে স্ত্রী-মাত্র নাহি দেখেন দৃষ্টি-কোণে॥ ঐ॥

৪১। স্ত্রী-হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণো না করিলা—বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
"গৌরাঙ্গ-নাগর"হেন স্তব নাহি বোলে॥ আঃ ১০।১১০॥

৪২। শুন বাপ! সভারই একই ঈশ্বর॥
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
একশুদ্ধ নিত্য বস্তু—অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেইমত কর্ম্ম করে সকল ভুবন॥
সে প্রভুর নাম-গুণ সকল জগতে।
বোলেন সকল মাত্র নিজ-শাস্ত্র-মতে॥ আঃ ১১।১২০॥

৪৩। হরিদাস বোলেন—যে করান ঈশ্বরে।
তাহা বই আর কেহো করিতে না পারে॥
অপরাধ-অনুরূপ যার যেন ফল।
ঈশ্বরে সে করে—ইহা জানিহ সকল॥
খণ্ড-খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ।
তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥ আঃ ১১।১২১॥

৪৪। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহ-দুঃখ না হয় প্রকাশ॥ ঐ॥

৪৫। কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে।
অল্প দুঃখো নাহি জন্মে এতেক প্রহারে॥

সবে যে-সকল পাপিগণ তাঁরে মারে।
তার লাগি দুঃখ মাত্র ভাবেন অন্তরে—॥
এসব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে-নহু এ-সভার অপরাধ ॥ আঃ ১১।১২১,১২২॥

৪৬। অশেষ দুর্গতি হই যদি যায় প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম ॥ আ ১১।১২৩॥

৪৭। কুম্ভীপাক হয় বিষ্ণুনিন্দন-শ্রবণে। আঃ ১১।১২৪ ॥

৪৮। 'বড়লোক করি লোকে জানুক আমারে।'
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে ॥
এ-সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই ॥ আঃ ১১।১২৬।॥

৪৯। হরিদাস-নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয়ে ও-নৃত্য-দেখনে ॥ ঐ ॥

৫০। 'জাতি-কুল সর্ব্ব নিরর্থক' বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে ॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সে-ই সে পূজ্য—সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
উত্তম কুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে,—নরকেতে মজে ॥
এ-সকল বেদবাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে।
প্রহ্লাদ যেহেন দৈত্য,—কপি হনুমান।
সেইমত হরিদাস নীচজাতি নাম ॥ আঃ ১১।১২৬,১২৭॥

৫১। শুন বিপ্র! সকৃত শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু-পক্ষী-কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম ॥
পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলে সে হরিনাম তারা-সব তরে ॥
জপিলে সে কৃষ্ণনাম—আপনে সে তরে।
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে ॥
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে ?

শতগুণ ফল হয়—সর্ব্বশাস্ত্রে বোলে ॥
জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চসঙ্কীর্ত্তনকারী।
শতগুণ অধিক—পুরাণে কেনে ধরি ? ॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ ॥
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন।
জন্তু মাত্র শুনিঞাই পায় বিমোচন ॥
জিহ্বা পাইয়াও নর-বিনে সর্ব্ব প্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম হেন ধ্বনি ॥
ব্যর্থজন্মা ইহারা নিস্তরে যাহা হৈতে।
বোল দেখি কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে ? ॥
কেহো আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহো বা পোষণ করে সহস্রেক জন ॥
দুইতে কে বড়—ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ' উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে ॥ আঃ ১১।১২৮,১২৯॥

৫২। কলিযুগে রাক্ষস-সকল বিপ্রঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে ॥
এ-সব বিপ্রের স্পর্শ কথা নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেও যায় পুণ্য ক্ষয় ॥আঃ ১১।১২৯,১৩০॥

৫৩। যে তাহান দাস্যপদ ভাবে নিরন্তর।
তাহারে অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর ॥
অতএব নাম তান সেবকবৎসল।
আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভৃত্য-বল ॥
সর্ব্বত্র-রক্ষক হেন প্রভুর চরণ ॥
বোল দেখি কেমতে ছাড়ব ভক্তগণ ? ॥ আঃ ১২।১৩২ ॥

৫৪। ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্প ভাগ্য ॥ মধ্য ১।১৫০ ॥

৫৫। অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি-ভক্তি হয়।
বাপ-মাতামহ কি তোমার ভক্ত নয় ? ॥

ইহা জানি ভালমতে কর অধ্যয়ন।
অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ॥ মধ্য ১১১৫০॥

সমালোচনা।

দুঃখিনী।—শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রণীত. একটি দুঃখিনী স্ত্রীলোকের জীবনী-রূপে এই পুস্তক খানি রচিত হইয়াছে—অঙ্গের অলঙ্কার অবশ্যই আছে। পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীত হইলাম। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে জলধর বাবু এই পুস্তকখানি লিখিয়াছিলেন, পয়ত্রিশ বৎসর পরে প্রকাশিত হইল, বালকের রচনা এত সুন্দর, ইহাই অধিক প্রশংসার বিষয়।

মাধুরী।—শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধূরী বিরচিত, মূল্য আটআনা। একখানি কাব্য। মাধুরীর গর্ভে অনেকগুলি ছোট ছোট কবিতা আছে। সকল গুলিই সংসার জ্ঞানের সোপান; কবিতাগুলি নবনব ছন্দে সুললিত পঠে বিরচিত। কবির কবিত্ব শক্তি প্রকৃতিপ্রসূত বলিয়াই বোধ হয়। পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ কারলাম, "মাএপ্রতি" শিরোনামযুক্ত কবিতাটি ভক্তি-রসের প্রস্রবন পাঠ করিবার সময় শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

বিরাম-কুঞ্জ।—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদবিদ্যাবিনোদ প্রণীত। মূল্য বার আনা। কর্ম্মফল, নির্ব্বাসিত, চিত্র দর্শন পো দাদা, এবং প্রায়শ্চিত্ত এই পাঁচটি বিষয়ের পাঁচটি গল্প এই পুস্তকের নির্ঘন্ট। গল্প গুলি সারগর্ভ; পাঠ করিলে আনন্দ জন্মে, উপদেশও পাওয়া যায়। অভিনয় উপযোগী কয়েক খানি সুন্দর সুন্দর নাটক রচনা করিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত ও প্রশংসিত হইয়াছেন, তাঁহার রচনার প্রশংসা করিবার জন্য অধিক আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। বিরাম কালে বিরাম-কুঞ্জের বাতাস লাগাইলে প্রাণ জুড়াইবে।

হোমিওপ্যাথি প্রচার—ইহা মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১০৮ নং গ্রেষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত মূল্য দুই আনা মাত্র। আজকাল আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসার প্রতি বহু লোকের শ্রদ্ধা জন্মিতেছে। হোমিওপ্যাথি তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বাবু প্রবোধচন্দ্র পরিস্কার বঙ্গ ভাষায় ইহা প্রচার করিতেছেন, হোমিওপ্যাথির সাহিত্য পুস্তকের সংখ্যা এখন অতি অল্প এই হোমিওপ্যাথি প্রচারের যাহাতে বহুল প্রচার হয় তদ্বিষয়ে উৎসাহ দান করা বঙ্গবাসীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।



"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৭শ বর্ষ। | ১৩১৬ সাল, আষাঢ়। | ৩য় সংখ্যা।

হুতাশ।

লেখক, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম, এ,।

অগ্নির অপর এক নাম হুতাশ। যজ্ঞীয় হবি ভক্ষণ করে বলিয়া অগ্নির নাম হুতাশ; হিন্দুর চক্ষে ইহা অনেক দিন হইতে পরম পবিত্র বস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; ঋগ্বেদের প্রথম সূক্ত অগ্নির স্তব, সামবেদেও তাহাই; অগ্নির মোহিনী মূর্ত্তি শুধু হিন্দুর কেন অনেক প্রাচীন জাতিয়দিগের মন বহুকাল হইতে আকৃষ্ট করিয়াছে।

দীপশিখায় যে অগ্নি, খদ্যোতে সেই অগ্নি ও সূর্য্যাদি গ্রহেও তাহারই আবির্ভাব। দীপশিখায় অগ্নির এমনি মোহিনী শক্তি যে শলভ সকল ইহারই লোভে

আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে; তাহারা না জানিয়া প্রাণ দেয়, ও আমরা জানিয়া শুনিয়া বিষয়াগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করি' বলিয়া শ্রীশিহ্লন মিশ্রকবি আক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু শলভের এই দৃষ্টান্ত হইতে আমরা কি আরও উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে পারি না?

শলভ যাহাকে চায় তাহার জন্য প্রাণপাত করে—তাহার দেহতে আত্মদেহ মিশাইয়া গিয়া কৃতকৃতার্থ হয়। কিন্তু আমরা কি তাহা করিতে পারি, না তাহার জন্য চেষ্টা করি? জগতে আসিয়া আমাদিগের কি লক্ষ্য, আমরা কয়জনে তাহা জানি বা জানিবার চেষ্টা করি। শ্রুতি বলিয়াছেন, "য এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা স্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ," অর্থাৎ, হে গার্গি যে ব্যক্তি এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া এই লোক হইতে অপসৃত হয় সে অতিশয় কৃপার পাত্র; আমরা বাস্তবিকই অতিশয় কৃপার পাত্র; ঈশ্বরের আশ্বাস বাণীতেও আমাদের বিশ্বাস শিথিল বাইবেল বলেন "Be faithful to me unto death, and I shall give you the crown of life"

অর্থাৎ আমৃত্যু আমাকে অবলম্বন করিয়া থাক আমি তোমাকে অমৃতময় জীবনের মুকুট প্রদান করিব। গীতা বলিতেছেন—

মন্মনাঃ ভবমদ্‌ভক্তোমদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামে বৈষ্যসি কৌন্তেয় প্রতিজানে প্রিয়োঽসিমে॥"

অর্থাৎ হে পার্থ, আমার প্রতি একান্তমনাঃ হইবে, আমাকে ভক্তি করিবে, আমাকেই কেবল যজন করিবে. কেবল আমাকেই নমস্কার করিবে; এইরূপ করিলে, আমাকে লাভ করিতে পারিবে, ইহা তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কারণ, তুমি আমার প্রিয়। শ্রীভাগবতে অনেক প্রকার গুরুর বিষয় উল্লিখিত আছে; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় শলভও আমাদের এক প্রকার গুরু স্থানীয়; দেয়ালী পোকা দেখিয়া উপহাস করিলে চলিবে না.—তাহাদের মত যখন মানব হইতে পারিবে তাহাদের মত আচরণ করিতে পারিবে তখনই মানব জন্মের সার্থক;—মানব যখন "অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।" এই মন্ত্রের সার্থকতা বুঝিতে পারিবে—তখনই তাহার মানব জন্মের সার্থকতা এক্ষণে দেখা যাউক, শলভ কিসে আকৃষ্ট হইয়া জীবন হারায়; অগ্নির সুবিমল জ্যোতি তাহার কাল; এই জ্যোতির রূপ তাহার জীবনের অপেক্ষা বড়; কিন্তু হায় আমরা জ্যোতির জ্যোতিকে অন্বেষণ না; যদি একবার সেদিনে ধাই তবে আর

অন্য বন্ধন থাকে না ; এই জ্যোতি বাহিরে যেমন ভাসমান অন্তরেও তদ্রূপ ; শ্রুতি বলিতেছেন—

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়ো—
ইমৃতময়ো পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।
যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽ ?
মৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।
তমেববিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃপন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায় ॥”

অর্থাৎ, এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ যিনি সকলি জানিতেছেন এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ যিনি সকলি জানিতেছেন সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে—মুক্তি প্রাপ্তির অন্য পথ আর নাই। সেই শশিসূর্য্যনেত্র দীপ্তহুতাশবক্ত্র ব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব কৃতার্থ হইতে পারে কিন্তু তাঁহার 'দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ং' রূপ দুর্নিরীক্ষ্য ; তাই বিশেষ ভক্ত না হইলে তাঁহার সেরূপ দেখিতে পায় না ; শ্রুতি বলিতেছেন "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহিনিত্যং” অর্থাৎ হে রুদ্ররূপিন্ তোমার যে কোমল দাক্ষিণ্যপূর্ণমুখ তাহার দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর ; শ্রীভগবানের পরম ভক্ত-অর্জ্জুন এরূপ দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

"রূপং মহত্তেবহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো ! বহুবাহূরুপাদং।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্টালোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহং ॥”

অর্থাৎ, হে মহাবাহো ! তোমার বহুবক্ত্রনেত্র, বহু বাহু ও উরু পাদ-বিশিষ্ট, বহু উদর, করালদংষ্ট্রাবিশিষ্ট রূপ দেখিয়া লোক সকল আমার ন্যায় ব্যথিত হইতেছে ; এরূপ ধারণ করিতে হইলে রূপ সাগরে ডুব দেওয়াই শ্রেয়। শলভ ঠিক বুঝে যে ক্ষুদ্র সে কিরূপে দীপ শিখায় অগ্নির মধুর রূপ ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা করিবে ; সেই জন্যই সে সেইরূপ সাগরে ঝাঁপ দেয় ; মানুষও যদি,—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা ॥"

এই শ্লোকের নিহিত অর্থানুসারে কেবল ব্রহ্মকেই অবলম্বন করে তবে সে কৃত কৃতার্থ হয়, ভক্তি শাস্ত্রে কহে—

কৃষ্ণেরতাঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্তি
রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুত্থিতা যে।
তে ভিন্নদেহা প্রবিশন্তি কৃষ্ণং
হবির্যথা মন্ত্রহুতংহুতাশে ॥”

আমাদিগকে মন্ত্র দ্বারা হুত হবির ন্যায় হইতে হইবে, তবে আমরা ব্রহ্মাগ্নিতে প্রাণ মিশাইবার অধিকারী হইব; আমাদিগকে মলিনতা সর্ব্বথা ত্যাগ করিলে তবে ব্রহ্মে লীন হইতে পারিব;—কিন্তু মলিনতা ত্যাগও ভগবৎকৃপা সাপেক্ষ অতএব যেদিকে যাও না কেন তাঁহাকে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য কারণ তাঁহাকে অবলম্বন করিলে “বিধূতকল্মষ্যযান্তি স্বর্গধাংমুক্তিগো যথা।”

গৃহবিচ্ছেদ ঘটায় কে ?

(বাবু না বৌমা ?)

বিচারাসনের সম্মুখে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের মন্তব্য ও কর্ত্তব্য শ্রবণের রীতি আছে, সংসার মধ্যে বস্তু বিশেষের শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পৃষ্ঠা পরীক্ষা করিয়া ভাল মন্দ বিচার করিবার রীতি আছে, আমরা সে রীতির অবমাননা করিব না।

এদেশে যখন রেলওয়ে হয় নাই, তখন হুগলী জেলার কোন্নগর, কোতরঙ্গ, উত্তরপাড়া, বালী ও চব্বিশ পরগণা জেলার পানিহাটি, সুখচর, আগড়-পাড়া, এবং কামারহাটি, প্রভৃতি গ্রামের যে সকল ভদ্র সন্তান কলিকাতায় চাকরি করিতেন, তাঁহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে নৌকা করিয়া কর্ম্মস্থলে আসিতেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে নৌকা করিয়া বাড়ী যাইতেন। সে সময়ের অবস্থা যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগের নিকটে সে বিষয়ের বিশেষ পরিচয় দিতে হইবে না।

ঐ সকল স্থানের মধ্যে একখানি গ্রাম নিবাসী প্রতাপচাঁদ মিত্র কলিকাতায় ট্রেজারি আফিসে অধিক বেতনের চাকরি করিতেন; তিনি ইচ্ছা করিলে স্বচ্ছন্দে কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই, বাটী হইতেই নিত্য যাতায়াত করিতেন। বাটীতে তাঁহার বৃদ্ধা জননী, প্রিয়তমা সহধর্ম্মিনী, একটি কনিষ্ঠ সহোদর, ভ্রাতৃবধূ, একটি ভ্রাতুষ্পুত্র ও একটি ভ্রাতুস কন্যা;

তাঁহাদিগকে লইয়াই তাঁহার সংসার। প্রতাপচাঁদের পুত্র কন্যা জন্মে নাই, সহোদরের পুত্র কন্যাকেই তিনি আপন পুত্র কন্যার ন্যায় স্নেহ যত্ন করিতেন। সহোদরটি এক প্রকার অকর্ম্মণ্য ; শৈশবে বসন্ত-রোগে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল, দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলি অবশ হইয়াছিল, সুতরাং তিনি কাজকর্ম্ম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন না, বাড়ীতে থাকিয়াই দাদার সংসারের নিয়মিত কার্য্য গুলি পরিদর্শন করিতেন। বিকলাঙ্গ বলিয়া দাদা তাঁহাকে কিছু অধিক ভাল বাসিতেন।

প্রতাপচাঁদের পরিবারের নাম দিগম্বরী, বয়ঃক্রম ত্রিশ বত্রিশ বৎসর। স্বামীর প্রণয়িনী হইলেও দিগম্বরী অত্যন্ত হিংসা পরায়না ছিলেন, স্বামীর ঔদার্য্য দর্শনে অনেক দিন পর্য্যন্ত আপন বুকের ভিতর সেই হিংসা পোষণ করিয়াছিলেন, ফুটিতে পারেন নাই। শেষ কালে হিংসা অতিশয় বলবতী হওয়াতে তিনি আর তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, স্বামীর কর্ণে অল্পে অল্পে হিংসা-বিষ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, তাহার এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বড়বধূ মধ্যে মধ্যে স্বামীকে পৃথক হইবার মন্ত্র দিতে থাকেন ; বড় বাবু তাহা শ্রবণ করেন, কিন্তু কোন প্রকার উত্তর দান করেন না। প্রতি সপ্তাহে অতিকম তিন দিন শয্যা গুরুর মন্ত্র শ্রবণ করিতে হয়, বাবু তাহাতে মনে মনে অসন্তুষ্ট হন, ভাল বাসার খাতিরে মুখে কিছু বলেন না। ক্রমে অত্যন্ত ঝড়াবাড়ি হইয়া উঠিল। এক শনিবার রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিয়া দিগম্বরী ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বড় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদো কেন ? হইয়াছে কি ? আমি তোমাকে এত ভাল বাসি, সংসারেও কোন কষ্ট নাই, তবে কিসে তোমার দুঃখ উথলিল ?"

ছলের ক্রন্দন, চক্ষের জল অধিকক্ষণ রহিল না, নেত্র-মার্জ্জন করিয়া অভিমান ভরে দিগম্বরী বলিলেন, "যাও আর তোমায় সোহাগ জানাতে হবে না ! ভাল-বাসা, কি আমার ভালবাসা গো ! আমার একটি কথাও রক্ষা হয় না ; মুখের ভাল বাসার মুখে ছাই ! আর আমার সহ্য হয় না। রাত পোয়ালেই এক কাপড়ে আমি বাপের বাড়ী চলে যাব।" কতকটা ভাব বুঝিতে পারিয়াও বিশেষ কথা শুনিবার জন্য প্রতাপচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ এত অভিমানের কি কারণ ? সংসারের উপর কেন এত বিরাগ ?"

দিগম্বরী বলিলেন, "ন্যাকা ! কিছুই যেন জানেন না। তোমার ন্যাকামী তোমার কাছেই থাকুক, আমি বিদায় হই। বার বার বোলছি, পৃথক হও,

জঞ্জাল তফাৎ কর, আমায় একটু শান্তি দাও। খাতিরেই আসে না। ঐ কথা উঠ্‌লেই যেন বোবা হন। বলি, কি বলি, আমরা ছুটি প্রাণি, কিসের খরচ গা? মাসে মাসে এত টাকা পাও, এত টাকা রোজগার কর, বাত্রোভূতে উড়িয়ে দেয়! লোকে বলে বড় বাবু বড় বাবু! আমাকে বলে বড় গিন্নি! আরে আমার বড় গিন্নি রে! বিশবৎসর বিয়ে হয়েছে, বড় গিন্নির গায়ে এক রত্তি সোণা উঠ্‌ল না? ভাই ভাজ বৌ, ভাই পো, ভাইঝী, হাঁসের পরিবার! তাদের পুষতেই সব টাকা ফুরিয়ে যায়, তাদের দিকেই ষোলআনা টান! আমি একটা দাসী বাঁদি-বৈত নই, আমার কথায় কাণ যাবে কেন? এখনো বোল্‌ছি, যদি ভাল চাও, যদি আমাকে চাও, তবে আবর্জ্জনা তফাৎ কর। আগাছা নির্ম্মূল করে দাও, সংসারে মা লক্ষ্মীর কৃপা হউক। আমার কথায় কাণ যায় না, বুড়ীর কথাই গুরু মন্ত্র। আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, ঐ বুড়ি বেটিই যত নষ্টের গোড়া। কাজকি আর এ সব ঝঞ্ঝাটে; আমাকে বিদায় দাও; আমি চলে যাই, আর আমি তোমাকে জ্বালাতন করতে আসব না।"

প্রতাপচাঁদ পাঁচ মিনিট নিস্তব্ধ। পাঁচ মিনিট পরে মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "এই কথা তোমার? এই জন্য এত অভিমান? আচ্ছা, কল্যই আমি পৃথক হইব।"

বড় গিন্নির অভিমান দূরে গেল, তাঁহার চন্দ্রমুখে মধুর হাস্য দেখা দিল। প্রেয়সীর মান-ভঞ্জন হইল, মুদিত নেত্রে দশমিনিট কি অনুধ্যান করিয়া প্রতাপচাঁদ ঘুমাইলেন। প্রভাতে বাহির বাটীতে গমন করিয়া বেলা ৮টার সময় তিনি একজন দাসীকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন, "দেখ, একটি লোকের উপযুক্ত চাল, ডাল, তরকারী, তৈল, লবণ, ঝালমসলা ইত্যাদিতে একটা সিঁধে সাজিয়ে বড় বৌকে দাও গে, একটা ছোট হাড়ী, একটা মালসা, আর একখানা সরা সেই সঙ্গে দিও, সরার উপর ছুটি পয়সা দিও, বড় বৌকে বোলো মাছের দাম।"

দাসী চলিয়া গেল। বেলা ১০টার সময় তৈল মাখিবার ছলে বাবু একবার বাড়ীর ভিতরে গেলেন, বড় গিন্নির সহিত দেখা হইল। তৎপূর্ব্বেই—প্রাচীনা-দাসী মনীবের হুকুম তামিল করিয়াছিল। কর্ত্তাকে দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "ওটা আবার কি রঙ্গ? সিঁধে পেয়েছি। ঐ জিনিষে কি দু-জনের খাওয়া হয়?"

বাবু।—দু-জন আবার কে?

বউ।—তুমি আর আমি।

বাবু।—আমি ত পৃথক হতে চাই নি, তুমি চেয়েছিলে, তোমার উপযুক্ত শিখে এসেছে।

বউ।—কেন ? রাত্রে ত তুমি বলে ছিলে, কলাই পৃথক হইব।

বাবু।—তাতো বলেছি। তাই ত হয়েছি। তোমারিই পৃথক্ হইবার সাধ, তোমার সঙ্গেই পৃথক হওয়া গেল।

বউ।—আর তুমি ?

বাবু।—আমার মা আছেন, ভাই আছে, ভাইটির স্ত্রী পুত্র আছে, তাদের আমি ত্যাগ করতে পারবো না, তুমি পৃথক্ হয়ে সুখভোগ কর।

দিগম্বরীর চক্ষু স্থির। তখন তাঁহার চৈতন্ত হইল। স্বামীর চরণ ধারণ করিয়া তিনি বলিলেন, "আমার অপরাধ হয়েছে, দয়া কর, ক্ষমা দাও, ক্ষমা দাও; আর আমি তেমন কথা মুখে আনব না।"

বাবু বলিলেন, "পথে এসো। হিংসা করিয়া সংসার ভাঙ্গিবার পন্থা যাহারা অন্বেষণ করে, তাহাদের সকলের পক্ষেই সু-শিক্ষা এইরূপ।"—দিগম্বরীর পৃথক্ হওয়া হইল না; সংসারটি বজায় রহিল।

ইতিপূর্ব্বে জন্মভূমিতে গৃহবিচ্ছেদ ঘটায় কে ? শিরোনামযুক্ত গল্পে আর এক সংসারের বড় বৌমা বলিয়াছিলেন, "মেয়েরা মন্ত্র দেয়, বাঁদরেরা শোনে কেন ? কথা ঠিক। বাবু প্রতাপচাঁদ মিত্র বাঁদর ছিলেন না; তিনি একজন তেজিয়ান মনুষ্য। তাঁহার সৎপুরুষোচিত কার্য্যটি আমাদের সমাজের সকল পুরুষের আদর্শ হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

ভক্তের-ভগবান্।

লেখক, ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী।

২। কারণ শরীরী ব্রহ্ম, ইহাকে সৎ-চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ বা ইচ্ছা মাত্র ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে হইবে; এই ইচ্ছাময় শ্রীভগবান্‌কে চিৎ-জগৎ এবং গুণময় প্রাকৃতিক বা প্রপঞ্চিক জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ স্বরূপ যুগল আদি পুরুষ প্রকৃতি বলিয়া বুঝিতে হইবে; বৈষ্ণবগণ এই আদি পুরুষ প্রকৃতিকে রাধাকৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করেন, শাক্তগণ ইহাকে এইরূপ শিবশক্তি বলিয়া অভিহিত করেন। অদ্বৈতবাদী শৈবগণ এই কারণ শরীরী ব্রহ্মকে 'বিশ্ব এবং বিশ্ববীজঃ

বিশ্বের আদি পুরুষ এবং বিশ্বের বীজ স্বরূপ দেবাদিদেব মহাদেব অর্থাৎ আদি পুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন। এক্ষণে সহজেই বুঝা যায় যে, দক্ষিণাকালিকা দেবীর ধ্যান মূর্ত্তির শবরূপী শিব, কূটস্থ ব্রহ্ম বা নিষ্ক্রিয় পরমাত্মার স্থানীয় এবং কালিকাদেবী আনন্দ চিন্ময় আদি যুগল পুরুষ প্রকৃতি স্থানীয়। এক্ষণে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, প্রকৃতি বা প্রপঞ্চিক জগতে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ সর্ব্ব পদার্থের কোন না কোন প্রকার শরীর বা আকার আছে; কিন্তু চিন্ময় দেশে যে স্থানে চৈতন্য ভিন্ন অন্য কোন সত্তা নাই, সে স্থানে শরীর বা আকারের অস্তিত্বের সম্ভাবনা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার পূর্ব্বে আকার এবং নিরাকারের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইবে। একটী-ইঞ্জিনিয়ার চিন্তা করিয়া একটী বাটী নির্ম্মানের সমস্ত অবয়ব স্থির করিলেন, পরে চিত্র শিল্পের সাহায্যে এই কাল্পনিক অবয়বের অনুরূপ একটী প্লান বা পট অঙ্কিত করিলেন। পরে স্থপতি শিল্পের সাহায্যে এই পট হইতে চুণ, সুরকি, ইষ্টক, কাষ্ঠ আদি উপাদান দ্বারা রাজমিস্ত্রীগণ বাটী প্রস্তুত করিল। এক্ষণে বিজ্ঞান অনুসারে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রস্তুত বাটীর ও তাহার প্লান বা পট গুণময় সাকার মূর্ত্তি, ইঞ্জিনিয়র চিন্তা করিয়া বাটীর যে অবয়ব কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাও সাকার মূর্ত্তি। ইহাতেই বুঝা যায়, যাহার বিশেষণ আছে, তাহাই সাকার।

আম, কাঁটাল, তাল, নারিকেল, আদির বীজ রোপণ করিলে, কালে সুবৃহৎ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, আবার এই সমস্ত সুবৃহৎ বৃক্ষ সকল দেখিয়া ইহাও বুঝা যায় যে, এই সমস্ত বৃক্ষের বৃহৎ অবয়ব নিরবয়বীর ন্যায় কারণে লীন হইয়া বীজ মধ্যে অবস্থিত ছিল! ইহার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হইল যে, কারণে (সূক্ষ্ম বা অপ্রকাশিত ভাবে) যাহা বর্ত্তমান থাকে, কার্য্যে ঠিক তাহাই বিকসিত ভাবে প্রকাশ পায়।

ইহার দ্বারা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে, এই প্রাকৃতিক বা প্রপঞ্চিক অনন্ত ভাবে বিকসিত জগৎ এবং ইহার অধিষ্ঠাতা সগুণ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি দেবগণ পূর্ব্বে কারণে সূক্ষ্ম-ভাবে বিলীন ছিল, অর্থাৎ কারণ শরীরী ব্রহ্মে লীন ছিল। এক্ষণে কার্য্যও কারণের সম্বন্ধ ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। পূর্ব্ব বিচারে বুঝান হইয়াছে যে, আম, কাঁঠাল, আদি বড় বড় বৃক্ষ সকল তাহার কারণীভূত বীজে পূর্ব্বে (সূক্ষ্ম সাকারে বা সূক্ষ্ম শরীরে বা কারণ-শরীরে অপ্রকাশিত রূপে বিরাজিত ছিল,) পরে উহা বিকসিত হইয়া সুবৃহৎ বৃক্ষ রূপে পরিণত হইয়াছে, এবং ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, এই পরিদৃশ্যমান নানারূপ বিচিত্র ভাবে

বিকশিত বিশ্ব-জগৎ পূর্ব্বে সূক্ষ্ম আকারে শরীরে বা কারণ শরীরে অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত ভাবে কারণে অর্থাৎ কারণ শরীরী ব্রহ্মে বিরাজিত ছিল, পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে এই সূক্ষ্ম শরীরী বা কারণ শরীরী জগৎ ক্রমশঃ বিকসিত হইয়া এই পরিজগৎ রূপে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে কারণে অবস্থিত কারণ শরীরী বা সূক্ষ্ম শরীরী জগৎকে জ্ঞানরূপ অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে এই কারণ শরীরী সূক্ষ্ম জগৎকে বিস্তার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আমাদের একটী সৌরজগতের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহাদি সহ নভোমণ্ডলে একটী সূর্য্যকে যে প্রকার পরিবেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই প্রকার অনন্ত কোটী সৌরজগৎ অনন্ত সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া অনন্ত চিন্ময় রাজ্যের অনন্ত নভোমণ্ডলে কারণ শরীরী-ব্রহ্ম বা কারণরূপী আনন্দ পুরুষের চিন্ময় শরীরের চিন্ময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আশ্রয় করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। এই প্রকার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম পরমাণু বা জীবানু হইতে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর জাগতিক সমস্ত পদার্থ প্রাকৃতিক জগতে যেরূপ বিচিত্র ভাবে প্রকটিত বা প্রকাশ পাইতেছে, তাহার সমস্তই কারণ সাগরের বা চিন্ময় জগতের অপ্রকট লীলার প্রতিচ্ছায়া বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এক্ষণে কারণ শরীরী ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইল, তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, তিনিই জগৎ প্রকাশক অর্থাৎ কারণ তত্ত্ব, অপ্রকট বা চিন্ময় জগতের সহিত প্রকট বা প্রাকৃতিক জগতের সহিত প্রকাশ্য প্রকাশক সম্বন্ধযুক্ত সুতরাং কারণ তত্ত্বে যে প্রকার বিচিত্র পরিবর্ত্তন হয়, অন্য কথায় ইচ্ছাময় শ্রীভগবানের যে প্রকার বিচিত্র ইচ্ছা হয়। প্রকট জগৎও ঠিক সেইরূপ বিচিত্র সৃষ্টি হয় বা প্রকাশিত হয়। এই পরিদৃশ্যমান এক অপর হইতে নানাপ্রকার ভিন্ন পদার্থে পরিপূর্ণ অনন্ত জগতের কারণ তত্ত্বকে কার্য্যভেদে, তিনটী ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম পুরুষ অবতার দ্বিতীয় পুরুষাবতার এবং তৃতীয় পুরুষাবতার নামে শাস্ত্রে অভিহিত করিয়াছেন। যা স্ব ব্যাপ্যা চারচর জগৎ পৃণাতি পুরয়তি স পুরুষঃ। সমগ্র জগতে পূর্ণ হইয়া আছেন বলিয়া পরমেশ্বরের নামপুরুষ হইয়াছে।

প্রথম পুরুষ—যিনি এই পরিদৃশ্যমান জগৎ-সৃষ্টির নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ প্রকাশ্য প্রকাশক-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া পুরুষ প্রকৃতি নাম গ্রহণ করিয়া বিশ্বের বীজ স্বরূপ মহৎ-তত্ত্ব রূপে পরিণত হইয়াছেন, তাহাকে প্রথম পুরুষ বলে। মহৎ-তত্ত্বকে

সৃষ্টির বীজ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, মহৎ-তত্ত্ব হইতে, অহঙ্কার তত্ত্ব অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে ভৌতিক সৃষ্টির উপাদান পঞ্চ-তন্মাত্র এবং জীবসৃষ্টির উপাদান একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। আবার পঞ্চ তন্মাত্রা বিকৃত হইয়া পঞ্চ মহাভুতাদিক্রমে স্থূল জগৎ-সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং স্থূল জগতের মৌলিক বীজ যে মহৎ-তত্ত্ব, তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আম, কাঁঠালাদি বৃক্ষের বীজে নিমিত্ত এবং উপাদান এই দুই কারণ বিরাজিত থাকে বলিয়া স্থূল বীজ হইতে স্থূল বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, এবং পূর্ব্বে ইহাও বুঝান হইয়াছে যে, শিব গড়িবার মাটীর ন্যায় উপাদান কারণ জড়, কিন্তু শিব নির্ম্মাতা বা নিমিত্ত কারণ চিৎ স্বরূপ। এক্ষণে এই প্রপঞ্চিক জগৎসৃষ্টির বিষয় যখন বিচার করিতে হইবে, তখনই নিমিত্ত কারণকে চিৎ এবং উপাদান কারণকে প্রকৃতি বা জড় বলিয়া বুঝিতে হইবে, এবং ঐ জড় এবং চিৎপ্রকাশ্য বা প্রকাশক সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে রাখিবে। এক্ষণে প্রকৃতি শব্দের অর্থ বুঝিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে, এই বিশ্ব জগতের উপাদান কারণই প্রকৃতি, সুতরাং প্রকৃতি জড়, এই জড় প্রকৃতি চিতের সান্নিধ্যেপ্রকাশ্য প্রকাশক সম্বন্ধযুক্ত হইয়া, এই জড় চৈতন্যময় জগৎরূপে পরিণত হইবার প্রথম পরিণতি, বিশ্বের অঙ্কুর স্বরূপ "মহৎ-তত্ত্ব।" এই মহৎ-তত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধিতত্ত্ব অর্থাৎ শ্রীভগবানের বিশ্ব সৃষ্টির বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে প্রকাশ হয়, আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় বিশ্ব সৃষ্টির Design মতলব বা Peanপ্ল্যান এই তত্ত্ব হইতে প্রকাশ পায়।

যাহা হউক, এই বিশ্ব প্রকাশক চিৎ-স্বরূপ পুরুষকে, শাস্ত্রে প্রথম পুরুষ বলে পুরাণে এই প্রথম পুরুষকে সংকর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী ও মহাবিষ্ণু বলিয়া অভিহিত করেন। এক্ষণে একবার অনন্যমনে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, অনন্ত পুরুষ এই অনন্ত জড়ময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী হইয়া অনন্ত সৌর জগতের অনন্ত গ্রহ উপ-গ্রহাদিকে অনন্ত শক্তিমান, অনন্ত জ্ঞানবান, অনন্ত ঐশ্বর্য্যবান রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি প্রথম পুরুষ বা মহাবিষ্ণু নামে খ্যাত। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি সমস্ত শক্তিহীন জড় পদার্থ প্রথম পুরুষ বা মহাবিষ্ণুর প্রভাবে, শক্তিমানের কার্য্য করিতেছে, এই প্রকার সমস্ত-জড় পদার্থ বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় পুরুষ—অহঙ্কার তত্ত্ব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মৌলিক অণ্ড বা ডিম্ব স্বরূপ, কেন না, এই অহঙ্কার-তত্ত্ব হইতে জীব এবং ভৌতিক সৃষ্টি প্রথম আরম্ভ হয়, অহঙ্কার তত্ত্ব বা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মৌলিক অণ্ডের অন্তর্য্যামী চৈতন্য পুরুষকে

হিরণ্যগর্ভের অন্তর্য্যামী দ্বিতীয় পুরুষ বলেন; পুরাণেও সমষ্টী জীবেরবা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী পুরুষ গর্ভোদকশায়ী প্রদ্যুম্ন নামে অভিহিত হন, এবং ইহারই নাভি হইতে জগৎসৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; ইহাতে বুঝা যায়, যিনি প্রথম পুরুষ তিনিই দ্বিতীয় পুরুষ মাত্র, অবস্থা ভেদে নাম ভেদ হইয়াছে।

তৃতীয় পুরুষ—এই পরিদৃশ্যমান জগতে যত পদার্থ আছে, তাহাদের এক অপর হইতে নানাপ্রকার গুণ বৈষম্য আছেই আছে। এই ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ জীবদেহের বা সৃষ্ট পদার্থের অন্তর্য্যামী চিৎকে তৃতীয় পুরুষ বলে। পুরাণে এই ব্যষ্টি জীবের দেহের অন্তর্য্যামী চিৎকে ক্ষীরোদ সমুদ্রশায়ী বিষ্ণু ও অনিরুদ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

শাস্ত্রে সৃষ্ট পদার্থে মাত্রকেই জীব বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে যাহাদের শরীরে ইন্দ্রিয় আছে, তাহাদিগকে সেন্দ্রিয় শরীরী বা সাধারণতঃ ইহাকে সজীব বলে এবং যাহাদের ইন্দ্রিয় নাই, তাহাদিগকে নিরীন্দ্রিয় শরীরী বা সাধারণতঃ নির্জ্জীব জড়পদার্থ বলে। তৃতীয় পুরুষ নামী চিৎ এই প্রকার সজীব ও নির্জ্জীব, এই উভয় সৃষ্টিতে সমভাবে বিরাজিত আছেন, তাহার মধ্যে সজীব সৃষ্টিতে ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকাতে এই চিৎ বা তৃতীয় পুরুষ সজীব সৃষ্টিতে জ্ঞানরূপে অধিকতর বিকসিত ভাবে প্রকাশিত হয়। আর নির্জ্জীব সৃষ্টপদার্থে ইন্দ্রিয়গণের অবস্থিতি না থাকাতে তথায় এই তৃতীয় পুরুষ নামী চিৎ কিছু অবিকসিত ভাবে চৈতন্য রূপে প্রকাশ পান, কিন্তু জ্ঞানরূপে প্রকাশ দেখা যায় না তাই কোন কোন পুরাণে এই তৃতায় পুরুষ নামী চিৎকে এই প্রকার জ্ঞান ও চৈতন্য রূপে বিভাগ করিয়া এককে বিষ্ণু এবং অপরকে অনিরুদ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। আবার কোন কোন পুরাণে বিষ্ণু এবং অনিরুদ্র উভয়ই এক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এক্ষণে আবার বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে যে, যিনি প্রথম পুরুষ, তিনিই দ্বিতীয় পুরুষ, এবং তিনিই তৃতীয় পুরুষ; এক কথায় সৃষ্ট রাজ্যে যে স্থানে এবং যে অবস্থায় যে প্রকারে নিমিত্ত কারণের সত্বা আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহার সমস্ত একই আদি পুরুষের বিকাশ। আবার সৃষ্টির মৌলিক উপাদান কারণ যে প্রকৃতি, সেই প্রকৃতিই আদি পুরুষের পরিণতি, সুতরাং পর পর এই জগৎসৃষ্টি প্রকরণে যে স্থানে যে অবস্থায় যে প্রকার উপাদান কারণ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহা বস্তুতঃ সমস্তই প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতি আদি পুরুষের পরিণতি; এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, শ্রীভগবান্ "সর্ব্বভূতেষু গূঢ়" অর্থাৎ তিনি সর্ব্বভূতে

সর্ব্ব সৃষ্ট পদার্থে গূঢ় অর্থাৎ অপ্রকাশক ভাবে বিরাজিত আছেন। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, এই পরিদৃশ্যমান, নানাবিধ রকমে বৈষম্যময় জগতে, চিৎ-অচিৎ জ্ঞান অজ্ঞান, জড় চৈতন্য, সজীব নির্জীব, আত্মা-অনাত্মা, বিদ্যা-অবিদ্যা বা মায়া, অহং-ইদং, অন্তর-বাহ্য, স্থূল-সূক্ষ্ম, কার্য্য-কারণ, কর্ত্তা-কর্ম্ম, সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ, আকার-নিরাকার ইত্যাদি যত প্রকার প্রভেদ আমরা ভেদচক্ষে প্রত্যক্ষ করি, তাহাদের মধ্যে যতই গুরুতর প্রভেদ বর্ত্তমান থাকুক না কেন, নির্ভেদ চক্ষে অর্থাৎ যাঁহারা নিশ্চয় বুঝিয়াছেন যে, এই বিশ্বের সমস্ত শ্রীভগবানের পরিণতি, তাঁহাদের নিকট ইহার যাবতীয় পদার্থ অভেদ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। শ্রীভগবান্ এই বিশ্বজগত হইতে ভেদ বা দ্বৈতও বটেন, অভেদ বা অদ্বৈত্যও বটেন সুতরাং আমরা তাঁহাকে অচিন্ত্য ভেদাভেদ বলিয়া বুঝিব।

"শ্রীভগবান্ ভাবের ঠাকুর, অভাবে কখন তাঁহাকে পাওয়া যায় না।" কেন না জগতে যতবিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী আছেন এবং ইহাঁদের প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যে আবার যত প্রকার সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন মতাবলম্বী আছেন, ইহাঁরা আপন আপন ভাবের অনুকূল শ্রীভগবানের যে ভাবে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্‌কে উপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ ভগবৎ ভক্তগণকে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন বা শ্রীভগবান্, তাহাদের আপনাপন ভাবানুরূপ মূর্ত্তিতে নিশ্চয় দেখা দেন, বা তাঁহাদের হৃদয়ে স্ফূরিত হন। কিন্তু শ্রীভগবানের অনন্ত ভাবের মধ্যে যাঁহারা কোন ভাবে বিমুগ্ধ না হইয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনকে নিযুক্ত করেন, এই প্রকার ভগবৎ-ভাবহীন বা অভাব পন্থীগণের কখন ভগবৎ দর্শন হয় না, বা তাহাদের হৃদয়ে ভগবৎ স্ফূর্ত্তি হয় না, তাহারা চিরকাল ভগবৎ-বিমুখী, এজন্যই বেদে শ্রীভগবান্‌কে রসস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং ভাবের ঠাকুরকে ভাবেই পাওয়া যায়, অভাবে কখন পাওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায় উৎকৃষ্ট কোন্ সম্প্রদায় অপকৃষ্ট, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সম্প্রদায়, ভগবান্‌কে রসময় বা রস স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, তাহা আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায় ভাব, এই ভাবের অনুশীলন, যে সম্প্রদায় যত অধিক করিয়াছেন বা অনুশীলন করিবার প্রণালী যে উপাসক সম্প্রদায় যত অধিক শিক্ষা দেন, সেই উপাসক সেই উপাসক সম্প্রদায় সাধন অঙ্গে অধিকউৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, বলিয়া বুঝিতে হইবে ইহাতে বেশ বুঝা যায়, ভাব এবং রস; সাধন অঙ্গের চরম সীমা।

—:০:—

পুরোহিতের অধঃপতন।

লেখক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপাল চরণ স্মৃতিভূষণঃ—

দেবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণে জ্ঞেয়াস্তস্মাৎ ব্রাহ্মণদেবতা ॥

সমুদায় জগৎ দেবতার অধীন, দেবতারা মন্ত্রের অধীন, সেই সকল মন্ত্র ব্রাহ্মণে বর্ত্তমান ; অতএব ব্রাহ্মণই দেবতা বলিয়া গণ্য।

দেবতা দ্বিবিধ—ভক্তিলভ্য ও মন্ত্রলভ্য। পরাভক্তি (বাঙ্গালাভাষায় ইহাকে অন্ধ-বিশ্বাস বলা যায়) থাকিলে দেবতা সুলভ। কিন্তু পরাভক্তি অতীব দুর্লভ। জন্মান্তরীণ সুকৃতি ভিন্ন ইহা লাভ করা যায় না।

মন্ত্রৈঃ শতগুণং প্রোক্তং ভক্ত্যা লক্ষ গুণোত্তরম্
ভক্তি মন্ত্র সমেতং তু কোটিকোটি গুণং স্মৃতম্ ॥

মন্ত্রে শতগুণ ফল, ভক্তিতে লক্ষগুণ, ভক্তি ও মন্ত্রের যোগ হইলে কোটি কোটি গুণ ফল হইয়া থাকে।

একটী গল্প করিব। বৃত্রাসুর নিজ বাহুবলে দেবগণকে পরাজয় করিয়া স্বর্গ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। দেবগণ পবিত্রব্রত মহর্ষি দধীচির অস্থিদ্বারা বজ্রনির্ম্মাণ করিয়া পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। বৃত্রাসুর নিজের পতন অনিবার্য্য স্থির জানিয়া "নচ দৈবাৎ পরং বলম্" আশ্রয় করিয়াছে। মহর্ষি মহাজ্ঞানী ভার্গব তাহার যজ্ঞে ব্রতী। এই যজ্ঞ পূর্ণ হইলে বৃত্রাসুরের পতন ত দূরের কথা, ইন্দ্রের ধ্বংস স্থির নিশ্চয়। সুতরাং দেবগণ মহাসমস্যায় পতিত হইয়া দুষ্ট সরস্বতীর শরণাপন্ন হইলেন। ভগবতী সরস্বতী মহর্ষিভার্গবের কণ্ঠ আশ্রয় করিলেন।

যজ্ঞীয় মন্ত্র "ইন্দ্রশত্রুং জহি স্বাহা" ইন্দ্ররূপ শত্রুকে বিনাশ কর। এই মন্ত্রে ইন্দ্র এই প্রথম পদে জিহ্বার আকর্ষণ রাখিলে ইন্দ্রের শত্রুকে বিনাশ কর, এইরূপ বুঝায়। আর ইন্দ্র ও শত্রু এই উভয় পদে জিহ্বার আকর্ষণ রাখিলে "ইন্দ্ররূপ শত্রুকে" এইরূপ অর্থ হয়। দুষ্টা সরস্বতীর কণ্ঠাশ্রয় জন্য বিকৃত স্বর হইয়া মহর্ষি শুক্রাচার্য্য "ইন্দ্র শত্রুং" এই পদের ইন্দ্র কথাটীর উপর জিহ্বার আকর্ষণ দিলেন। ইন্দ্রের শত্রু বিনাশ কর, এইরূপ অর্থ বুঝাইয়া বৃত্রাসুরের যজ্ঞের ফলে বৃত্রাসুরেরই ধ্বংস সাধন হইল।

উপরিলিখিত প্রমাণত্রয়ের দ্বারা মন্ত্রের উপযোগিতা বোধ হয় কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে। বিকৃত মন্ত্রের বিপরীত ফলও বোধ হয়, পাঠকবর্গ কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় মন্ত্রের পারশুদ্ধি বিষয়ে কিরূপ সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া উচিত, তাহা আর বুঝাইতে হইবে কি ?

এই মন্ত্র আমাদের পুরোহিতের উপরেই ন্যস্ত। সুতরাং পুরোহিতের শিক্ষা-দীক্ষা যে কিরূপ হওয়া উচিত তাহা বোধ হয়, সকলেই বুঝিতে পারেন।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, আমরা পুরোহিতের প্রতি ভার দিয়া নিশ্চিন্ত। তাহাতে যে দোষ হইবে তাহার ভাগী পুরোহিত। একথার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি তুমি হিন্দু গোপালকের উপর গোরক্ষার ভার অর্পণ কর—আর যদি অপালনে তোমার গরুটী মরিয়া যায়, তাহা হইলে উপযুক্ত পাত্রে ভারার্পণ করায় গোপালকই পাপভাগী ও প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে এ কথা বলিতে পার, কিন্তু যদি তুমি গোখাদক ম্লেচ্ছকরে গোরক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাক, আর অপালন বশতঃ তোমার গোবধ হয়, তখন বল দেখি হে যুক্তিবাদিন্! তুমি কাহা দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করাইবে? কি বলিয়াই বা নিজের মনকে প্রবোধ দিবে? জানিয়া শুনিয়া ব্যয়ের লাঘব করিবার জন্য অযোগ্য লোকের দ্বারা ক্রিয়া করাইবে তুমি—আর পাপভাগী হইবে সেই নিরীহ বেচারী পুরোহিত! যুক্তি বটে!

প্রায় ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে আমি একটী আত্মীয়ের বিবাহের বরযাত্র যাই। বহির্বাটীস্থ সভায় বসিয়া একটী অর্দ্ধব্রাহ্ম শিক্ষিত বাবু মহাশয়ের সহিত তর্ক করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া পড়ি। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী আহ্বানে আমাকে বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হয়। সেখানে গিয়া দেখি যে উভয় পুরোহিতে মহীরাবণের যুদ্ধ চলিতেছে। "অর্হণা পুত্র বাসসা" এইস্থলে কেহ অর্হণা পুত্র বাসয়া অন্যজন অর্হণা পুত্র বায়সা এইরূপ বলিতেছেন। ইহা লইয়াই দ্বন্দ্ব। একজন বলিতেছেন আমি কাশী হইতে বেদান্ত পড়িয়া আসিয়াছি। চতুর্ব্বেদ আমার কণ্ঠস্থ। বাঙ্গালার সমস্ত পণ্ডিতই আমার নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য। তাঁহার অহঙ্কার ও শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া বুঝিলাম যে, কাশীতে তিনি শাস্ত্র কিছুই শিক্ষা করেন নাই। কেবল কাল ভৈরব গিরিতে সুপণ্ডিত হইয়াছেন। গৃহস্থের পীড়াপীড়িতে উভয়েই আমাকে মধ্যস্থ মানিলেন। আমিও বেদমন্ত্রে তদ্রূপ সুপণ্ডিত, সুতরাং আমারও চক্ষু কপালে উঠিল। "করীষভস্ম নৈবেদ্যোশূল্লীমুখসুরার্চ্চনম্" অবশেষে দেখিলাম যে, পুরোহিত মহাশয়ের হস্তে একখানি ছিন্নজীর্ণ সর্ব্বদশকর্ম্ম পদ্ধতি, নিম্নপ্রদেশে কিঞ্চিৎ গুণবিষ্ণুকৃত টীকা বিদ্যমান। কিন্তু তাহাও অতি সংক্ষিপ্ত, অশুদ্ধির ঘণ্ট, বটতলার সরস্বতী। তাহা দেখিয়া কোনও বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা আর পুরাতন শিলালিপি দেখিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বনির্দ্ধারণ করা সমব কথা। অতি কষ্টে তাহা হইতে "পুত্রবাসং সীদতি ইতি সন্দের্ভঃ" এইটুকু উদ্ধার করিয়া উভয়কে পুত্র বাসসা এই হইবে বলিয়া এক প্রকার বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিলাম। তাহার পর হইতে আমি যশোহরের উকীল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদারের সম্পা-

দিত হিন্দুপত্রিকায় সামবেদীয় ক্রিয়াকাণ্ডের বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যাগুলি ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিয়াছিলাম।

আর একবার বারুণীর গঙ্গাস্নানে এক পুরোহিতকে "ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ বারভ্যা" এইরূপ মন্ত্র পাঠ করাইতে শুনিয়াছিলাম। আপত্তি করিলে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে, সমস্ত দিন ত্রয়োদশী নাই বলিয়া বার ধরিয়া বলিয়াছি।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে শ্রাদ্ধে "পিণ্ডে সূত্রং দত্তাৎ" এইস্থলে পিণ্ডে মূত্রং দত্তাৎ এইরূপ পাঠ করিয়া পুরোহিত মহাশয় যে পিতৃপিণ্ডে প্রস্রাব করিবার ব্যবস্থা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এগুলি হাসিবার কথা সত্য। কিন্তু পাঠক! ইহাতে হাসিবেন না। বুঝিবেন যে এগুলি আমাদের অধঃপাতের নিম্নস্তরে পতনের চিহ্ন। ইহাই আমাদের সর্ব্বনাশের একটী প্রকৃষ্ট কারণ। জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, "যে দেশের ধর্ম্মবল যত ক্ষীণ সে দেশের পতন ততই অনিবার্য্য" এক্ষণে পুরোহিতের অধঃপতনের কারণগুলি একে একে বিবৃত হইতেছে।

১ম। নীতিশাস্ত্রে বলিয়াছেন :—

ছেদশ্চন্দন-চূত-চম্পকবনে রক্ষা চ সাকোটকে
হিংসা-হংস-ময়ূর কোকিলগণে কাকে চ বহ্বাদরঃ।
মাতঙ্গে তুরগে খরে চ সমতা কর্পূর কার্পাসয়োঃ
এষা যত্র বিচারণা গুণি-গণা দেশায় তস্মৈ নমঃ

চন্দন আম্র চম্পক বন ছেদন করিয়া যে দেশে সকোটক (শাড়া) রক্ষিত হয়, যে স্থানে হংস ময়ূর কোকিল প্রভৃতি দূর করিয়া কাকের প্রতি সমাদর করা হইয়া থাকে, হস্তী অশ্ব গর্দ্দভ, কর্পূর কার্পাসে যে স্থানে অভেদ বুদ্ধি হে গুণিগণ! আমি এরূপ সুবিচারক দেশকে দূর হইতে নমস্কার করি।

আজ পাঠক! আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশা। মুড়ি মিছরীর সমান দর, বা মিছরী অপেক্ষা মুড়ির অধিক দর।

বাড়ীর পৌরহিত্য সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন? তাহাতে কথা বলিবার অধিকার আমাদের আছে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু নিরপেক্ষ অধ্যাপক বিদায়ে শিক্ষিতের আদর প্রায় নাই, দুই একটী অধ্যক্ষতা করিতে পারিলে কিম্বা অধ্যক্ষ মহাশয়ের আত্মীয় হইতে পারিলে বা দুই একটী বড়লোক সহায় থাকিলে আর কথা নাই, লেখাপড়া জানিবার দরকার নাই; চরিত্রের সদসদ্বিচার নাই "বড়ো যস্য সহায়ো দুস্তি স এব বস্তু পণ্ডিতঃ" উচ্চ বিদায় না হউক মধ্যম বিদায় তাঁহার হস্তগত হইয়া রহিয়াছে।

অবশ্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ দুই পয়সা লাভ করেন আমরা তাহার বিরোধী নহি। একদিন স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় একটী অন্ধ ভিক্ষুককে আট আনা দান করিলে তাঁহার একজন আত্মীয় বলিয়াছিলেন যে, আপনি ওকে ভিক্ষা দিলেন কেন? ও লোকটী প্রকৃত অন্ধ নয়, ফাঁকি দিয়া লইয়া গেল, এখনই মদ খাইবে। আহাতে পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার সমক্ষেই উত্তর দিয়াছিলেন। হউক তাহাতে ক্ষতি কি? ভিক্ষুক সাজিয়া ভিক্ষা লইতে আসিয়াছে। জামাই হইয়া দুধেরবাটি লইতে ত আসে নাই। নাট্যচার্য্য গিরীশচন্দ্র ঘোষ আমার নিকট এইগল্প শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে, "যে ভিক্ষা করিয়া মদখায় তাহার মদ না হইলে চলে না, সুতরাং এরূপ লোক কৃপার পাত্র" সুতরাং এরূপ লোক কিছু পাইলে দুঃখিত না হইয়া আনন্দলাভ করিবারই কথা। কিন্তু তাই বলিয়া যথার্থ জ্ঞানী পবিত্রব্রত ঋষিকল্প মনস্বী পণ্ডিতগণ কিছুই পাইবেন না আর অপাত্রে দান পর্য্যাপ্তরূপে হইবে ইহাতে গুণগ্রাহিতার অভাবে যে গুণশালী লোকের হ্রাস হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমাদের বিবেচনায় পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাপক বিদায়ে শাস্ত্র বিচার চালাইলে এবং দুই একটী শিক্ষিতলোক তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে এ দোষ অনেকাংশে কমিয়া যাইতে পারে।

২য়। প্রকৃত বুদ্ধিমান ও মেধাবী বালকেরা আর এ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে চেষ্টা করে না বা তাহাদের পিতামাতা তাহাদিগকে এ সকল কার্য্যে নিযুক্ত করিতে অভিলাষী নহেন। আমার এ অধঃপতন চিরদিন হয় নাই, এককালে আমার জন্মভূমি কেঁড়াগাছি গ্রামে আমার টোল ছিল। সেই সময় শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য নামে আমার একজন আত্মীয় আমাকে বলেন "খুড়ো! আমার বড়ছেলে দেশো (দাশরথী) কিছু নির্ব্বোধ, তুমি লইয়া গিয়া তাহাকে ব্যাকরণ পড়াও" ইহার উপর বোধ হয় আরটীকা করা নিষ্প্রয়োজন।

৩য়। ১টার সময় আহার করিতে বা মধ্যে মধ্যে উপবাস করিয়া যাজা ক্রিয়া করিতে বর্ত্তমানে অনেকেই সম্মত নহেন। তাঁহাদিগের উত্তর এই যে, উহাতে শরীর খারাপ হয় এবং অল্পায়ু হইতে হয়। ইহার উত্তর দেওয়া আজ আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমি বৈজ্ঞানিক বা আয়ুর্ব্বেদিক প্রবন্ধ লিখিতে বসি নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে আমার প্রিয়বন্ধু স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন এ বিষয়ে বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যদিগের মধ্যে শতকরা যত লোক স্বাস্থ্যহীন বা স্বল্পায়ু; তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যক বাবুগণ

স্বাস্থ্যহীন ও অল্পায়ু। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য বা অনিয়মবদ্ধ কঠোর পরিশ্রমী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কখনও অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, হৃদ্রোগ বা চক্ষুরোগে বিশেষ কষ্টভোগ করেন না। এ সকল রোগগুলি প্রাতর্ভোজী বাবুদিগের একচেটিয়া বলিলেও চলে।

৪র্থ। লোকে কথায় বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট। বাস্তবিক এ সংসারে যত লোক দুষিত ও অসচ্চরিত্র হয় তাহার বার আনা অংশ অর্থাভাবেই হইয়া থাকে। আজকাল পুরোহিত সম্প্রদায়েরও অনেকটা তাহাই ঘটিয়াছে। পূর্ব্বসময় অপেক্ষা সাংসারিক ব্যয় বোধ হয় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু কালী পূজার দক্ষিণা ১৲ টাকার অধিক হয় নাই। যজমানের যে ৺কালীপূজা করিতে ১০৲ খরচ হইত এখন সেখানে ৪০৲ টাকার ন্যূনে হয় না। কিন্তু পুরোহিত মহাশয়ের সেই একটী টাকা ঠিক আছে, এবং কাপড়খানি ১০ হাতের স্থানে ৬ হাত হইয়া পড়িয়াছে। দুঃখের কথা কি বলিব? দোকানে আভ্যুদয়িকের বা শ্রাদ্ধের সুপারি কাচা চাহিলে দোকানদার সেই পৈতৃক সময়ের শুষ্ক নীরস অন্তঃসার শূন্য আখুবৃষণোপম সুপারী এবং একহস্ত পরিমিত কাচা বাহির করিয়া দিবে। পাঠক! মনে করিবেন না যে আমি অবস্থা না বুঝিয়া একথা বলিতেছি—ধনিগৃহেও এরূপ অবস্থা দৃষ্ট হয়। তাঁহারা কর্ম্মকারকে ইস্পাৎ ফাঁকি দিয়া নিজের অস্ত্রেরই মস্তক ভক্ষণ করিতেছেন—তাহা কিন্তু বুঝিতে পারেন না। এক সময়ে আমি একটী বিশিষ্ট ধনীর সাংসারিক মাতৃকৃত্যে পৌরোহিত্য করিতে গিয়া একখানি ৪ হাত কাপড় দেখিলাম। দেখিয়া আমার পিত্ত পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল। কিন্তু অতিকষ্টেক্রোধ সংবরণ করিয়া মন্ত্র পাঠ করাইলাম। পরে ভাবনা করিবার সময় উপস্থিত হইলে কহিলাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়! মনে মনে চিন্তা করুন্ আপনার জননী এখানে বসিয়া কাপড়খানি পরিধান করিতেছেন। কিন্তু বেড় আঁটিল না। সুতরাং কাপড় খানি একপ্রকার কোটিদেশে জড়াইয়া বামহস্তে অতিকষ্টে ধরিয়া পিণ্ডটী গলাধঃ করিয়াই সেই অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় কাহারও দেখিবার ভয়ে শঙ্কিত হইয়া তীব্রবেগে স্বর্গপথে প্রস্থান করিতেছেন। বলাবাহুল্য সেই হইতেই আমার সেই বাড়ীর অন্নজল চিরদিনের জন্য উঠিয়াছে। অবশ্য—দরিদ্র অসমর্থ পক্ষে ঐ ৪ হাত বস্ত্রই যথেষ্ট। শাস্ত্র বলিয়াছেন-"বিত্তশাঠ্যং নকুর্ব্বাণো সম্যক ফল মবাপুয়াৎ। কুর্ব্বাণো বিত্ত শাঠ্যন্তু নলভেৎ সদৃশং ফলম্।" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ধনিগণ আজ নিজের ক্রিয়াকাণ্ড সিদ্ধ হইল কি না তাহা বিবেচনা না করিয়া দরিদ্রগণের অনুকরণে তৎপর হইতেছেন। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির হ্রাস হওয়াই ইহার প্রধান কারণ।

৫ম। প্রায় ২।৩ বৎসর হইল এই কলিকাতায় কোনও এক ধনী শূদ্রজাতির পুত্রবধূর মৃত্যুর ৬ দিন পরে কন্যার বিবাহ হইতে দেখিয়াছি। মাতুল মহা-

শয় কন্যা সম্প্রদান করেন। কলিকাতাস্থ কোনও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৫০৲ টাকা লইয়া উক্ত ব্যবস্থা দেন। অবশ্য স্বীকার করি, অদত্তা কন্যার এক রাত্রি ভিন্ন অশৌচ নাই। কিন্তু দানাধিকারী এবং বৃদ্ধি শ্রাদ্ধাধিকারী কন্যার পিতার মরণাশৌচ সত্ত্বে কি প্রকারে তাহার প্রতিনিধি প্রদানে বিবাহ কার্য্যে সমাহিত হইল তাহা বুঝিবার সাধ্য আমাদের নাই। যে দেশে ৫০৲ টাকায় এরূপ ব্যবস্থা মিলে সে দেশের ধর্ম্মতরুর মূল যে কিরূপ শিথিল-ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, আমাদের এই প্রাচীন ধর্ম্ম আজ একটী খেলনার সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে সমাজের মস্তক অবশ্য ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র-পরায়ণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা পুরোহিত সম্প্রদায়। বিষয়ী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৃত্তি ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ জাতি ইহার রক্ষক। শ্রুতি বলিয়াছেন॥

ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীৎ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূতদস্য বৈশ্যশ্চ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহ জায়ত।

এই সমাজরূপ বিরাট পুরুষের মুখ অর্থাৎ মস্তক ব্রাহ্মণ। বাহুশক্তি অর্থাৎ রক্ষণশীলতা ক্ষত্রিয়ে বর্ত্তমান। ইহার উরুদ্বয় অর্থাৎ চলচ্ছক্তি বৈশ্যে নিহিত। আর শূদ্রজাতি ইহার চরণ যুগল।

আজকাল প্রভাবে সেই মস্তক বিকৃত। বাহুশক্তি অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ জাতি একেবারে উদাসীন। চলচ্ছক্তি বৈশ্য নির্দ্ধন। সুতরাং কে ইহার প্রতি লক্ষ্য করিবে? সমাজ কাহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইবে? বৃদ্ধ রুগ্ন আর্য্যসমাজের বুঝি আর রক্ষা নাই।

তাই বলি হে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত! হে আর্য্যসমাজের মস্তক স্বরূপিন্! আজ তোমাকেই বদ্ধপরিকর হইয়া সমাজ রক্ষা করিতে হইবে। বিলাস ব্যসন, আত্ম-সুখেচ্ছা, স্বার্থান্ধতা একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে। দুঃখ, দারিদ্র, অপমান অঙ্গের আভরণ করিতে হইবে। একদিন তোমাদেরই একজন মহামান্য নবদ্বীপা-ধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বৃত্তি ধূলি মুষ্টির ন্যায় দূর করিয়া দিয়া তেজস্বীতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। একদিন তোমাদের ন্যায় একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহিণী রাজমহিষীকে হস্তের সূত্র দেখাইয়া সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন্ "এই সূতা যত-দিন তোর নদীয়া ততদিন"। আমাদের কি সে তেজঃ একেবারে নির্ব্বাণ হই-য়াছে? কখনই নহে-তবে বলিতে পার তাহার উন্মেষ নাই। তাহাকে উন্মেষিত ও প্রবুদ্ধ কর—ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন। সমাজের কণ্টক তোমার তেজে দগ্ধ হইয়া যাইবে। সেই দগ্ধ সংসার ক্ষেত্রে মহাবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফলচ্ছায়া প্রদানে আবার তোমাকেই পরিতৃপ্ত করিবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-প্রোক্ত

শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ।

প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

আদি-লীলা।

১। চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তিদান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥
সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পায়া॥
সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত—যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নামসঙ্কীর্ত্তন।
চারিভাবভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥
আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে॥
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে কয়॥ ৩পং। ৯ পৃষ্ঠা।

যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে,—আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥ ১২ পৃঃ

আমাকে ত যে-যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে-সে ভাবে ভজি—এ মোর স্বভাবে॥

---

*পৃষ্ঠাঙ্কগুলি 'বঙ্গবাসী'-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্করণের।

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে,—আমারে সম হীন।
সেই-ভাবে আমি হই তাহার অধীন॥ ঐ

৪। এই তাঁর (গুরুর) বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।
নিরন্তর কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন করি॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম॥ ৭পং। ৩৪পৃঃ

৫। ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এইসব॥ ঐ ৩৫পৃঃ

৬। উপনিষৎ-সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ—পরম মহত্ত্ব॥
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য॥
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্বকার্য্য॥ ঐ

৭॥ 'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য-অর্থে কহে—ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ—অনূর্দ্ধসমান॥
তাঁহার বিভূতি-দেহ—সব চিদাকার।
চিদানন্দ তেঁহো—তাঁর স্থান পরিবার॥ ঐ

৮। বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর॥ ঐ

৯। ঈশ্বরের তত্ত্ব—যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ—যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ॥ ঐ

১০। অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগতরূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি॥

নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥
প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময়॥ ঐ

১১। প্রণব সে মহাবাক্য—বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব সর্ববিশ্বধাম॥
সর্বাশ্রয়-ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
'তত্ত্বমসি'-বাক্য হয় বেদের একদেশ॥ ঐ

১২। স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণশিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি॥ ঐ

১৩। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।
ষড়বিধ-ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ পরতত্ত্বধাম॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর, নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান সে 'সম্বন্ধ'॥
তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥ ঐ। ৩৬পৃঃ

১৪। ভগবান্-প্রাপ্তিহেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়॥
সেই সর্ববেদের 'অভিধেয়'-নাম।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম॥ ঐ

১৫। কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥ ঐ

১৬। পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণসেবাসুখরস॥ ঐ

১৭। ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥ ৯পঃ। ৪০পৃঃ

১৮। প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন॥ ১২পং।৪৮পৃঃ

১৯। লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্ম-কীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥ ঐ

২০। খৈ সন্দেশ অন্ন যত—মাটীর বিকার।
এহো মাটী সেহো মাটী—কি ভেদ বিচার? ॥
মাটী দেহ মাটী ভক্ষ্য—দেখহ বিচারি। ১৪পং।৫৪পৃঃ

২১। প্রভু কহে—[illegible] [illegible]

২২। ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল॥ ঐ

২৩। গৃহস্থ হইয়া করিব পিতামাতার সেবন।
ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ॥ ১৬পং।৫৭পৃঃ

২৪। কথোদিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন।—
গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধর্ম্ম॥
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন॥ ঐ

২৫। প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য-সাধন কহিল।
'নামসঙ্কীর্ত্তন কর' উপদেশ কৈল। ঐ।৫৮পৃঃ

২৬। ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তাসভার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ॥
দোষ-গুণ-বিচার এই 'অল্প' করি মানি।
কবিত্বকরণে শক্তি—তাহা সে বাখানি॥ ঐ।৬০পৃঃ

ক্রমশঃ



ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।

লেখক—নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বহুদিন পূর্ব্বে Indian Mirror এ দেখিয়াছিলাম যে দক্ষিণেশ্বরে একজন পরমহংস আছেন, তথায় স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেনের সশিষ্যে গতিবিধি আছে। আমি হীন বুদ্ধি, ভাবিলাম—যে ব্রাহ্মরা যেমন হরি, মা প্রভৃতি বলা আরম্ভ করিয়াছে, সেইরূপ এক পরমহংসও খাড়া করিয়াছে। হিন্দুরা যাহাকে পরমহংস বলে, সে পরমহংস ইনি নন। তাহার পর কিছুদিন বাদে শুনিলাম, আমাদের বসুপাড়ায় ৺ দীননাথ বসুর বাড়ীতে পরমহংস আসিয়াছেন, কৌতূহল বশতঃ দেখিতে যাইলাম কিরূপ পরমহংস। তথায় যাইয়া শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা লইয়া আসিলাম। দীননাথ বাবুর বাড়ীতে যখন আমি উপস্থিত হই, তখন পরমহংস কি উপদেশ দিতেছেন ও কেশব বাবু প্রভৃতি তাহা আনন্দ করিয়া শুনিতে-

ছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, একজন সেজ জ্বালিয়া আনিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে রাখিল। তখন পরমহংস পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"সন্ধ্যা হইয়াছে?" আমি এইকথা শুনিয়া ভাবিলাম "ঢং দেখ, সন্ধ্যা হইয়াছে, সম্মুখে সেজ জ্বলিতেছে, তবু ইনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, সন্ধ্যা হইয়াছে, কি না!" আর কি দেখিব, চলিয়া আসিলাম।

ইহার কয়েক বৎসর পরে রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ ৺বলরাম বসুর ভবনে পরমহংসদেব আসিবেন। সাধুত্তম বলরাম তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পাড়ার অনেককেই নিমন্ত্রন করিয়াছেন। আমারও নিমন্ত্রন হইয়াছিল,—দর্শন করিতে গেলেম। দেখিলাম পরমহংসদেব আসিয়াছেন, বিধু কীর্ত্তনী তাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য নিকটে আছে। বলরাম বাবুর বৈঠকখানায় অনেক লোক সমাগম হইয়াছে। পরমহংসদেবের আচরণে আমার একটু চমক্ হইল। আমি জানিতাম, যাঁহারা পরমহংস ও যোগী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেয়, তাহারা কাহারোও সহিত কথা কয় না, কাহাকেও নমস্কার করে না; তবে কেহ যদি অতি সাধ্য সাধনা করে, পদসেবা করিতে দেয়। এ পরমহংসের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতি দীনভাবে পুনঃ পুনঃ মস্তক ভূমিস্পর্শ করিয়া নমস্কার করিতেছেন। এক ব্যক্তি আমার পূর্ব্বের ইয়ার, তিনি পরমহংসকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "বিধু ওঁর পূর্ব্বের আলাপী, তার সঙ্গে রঙ্গ হচ্চে।" কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এমন সময়ে অমৃতবাজার পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা বোধ হইল না। তিনি বলিলেন, "চল আর কি দেখ্‌বে?" আমার ইচ্ছা ছিল, আরো কিছু দেখি, কিন্তু তিনি জেদ করিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া আসিলেন। এই আমার দ্বিতীয় দর্শন।

আবার কিছুদিন যায়, ষ্টার থিয়েটারে (৬৮ নং বিডনষ্ট্রীট) "চৈতন্যলীলার" অভিনয় হইতেছে, আমি থিয়েটারের বাহিরের compound এ বেড়াইতেছি, এমন সময়ে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভক্ত (এক্ষণে তিনি স্বর্গগত) আমায় বলিলেন, "পরমহংসদেব থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে বসিতে দাও, ভাল, নচেৎ টিকিট কিনিতেছি।" আমি বলিলাম, "তাঁহার টিকিট লাগিবে না কিন্তু অপরের টিকিট লাগিবে।" এই বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতেছি, দেখিলাম তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া থিয়েটারের compound মধ্যে

প্রবেশ করিয়াছেন; আমি না নমস্কার করিতে করিতে তিনি অগ্রে নমস্কার করিলেন, আমি নমস্কার করিলাম, পুনর্ব্বার তিনি নমস্কার করিলেন, আমি আবার নমস্কার করিলাম, পুনর্ব্বার তিনিও নমস্কার করিলেন। আমি ভাবিলাম, এইরূপই তো দেখিতেছি চলিবে। আমি মনে মনে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া আসিয়া একটি box এ বসাইলাম ও একজন পাখাওয়ালা নিযুক্ত করিয়া দিয়া শরীরের অসুস্থা বশতঃ বাড়ী চলিয়া আসিলাম। এই আমার তৃতীয় দর্শন।

আমার চতুর্থ দর্শন বিবৃত করিবার পূর্ব্বে আমার নিজের অবস্থা বলা প্রয়োজন। আমাদের পঠদ্দশায় যাঁহারা Young Bengal. নামে অভিহিত হইতেন, তাঁহারাই সমাজে মান্যগণ্য ও বিদ্বান বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বাঙ্গালায় ইংরাজী শিক্ষার তাহারই প্রথম ফল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, অল্প সংখ্যা ক্রিশ্চিয়ান হইয়া গিয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও ছিল না, বলিলেও বলা যায়। সমাজে যাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ. শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চলে এবং বৈষ্ণব সমাজ এমন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত যে, পরস্পর-পরস্পরের প্রতিবাদী। ইহা ব্যতীত অন্যান্য মতও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মতেই অপর মতাবলম্বীর নরক ব্যবস্থা। ইহার উপর অনেক যাজক ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচার হইয়াছেন। সত্যনারায়ণের পুঁথি লইয়া শ্রাদ্ধ করেন, মেটে দেওয়ালে পাইখানার ঘটী হইতে জল দিয়া গঙ্গামৃত্তিকার কৌটা ধারণ করেন। তাহার উপর ইংরাজীও দু-পাতা পড়িয়াছি, কালাপাহাড় জগন্নাথ ভাঙ্গিয়াছে প্রভৃতি। আবার জড়বাদীরা বুদ্ধি বিদ্যায় সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, ঈশ্বর না মানা বিদ্যারপরিচয়, এ অবস্থায় স্ব-ধর্ম্মের প্রতি আস্থা কিছুমাত্র রহিল না; কিন্তু মাঝে মাঝে ঈশ্বর লইয়া সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত তর্কবিতর্কও চলে। আদি সমাজেও কখনো কখনো যাওয়া আসা করি, একটী ব্রাহ্ম সমাজও পাড়ার কাছে ছিল, সেখানেও মাঝে মাঝে যাই। কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ঈশ্বর আছেন কি না সন্দেহ, যদি থাকেন, কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া উচিত? নানা তর্কবিতর্ক করিয়া কিছু স্থির হইল না, ইহাতে মনের অশান্তি হইতে লাগিল। একদিন প্রার্থনা করিলাম, "ভগবান্ যদি থাকো আমায় পথ নির্দ্দেশ করিয়া দাও।" ইহার কিছুদিন পরেই দাম্ভিকতা আসিল। ভাবিলাম জল-বায়ু আলো ইহ-জীবনের যাহা প্রয়োজন—তাহা অর্জ্জন রহিয়াছে; তবে ধর্ম্ম, যাহা অনন্ত জীবনের প্রয়োজন, তাহা এত খুঁজিয়া লইতে হইবে কেন?

সমস্তই মিথ্যা কথা ; জড়বাদীরা বিদ্বান-বিজ্ঞ, তাঁহারা যে কথা বলেন, সেই কথাই ঠিক। ভাবিলাম ধর্ম্মের আন্দোলন বৃথা, এইরূপ তমাচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিবাহিত হইল। পরে দুর্দ্দিন আসিয়া ঠিক নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না। দুর্দ্দিনের তাড়নায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, বিপদমুক্ত হইবার কোনও উপায় আছে কি ? দেখিয়াছি, অসাধ্য রোগ হইলে তারকনাথের শরণাপন্ন হইয়া থাকে, আমারও তো কঠিন বিপদ ; একরূপ উদ্ধার হওয়া অসাধ্য, এ সময়ে তারকানাথকে ডাকিলে কিছু হয় কি ? পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্। শরণাপন্ন হইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সেই চেষ্টাই সফল হইল, বিপজ্জাল অচিরে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল ; দেবতা মিথ্যা নয়। বিপদ হইতে তো মুক্ত হইলাম, কিন্তু আমার পরকালের উপায় কি ? আবার মনোমধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব, কোন পথ অবলম্বন করি ? তারকানাথের মহিমা দেখিয়াছি, তারকানাথকেই ডাকি। ক্রমে দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই বলে যে গুরু ব্যতীত উপায় নাই। ভাবিলাম, কেন উপায় নাই ? এই তো ঈশ্বরের নাম রহিয়াছে. ঈশ্বরকে ডাকিলে কেন উপায় হইবে না ? কিন্তু সকলেই বলে গুরুব্যতীত উপায় হয় না। তবে গুরু কাহাকে করিব ? শুনিতে পাই, গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করিতে হয় ; কিন্তু আমার ন্যায় মনুষ্যকে ঈশ্বর জ্ঞান কিরূপে করি ? মন অতি অশান্তি পূর্ণ হইল। মানুষকে গুরু করিতে পারি না।

'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর।
গুরুরেব পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥'

এই বলিয়া গুরুকে প্রণাম করিতে হয়। সামান্য মানুষকে দেখিয়া ভণ্ডামি কিরূপে করিব ? ঈশ্বরের নিকট অকপট হৃদয়ের প্রয়োজন, গুরুর সহিত ঘোর কপটতা করিয়া কিরূপে তাঁহাকে পাইব ! যাক্ আমার গুরু হইবে না। বাবা তারকনাথের নিকট প্রার্থনা করি, যদি গুরুর একান্ত প্রয়োজন হয়, তিনি কৃপা করিয়া আমার গুরু হোন। শুনিয়াছিলাম নরবেশ ধরিয়া কখনো কখনো মহাদেব মন্ত্র দিয়া থাকেন। যদি আমার প্রতি তাঁহার এরূপ কৃপা হয়, তবেই ;-নচেৎ আমি নিরুপায়। কিন্তু তারকনাথের তো কই দেখা পাই না, তবে আর কি করিব ? প্রাতে একবার ঈশ্বরের নাম করিব, তারপর যা হয় হইবে। এসময়ে একজন চিত্রকরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তিনি একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন, সত্য হোক আর মিথ্যা হোক—একদিন তিনি আমায় বলিলেন, "আম

প্রত্যহ ভগবানকে ভোগ দিই, তিনি গ্রহণ করেন. কখনো কখনো রুটীতে দাঁতের দাগ থাকে, কিন্তু এ ভাগ্য গুরুর নিকট উপদিষ্ট না হইলে হয় না। আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইল। তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া ঘরে দোর-বন্দ করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। এ ঘটনার তিন দিন পরে আমি কোন কারণ বশতঃ আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় একটি রকে বসিয়া আছি, দেখিলাম চৌরাস্তার পূর্ব্বদিক হইতে নারায়ণ, আর দুই একটী ভক্ত সমভিব্যাহারে পরমহংসদেব ধীরে ধীরে আসিতেছেন। আমি তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাইবা মাত্র তিনি নমস্কার করিলেন। সেদিন আমি নমস্কার করায় পুনর্ব্বার নমস্কার করিলেন না। আমার সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে চৌমাথার দক্ষিণ দিকের রাস্তায় চলিলেন। তিনি যাইতেছেন, আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন কি অজানিত সূত্রের দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল তাঁহার দিকে কে টানিতেছে। তিনি কিছুদূর গিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হইল তাঁহার সঙ্গে যাই। এমন সময় তাঁহার নিকট হইতে আমায় একজন ডাকিতে আসিলেন, কে আমার স্মরণ হইতেছে না। তিনি বলিলেন, "পরমহংসদেব ডাকিতেছেন।" আমি চলিলাম, পরমহংসদেব ৺বলরাম বাবুর বাটীতে উঠিলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। (তৎকালে বলরাম বাবু দেহ পরিত্যাগ করেন নাই।) বলরাম বাবু বৈঠকখানায় শুইয়া ছিলেন, বোধ হইল পীড়িত, পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বসিয়া বলরাম বাবুর সহিত দুই একটী কথা বলিবার পর পরমহংসদেব হঠাৎ উঠিয়া, "বাবু আমি ভাল আছি—বাবু আমি ভাল আছি"—বলিতে বলিতে কিরূপ এক অবস্থাগত হইলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন—'না না, ঢং নয়—ঢং নয়। অল্প সময় এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'গুরু কি?' তিনি বলিলেন, "গুরু কি জান যেন ঘটক।" আমি ঘটক কথা ব্যবহার করিতেছি, তিনি এই অর্থে অন্য কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন। আবার বলিলেন—'তোমার গুরু হয়ে গেছে!' "মন্ত্র কি,?" জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন,—"ঈশ্বরের নাম।' দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে লাগিলেন "রামানুজ প্রত্যহই প্রাতঃস্নান করিতেন। ঘাটের সিঁড়িতে 'কবীর' নামে এক জোলা শুইয়াছিল। রামানুজ নামিতে নামিতে তাঁহার শরীরে পাদস্পর্শ করায় সকল দেহে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞানে 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিলেন। সেই রাম নাম কবীরের মন্ত্র হইল। আর সেই নাম জপ করিয়া কবীরের সিদ্ধিলাভ হইল।"

থিয়েটারেরও কথা পড়িল। তিনি বলিলেন,—"আর একদিন আমায় থিয়েটার দেখাইও।" আমি উত্তর করিলাম. "যে আজ্ঞে, যে দিন ইচ্ছা দেখিবেন।" তিনি বলিলেন,—"কিছু নিও।" বলিলাম, 'ভালো আট আনা দিবেন।' পরমহংসদেব বলিলেন,—'সে বড় ব্যাজলা যায় গা।' আমি উত্তর করিলাম, "না আপনি সে দিন যেখানে বসে ছিলেন সেইখানে বস্‌বেন।' তিনি বলিলেন, 'না একটা টাকা নিও।" আমি 'যে আজ্ঞে' বলায় এ কথা শেষ হইল।

বলরাম বাবু তাঁহার ভোগের নিমিত্ত কিছু মিষ্টান্ন আনাইলেন। তিনি একটী সন্দেশ হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন মাত্র। অনেকেই প্রসাদ ধারণ করিলেন। আমারও ইচ্ছা ছিল, কে কি বলিবে, লজ্জায় পারিলাম না। ইহার কিছুক্ষণ পরেই হরিপদ নামে এক ভক্তের সহিত পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া বলরাম বাবুর বাটী হইতে বাহির হইলাম। পথে হরিপদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন দেখিলেন?" আমি বলিলাম—"বেশ ভক্ত।" তখন আমার মনে খুব আনন্দ হইয়াছে, গুরুর জন্যে হতাশ আর নাই। ভাবিতেছি গুরু করিতে হয় মুখে বলে। এই তো পরমহংস বলিলেন—"আমার গুরু হ'য়ে গিয়েছে. তবে আর কার কথা শুনি?"

যে কারণ মনুষ্যকে গুরু করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, তাহা একরূপ বলিয়াছি, কিন্তু এখন বুঝিতেছি, যে আমার মনের প্রবল দম্ভ থাকায় আমি গুরু করিতে চাহি নাই। ভাবিতাম—এত কেন? গুরুও মানুষ, শিষ্যও মানুষ, তাঁহার নিকট জোড়হাত করিয়া থাকিবে, পদসেবা করিবে,-তিনি যখন যাহা বলিবেন, তখন তাহা জোগাইবে, এ একটা আপদ জোটান মাত্র। পরমহংদেবের নিকট এই দম্ভ চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গেল। থিয়েটারে প্রথমেই তিনি আমায় নমস্কার করিলেন, তাহার পর রাস্তায়ও আমায় প্রথম নমস্কার করিলেন। তিনি যে নিরহঙ্কার ব্যক্তি আমার ধারণা জন্মিল এবং আমার অহঙ্কারও খর্ব্ব হইল। তাঁহার নিরহঙ্কারিতার কথা আমার মনে দিন দিন উঠে। বলরামবাবুর বাটীর ঘটনার কিছুদিন পরে আমি থিয়েটারের সাজঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় শ্রদ্ধাস্পদ ভক্ত প্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া আমায় বলিলেন, "পরমহংসদেব আসিয়াছেন।" আমি বলিলাম, "ভাল, Box এ লইয়া গিয়া বসান।" দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আপনি অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিবেন না!" আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "আমি না গেলে তিনি আর গাড়ী থেকে নাম্‌তে পার্‌বেন না!" কিন্তু গেলেম।

আমি পুঁহুছিয়াছি, এমন সময় তিনি গাড়ী হইতে নামিতেছেন। তাঁহার মুখপদ্ম দেখিয়া আমার পাষাণ হৃদয়ও গলিল। আপনাকে ধিক্কার দিলাম, সে ধিক্কার এখনও আমার মনে জাগিতেছে। ভাবিলাম, এই পরম শান্ত ব্যক্তিকে আমি অভ্যর্থনা করিতে চাহি নাই? উপরে লইয়া যাইলাম। তথায় শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। কেন যে করিলাম, তাহা আমি আজও বুঝিতে পারি না। আমার ভাবান্তর হইয়াছিল নিশ্চয়, আমি একটি প্রস্ফুটিত গোলপ ফুল লইয়া তাঁহাকে দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আমায় ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন,—"ফুলের অধিকার দেবতার আর বাবুদের, আমি কি করিব?"

Dress circle এর দর্শকের Concert এর সময় বসিবার জন্য Star Theatre এর দ্বিতলে স্বতন্ত্র একটী কামরা ছিল। সেই কামরায় পরমহংসদেব আসিলেন। অনেকগুলি ভক্ত তাঁহার সহিত আসিলেন। পরমহংসদেব একখানি চৌকিতে বসিলেন, আমিও অপর এক চৌকিতে বসিলাম। কিন্তু দেবেন বাবু প্রভৃতি ভক্তেরা অপর চৌকি থাকা সত্ত্বেও বসিতেছেন না। দেবেন বাবুর সহিত আলাপ ছিল। আমি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলাম, "বঁসুন না।" কিন্তু তিনি অসম্মত। কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আমার এতদূর মূঢ়তা ছিল যে গুরুর সহিত সম আসনে বসিতে নাই, ইহা আমি জানিতাম না। পরমহংসদেব আমার সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। আমার বোধ হইতে লাগিল, যে কি একটা স্রোত যেন আমার মস্তক অবধি উঠিতেছে ও নামিতেছে। ইতিমধ্যে তিনি ভাব নিমগ্ন হইলেন। একটী বালকভক্তের সহিত ভাবাবস্থায় যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহুপূর্ব্বে আমি এক দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডের নিকট পরমহংসদেবের নিন্দা শুনিয়াছিলাম, এই বালকের সহিত এইরূপ ক্রীড়া দেখিয়া আমার সেই নিন্দার কথা মনে উঠিল। পরমহংসদেবের ভাবভঙ্গ হইল। তিনি আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তোমার মনে বাঁক আছে।" আমি ভাবিলাম অনেক প্রকার বাঁক তো আছেই বটে, কিন্তু তিনি কোন বাঁক লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বাঁক যায় কিসে?" পরমহংসদেব বলিলেন—"বিশ্বাস করো।"

আবার কিছুদিন গত হইল, আমি বেলা তিনটার সময় থিয়েটারে আসিয়াছি, একটু চিরকুট পাইলাম, যে মধুরায়ের গলিতে রামচন্দ্র দত্তের ভবনে পরমহংসদেব আসিবেন। পড়িবামাত্র আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় বসিয়া আমার হৃদয়ে যেরূপ

টান পড়িয়াছিল, সেইরূপ টান পড়িল। আমি যাইতে ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলাম, যে অজানিত বাটীতে বিনা নিমন্ত্রণে কেন যাইব? ঐ অজানিত সূত্রের টানে সে বাধা রহিল না। চলিলাম, অনাথ বাবুর বাজারের নিকটে গিয়া ভাবিলাম—যাইব না। ভাবিলে কি হয়, আমায় টানিতেছে। ক্রমে অগ্রসর হই আর থামি। রামবাবুর গলির মোড়ে গিয়াও থামিলাম। পরে রামবাবুর বাড়ী গিয়া পুঁহুছিলাম। দোরে রামবাবু বসিয়া আছেন। ভক্ত চূড়ামণি সুরেন্দ্রনাথ মিত্রও ছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু আমায় স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আমি তথায় গিয়াছি?" আমি বলিলাম, "পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে।" রামবাবুর বাড়ীর নিকটেই সুরেন্দ্রবাবুর বাটী। তিনি তথায় আমায় লইয়া গেলেন এবং তিনি কিরূপে পরমহংসদেবের কৃপা পাইয়াছেন, তাহা আমায় বলিতে লাগিলেন। আমার সে সব কথা ভাল লাগিল না। আমি তাঁহারই সহিত রামবাবুর বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, রামবাবুর উঠানে, রামবাবু খোল বাজাইতেছেন, পরমহংসদেব নৃত্য করিতেছেন, ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন। গান হইতেছে,—"নদে টলমল্ টলমল্ করে গৌর-প্রেমের হিল্লোলে।" আমার বোধ হইতে লাগিল, সত্যই যেন রামবাবুর আঙ্গিনা টলমল্ করিতেছে! আমার মনে খেদ হইতে লাগিল এ আনন্দ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। চক্ষে জল আসিল। নৃত্য করিতে করিতে পরমহংসদেব সমাধি হইলেন, ভক্তেরা পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন, আমার ইচ্ছা হইল, গ্রহণ করি, কিন্তু লজ্জায় পারিলাম না। ভাবিলাম, তাঁহার নিকটে গিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে কে কি মনে করিবে। আমার মনে যে মুহূর্ত্তে এইরূপ ভাবের উদয় হইল, তৎক্ষণাৎ পরমহংসদেবের সমাধি ভঙ্গ হইল ও নৃত্য করিতে করিতে ঠিক আমার সম্মুখে আসিয়া সমাধিস্থ হইলেন। আমার আর চরণস্পর্শের বাধা রহিল না। পদধূলি গ্রহণ করিলাম। সংকীর্ত্তনের পর পরমহংসদেব রামবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। আমিও উপস্থিত হইলাম। পরমহংসদেব আমারই সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার মনের বাঁক যাইবে তো?' তিনি বলিলেন—'যাইবে।' আমি আবার ঐ কথা বলিলাম। তিনি ঐ উত্তর দিলেন। আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, পরমহংসদেবও ঐ উত্তর দিলেন। কিন্তু মনোমোহন মিত্র নামে একজন পরমহংসদেবের পরম ভক্ত কিঞ্চিৎ রূঢ়স্বরে আমায় বলিলেন,—"যাও না, উনি বল্লেন, আর কেন ওঁকে ত্যক্ত কচ্ছ?" এরূপ

কথার উত্তর না দিয়া আমি ইতিপূর্ব্বে কখন ক্ষান্ত হই নাই। মনোমোহন বাবুর পানে ফিরিয়া চাহিলাম, কিন্তু ভাবিলাম—ইনি সত্যই বলিয়াছেন; যাহার এক কথায় বিশ্বাস নাই, তিনি শতবার বলিলেও তো তাঁহার কথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়। আমি পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া থিয়েটারে ফিরিলাম। দেবেন বাবু কিয়দ্দূর আমার সঙ্গে আসিলেন, ও পথে অনেক কথা বুঝাইয়া আমায় দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পরামর্শ দিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি দক্ষিণদিকের বারাণ্ডায় একখানি কম্বলের উপর বসিয়া আছেন, অপর একখানি কম্বলে ভবনাথ নামে একজন পরম ভক্ত বালক বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। আমি যাইয়া পরমহংসদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিলাম। মনে মনে "গুরুব্রহ্ম ইত্যাদি"—এই স্তবটীও আবৃত্তি করিলাম। তিনি আমায় বসিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, "আমি তোমার কথাই বলিতেছিলাম; মাইরি, একে জিজ্ঞাসা করো। পরে কি উপদেশের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "আমি উপদেশ শুনিব না, আমি অনেক উপদেশ লিখিয়াছি, তাহাতে কিছু হয় না। আপনি যদি আমার কিছু করিয়া দিতে পারেন, করুন। এ কথায় তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। রামলাল দাদা উপস্থিত ছিলেন,—তাঁহাকে বলিলেন,—"কিরে—কি শ্লোকটা বল্ তো? রামলাল দাদা শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন,—শ্লোকের ভাব,—"পর্ব্বতগহ্বরে নির্জ্জনে বসিলেও কিছু হয় না,—বিশ্বাসই পদার্থ। আমার তখন মনে হইতেছে—আমি নির্ম্মল। আমি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কে?" আমার জিজ্ঞাসার অর্থ এই, যে আমার ন্যায় দাম্ভিকের মস্তক কাহার চরণে অবনত হইল। এ কাহার আশ্রয় পাইলাম; যে আশ্রয়ে আমার সমুদয় ভয় দূর হইয়াছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে পরমহংসদেব বলিলেন,—"আমায় কেউ কেউ বলে—আমি রামপ্রসাদ কেউ বলে রাজা রামকৃষ্ণ,—আমি এইখানেই থাকি।" আমি প্রণাম করিয়া বাটীতে ফিরিতেছি, তিনি উত্তরের বারাণ্ডা অবধি আমার সঙ্গে আসিলেন। আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমি আপনাকে দর্শন করিয়াছি, আবার কি আমায় যাহা করিতে হয়, তাহা করিতে হইবে?" "ঠাকুর বলিলেন,—তা করোনা!" তাঁহার কথায় আমার মনে হইল, যেন যাহা করি, তাহা করিলে দোষ স্পর্শিবে না।

তদ্‌বধি গুরু কি পদার্থ, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ আমার হৃদয়ে আসিল, গুরুই সর্ব্বস্ব আমার বোধ হইল। যাঁহার গুরু আছেন, তাঁহার উপর পাপের আর অধিকার নাই। তাঁহার সাধন ভজন নিষ্প্রয়োজন। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল আমার জন্ম সফল।

ইহার পর অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, এই যে পরম-আশ্রয় দাতা, ইহাঁর পুজা আমার দ্বারা হয় নাই। মদ্যপান করিয়া ইহাঁকে গালি দিয়াছি। শ্রীচরণ সেবা করিতে দিয়াছেন—ভাবিয়াছি—একি আপদ। কিন্তু এ সকল কার্য্য করিয়াও আমি দুঃখিত নই। গুরুর কৃপায় এ সকল আমার সাধন হইয়াছে। গুরুর কৃপায় একটী অমূল্য রত্ন পাইয়াছি। আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, গুরুর কৃপা আমার কোন গুণে নহে। অহেতুকী কৃপাসিন্দুর অপার কৃপা, পতিত-প্লাবনের অপার দয়া—সেইজন্ত আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন চিন্তার কারণ নাই। জয় রামকৃষ্ণ!

প্রতিদান।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

(৭)

সন্ন্যাসী ভৈরবাবা কেরুয়ার গুরু। তিনি কর্ম্মসূত্রে একদিন সহরে নামিয়াছিলেন এবং বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাতের জন্ত ফিরিতে অসমর্থ হইয়া এই সরলহৃদয় বালকের শিষ্ট ব্যবহারে ও ক্ষমতাতীত আতিথ্য-সৎকারে একান্ত প্রীত হইয়া তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই অবধি কেরুয়াও তাঁহার নিকট গতায়াত করিত। ইনি সর্পদংশনের অমোঘ ঔষধ জানিতেন এবং কেরুয়াকেও তাহার অংশ দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু গুরুর আদেশ ছিল যে একজনের প্রাণ দিতে হইলে নিজের প্রাণবিনিময়ে তাহা করিতে হইবে। সর্প মরিবে ও রোগীরক্ষা পাইবে বটে, কিন্তু চিকিৎসককে সঙ্গে সঙ্গে ইহধাম হইতে প্রয়াণ করিতে হইবে। সেইজন্ত তিনি প্রিয় শিষ্যকে বিশেষ প্রয়োজন না বুঝিলে ইহার ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কেরুয়ারও এপর্য্যন্ত তাদৃশ কোনও ঘটনা ঘটে নাই। আজ তাহার গুরু সন্দর্শন ঘটিবে, এই আশায় উদ্বেলিতহৃদয়ে ভোজন সমাপন করিয়া

তাহার সঙ্গের সাথী বাঁশীটী লইয়া মনীব গৃহে উপস্থিত হইল। হৈমবতী সহ খোকা ও বিমলার বর্ষীয়সী পিতৃস্বসা একখানি গাড়ী করিয়া সদয় ও কেরুয়া পদব্রজে রওনা হইলেন। ক্রমে তাঁহারা বন্ধুর পার্ব্বত্যপথে আসিয়া পড়িলেন। গাড়ী একবার চড়াই অতিক্রম করিতেছে, পুনরায় সবেগে উৎরাইয়ের দিকে নামিতেছে। স্থানটী বড়ই মনোরম। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিবার মানসে বিমলা ও হৈমবতী গাড়ী ছাড়িয়া হাঁটিয়া চলিলেন এবং পাহাড়ের পাদমূলে আসিয়া পৌঁছিলেন। খোকা কেরুয়ার হাত ছাড়াইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে এক আধবার আছাড় খাইয়া রোরুদ্যমান বালক ধুলি ঝাড়িয়া পুনরায় দৌড়াইতে লাগিল। পর্ব্বতের পার্শ্বে এক ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী কুল কুল রবে প্রবাহিত। মাঝে মাঝে তন্মধ্যে এক এক খানা উপলখণ্ড পড়িয়া দ্বীপের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। তাঁহারা ক্ষুদ্র গিরিতটিনীর উপকূলে বিশ্রাম করিয়া ও আকণ্ঠ পুরিয়া নির্ম্মল সলিল পান করিয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন; নদীটি এককালে বিপুল প্রবাহ সম্পন্না ছিল এক্ষণে শুষ্ক প্রায়।

(৮)

বিমলার পিসিমা খানিকদূর উঠিয়া আর উঠিতে না পারিয়া ফিরিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন ও সদয় তাঁহার তত্ত্বাবধানে রহিল। তাঁহারা উঠিয়া বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, ও কিছু পূজা চড়াইলেন। পরে প্রসাদ ও চরণামৃত খাইয়া ইতস্তত বেড়াইতে লাগিলেন। খোকা ভৃত্যের নিকটেই রহিল। মন্দিরটি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। পাহাড়ের কতকটা সমতলভূমির উপর একটি অশ্বথ মহীরুহের নিম্নে মন্দিরটী রচিত। মন্দিরের সংস্থান বড়ই রমণীয়। দুই সইয়ে প্রাণের উদ্বেগ দুরীভূত করিয়া আজ উন্মুক্ত প্রাণে ও প্রফুল্লচিত্তে পরস্পর পরস্পরের সহিত আলাপ করিতেছেন। দুইটী পর্ব্বতের মধ্যস্থলে উপত্যকার উপর অগণিত শিখরিণী স্বেচ্ছাচারে বিচরণ করিতেছে ও তাহাদের কেকারবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে ছিল। কদাচিৎ দু-একটা হরিণশিশুও তাঁহাদের নেত্রপথে পতিত হইল। নিম্নে অদূরে জলবিরল বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর শোভা পাইতেছে। কেরুয়ার আজ আনন্দের সীমা নাই গুরুর পদধূলি ভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত বিবিধ আলাপে প্রবৃত্ত। এদিকে খোকা এক কাণ্ড বাধাইয়া উপস্থিত। সে অন্যের অগোচরে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বটের জল

ফেলিয়া দিয়া মৃৎপাত্রটীকে কোন এক বিশিষ্ট-খেলার সামগ্রী মনে করিয়া আহ্লাদ ভরে তাঁহার কেলুয়াকে দেখাইতে আনিতেছে। সন্ন্যাসীর দৃষ্টি প্রথমেই আকৃষ্ট, তিনি ক্রোধে আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া অভিসম্পাত দিলেন। "সর্ব্বনাশ কি করিলেন" বলিয়া কেরুয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল ও জানাইল যে তাহার দয়ার্দ্রচিত্ত মনীবের ইহাই একমাত্র প্রাণের পুতুলী ও ইহার বিরহে তিনি জীবন্মৃত হইয়া থাকিবেন। তিনি দয়া না করিলে কেরুয়া ও তাহার পরিবারবর্গ দারিদ্র্যের ভীষণ তাড়নে বিষম বন্যার মুখে তৃণ-খণ্ডের ন্যায়—কবে কোথায় ভাসিয়া যাইত। কিন্তু হাতের ঢিল একবার নিক্ষেপ করিলে পুনরায় তাহা পাওয়া যায় না ও সন্ন্যাসী ঠাকুর ইহার নিমিত্ত পশ্চাত্তাপ করিতে লাগিলেন। আশু বিপদের আশঙ্কায় ভীত হইয়া কেরুয়া তাহার মনীবপত্নী প্রভৃতির সহিত নামিয়া তখন গিরি-শিখরের পাদপে আসিল নীরে অস্তগমনোন্মুখ আরক্ত ভাস্কর প্রভায় অনুরঞ্জিত এ ভীষণ বার্ত্তা অপরের নিকট নিবেদন করিতে তাহার প্রাণ কিছুতেই চাহিল না। যখন তাহারা পৌঁছিলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। সেই সন্ধ্যার অন্ধকারের সহিত কেরুয়ার হৃদয়কাশের এক কোণে যেন একখণ্ড কাল মেঘ জমাট বাঁধিয়া রহিল তাহা অপসারিত করিতে কোনও অনুকূল বায়ু তাহার সহায় হইল না।

(৯)

এই ঘটনার পর পাঁচ মাস অতীত হইয়াছে। কেরুয়াও প্রায় সে কথা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছে। কালের কি অভিনব কৌশল। পুত্রশোকাতুরা মাতারও হৃদয় ভার কালের গতিতে লঘু হইয়া আসে। একমাত্র পুত্র হইতে বঞ্চিতা হইয়াও তিনি আহার করেন শরীরের যত্ন করেন। বিস্মৃতির প্রবল স্রোতে সকলই পরিবর্ত্তিত বিধৌত। বিস্মৃতিই শোকের নির্ব্বাণ।

কেরুয়া আবার হাসে খেলা করে খোকাকে লইয়া বেড়ায়। নিজ কনিষ্ঠ সহোদরদিগের অপেক্ষা তাহাকে স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার নয়নে দেখিত। যখন কোনও মানসিক ব্যথা অনুভব করিত, তখন একান্তে বসিয়া সুমধুর নিক্কনে বংশী বাদন করিয়া হৃদয়ের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রনার কতকটা লাঘব করিতে প্রয়াস পাইত। শ্রোতা কেহই নাই। সেই একধারে গায়ক ও শ্রোতা। তবে মধ্যে মধ্যে সদরকে তাহার কথার একাংশ অধিকার করিতে দেখা যাইত। একদিন প্রত্যুষে— জগতের অন্ধকার অপসারিত হইতেছে মাত্র—হরিভূষণ ডাক্তারের বাটীর সম্মুখে

একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। আরোহীর মধ্যে চামড়ার ব্যাগ হস্তে ভগ্নস্বাস্থ্য লুপ্তযৌবন পুরুষ। সমগ্র বদনমণ্ডল কালিমামণ্ডিত। সে মাংসল স্কন্ধ, যৌবনের সারল্য লালিত্য অবৈধ অত্যাচারের উৎপীড়নে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। দৃঢ় পেশীবদ্ধ বাহুর পরিবর্ত্তে কৃশ ভুজ যুগলই জগতে তাহার অস্তিত্ব ও লুপ্তগৌরব ঘোষণা করিতেছে। চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত অপরাধীর ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ বাটীতে প্রবেশ করিলেন। বহুদিন পরে নিরুদ্দিষ্ট জামাতার দর্শন পাইয়া ডাক্তার বাবু আহ্লাদে আত্মহারা হইয়াছিলেন। তিনি জামাতাকে বাবাজী বলিয়া কি ভাই বলিয়া সম্বোধন করিবেন, তাঁহার আলোড়িত মস্তকে খট্‌কা লাগিতেছিল। প্রকৃতস্থ হইয়া "এস বাবা এস" বলিয়া জামাতার মস্তকে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী জামাতাকে পাইয়া প্রথমত কান্না পালা শুরু করিয়াছিলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ রোদন সম্বরণ করিয়া জামাতাকে পরম সমাদর করিতে লাগিলেন। তিনি হিন্দুবিগ্রহ মন্দিরে পূজা পাঠাইয়া দিলেন ও মাথা খুড়িয়া কপালটা ফুলাইয়া ফেলিলেন। আর বিমলা করিতেছে? সমস্ত ব্যাপারটা তাহার নিকট স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল। চক্ষু মার্জ্জিত করিতে করিতে রক্তবর্ণ করিয়া ফেলিল, তত্রাচ তাহার ঘটনাটা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছিল। স্বামী আজ ৮ বৎসর নিরুদ্দেশ। এতদিনে কি তাঁহার দাসীকে স্মরণ হইয়াছে? যখন কাণ্ডটা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইল, তখন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। এতদিন তাহার মর্ম্মবেদনা অন্তর্য্যামির শ্রবণপুটে পৌঁছিয়াছে। সেই দিনরাত্রে স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া যখন শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিল তখন প্রমোদ (তাহার স্বামী) একেবারে স্ত্রীর চরণপ্রান্তে বসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল, বিমলার বদন অস্বাভাবিক গাম্ভির্য্যে নব-জলধরে দিনমণির ন্যায় শোভা পাইতেছিল। সই বলিয়া দিয়াছিল এক চোট ঘোল খাওয়াইয়া লইতে কিন্তু কাহার সহিত সে গর্হিত আচরণ করিবে? বিমলা শশব্যস্তে হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল, "তোমার যে মনে পড়িয়াছে এই যথেষ্ট। আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি বলিতে পারি না, এবং অজস্র অশ্রুপাত ও প্রেমের সহস্র ধারায় প্রমোদের সংক্ষুব্ধ হৃদয় প্রাবৃট প্লাবিত নদীর ন্যায় ভাসাইয়া দিল! চন্দ্র-লোকে প্রমোদের লজ্জিত আনন উদ্ভাসিত হইয়া বিমলার নয়নপ্রান্তে পরিস্ফুট হইতে ছিল ও মলয়ানীল ঘরে প্রবেশ করিয়া মিলনসঙ্গীত গাহিতেছিল।

প্রঃ—তুমি কি আবার আমায় গ্রহণ করিবে?

বি—বেশ কথা। আমরা ত ছায়া মাত্র। ছায়া কি কায়া ছাড়া হয়?

পূর্ব্ব দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপের কশাঘাতই প্রমোদের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইতেছিল। তিনি পত্নীর হস্তে ক্রীড়ক হইলেন; মনে করিলেই বিমলা তাঁহাকে অঞ্চল প্রান্তে চাবির গোছার ন্যায় অঙ্গুলীর হেলনে যদৃচ্ছা সঞ্চালিত করিতে পারিত।

(১০)

সংসারের সকল ঘটনাই নিয়তির বিধানে সংঘটিত হয়। নিয়তি-চক্রের গতি নিরবচ্ছিন্ন। ওকি হৃদয় বাবুর বাটিতে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল কেন? কি সর্ব্বনাশ সন্ন্যাসীর অভিসম্পাৎ কি এতদিনে ফলিল। তাই ত। খোকা বাবু পিতার সহিত উদ্যানে প্রাতঃভ্রমণ করিবার কালীন সর্প-দংষ্ট্র হইয়াছে। তরুণ অরুণের স্নিগ্ধরশ্মি তখনও ধরণীতল প্লাবিত করে নাই, সেই দুঃখিনী ঠাকুর মা ও মাতার দিগন্ত প্রসারিণীর ভীষণ মর্ম্মভেদী করুণ চিৎকারে ধরিত্রী বিচলিত করিয়া অনন্তাকাশে মিশাইয়া যাইতে লাগিল! ঠাকুর মার এত যত্নে প্রতিপালিত প্রাণের পুত্তলী বুঝি এইবার ফাঁকি দেয়। বিমলা উৎকর্ণ থাকিয়া শুনিয়া বলিল, আজ সুরপুরিতে এ হাহাকার কেন? বিমলা সইয়ের বাটিকে সুরপুরী বলিয়া অভিহিত করিত। বিমলা ও প্রমোদ ঊর্দ্ধশ্বাসে আহত পরিবারকে আশ্বস্ত করিতে ছুটিল। হৃদয় বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া মস্তকের কেশ রাশি উৎপাটন ও বক্ষে অনবরত করাঘাত করিতেছেন। পূজা বলিয়া কল্পনায় সহস্র মুদ্রা পৃথক সংরক্ষিত করিয়াছিলেন। ওকি ত্রুটি হইয়াছে স্মরণ করিতে না পারিয়া সাতিশয় ম্রিয়মান হইতেছেন, তৎসঙ্গে অস্ফুট ক্রন্দন করিতেছেন। তাঁহার মস্তিষ্কে বিভ্রম ঘটিয়াছিল। খোকাকে তুলসী তলায় শয্যা রচনা করিয়া শোয়ান হইয়াছে। ক্ষতস্থান হইতে রুধির সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিতেছে। দংশিত স্থানের উপর ও নীচে দড়ি—দিয়া সজোরে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। ঠাকুর মা তুলসী মৃত্তিকা খোকার ললাটে মাখাইতেছেন। বিষ প্রায় সর্ব্বত্র পরিব্যপ্ত হইয়াছে। যন্ত্রনায় খোকা ছট্‌ফট্‌ ও আর্ত্তনাদ করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ নীল হইয়া গিয়াছে এবং বদনমণ্ডল শারদ শুষ্ক তটিনীবৎ পাণ্ডুবর্ণ ও বিশীর্ণভাব ধারণ করিয়াছে। তাহার নেত্র যুগল কমল পল্লবের ন্যায় মুদিয়া হইয়া আসিতেছে আর বিলম্ব নাই। জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিস্থানে দাঁড়াইয়া কে স্থির থাকিতে পারে? সইকে দেখিয়া হৈমবতী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। প্রমোদ দিন কয়েকের জন্য সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঘুরিয়াছিল বলিয়া টোটকা ঔষধ একটু আধটু জানিত। সে তাহাই প্রয়োগ করিতে লাগিল; কিন্তু মন্ত্র-

ক্ষেত্রে বারিবিন্দু পাতের ন্যায় তাহা মিলাইয়া গেল, সুতরাং ব্যর্থ মনোরথ হইয়া উপায়ন্তর উদ্ভাবন করিতে লাগিল। সদ্য সুপ্তোত্থিত কেরুয়া মনীব-বাটী আসিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইতে ব্যস্ত-সমস্তভাবে সদয়কে যাইতে দেখিয়া কোনও ভাবি অমঙ্গলের আশঙ্কায় একান্ত উৎপীড়িত হইয়া উঠিল। সদয় সংক্ষেপে বিপদ্ কাহিনী বিবৃত করিয়া কহিল যে, সে মাল ডাকিতে যাইতেছে। প্রসিদ্ধমাল শিব-রাম হৃদয় বাবুর বাটী হইতে তিন মাইল অন্তরে থাকে। কেরুয়া আকস্মিক বিপদে বিচলিত না হইয়া মনে মনে বলিল "এইত সময়"। সে সদয়কে যাইতে নিষেধ করিল এবং বলিল যে, সে স্বয়ং গুরুর প্রসাদে ইহার অব্যর্থ ঔষধ জানে। সদয় জানিলেও তাহাতে প্রত্যয় করিতে না পারিয়া চলিয়া গেল। কেরুয়াও "জয় ভৈরবাবা" বলিয়া এক লম্ফে দাওয়া পরিত্যাগ করিয়া ঔষধ সংগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্বে মনীব-বাটী উপস্থিত হইল।

(১১)

সে যখন মনীববাটীতে সশরীরে দর্শন দিল, তখন ঠাকুর মা তার স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, "কেরুয়া, আর কাহাকে কোলে নিতে এসে-ছিস্! কেরুয়া সে কথায় উত্তর না দিয়া নিবাত নিষ্কম্প দীপ শিখার ন্যায় নির্নিমেষ নয়নে মুমূর্ষ খোকাকে দেখিতে লাগিল। পরে রোগীকে পরীক্ষা করিয়া তাহার বদনে হর্ষের চিহ্ন প্রতিভাত হইল ও আশাদেবী তাহার হৃৎকন্দরে সিংহা-সন গ্রহণ করিলেন। দেবী! তোমার অপার মহিমা বুঝা ভার ; জীব মাত্রেই তোমার দাস। তুমি কি মোহে তাহাদের আচ্ছন্ন করিয়াছ তাহা তুমিই জান। তোমার অস্তিত্ব না থাকিলে পৃথিবী এতদিন রসাতলে যাইত। দুইটী শিকড় সে ঠাকুরমাকে পৃথক্ বাটিয়া আনিতে দিল ও ক্ষত স্থানে অধর সংযোগ করিয়া গরল উদ্গীরণ করিতে লাগিল ; কতকটা নীলবর্ণের পদার্থ বাহির হইয়া আসিল। সেই স্থানে একটা শিকড়ের প্রলেপ দিল ও খোকার মস্তক স্বহস্তে মুণ্ডিত করিয়া মাথায় বড় রকম একটা প্রলেপ দিয়া রোগীর অবস্থা লক্ষ্য করিতে লাগিল ; পরে গুরুর নাম করিয়া একমুষ্টি ধূলি লইয়া মন্ত্রঃপূত করিয়া খোকার চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিল। কিঞ্চিৎ পরে প্রলেপ দুইটা উঠাইয়া স্বতন্ত্র প্রলেপ লাগাইয়া দিল। একবার উঠিয়া বাগানের দিকে যাইল ও একটা প্রকাণ্ড মৃত বিষধর ভুজ নামক লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিল,—"ঠাকুরমা শয়তান মরা আর খোকা জীয়েগা তাহার চিকিৎসায় সকলের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ঠাকুরমা মনে করিতেছিলেন, খোকার অমূল্য জীবন রক্ষার্থে স্বয়ং ভগবান্ সুরলোক হইতে দূত প্রেরণ করিয়াছেন!

ইতিমধ্যে কেরুয়ার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল কিন্তু সে যথাসাধ্য প্রাণপণ করিয়া খোকার সেবা করিতেছিল। শরীরপাতই তাহার সঞ্জীবন মন্ত্র স্বরূপ হইয়াছিল। একটা শিকড় বাটা গুলিয়া খাওয়াইয়া দিতে খোকার ভেদ হইল ও তৎসঙ্গে সমস্ত বিষ বাহির হইয়া গেল।

কেরুয়া বলিল—"আর ভয় নাই খোকা ভাল হইয়াছে। ঠাকুরমাকে ইঙ্গিত করিয়া ভৈরববাবার মন্দিরে পূজা পাঠাইতে, খোকাকে রাত্রে সিক্ত অন্ন ও ডাবের জল খাওয়াইতে ও তাহাকে অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করাইতে বলিল, সে আরও বলিল যে তাহার সময় হইয়া আসিতেছে। আনন্দের কোলাহলে তাহার শেষ বাক্য মিলাইয়া গেল। সে বাটী চলিয়া গেল। মাপ অন্য স্থানে রোগী দেখিতে যাওয়ায় সদয়কে রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইল। সে সমস্ত শুনিল এবং কেরুয়াও তাহার গুরুর কথা সমুদয় তাহার স্মরণপথে উদিত হইয়া যুগপথ বিস্মিত ও আনন্দিত হইল।

(১২)

রাত্রে খোকাকে ভাত খাওয়াইতে খাওয়াইতে যখন হৈমবতী সইকে বলিতেছিলেন—দেখিলি আমার কথা বেদবাক্য। আমি বলেছি আর তোর স্বামী ফিরেছে। গুরু ব'লে ভক্তি করিস্, একটু সামিহ করিস্—এমন সময়ে সদয় কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া কেরুয়ার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করিল। এবং বলিল, যে সেবার জন্য তাহার পরিবারবর্গের সঙ্গে সেও তাহার নিকট বসিয়াছিল। কেরুয়ার গুরুর আদেশ ও তাহার ঋণ পরিশোধের কথা কিছুই বলিতে ভুলিল না। সকলে অঞ্চল প্রান্তে তাহার উদ্দেশে অশ্রু মার্জ্জনা করিলেন। ঠাকুর মা হায় হায় করিতে লাগিলেন। হৃদয় বাবু তাহার শোকবিহ্বল ও দারিদ্র্যভীত পরিবারের মাসিক-বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তুচ্ছ অর্থে কি হইবে, এখন অপরিশোধনীয়। কেরুয়ার মহত্ব জগতে ঘোষিত হইল না বটে, কিন্তু স্বর্গে সরলহৃদয় মহোপকারী সাঁওতাল বালকের জন্য দুন্দুভি নিনাদিত হইয়াছিল।

মুষ্টিযোগ।

লেখক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

আমাশয়।

১। তুলসীর শিকড় এক টুক্‌রা ২॥ টা মরিচের সঙ্গে মাড়িয়া সেবন করিলে তিন দিনে সাদা আমাশয় ভাল হয়। পথ্য—জ্বর না থাকিলে তক্র (ঘোল) ও ভাত।

২। জলে পচা আমপাতা ও আমের কুশী সমভাগে মর্দ্দন করিয়া বড় মটরের মত বটী প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে শ্বেত ও রক্ত উভয়বিধ আমাশয় ভাল হয়।

৩। বেলশুঁঠা, লবঙ্গ, দাড়িম্ব-খোসা ও কাঁচড়া প্রত্যেকে ॥• তোলা অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তিনবারে অর্থাৎ প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সেবন করিলে উভয়বিধ আমাশয় ভাল হয়।

৪। ছোট পিয়াজের অন্তর শূন্য করিয়া তাহার মধ্যে মটর কলাইয়ের মত আফিং একটু পুরিয়া ফাঁক টুকু পিয়াজের তালি দ্বারা বন্ধ করিবে, পরে আগুনে পাঁচ সাত মিনিট পোড়াইয়া সর্ষপ পরিমিত সেবন করাইলে যে কোন রকমের যত দিনের পুরাতন আমাশয় হউক ভাল হইবে। পিয়াজে আফিমের উগ্রতা নষ্ট করিবে, পেট ফাঁপিবে না বহু রোগীকে পরীক্ষা করা হইয়াছে।

৫। কড়চি এক সের, চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া ১সের থাকিতে নামাইয়া তাহাতে একপোয়া কুল কুঁড়ির রস দিয়া পাক করিবে। আঠার মত হইলে নামাইয়া ছোট মটরের মত বটী ছাগল দুধের সঙ্গে খাইতে দিবে। ইহা কোন কোন স্থলে পেটেন্ট রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৬। বিলাতী গাব, সাহেবেরা যাহাকে Mango sting বলেন, সেই গাবের খোসা ॥• তোলা, লবঙ্গ ॥• তোলা, যমানী ॥• তোলা, মৌরি ৷৹ তোলা এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সকালে মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তিনবারে সেই কাথ সেবন করাইলে শ্বেত রক্ত উভয়বিধ আমাশয় ভাল হয়।

—:•:—

বেরি বেরি।

লেখক, কবিরাজ সত্যচরণ গুপ্ত কবিশেখর।

সংবাদপত্রে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে বেরি বেরি রোগের লক্ষণ পাঠ করিয়া বোধ হইল যে, ঐ বেরি বেরি রোগকে ভারতবর্ষের প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিতগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের রোগবিনিশ্চয় গ্রন্থে বিষম জ্বরাধিকারে বাতবলাসক জ্বর নামে উল্লেখ করিয়াছেনঃ—

বাতবলাসক জ্বরের (বেরি বেরি রোগের) লক্ষণ—
নিত্যং মন্দজ্বরো রূক্ষঃ শূনকস্তেন সীদতি।
স্তব্ধাঙ্গঃ শ্লেষ্মভূয়িষ্ঠো নরো বাতবলাসকী।

প্রত্যহ অল্প অল্প জ্বর হয়, এই জ্বরে রোগীর শরীর রুক্ষ ও শোথযুক্ত হয়। শোথের কারণে রোগী অবসন্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই রোগে রোগীর শরীর ভারবোধ ও অত্যন্ত কফের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

টীকা।—বাতবলাসকাখ্যো জ্বরোঽস্যাস্তীতি বাতবলাসকী নরঃ। তেন জ্বরেন শূষকঃ শোথী, সীদতি অবসন্নো ভবতীতি। শোথিনঃ স উপদ্রব ইত্যর্থঃ। শূণঃ কৃচ্ছে ন সিদ্ধ্যতীতি। পাঠান্তরে তেনেতি শেষঃ। বাতবলাসকমেকে কুম্ভাহ্বয় পাণ্ডুরাগবিষয়মাহুরিতি গয়দাসঃ। বাতবলাসক আরব্ধত্বাৎ বাতবলাসকঃ বলাশকঃ শ্লেষ্মপিত্তমপাত্র বোদ্ধব্যম্। যদুক্তং তন্ত্রান্তরে বায়ুঃ প্রকুপিতো দোষাবুদীর্য্যোভৌ বিধাবতি, স শিরঃস্থঃ শিরঃ শূলমিত্যাদি। যদুক্তং সুশ্রুতেন—প্রলাপকং বাত-বলাসকং বা কফাধিকত্বাৎ প্রবদন্তি তজজ্ঞা ইতি। ততঃ শ্লেষ্মণে। নিত্যানুবক্তত্বে-নেতি জেজ্জড়ঃ। রুক্ষত্বং চাস্য বাতপিত্তাতিভূতত্বাৎ কভমেহস্য ব্যাধিপ্রভাবাদ্বেতি।

সমালোচনা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।—অপূর্ব্ব সংস্করণ। এক অঙ্গুলী মাত্র পরিমাণে অতি ক্ষুদ্র চতুষ্কোন পদার্থ, দেখিলেই বোধ হইবে যেন একখানি কবজ। অথচ ইহার মধ্যে গীতার সমস্ত শ্লোক অবিকল সন্নিবেশিত হইয়াছে, কলিকাতা গুপ্তপ্রেস হইতে প্রকাশিত মূল্য দুই আনা। গীতাভক্ত পাঠকেরা ইহার এক একখানি সংগ্রহ করুন, স্বচ্ছন্দে পকেটে রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন।

কলেরা চিকিৎসা।—উক্ত প্রবোধ বাবুর দ্বারা প্রকাশিত মূল্য ১৮০ আনা। কলেরা রোগের লক্ষণ কিরূপ চিকিৎসা কোন লক্ষণে কি কি ঔষধ ব্যবস্থা তাহা ইহাতে পরিস্কার করিয়া লেখা হইয়াছে, চিকিৎসা বিজ্ঞান আলোচনা না করিয়া যাঁহারা হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতে অভিলাষী তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া কয়েক প্রকার ঔষধ সংগ্রহ করিয়া রাখিলে ঘরে বসিয়া অতি সহজে কলেরারোগের চিকিৎ করিতে পারিবেন, সাধারণের বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত পুস্তকখানি অতি সহজ ভাষায় লিখিত।

—:o:—



"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৭শ বর্ষ। | ১৩১৬ সাল, শ্রাবণ। | ৪র্থ সংখ্যা।

বিধবা বিবাহ।

পরাশর সংহিতায় "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ" ইত্যাদি বচনটি উদ্ধৃত করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অল্পবয়স্কা হিন্দুবিধবার পুনঃ বিবাহের ব্যবস্থার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই মতানুসারে সেইসময় যে কয়েকটি বিধবা বিবাহ হইয়াছিল, তাহার ফলে সমাজে ভীষণ আন্দোলন হইয়াছিল, ইহা বোধহয় হিন্দু সমাজের সকলেই জানেন ; অত্যাল্পদিন আন্দোলনের পর সেই নূতন উৎসাহের প্রধূমিত বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল, সম্প্রতি তাহা আবার ধিকি ধিকি জ্বলিবার উপক্রম হইয়াছে, নজীর মন্দ হইতেছে, বলিয়া কলিকাতার ও সহরতলির অধিকাংশ কায়স্থ তৎবিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করিতেছেন।

নজীরের প্রতিপোষক যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অবশ্যই অল্প, অথচ ইতিমধ্যে পরস্পর দলাদলি ও জাতিবিরোধের সৃষ্টি হইতেছে।

আষাঢ় মাস শেষ হইবার পূর্ব্বে বিডনষ্ট্রীটস্থ কহিনুর থিয়েটারে কায়স্থ জাতির একটি বিরাট সভা হইয়াছিল। তাহাতে প্রস্তাব হইয়াছে, "যাহারা বিধবা কন্যার বিবাহ দিবেন এবং যাঁহারা তাহার সংশ্রবে থাকিবেন তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিতে হইবে।"

বাদানুবাদের অভিনয় যেরূপ হইয়া থাকে, তাহা ত হইতেছে, বোধহয় হইবেও কিছুদিন, সে বিষয়ে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করা এ অবস্থায় নিস্ফল, বাস্তবিক বর্ত্তমান সমাজের অবস্থায় বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না? তাহাই দেখা আবশ্যক। শাস্ত্রের বিধি নিষেধ বাক্য আমরা এখন দূরে রাখিব, সামাজিক ব্যবহারই সমাজের প্রধান লক্ষ্য। হিন্দু ব্যবহারে স্মরণাতীত কালাবধি বিধবা-বিবাহ অপ্রচলিত, সনাতন শাস্ত্র মতে বিধবার বৈধব্য ব্রত ব্রহ্মচর্য্য পালন অক্ষুন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে। মৃত পতির উদ্দেশে বিধবার ভক্তি ও অক্ষুন্ন রহিয়াছে। বিধবা-বিবাহ চালাইয়া দিলে, নিশ্চয়ই তাহার বিপর্য্যয় ঘটিবে। সকলেই দেখিতেছেন, হিন্দুসমাজের সধবা নারীগণ একান্ত পতিপ্রাণা, সর্ব্বদা পতিসেবাই অনুরতা, পতির সামান্য অসুখে সতীনারীর আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে, পতির বিয়োগ হইলে আর পতি পাইব না, জীবনের এই যে এক বদ্ধ মূলসংস্কার, তাহাই অবলার পতি-ভক্তির নিদান। এক পতির অভাবে দ্বিতীয় পতি পাইব, দ্বিতীয় পতির বিয়োগে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, প্রভৃতি বহুপতি পাইব, এরূপ ভরসা থাকিলে, পতি-ভক্তি শব্দটি কেবল অভিধানেই থাকিবে, নারী হৃদয় হইতে এককালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে পতিব্রতা নারীর অস্তিত্ব আর আমাদিগকে দেখিতে অথবা শুনিতে হইবে না, সেরূপ ব্যবস্থা ঘটিলে পবিত্র বিবাহ বন্ধনবদ্ধ হিন্দু সমাজে ডাইভোর্স আইন বিধিবদ্ধ করান আবশ্যক হইয়া উঠিবে।

প্রধান দৃষ্টান্ত পুরুষেরা। পরিণীতা পত্নীর প্রতি পুরুষের ভালবাসা থাকে, অনুরাগ থাকে, মায়া-দয়াও থাকে, কিন্তু পতির প্রতি পত্নীর হৃদয়গত যে ভাব পতির তাহা থাকে না; কেন না, এক স্ত্রী বিয়োগে দ্বিতীয় স্ত্রী প্রাপ্ত হইব, মনে মনে সে আশা জাগে। এইস্থলে একটা সাধারণ কথার উল্লেখ করিতে হইল। বৃদ্ধা গৃহিনীরা স্ত্রী বিয়োগী পুরুষকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দেন, "বেঁচে থাকুক চুড়োবাঁশী, কত শত মিলবে দাসী।" বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে, "বেঁচে

থাকুক ঘর যুবতী, কত শত মিলবে পতি।” এক্ষণে সকলে বিবেচনা করুন, ঐরূপ সান্ত্বনা প্রাপ্ত বিধবারা,—কেবল বিধবা কেন, ভবিষ্যৎ সান্ত্বনা প্রত্যাশিনী সধবারাও পতিব্রতা ধর্ম্মের সার্থকতা দেখাইতে পারিবে কি না?—যাঁহাদের যথার্থ বিবেচনা শক্তি আছে, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে উত্তর দিবেন কখনই পারিবে না। তাহা যদি সত্য হইল, তবে হিন্দু সংসার হইতে পতি-ভক্তি উঠিয়া যাইবে, জীবীতে পতির প্রতি সধবার মায়া-দয়া কমিয়া যাইবে, ইহাও নিশ্চয়।

ধর্ম্মানুগত হিন্দুর বিবাহ বন্ধন। বড় শক্ত বন্ধন উভয়ের জীবন কালমধ্যে সে বন্ধন ছিন্ন হইবার নয়। পৃথিবীর অপর কোন জাতির মধ্যে এমন সুদৃঢ় পবিত্র বন্ধন আর নাই। যাঁহারা হিন্দু বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের পক্ষপাতি তাঁহারা এই বন্ধন শিথিল করিবার, অর্থান্তরে ছেদন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, সমাজের পক্ষে ইহা মঙ্গল কর হইবে কি না; প্রকৃতি সিদ্ধ বিবেকের সাহায্যে স্থির চিত্তে একবার বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। জ্ঞানবান লোকেরা বলেন, “নারীর পত্যন্তর গ্রহণ এক প্রকার ব্যভিচার। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিয়া অবলা সরলা হিন্দু নারীর ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয়া, দেশেরমধ্যে ব্যভিচার স্রোত প্রবল হইতে দেওয়া কত বড় বুদ্ধি-মানের কার্য্য, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

যুগধর্ম্মের কথায় অনেকে অবিশ্বাস করেন; অকপটে আমরা তাহাতে বিশ্বাস রাখি। দিন দিন তাহার ফলও প্রত্যক্ষ লক্ষিত হইতেছে। কাল মহাত্মে সম্প্রদায় বিশেষে অসবর্ণ বিবাহের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ জাতির কন্যার সহিত অধম নিকৃষ্ট বর্ণের বিবাহ হইতেছে। দেশের মধ্যে বর্ণ শঙ্করের আধিক্য অতীব অমঙ্গল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্ণ শঙ্কর উৎপাদনের সহায়তা করা মহাপাপ। শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে কৌরব যুদ্ধে প্রবৃত্তি দান করেন, সেই সময় অর্জ্জন বলিয়াছিলেন, “এই মহাযুদ্ধে বহু প্রাণীক্ষয় হইবে, তাহাদের বিধবা পত্নীগণ ব্যভিচারে রত হইয়া ক্রমাগত বর্ণশঙ্কর উৎপাদন করিবে, আমি সেই মহাপাতকের কারণ হইব, অতএব আমি যুদ্ধ করিব না।” যাঁহারা ভগবতগীতা পাঠ করিয়াছেন—তাঁহারা অবশ্যই এই বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন।

অসবর্ণ বিবাহের কথা পরিত্যাগ করিলেও হিন্দু বিধবার স্ববর্ণ বিবাহেও সমাজে বহু অনর্থ ঘটিবে। আজকাল কুমারী বিবাহে যেরূপ মহা দুর্জ্জগ উপস্থিত, তাহাতে বিধবা বিবাহ চাপাইবার চেষ্টা করিয়া বিবাহার্থিনী রমণীর সংখ্যা বৃদ্ধি

করা বিষম অনর্থের হেতু। অর্থ লোভান্ধ ঔদরিক বরকর্ত্তাগণের উপদ্রবে দরিদ্র কন্যাকর্ত্তারা অধিক বয়স্কা কন্যাগণকে কুমারী অবস্থায় রাখিতে বাধ্য হইতেছেন। উচ্চমর্য্যাদা সম্পন্ন এক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ উপযুক্ত ঘর বরের অভাবে আপনাদের কন্যা ও ভগ্নীগণকে ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, এমন কি, এক একটি কন্যাকে অন্তঃকাল পর্য্যন্ত চির-কুমারী রাখিতেন, এখনও একএক পরিবারে সেইরূপ শোচনীয় দশা বিদ্যমান, গরীব কায়স্থ গৃহে ক্রমে ক্রমে সেইরূপ বিষময় ফল ফলিতে তাহার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। এখন বরং চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ ষোড়শ বর্ষিয়া দরিদ্র কায়স্থ কন্যা কুমারী অবস্থায় থাকিতেছে, বিংশতি বৎসরের মধ্যে সে সীমাও ছাপাইয়া উঠিবে।

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আর একটা নিগূঢ় প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে। বিধবা কন্যাকে দ্বিতীয়বার দ্বিতীয় পাত্রে সম্প্রদান করিবে কে? সম্প্রদানের অধিকার কে? পিতা একবার কুমারী কন্যাকে অগ্নি সাক্ষাতে নারায়ণ সাক্ষাতে ব্রাহ্মণ সাক্ষাতে ধর্ম্মানুসারে একপাত্রে দান করিয়াছিলেন, কন্যা গোত্রান্তর প্রাপ্ত হইয়া অপরের গৃহলক্ষ্মী হইয়াছিল, পতিহারা হইলে তাহার পিতা তাহাকে আর অন্য পাত্রে প্রদান করিতে পারেন না, তাঁহার সে অধিকার প্রথম বিবাহ রাত্রেতেই হস্তান্তর হইয়াছে, সে অধিকার কন্যার শ্বশুর কুলে ন্যস্ত হইয়াছে।

আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া বলিতে পারা যায়, সমাজ এখনও একবারে জীবন শূন্য হয় নাই। উপরে যে সভার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সভ্যবৃন্দের নামের তালিকা দর্শনে বুঝিতে পারা গেল, কায়স্থ জাতির বিধবা বিবাহে যাঁহারা অগ্রগামী তাঁহাদের মধ্যে নগরেরও উপনগরের প্রকৃত সম্ভ্রান্ত বনেদী বংশের কায়স্থ সংখ্যা অঙ্গুলীর দ্বারা গণনা করা যায়। বংশানুক্রমে যাঁহারা কায়স্থ সমাজের শ্রেষ্ঠ পদবীতে মান্যগণ্য উক্ত অবৈধ ব্যবহারে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই। যাঁহারা দলাদলি সূত্রে বিভক্ত হইয়া বিধবা বিবাহের মত পোষক হইয়াছেন, সেই মুষ্টিমেয় সমাজ গুলিকে সমাজ হইতে পৃথক্ রাখাই যুক্তি যুক্ত।

কুষ্ঠরোগের মহৌষধ তুবরক রসায়ন।

স্বর্গীয় ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম, ডি, লিখিত।

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে অনেক আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধের নাম দেখা যায়, দুঃখের বিষয় আজ-কাল-কার চিকিৎসকেরা সেই প্রাচীন নামের সহিত কোন কোন ঔষধ মিলাইতে সক্ষম নহেন। যতদিন পর্য্যন্ত এই সকল আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধগুলি নিরূপিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই সকল ঔষধ শাস্ত্রে উল্লিখিত থাকিলেও না থাকার সমান। এক্ষণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে ভারতবর্ষের অনেক বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমি এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে বর্ণিত ঔষধ সকল ইংরাজী পুস্তকের নাম ও বর্ণনার সহিত মিলাইতে বিশেষ যত্ন করিতেছি। এই দুরূহ ব্যাপার এক আধ-জনের দ্বারা সাধিত হওয়া অসম্ভব। মহারাজা, রাজা, জমিদারগণ এবং চিকিৎসক-মণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায় অনেক লুপ্ত ঔষধের পুনরাবিষ্কার হইতে পারে। সত্যের প্রকাশ করিয়া জীবগণের উপকার করিতে চেষ্টা করিলে সর্ব্বভূতহিতে রত ভগবানের অনুগ্রহে অনেক সত্য পুনরাবিষ্কৃত হইবে। আমি যতদূর পারি চিকিৎসক-মণ্ডলীকে ও জনসাধারণকে নূতন নূতন ঔষধ নির্ণয়ের সংবাদ জানাইতে চেষ্টা করিব।

তুবরক রসায়ন সম্বন্ধে সুশ্রুত সংহিতায় ও বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয় নামক গ্রন্থে এইরূপ লেখা আছে,—এই তুবরক বৃক্ষ পশ্চিম সমুদ্রের তীর-ভূমিতে উৎপন্ন হয়, ইহা সমুদ্রের এত নিকটে উৎপন্ন হয় যে, ইহার পল্লব সকল সমুদ্রের তরঙ্গের বিক্ষেপে সঞ্চালিত বায়ুর দ্বারা আন্দোলিত হইতে থাকে। এই বৃক্ষের সুপক্ক ফল সকল বর্ষাগমে সংগ্রহ করিবে এবং সেই সকল ফল হইতে মজ্জা (শাঁস) নিষ্কাশিত করিয়া শুষ্ক ও চূর্ণ করিবে। তৎপরে তিলবৎ ঘানিতে পীড়ন করিবে। অথবা কুসুম ফুলের বীজের ন্যায় দ্রোণীতে তৈল নিষ্কাশিত করিবে। সেই তৈল অগ্নিতে চড়াইবে, যখন তৈল সংযুক্ত জল শুকাইয়া যাইবে, তখন উহা নামাইয়া একপক্ষ কাল ঘুঁটের ভস্মের মধ্যে স্থাপন করিবে। পরে রোগী স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন ও বিরেচনাদি দ্বারা হৃতমল হইয়া শুক্ল পক্ষাদি শুভদিনে চতুর্থ ভোজন-কালে অর্থাৎ প্রথম দিন প্রাতঃ ও সায়ং ভোজন এবং দ্বিতীয় দিন প্রাতর্ভোজন করিয়া সায়ংকালে এই তৈল নিম্নলিখিত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক যথাকালে পান করিবে।

মজ্জসার মহাবীর্য্য সর্ব্বান্ ধাতূন বিশোধয়।
শঙ্খচক্র গদাপাণি স্বমাজ্ঞা পদ্মতেহ চ্যুতঃ॥

তৈল পানান্তর অল্প ঘৃত এবং লবণযুক্ত শীতল যবাগু রাত্রিতে পান করিবে। এইরূপ বিধানে পাঁচ দিন তৈল পান করিবে, আর একপক্ষ কাল ক্রোধাদি অহিত কর বিষয় সকল পরিবর্জ্জন করতঃ মুগের যুষের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়। এই তৈল তিনগুণ খদিরের কাথে পাক করিয়া একমাস কাল পান করিলে, কুষ্ঠ ও মধুমেহ বিনষ্ট হয়। এই তৈল গাত্রে মর্দ্দন ও পান এবং তৎসঙ্গে নিয়মিত সাত্ত্বিক আহার করিলে ভিন্ন স্বর রক্তনেত্র, ক্রিমিভক্ষিত, ও গলিতাঙ্গ কুষ্ঠরোগীও আশু রোগমুক্ত হইয়া থাকে। ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া এই তৈল খদির কাথের সহিত পান করিয়া পক্ষিমাংস রস আহার করিলে দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারা যায়। ৫০ দিবস এই তৈলের নস্য লইলে মনুষ্য সুন্দর দেহ ও শ্রুতিধর হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে। এক্ষণে দেখা যাউক Flora Indica. নামক গ্রন্থে উল্লিখিত কোন বৃক্ষের সহিত তুবরক বৃক্ষ মিলাইতে পারা যায়। Hydnocarpus-wightiana. নামক বৃক্ষ সম্বন্ধে লেখা আছে যে, এই বৃক্ষ পশ্চিম সমুদ্রের তীরে জন্মায়, মালাবার প্রদেশে, এই তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তথাকার লোকেরা এই বৃক্ষকে তুবরকম্ কহে। উৎকট চর্ম্মরোগে ঘোড়ার বর্ষাতি রোগে এই তৈল বিশেষ উপকারী এইরূপ সেই দেশের লোকের বিশ্বাস। Western Ghat. এ এইরূপ তৈলযুক্ত বীজ আর নাই। এই সকল দেখিয়া আমার ধারণা এই যে, তুবরক এবং Hydnocarpus wightiana. এক বৃক্ষের ভিন্ন নাম মাত্র। আমাদের দেশে তুবরক কি, তাহা অনেকেই জানেন না। অনেক চিকিৎসকেরা মনে করেন যে, তুবরক একপ্রকার অরহর ডাল। ডাল হইতে তৈল বাহির হয় না, একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। ডালের চূর্ণ (বেসম) অনেক সময়ে সাবানের পরিবর্ত্তে কোন পদার্থ হইতে ঘৃত বা তৈল নিষ্কাশিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই তৈল অনেকে কুষ্ঠরোগে ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্যফল পাইয়াছেন। এই তৈলের ব্যবহার সম্বন্ধে আমি ইংরাজীতে এক প্রবন্ধ লিখি, সেই প্রবন্ধ বিলাতে Lancet. নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া Transval government. এর Health officer. আমাকে পত্র লিখিয়া কুষ্ঠ রোগে এই তৈল ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ লন। উক্ত তৈল অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে বমন এবং বিরেচন হইতে পারে।

আভ্যান্তরিক প্রয়োগে আমি এই তৈল ১৫ হইতে ৬০ ফোঁটা বা ততোধিক মাত্রায় ব্যবহার করাইয়া থাকি। এই তৈল মর্দ্দন নস্য ও আভ্যান্তরিক প্রয়োগে আমি অনেক কুষ্ঠরোগী আরোগ্য করিয়াছি! যাঁহারা এই তৈল কুষ্ঠ রোগে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহারাই আশাতীত উপকার পাইয়াছেন। ত্রিশ বৎসরের বাতরক্ত এবং কুষ্ঠরোগে উক্ত তৈল ব্যবহারে আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। আজকাল এই তৈল ফরাসী দেশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবহৃত হইতেছে। এইরূপ আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ ভারতের রোগীগণ যত ব্যবহার করিবেন, ততই ভারতের পক্ষে মঙ্গল। অধিকাংশ ডাক্তারগণের ধারণা যে আয়ুর্ব্বেদে ডাক্তারদের শিখিবার কিছুই নাই। আমার অনুরোধ চিকিৎসকেরা ভারতের বহু পরীক্ষিত ঔষধগুলি উদার-চিত্তে ব্যবহার করেন। সত্যের অনুসন্ধান করিতে পিপাসা হইলে এমন কি নরক হইতেও সত্য সাদরে গ্রহণ করা যায়। কবিরাজ মহাশয়েরা মনের সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়া জগতে যেখানে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা প্রণালীতে ব্যবহার করিয়া রোগীর বেদনা নিগ্রহ করুন।

প্রাচীন ঋষিরা যবনোক্ত ঔষধ সকল গ্রহণ করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। সেই সরল-প্রাণ ঋষিদিগের সন্তান হইয়া আপনারা চিকিৎসায় দ্বেষভাব ত্যাগ করুন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের সহিত ভারতবর্ষের ঔষধ তিব্বত, চীন প্রভৃতি অথর্ব্ব-বেদাচারী মানবের নিকট প্রচারিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসার মেরুদণ্ড পারদ, স্বর্ণ, রৌপ্য, লবঙ্গ, জাফরাণ প্রভৃতি ঔষধ সকল বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিতেছে। ভারতবর্ষের অনেক ঔষধ মুসলমানেরা আপনাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে সন্নিবেশিত করিয়া লইয়াছেন। তাই সকলের কাছে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, সত্যের প্রচারে কেহ যেন বাধা না দেন; এবং মহর্ষি চরকের সহিত একমত হইয়া সকলেই যেন স্বীকার করেন, "তদেবযুক্তং ভৈষজ্যম্ যদারোগ্যায় কল্পতে"। প্রাচীন সকল সভ্যজাতিরাই ভারতবর্ষ হইতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ছিলেন। ইজিপ্সীয়ান (মিসর দেশবাসীগণ), আরবজাতি, গ্রীকজাতি, রোমান জাতি, এই সকল জাতিরাই ভারতের কাছে ঋণী ছিলেন। রঘুবংশের কুলগুরু বশিষ্ঠদেব চীনদেশে যাইয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। এখনও চীন, জাপান, বর্ম্মা, সিংহল এবং তিব্বতবাসীরা ভারতবর্ষকে পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া মানেন। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা নিরূপণ করিয়া চিকিৎসা ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত সভ্যজাতির মধ্যে

প্রচারিত হয়। প্রাচীন জাতিদের ভিতর যখন পরস্পরের বিদ্যা বিনিময় করাতে দ্বেষভাব ছিল না, আজকাল তাঁহাদের সন্তানগণের এত চিত্তের সঙ্কীর্ণতা কেন? ভগবান্ সত্যস্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ ও সুখস্বরূপ।

জগতে যার নিকট হইতে যে জ্ঞান প্রচারিত হউক না কেন, সে অনন্ত জ্ঞানের আংশিক-বিকাশমাত্র। তিনি বুদ্ধিস্বরূপে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। জীবের কষ্ট দূর করিবার জন্য যে, ঔষধ বা চিকিৎসা প্রণালী প্রকাশ হউক না কেন, তাহা সকল দেশের লোকেরই আরাধ্য। সমুদ্র তীরে যে সকল ওষধ জন্মায়, হিমাদ্রিশিখরে সে ঔষধ রোপন করিলে চলিবে না। ঔষধের স্থান-ভেদ গুণ-ভেদে হইয়া থাকে। যে দেশে যে ঔষধ জন্মায় সেই সেই স্থলের রাজা ও জমিদারগণ সেই সকল ঔষধ যথাকালে সংগ্রহ করিয়া রাখিলে তবে চিকিৎসকগণ পূর্ণবীর্য্য ঔষধ পাইতে পারেন। উপযুক্ত ঔষধ না পাইলে চিকিৎসা করা বিড়ম্বনা মাত্র; ওষধ সংগ্রহের এই সকল দুরাবস্থা দেখিয়া সকলে নিশ্চেষ্ট থাকিলে চিকিৎসার দিন দিন অবনতি হইবে। জগতে কত স্থানের লোক কত প্রকার ঔষধ আবিস্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে, ভারতের রাজা, মহারাজা, জমীদারগণ ও চিকিৎসকগণ ভারতের বহু পরীক্ষিত প্রাচীন ঔষধগুলির সদ্ব্যবহার জগতকে শিক্ষা দিলে অনেক সুফল ফলিতে পারে।

—:০:—

আশা।

লেখক, শ্রীমলীনমোহন মজুমদার।

ধন্যা আশা ধন্যা তুমি অবনী ভিতর।
মোহিনী শকতি তব, সকলেই পরাভব,
ধন্যা তুমি ধন্যা তব ক্ষমতা বিস্তর।

তোমায় নাহিক ভজে হেন লোক কোথা?
কাহারো পুরাও বাস, কাহাকেবা হতশ্বাস,
কর তুমি নিরন্তর নাহি কোন ব্যাথা,

আশায় আশায় সবে কাটিতেছে কাল,
আজকাল বলি কত, দিন যায় হ'য়ে গত,
কারো কভু সুখোদয় কেহবা বেহাল।

ধন্য তুমি সকলেই বড় চায় তব ;
ছোট হ'তে কখনও,　　কভু নাহি চায় কেহ,
(তব) কি তাৎপর্য্য এর নাহি বুঝি তার।

হের যদি কেহ থাকে সম্পদ বিহীন,
বাড়াতে ঐশ্বর্য্য তার,　　সদাকাল ধ্যান তার,
কভু নাহি চায় কেহ হইতে যে হীন।

কি মোহিনী তব শক্তি বুঝে উঠা ভার,
অনন্ত মহিমা তব,　　কেবা করে অনুভব,
সকলেই অবনত নিকটে তোমার।

অদৃষ্ট দেবীর ভৃত্য তুমি বোধ করি!
অদৃশ্য অদৃষ্ট সনে,　　সদা থাক বিচরণে,
মানব হৃদয়োপরি দিবা বিভাবরী।
যাহার অদৃষ্টা দেবী সুপ্রসন্না থাকে ;
তার পাশে সেইমত,　　হ'য়ে তুমি হরষিত,
বাস কর নিরন্তর পড়িয়ে কুহকে।

অদৃষ্ট বিরূপ হ'লে তুমিও সেমতি—
সদাই কুচক্র ক'রে,　　রাখ তারে সদা ফেরে,
হইয়ে সরল তুমি ঘটাও দুর্ম্মতি।

তোমারে ভজিয়ে যেবা পূর্ণমনস্কাম ;
হইয়াছে ধরাধামে,　　ধন্য সেই ধন্য নামে,
নাহি যে তোমার কভু নাহিক বিরাম।

তোমারে লভিয়ে তৃপ্তি নাই মানবের,
যত না হইবে পূর্ণা,　　ততই বাড়িবে তৃষ্ণা,
তবু নাহি তব কেহ ছাড়িবে এবার।

তোমার কুহকজালে পরিবদ্ধ হ'য়ে
করে কত পাপকর্ম্ম,　　নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম,
কি যেন যাদুর গুণে রাখ ভুলাইয়ে।

মানব তোমার পাশে কৃতাঞ্জলিপুটে,
অমৃত লভিব ব'লে,　　দাঁড়াইবে কুতূহলে,
রহিয়াছে নিরন্তর তোমার নিকটে॥

বেরি বেরি।

লেখক, কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ রায় সেনগুপ্ত।

আজ কাল 'বেরি বেরি' নামক একটী সংক্রামক ব্যাধি কলিকাতায় দেখা দিয়াছে। শুনাযায় বহুবৎসর পূর্ব্বে এইব্যাধি আরও দুইবার ভারতে দেখা দিয়াছিল, তবে অল্পদিন মধ্যে বিদূরিত হইয়া যায়, কিন্তু গত ৩।৪ বৎসর হইতে এই রোগ যে, পুনরায় এদেশে ঢুকিয়াছে, তাহা আর অপনীত হইতে চাহে না। এখন বিচার্য্য এই যে, যথার্থই এই রোগটী একটী নূতন ব্যাধি কি না এবং কি কারণেই বা ইহা উৎপন্ন হইতেছে।

প্রথমতঃ বেরি-বেরির সাধারণ লক্ষণ গুলির আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সাধারণতঃ কলিকাতায় যে বেরি-বেরি হইতেছে, তাহাতে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের নিম্নভাগ প্রথমতঃ ফুলিয়া থাকে। অধিকাংশ রোগীর পায়ের পাতা ও তাহার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ পর্য্যন্ত দিবসে ফুলিয়া থাকে, ক্রমে যত বেলা পড়িতে থাকে ও যত রাত্রি আসে ততই ফুলা কমিয়া যায়। রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ অধঃ অঙ্গের ফুলো বাড়িতে থাকে। এবং উর্দ্ধে-কোমর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যে সকল বেরি-বেরি কষ্টসাধ্য, তাহার সহিত প্রায়ই অজীর্ণ, উদরাময়, জ্বর, শরীরের অবসাদ বা হৃদ্রোগের লক্ষণ সকল বর্ত্তমান থাকে। অসাধ্য বেরি-বেরিতে জ্বর, দাহ, শ্বাস, বমি, অতিসার প্রভৃতি আশু প্রাণনাশক নানা উপদ্রব উপস্থিত হয়, এবং রোগী ৮।১০ দিনের মধ্যেই প্রায় পঞ্চত্ব লাভ করিয়া থাকে; অপরাপর স্থলে দীর্ঘ দিন রোগ ভোগ করিয়া হয় রোগী ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করে, অথবা কালগ্রাসে পতিত হয়।

এখন দেখা যাউক, বেরি-বেরি রোগটী কি যথার্থই নূতন, না ইহা পূর্ব্বেও আমাদের দেশে পরিজ্ঞাত ছিল। বেরি-বেরির যেরূপ লক্ষণাদি, তাহা বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ইহাকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত "শোথ" রোগেরই অন্তর্গত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; এবং কার্য্যতঃ যতটুকু দেখিতেছি, তাহাতে শোথ রোগোক্ত ঔষধাদি সেবনেই যখন প্রশমিত হইতেছে, তখন যে ইহা একপ্রকারের শোথ রোগই, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার হেতু কি? তবে এখন দেখা উচিত বেরি-বেরি কি প্রকারের শোথ, কোন্ দোষোৎপন্ন, কি কি কারণে ইহার বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি এবং কেনই বা ইহা সংক্রামক।

"শুদ্ধ্যাময়াভুক্তকৃশাবলানাং ক্ষারাম্লতীক্ষ্ণোষ্ণগুরূপসেবা।
দধ্যামমৃচ্ছাকবিরোধিপিষ্ট-গরোপসৃষ্টান্ননিষেবণাচ্চ।

অর্শাস্বচেষ্টা বপুষো হৃশুদ্ধির্মর্ম্মভিঘাতো বিষমা প্রসূতি।
মিথ্যোপচারঃ প্রতিকর্ম্মণাঞ্চ নিজস্য হেতুঃ শ্বয়থোঃ প্রদিষ্টঃ॥"

অধিক বমন বিরেচন করাইলে, পাণ্ডু গ্রহণী প্রভৃতি রোগ হইতে অনাহার বা অল্পাহার নিবন্ধন কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির ক্ষার উষ্ণ, তীক্ষ্ণবীর্য্য অম্লরস ও গুরু-দ্রব্য ভোজন হেতু শোথ রোগ হইয়া থাকে অতিরিক্ত দধি, মৃত্তিকা, শাক সংযুক্ত বিরুদ্ধ আহার, বিষ মিশ্রিত অন্নাদি ভক্ষণ, অর্শরোগ হইতে সতত নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা প্রযুক্ত, মলাদি দেহে সঞ্চিত থাকিতেও বমন বিরেচন দ্বারা বহুদিন পর্য্যন্ত শরীর শুদ্ধি না করাইলে, অবথা প্রযুক্ত বমন বিরেচন দ্বারা—শোথ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ঐ শোথ দোষাদি ভেদে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাত-পৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্ত-শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, অভিঘাতজ ও বিষজ এই নয় প্রকারের যথাঃ—

"দোষৈঃ পৃথগ্ দ্বয়ৈঃ স বৈর্ব্বরভিঘাতাদ্বিষাদপি।
সর্ব্বো হেতুবিশেষৈস্তে রূপভেদো নবাত্মকঃ।"

এখন শোথ কাহাকে বলে তাহাই বলিতেছিঃ—

"রক্তপিত্তকফান্ বায়ুদুষ্টোঃ দুষ্টান্ বহিঃ শিরাঃ।
নীত্বারুদ্ধগতিস্তৈর্হি কুর্য্যাত্বঙমাংসসং শ্রয়ম্॥
উৎসেধং সংহতং শোথং মহাহুনির্চয়াদতঃ।
স গৌরবং স্যাদনবস্থিতত্বং সোৎসেধমুষ্মাথ শিরাতনুত্বম্॥
স লোমহর্ষঞ্চ বিবর্ণতা চ সামান্যলিঙ্গং শ্বয়থোঃ প্রদিষ্টম্॥

বায়ু কুপিত হইলে দুষিত রক্ত, পিত্ত ও কফকে বহিঃশিরায়প্রেরণ করে; সেই দুষিত রক্ত, পিত্ত কফকর্ত্তৃক বায়ু তখন রুদ্ধ হইয়া চর্ম্ম ও মাংসে আশ্রয় করিয়া যে যে গাঢ় স্ফীতি বা ফুলা উৎপাদন করে, তাহাকেই শোথ রোগ বলে। যে স্থানে শোথ হয়, সে স্থান ভারি হইয়া থাকে, কখন কখন বিনা চিকিৎসাতে উহা কমিয় যায়। শোথস্থান উন্নত উষ্ণ ও রোমাঞ্চযুক্ত ও বিবর্ণ হইয়া যায় এবং ঐ স্থানের শিরা সকল পাতলা হইয়া পড়ে।

এখন দেখা যাইতেছে যে বেরি-বেরি রোগেও ঐ সকল লক্ষণ হইয়া থাকে তবে বেরি-বেরিকে শোথ রোগান্তর্গত কেন না করা যায়?

অতঃপর পৃথক্ পৃথক্ দোষোৎপন্ন শোথ রোগের সহিত বেরি-বেরির সাদৃশ্য দেখাইব। প্রথমেই বলিয়াছি অধিকাংশ বেরি-বেরিতে লো প্রায় দিবসে বাড়েক্

এবং রাত্রে কমিয়া যায়—আয়ুর্ব্বেদেও বাতিক শোথে ঐ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে।

যথা—

"চরস্তনুত্বক্ পরুষোঽরুণোঽসিতঃ
প্রসুপ্তিহর্ষার্ত্তিযুতো নিমিত্ততঃ।
প্রশাম্যতি প্রোন্নতমেতি পীড়িতো
দিবা বলী স্যাৎ শ্বয়থুঃ সমীরণাৎ॥

বায়ুজন্য শোথ রোগে—ফুলা স্থানের চর্ম্ম খস্‌খসে অরুণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায় এবং ঐ ফুলা শোথ সকলের হইয়া থাকে, অর্থাৎ একস্থান হইতে অন্যস্থানে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ঐ স্থানের স্পর্শ-জ্ঞান কমিয়া আইসে, ঝি ঝি ধরার মত বেদনা অনুভূত হয়, শোথ স্থান টিপিলে গর্ত্ত হইয়া যায়। এই শোথ দিবসে বৃদ্ধি এবং রাত্রে হ্রাস হইয়া থাকে। উপরি-লিখিত বাতিক শোথের লক্ষণের সহিত অধিকাংশ বেরি-বেরি রোগীর উপদ্রবের সহিত সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল পাড়ায় পাড়ায় হাটে বাজারে পা-ফোলা বহু লোক দেখিতে পাইবেন, জিজ্ঞাসা করিলেই জানিবেন যে, তাহারাও ঐ লক্ষণাক্রান্ত শোথরোগী। তাহা হইলেই বেরি-বেরি যে একটা পৃথক্ রোগ নহে, তাহা বুঝিলেন। আর্য্য মনীষিগণ বহুকাল পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণাক্রান্ত রোগ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, তবে এখানকার বেরি-বেরি রোগ যে, কেবল পূর্ব্বোক্তরূপ বাতিক শোথই, তাহা নহে। অনেকের বাতিক শোথের লক্ষণ-বিশিষ্ট বেরি-বেরি হইলেও, পিত্তজ শোথ, গরজ শোথ, সান্নিপাতিক বা অন্যান্য প্রকার শোথের লক্ষণও অনেক বেরি-বেরিতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য প্রকার শোথের লক্ষণও উল্লেখ করিতেছি,—

মৃদুঃ সগন্ধোঽসিতপীতরাগবান্ ভ্রমজ্বরস্বেদতৃষামদান্বিতঃ।
যস্তূষ্যতে স্পর্শরুগক্ষিরাগবান্ স পিত্তশোথোভৃশদাহপাকবান্॥"

পিত্ত জন্য শোথে ফোলাস্থান মৃদু দুর্গন্ধযুক্ত, উষ্ণ বেদনা, দাহ পাকযুক্ত কৃষ্ণ, পীত বা লোহিত বর্ণ হইয়া থাকে। এই শোথে রোগীর ভ্রম, জ্বর, ঘর্ম্ম পিপাসা, মত্ততা ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। এই লক্ষণের শোথও (বেরি-বেরি) বহুতর হইতেছে।

গুরুঃ স্থিরঃ পাণ্ডুররোচকান্বিতঃ প্রসেকনিদ্রাবমিবহ্নিমান্দ্যকৃৎ।
স কৃচ্ছ্রজেন্মপ্রশমো নিপীড়িতো ন চোন্নমেদ্রাত্রিবলী কফাত্মকঃ॥

শ্লেষ্ম জন্য শোথ অত্যন্ত ভারি হয়, উহা একস্থানেই স্থির থাকে এবং শোথস্থান পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে। রোগীর অরুচি, মুখ নাসাদি হইতে জলস্রাব, অতিনিদ্রা, বমি, অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে, বহুদিন ধীরে ধীরে ইহার বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়া থাকে। এই রোগ দিবসে কমে ও রাত্রে বৃদ্ধি পায়।

নিদানাকৃতিসংসর্গাৎ জ্ঞেয়ঃ শোথো দ্বিদোষজঃ।
সর্ব্বাকৃতিসান্নিপাতাচ্ছোথো ব্যামিশ্রলক্ষণঃ॥

পুর্ব্বোক্ত বাতাদি পৃথক্ দোষের দুটী দুটীর বৃদ্ধিবশতঃ দ্বন্দ্বজ এবং ত্রিদোষের প্রকোপে সান্নিপাতিক শোথের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অভিঘাতজ শোথ অস্ত্রাদির আঘাত, ভেলা অলিকুশী প্রভৃতি ও শুয়া ফুটিলে হইয়া থাকে।

বিষজঃ স বিষপ্রাণিপরিসর্পণমূত্রণাৎ।
দংষ্ট্রাদন্তনখাঘাতাদ বিষপ্রাণিনামপি॥
বিন্মূত্রশুক্রোপহতমল বস্ত্রসঙ্করাৎ।
বিষবৃক্ষানিলস্পর্শাদগরযোগবচূর্ণনাৎ॥
মৃদুশ্চলোহবলম্বী চ শীঘ্রো বহুরুজাকরঃ॥

বিষাক্ত প্রাণিগণ শরীরের উপর দিয়া চলিয়া বেড়াইলে অথবা তাহাদের মূত্র লাগিলে অথবা বিষহীন দংষ্ট্রা প্রাণিগণের নখ বা দন্তাঘাত দ্বারা, ঝাটার ধূলি গায়ে লাগিলে, বিষবৃক্ষের বায়ু সেবনে এবং গরযোগ (বিষযোগ) হেতু বিষজ শোথ রোগ হইয়া থাকে।

উপরে যত প্রকার শোথের লক্ষণ লিখিত হইল, তন্মধ্যে আজকাল যতগুলি বেরি বেরি রোগী দেখিয়াছি, তাহাতে বাতিক শোথ, পৈত্তিক শোথ, বিষজ শোথ এবং সান্নিপাতিক শোথই হইতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে বেরি-বেরি শোথ রোগের ভেদ মাত্র।

তবে এ স্থলে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ভিন্ন ভিন্ন ধাতু বিশিষ্ট লোকের অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন প্রকৃতি আহার দেহবল সাত্ম্য সত্ব লিঙ্গ ও বয়স হইলেও মনুষ্যগণের একই রকম লক্ষণ বিশিষ্ট রোগ একই সময়ে কেন হয়? ইহার মীমাংসা ভগবান্ পুনর্ব্বসু চরকের জনপদধ্বংসনীয় অধ্যায়ে করিয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ সকল রোগের উৎপত্তি হেতু দুই প্রকার—সামান্য ও বিশেষ। তন্মধ্যে পুর্ব্বোক্ত বাতাদি প্রকোপবর্দ্ধক দ্রব্যাদির আহার বিহার হইলে সামান্য কারণ, ইহাতে পৃথক্ পৃথক্ সময়ে পৃথক পৃথক লোকের রোগ হইয়া থাকে।

বিশেষ কারণে, দেশ, কাল, জল, বায়ুদূষিত হইয়া দেশময় সংক্রামকরূপে সকলেরই এক প্রকারের রোগ উৎপন্ন হয়।

এখন বিকৃত বায়ু প্রভৃতির লক্ষণ বলিবঃ—

তত্র বাতমেবংবিধমনারোগ্যকরং বিদ্যাৎ। তদ্‌যথা ঋতু-বিষম-মতিস্তিমিতমতি-চল-মতিপরুষ-মতিশীতল-মত্যুষ্ণ-মতিরুক্ষ-মত্যাভিসন্দিন-মতিভৈরবারাবমতিপ্রতি-হতপরস্পরগতিমতিকুণ্ডলিন-মসাত্ম্যগন্ধবাষ্পসিকতাপাংশুধূমোপহতমিতি।

চরকঃ

অস্বাভাবিক ঋতু গুণ বিশিষ্ট ; কখন স্তিমিত কখন চঞ্চল, কখন রুক্ষ, কখন অতি-শীতল কখন অত্যন্ত উষ্ণ-স্পর্শ, কখন অভিসন্ধি অতি ভীষণ শব্দযুক্ত, পরস্পর অত্যন্ত অপ্রতিহতগতি (এলো-মেলো) ঝড় কুণ্ডলীভূত ঘূর্ণি জীবের প্রতিকুল গন্ধ-বাষ্প-সিকতা পাংশু ধুলি ও ধূমযুক্ত বায়ু—জনপদবাসীদিগের রোগ জনক হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঋতু বিপরীত বায়ু মানবের স্বাস্থ্যের প্রতিকুল. কাজেই যে দেশে উক্তরূপ বায়ু চলে, সে দেশে এক সময়েই অনেক লোকের ব্যাধি হইয়া থাকে। এখন বিকৃত জলের লক্ষণ বলিতে ছিঃ—

উদকন্তু খলু অত্যর্থবিকৃতগন্ধ-বর্ণরসস্পর্শবৎ, ক্লেদবহুল-মত্রগণ্ডজলচর-বিহঙ্গমু-পক্ষীণ জলাশয়মপ্রতিকরমপগতগুণং বিদ্যাৎ। চরকঃ।

অপিচ—আচ্ছাদিতবদ্ধজলমপি মনারোগ্যাক রং। চক্রদত্তঃ। অতিশয় বিকৃত গন্ধ-বর্ণ-রস স্পর্শযুক্ত, অতি ক্লেদবিশিষ্ট, জলচর জন্তু বিহঙ্গম পরিত্যক্ত, শুষ্ক পঙ্কিল জলাশয়গত অতৃপ্তিকর জলই দূষিত জল। ঐ প্রকার জলের শৈত্যগুণ ও আস্বাদে মাধুর্য্য কমিয়া যায়। আচ্ছাদিত বদ্ধ জলও অস্বাস্থ্যকর।

এখন বিকৃত দেশের কথা বলিব।

দেশং পুনঃ প্রকৃতি-বিকৃতি বর্ণ-গন্ধ-রস-স্পর্শং ক্লেদবহুলমুপসৃষ্টং সরীসৃপ-ব্যাল-মশক-শলভমক্ষিকামূষিকোলুকশ্মশানিক শকুনিজম্বুকাদিভিস্তৃণোলুপোপবনবন্তং প্রতানাদিবহুলমপূর্ব্ববদ্‌পতিতঃ শুষ্কনষ্টশস্যং ধূম্রপবনং প্রধ্মাতেপতত্রিগণ মুৎকুষ্টশ্ব-গণমুদ্‌ভ্রান্তব্যাভ্রিস্ত-থতবিবিধ মৃগপক্ষিসঙ্ঘমুৎসৃষ্ট-নষ্ট ধর্ম্মসত্যলজ্জাচারগুণ জনপদং বিদ্যাৎ। চরকঃ।

প্রকৃতির বিকৃতি ভাবাপন্ন গন্ধ বর্ণ রস স্পর্শযুক্ত বহুল ক্লেদবিশিষ্ট ব্যাল সরীসৃপ, মশক, পতঙ্গ, মক্ষিকা, মূষিক, উলুক, পেচক, শ্মশানবাসী, শকুনি, ও শৃগালাদি দ্বারা পূর্ণ হইলে, বাটীর প্রাঙ্গনে উলুপ জাতীয় তৃণদ্বারা ব্যপ্ত হইলে পূর্ব্বে অপরি-

জাত নূতন জাতীয় লতাগুল্মাদি দ্বারা সহসা আচ্ছন্ন হইলে, কখন পূর্ব্বে যে সকল পক্ষী দেশে ছিল না, সেই প্রকার পক্ষী আসিলে, ক্ষেত্রস্থ শস্য সহসা শুষ্ক ও নষ্ট হইয়া যায়; যখন ধূমময় বায়ু বহিতে থাকে, পক্ষী ও কুকুরাদি সতত আর্ত্তনাদ করিতে থাকে এবং মৃগ পক্ষিগণ ত্রস্ত ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে থাকে, মানবগণ যখন সত্য ধর্ম্ম লজ্জা ও আচারত্যাগী হয়, জলাশয় সকল ক্ষুব্ধ ও উচ্ছলিত হইতে থাকে। প্রায় উল্কাপাত ও ঘন ঘন সশব্দে ভূমিকম্প হইতে থাকে, তখনই সে দেশ অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে জানিবে। সেই দেশবাসিগণের একই সময়ে বহুলোকের এক রোগ হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা *

লেখক, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

কলির সাধন-ভজন বিহীন নর-নারীগণের হৃদয়ে স্বর্গীয় সুপবিত্রতার সৌরভ-বিতরণার্থ ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথিতে চন্দ্রগ্রহণ যোগে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রার দিবস কৃষ্ণনগর হইতে দুইক্রোশ দূরে নবদ্বীপধামে মহাপ্রভু চৈতন্য-দেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি যেস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেস্থান এক্ষণে ভাগিরথি গর্ভে বিলীন হইয়াছে। চৈতন্য-চরিত্র জগতের উজ্জ্বল আদর্শ। এই জন্যই মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের শিক্ষা লোক সমাজে অভাবনীয় সুফলোৎপাদন করিয়াছে। মহাপ্রভু আপনার লীলা দ্বারা জীবগণকে কিরূপ এক সু-মহৎ শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

চৈতন্যদেবের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, জননী শচীদেবী। চৈতন্যদেব বাল্যকালে সুপণ্ডিত গঙ্গাদাসের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বস্তু ছিল। উপযুক্ত বয়সে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, সর্পাঘাতে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু হয়। তদন্তর তিনি দ্বিতীয়-বার দার পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। ২৪ বৎসর বয়সে

---

* নদীয়া "শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী" সভার বিজ্ঞাপিত "শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা" ইতিশীর্ষক পুরস্কার প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছিলাম। শান্তিপুরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদন গোপাল গোস্বামী, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী, বাঘনাপোড়ার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গোস্বামী, হাই-কোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত কিশোরী লাল গোস্বামী, এম, এ, বি, এল, ভূত পূর্ব্ব ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি মহোদয়গণ পরীক্ষক ছিলেন। পরীক্ষায় মল্লিখিত প্রবন্ধটি পুরস্কারের উপযুক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কয়েক খানি মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। লেখক

(১৫০৯ খৃষ্টাব্দে মাঘমাসে) কালনায় গমন পূর্ব্বক মহাপ্রভু সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে, জননী শচীদেবী মহাদুঃখে অভিভূতা হইয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে মহাপ্রভুর আটটি ভগ্নী শৈশবে অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপমিশ্র সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, এজন্ত মাতা শচীদেবী চৈতন্যদেবকে নয়নান্তর করিতেন না। যে রাত্রে মহাপ্রভু কালনায় সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতে যান, সেই রাত্রে শচীদেবী তাঁহাকে ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে লইয়া নানা চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন, মহাপ্রভুর সহচরেরা সেই অবসরে বংশীধ্বনি করিয়া সংকেত করায় তিনি নিদ্রিতা মাতার ক্রোড় হইতে উঠিয়া চুপি চুপি পলায়ন করেন। সেই সময় হইতে এই নিয়ম হইয়াছে যে, যে জননীর এক পুত্র, তিনি রাত্রে বংশীরব শুনিলে আহার করেন না।)

চৈতন্যদেব সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের পর একবার শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে জননীকে আনাইয়া সাক্ষাৎ করেন। সংসারে পিতামাতার প্রতিভক্তি, পত্নী প্রেম, লোক প্রিয়তা, শিষ্যবৎসলতা, জ্ঞান-পাণ্ডিত্য দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সকল গুণই মহাপ্রভু চৈতন্য-চরিত্রে সম্যক-রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল; মানব-জীবনে ঐ সকল অমূল্য গুণরাশি কিরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে, স্বীয়জীবনে আচরণ দ্বারা তিনি নানাতীর্থ ভ্রমণ পুর্ব্বক জীব সাধারণকে সবিশেষ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুর পরম সুপবিত্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থপাঠে তাঁহার শিক্ষাবীজ সর্ব্বপ্রথমে অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু অজ্ঞান মানব তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না, এই আশঙ্কায় মহাপ্রভু সেই অঙ্কুরকে সুবৃহৎ কল্পতরু বৃক্ষ রূপে পরিণত করিয়া ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই কল্প-বৃক্ষের সুধাময় ফল ভারতে হরিনাম প্রচার। সেই সুপবিত্র ভাগবত ধর্ম্ম ভারত ও অন্যান্য প্রদেশে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। পূর্ণ অবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাবতারে যাহা অজ্ঞানান্ধ জীবের অগম্য-অপূর্ণ ছিল, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আগমনে তাহাই সরল সুগম্য হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কলির মায়ামুগ্ধ জীবের ভগবত আরাধনার সারগ্রন্থ সর্ব্বপুরাণ সার শ্রীমদ্ভাগবতে আছেঃ—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ॥

তাই শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেনঃ—

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগে ধর্ম্ম—নাম সঙ্কীর্ত্তন সার॥

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য,--নাম-সঙ্কীর্ত্তনে ও ভক্তি প্রবর্ত্তনে বদ্ধ জীবের নিস্তার সাধন।

"অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতঃ ॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার এই সকল অভ্রান্ত সারসত্য বাক্যের সূক্ষ্মভাব গ্রহণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেনঃ—

"সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য ॥"

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তারকব্রহ্ম-শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক-রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর জন্মদিবসে নদীয়ানগরে শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিয়াই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যথাঃ— শ্রীচরিতামৃতেঃ—

সর্ব্বসদ্‌গুণ পূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামাভিঃ ॥
বৈবস্বত মনোরষ্টাবিংশকে যুগ সন্তবে।
চতুর্দ্দশ শতাব্দে বৈ সপ্তবর্ষ সমন্বিতে ॥
ভাগীরথী তটে রম্যে শচীগর্ভে মহার্ণবে।
রাহুগ্রস্তে পূর্ণিমায়াং গৌরাঙ্গং প্রকটোভবেৎ ॥
শ্রীচরিতামৃতের পয়ার এই যেঃ—

ফাল্গুনী পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেই কালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয় ॥
হরি হরি বলে লোক হরষিত হৈঞা।
জন্মিলা গৌরাঙ্গ প্রভু নাম জন্মাইয়া ॥
শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন :—

সর্ব্বলীলা লাবণ্য বৈদগ্ধ্য করি সঙ্গে।
কৃষ্ণরূপে গোকুলে করিলা মহারঙ্গে ॥
এই অবতারে ভাগবতরূপ ধরি।
কীর্ত্তন করিবা সর্ব্বশক্তি পরচারি ॥
সঙ্কীর্ত্তনে পূর্ণ হৈল সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈল প্রেমভক্তি পরচার ॥

শচী গর্ভে বৈসে সর্ব্বভুবনের বাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইলা প্রকাশ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সু-মঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল ॥
সঙ্কীর্ত্তন সহিত প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার ॥

*　*　*

গঙ্গাস্নানে চলিলেন সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিকে হরি সংকীর্ত্তন ॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব জগত-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন ॥

মহাপ্রভু জীবনগণকে যত প্রকার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন সর্ব্বত্রই সনাতন শাস্ত্রের সম্বন্ধ, শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেনঃ—

"বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম, তিন মহাধন ॥
গৌণ মুখ্যবৃত্তি কি অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয় কৃষ্ণকে ॥"

বেদশাস্ত্রই শাস্ত্র। বেদ যাহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই অভ্রান্ত সত্য। বেদশাস্ত্রের অনুগত হইয়া চলা সাধু মহাজনগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

গৃহস্থাশ্রমীগণের মুক্তির পথ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেব গৃহস্থের সাধন স্থির করিয়া দিয়াছেন,—

"প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর-কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন ॥"

১৫১০ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের দ্বারা যে ধর্ম্মভাব প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মনামে সুপ্রসিদ্ধ। আর্য্য সমাজ প্রচলিত সমুদয় সনাতন ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ভিত্তি বেদ, বিশেষতঃ সংসারে পদার্পণ পূর্ব্বক গৃহস্থ সংসার পরিত্যাগ করিয়া যে প্রকারে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইলে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মলাভ করা যায়, এবং প্রেম ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারা অকৈতব পরমানন্দ লাভ করা যায়, ভক্তাবতার মহাপ্রভু আপামর সাধারণকে তাহাই শিক্ষাদিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুর

আবির্ভাবের পূর্ব্বে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের শোচনীয়াবস্থা ঘটিয়াছিল। হিন্দুগণ বিজাতীয় সংশ্রবে বাস করিয়া স্ব স্ব ধর্ম্মে মতিহীন হইয়া সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় ভাব হইতে প্রায় পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান্ যুগে-যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তাই অবতীর্ণ হইয়া সনাতন ধর্ম্মের সরল ভাব সকল পরিপুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ভগবানের সু-মধুর নাম সংকীর্ত্তনের প্রথা জন-সমাজে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নাম সংকীর্ত্তনের মহিমায় ভাবুক লোকে মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্ম বিস্মৃতিতে বিমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। লোকে এখন কথায় বলে, "সংকীর্ত্তনের মহিমা শ্রীগৌরাঙ্গই বুঝিতেন." বাস্তবিক বৈরাগ্য লাভের অপর কোন সুগম প্রণালী মহাপ্রভুর আর কেহ জন-সমাজে প্রচার করেন নাই। জীবকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্য তিনি ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বৈদিক মতে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন. সন্ন্যাস-ধর্ম্মের শাসন-প্রণালী স্ত্রীর হস্তে ভিক্ষা গ্রহণাপরাধে ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগ করায় প্রকাশ পাইয়াছে। পুরুষ স্ত্রী-স্বভাবপন্ন হইলে অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি দমন করিতে না পারিলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে না, ইহাও তাঁহার একটি শিক্ষা, তাহাকে সাধারণতঃ সখিভাব কহে। এই শিক্ষার মধ্যে আর্য্য-ভাবের কোন বিরোধ লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বিশিষ্ট জীবগণকে রাধাপ্রেম শিক্ষা দিবার জন্য—"গৌর-বরণ রূপ," ধারণ করিয়া দেশ বিদেশে নগরে প্রান্তরে দীন-হীন বেশে কেঁদে কেঁদে সু-মধুর হরিনাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তিনি জীব সাধারণকে সমাদরে বলিয়াছিলেনঃ—,"আয় জীব হরি প্রেম নিয়ে যা। দেবতাদুর্ল্লভ মধুর-প্রেম জীবের কল্যাণের জন্য আনিয়াছি। এই অপার্থিব প্রেমে শিব-শ্মশান-বাসী হইয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ প্রেমোন্মত্ত হইয়া দিবানিশি হরিগুণ গান করিয়া বেড়াইয়া ছিলেন। কামিনী কাঞ্চনে আশক্ত জীব! আইস, নির্জ্জনে বসিয়া প্রেমময়ের প্রেমরূপ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করি।"

জীবের প্রতি মহাপ্রভুর শিক্ষা এই যে, গৃহে থাকিয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করিবে। যেহেতু গৃহাশ্রমই চতুরাশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ! মনু বলিয়াছেন যথা—মনুসংহিতা ৬ষ্ঠ অধ্যায় উননবতি শ্লোকঃ—

"সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতি বিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ সঃ ত্রিনেতান্ বিভর্ত্তি হি॥"

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যখন দক্ষিণদেশ পর্য্যটনে গমন করেন, তখন কোন কোন ভক্ত

প্রভুর সহগামী হইতে ইচ্ছা করিলে, প্রভু অমনি তাহাকে নিষেধ-সূচক বাক্যে বাধা দান করিয়া উপদেশ দিতেন—

প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না কহিবা।
ঘরে রহি নিরন্তর কৃষ্ণনাম নিবা॥

অতএব সংসারে থাকিয়া সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত না হইয়া ভগবৎ শরণে দিন অতিবাহিত করিলে অবশ্য সে ভক্ত ভগবৎ কৃপালাভ করিবেন সন্দেহ কি?

"যাহার ভুবন তার বন, তুমি, আমি।
তবে কেন গৃহ ছাড়ি হবে বন-গামী॥
কেবল মনের মূলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
মন চাঙ্গা হলে গঙ্গা কেটাতে মিলয়॥
কলিযুগে সন্ন্যাস নাহিক বেদে বলে।
সেইত সন্ন্যাসী মনে বৈরাগ্য জন্মিলে॥"

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি রায় রামানন্দ ও রাজা প্রতাপরুদ্রই ইহার প্রকৃত প্রমাণ। ইহারা প্রভুর সাক্ষাৎ স্বরূপ দর্শন পাইয়াও সাংসারিক কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন।

"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি র্ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ।"

ভক্তিই সার, ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, ভক্তিই ভূষণ, এবং ভক্তিই জীবন, তাই সকলের সর্ব্বথা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা সঙ্গত। ভক্তি-সাধন ও ভক্তের-সেবা জীবের বিশেষ কর্ত্তব্য। ধর্ম্মপথে চলিতে হইলে এই দুইটী কথা সতত মনে রাখা উচিত। শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেনঃ—

"যে মে ভক্তজনা পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥"

অর্থাৎ হে পার্থ! যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নয়, যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

যাহাদের স্বভাবই মাধুর্য্য প্রবণ তাঁহারা ঐশ্বর্য্য বা মাহাত্ম্য দর্শন বা শ্রবণ বা বর্ণন করিলে তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ মাধুর্য্য ভাব সিন্ধুই উচ্ছসিত হইয়া উঠে। ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিতে কারতে মহাপ্রভু মাধুর্য্যে মগ্ন হইতেনঃ—

"ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইল।
মাধুর্য্যে মজিল মন এক শ্লোক পড়িল॥" মধ্য ২১ অ

শ্রীচরিতামৃতে কৃষ্ণ তত্ত্বকে তিন ভাগে বিভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে ১। সম্বন্ধ ২। অভিধেয় ৩। প্রয়োজন। সম্বন্ধ অর্থাৎ কৃষ্ণকে প্রাপ্তি। অভিধেয় অর্থাৎ পাইবার উপায়ের নাম ভক্তি। প্রয়োজন অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রেম।

বেদ শাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম তিন মহাধন॥ মধ্য ২০ অঃ

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ভাবাবেশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেম রহস্য ভেদ করিয়া জীবকে প্রেম-ভক্তি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তিনি প্রেমের ভিখারী. প্রেম ভিন্ন প্রেমময়কে লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। কঠোর তপস্যা বলে তাঁহাকে লাভ করা যায় বটে, কিন্তু সে লাভ ক্ষণমাত্র—চপলা চমকের ন্যায় ক্ষণমাত্র দর্শন দিয়াই তিনি অদৃশ্য হইয়া যান। আমাদের সনাতন শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। ভগবান ভক্তের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া অভয়-দান পূর্ব্বক, চকিত মাত্রেই আবার অন্তর্দ্ধান হইয়া যান, তাঁহার লুকাইবার স্থান নাই, যে অস্থির প্রাণ হইয়া তাঁহার উপাসনা করে, তিনি সেই প্রেমিকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার সু-মধুর নাম মহাত্ম্যে প্রেমহীন ভক্তি বিবর্জ্জিত হৃদয়েও ভক্তির আবির্ভাব হয়, ইহাও প্রমাণসিদ্ধ কথা। বলা হইয়াছে, চারিশত আটশ বর্ষ অতীত হইল, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রেম ও ভক্তির ধর্ম্ম। প্রেম-ভগবৎপ্রসাদ লাভের প্রধান উপায়, তাহা দেখাইবার জন্যই মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের শুভাগমন। তাঁহার নিকট জাতি-বিচার ছিল না। ব্রাহ্মণ শূদ্র আর্য্য ম্লেচ্ছ, আপামর লোক সাধারণ মনুষ্য মাত্রকেই ঈশ্বর প্রেমে সমান অধিকার প্রদান করিয়া মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের জয়-পতাকা উড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে যাঁহারা শরণাগত, তাঁহাদের আশাপূর্ণ হইতেছে, আজিও নর-নারীগণ তাঁহার সু-মধুর নাম রস পান করিয়া বিভোর হইয়া রহিয়াছেন।

কলি-যুগে কেবল ভগবানের নামের মহিমা দেখাইবার জন্য মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ভূরি ভূরি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন. যদ্যপি রজো অথবা তমোগুণ প্রভাবে জগন্মোহনের নিমিত্ত নাম সংকীর্ত্তনই যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে তিনি সন্ন্যাসী হইতেন না। সনাতন শাস্ত্রানুমোদিত গুরু-করণ যদি নিষ্প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে তিনি কেশব মহাভারতীর নিকটে দীক্ষিত হইতেন না। কেশ-বিন্যাসও মনোহর বসন ভূষণের শোভা যদি ভগবৎ সাধনের সহায় হইত, তাহা হইলে, মহাপ্রভু

মস্তকমুণ্ডন ও কৌপিণ ধারণ করিতেন না। কামিনী কাঞ্চনের ভোগাশ্রয়ে থাকিয়া যদি ভগবানের সাক্ষাৎ-কার লাভ হইত, এবং কলিকালে তাহাই মাত্র যদি সাধন হইত, তাহা হইলে চৈতন্যদেব কদাচ বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করিতেন না। আত্মীয়-পরিজন-বর্গের মনতুষ্টি করিলেই যদি সাধনার সমাপ্তি হইত, তবে তিনি উদাসীন হইয়া পরম তত্ত্বান্বেষণে সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করিতেন না। ভগবৎ সাধনের উপায় তিনি নিজে সাধন করিয়া জীবগণকে সুগম পথ দেখাইয়া গিয়াছেন. যে উদ্দেশে ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকিয়া উদ্দীপক কারণ স্বরূপ সংসারের বিভীষিকা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, অনিত্য জ্ঞান লাভে মতি হয়, সে উদ্দেশে সমবর্ত্তী কারণ স্বরূপ, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী কারণ স্বরূপ ভক্তসঙ্গে দিনযাপন করিতে হয়, সাধারণ লোকে সে মহৎতত্ত্ব লাভ করিতে অক্ষম হয়; রজস্তমোভাবে সেই সকল অক্ষম লোকের দেহ মন এরূপ কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, মহাপ্রভুর সাধনার তাৎপর্য্য তাহারা বুঝিতে পারে নাই; কেবল জগাই মাধাই ও রূপ সনাতন প্রভৃতি কতিপয় অজ্ঞানের হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বসাধারণে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। সর্ব্বসাধারণে তাহার অধিকারী হইতেও পারে নাই, শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত নাম সাধন প্রণালী সর্ব্ব সাধারণকে শিক্ষাদান পূর্ব্বক অসিদ্ধ মনোরথ হইয়া যখন মহাপ্রভু সমীপে ফলাফল নিবেদন করিলেন, তখন মহাপ্রভু যারপর নাই দুঃখিত হইয়া প্রেমাবেগে বলিলেন, "ভাই রে! তবে উপায় কি? জীবগণকে উদ্ধার করিতে আসিলাম, জীব যদি সহজ সাধন না লইল, তবে তাহাদের গতি কি হইবে?"

মহাপ্রভুর এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বল্পবুদ্ধি লোকে মনে করিতে পারে, যিনি স্বয়ং ভগবান্ তিনি কি জানিতেন না, যে কি উপায়ে জীবের কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা? সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বান্তর্য্যামী কি এত শক্তিহীন যে, সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য বিস্মৃতি এবং কার্য্যের অসম্পূর্ণতার নিমিত্ত তাঁহাকে পরিতাপ করিতে হইয়াছিল? অবশ্যই ইহার-তাৎপর্য্য আছে, মনুষ্যের স্বভাবানুসারে মনুষ্যের ধারনানুসারে, দেশকাল পাত্রানুসারে ভগবান কার্য্য করিয়া থাকেন, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সে সময়ে কেন যে ঐ প্রকার কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও ক্রমে ক্রমে উল্লেখ করা যাইবে। নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত নানাবিধ কথোপকথনের পর মহাপ্রভু স্থির করিলেন যে, কলিকালে বিনা কৌশলে কোন কার্য্যই হয় না।

প্রেমভক্তির দ্বারা ভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কঠোর সন্ন্যাস না দেখাইয়া প্রকারান্তরে সন্ন্যাসাশ্রমের কার্য্য করিতে হইবে। এই যুক্তি স্থির করিয়া তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি পুনর্ব্বার শ্রীশ্রীহরিনাম প্রচার ভার সমর্পণ করিলেন, নিত্যানন্দ প্রভু তদনুসারে প্রচার করিতে লাগিলেনঃ—

"মাগুর মাছের ঝোল,
* * * কোল,
বোল হরি বোল।"

ইহা শ্রবণ করিয়া অজ্ঞ লোকে বলিল,—"অবধূত ঠাকুর! এমন সাধনের উপদেশ আমরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই গ্রহণ করিতে পারি।" সজন-সমাজে আনন্দের আর সীমা রহিল না। সকলেই পরমানন্দে বলিতে লাগিল, "নিত্যানন্দ প্রভু আমাদের ব্যথার ব্যথি বটে; ইহাকেই বলে প্রাণের বন্ধু, প্রভু আমাদের ঠিক কথাই বলিয়াছেন।"

নিত্যানন্দ প্রভু এইরূপে মায়ামোহ বিমুগ্ধ জন-সাধারণকে কৌশল পূর্ব্বক নাম সাধন করিতে শিক্ষা দিয়া কি বাস্তবিক যাবতীয় দুষনীয় মূল্য বিষয়ের দ্বারো দ্ঘাটন করিয়া দিয়াছিলেন? ইহা কখনই হইতে পারে না। উহা কেবল অজ্ঞা-নের ধারনা মাত্র।

বিলাসীতাই কলির ধর্ম্ম। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব লোক সমাজে অবতীর্ণ হইয়া নাম-সাধনার ছলে বিলাস ব্যসনের প্রশ্রয় দিয়া ছিলেন, তাদৃশ প্রশ্রয় দিবার কি কারণ ছিল তাঁহার অভিপ্রায় তিনিই জানিতেন, সাধারণ জীবে তাহা কিরূপে অনুভব করিতে পারিবে?

মহাপ্রভু নবদ্বীপে ভক্তগণ লইয়া কলির নাম যজ্ঞ শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভক্তগণ শ্রীরাম পণ্ডিতের গৃহে তাঁহার মহাভাব প্রকাশ দর্শন করাতে নবদ্বীপ বাসীর গৃহে গৃহে দ্বারে দ্বারে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচার আরম্ভ হইল, নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুরকে তিনি শ্রীহরিনাম প্রচারে মনোনীত করিলেন। মহাপ্রভুর অগ্রজ, অবধূত চূড়ামণি ছোট হরিদাস ঠাকুর, শ্রীহরি নাম-রসের মূর্ত্তিমন্ত,-ভক্তাবতার মহাপ্রভু চৈতন্যদেব দুইজন অনুরক্ত ভক্তকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেনঃ—

"শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥"

প্রতি ঘরে ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল-কৃষ্ণ ভজ-কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
ইহাবহি আর না বলাবে, না বলিবা।
দিবা অবসানে আসি আমারে কহিবা॥

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কীর্ত্তনাঙ্গে কাজীদমন একটী উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। তৎকালে বিধর্ম্মিগণের রাজত্ব। নবদ্বীপের কাজী শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের সময় ভক্তগণের খোল খরতাল ভাঙ্গিয়া ভক্তগণকে প্রহার করিয়াছিল, মহাপ্রভু তখন কিছুই বলেন নাই, অনন্তর নিশাকালে একবিরাট পুরুষ সেই কাজীর শিহরে বসিয়া হরিনামের স্বপ্ন দেন, পরদিন প্রভাতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কাজী হরিভক্ত হয়, ইহার নাম কাজীদমন অথবা কাজী উদ্ধার।

প্রেমাবতার মহাপ্রভু চৈতন্যদেব জন-সমাজে প্রেমের প্রস্রবণ খুলিয়া আমর-সাধারণকে প্রেমি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, জগাই মাধাইকে তিনি কৃপা না করিলে তাহাদের সদ্গতির কোন উপায় হইত না। তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য প্রশিষ্য পরিচালিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীহরিভক্তি বিলাস প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থ সমূহের বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাও দেখা আবশ্যক। অল্প কথায় সপ্রমাণ হইতে পারে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসামায়িক সহচর। তাঁহার প্রণীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের শাস্ত্র, উক্ত গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার-সত্য প্রকটিত আছে। মহাপ্রভু আপনার প্রধান শিষ্য রামানন্দ রায়ের হৃদয়ে উদিত হইয়া ভক্তমুখে বৈষ্ণব ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কার উক্ত প্রসঙ্গের প্রথমেই রামানন্দে মহাপ্রভুর আবির্ভাব এই ভাবে লিখিয়াছেনঃ—

"সঞ্চার্য্য রামাভিধভক্তমেঘে স্বভক্তিসিদ্ধান্ত চয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনাবিতীর্ণৈস্তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রযাতি॥

ইহার অর্থ এই যে, গৌর জলনিধি, রামানন্দ নামক মেঘেতে ভক্তমেঘে স্বকীয় ভক্তি সিদ্ধান্ত-সুধা সঞ্চারিত করিয়া, সেই ভক্তমেঘ প্রদত্ত ভক্তি সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক, ভক্তিরত্নাকর নাম ধারণ করিতেছেন।

পরম ভক্ত রামানন্দ রায়কে আপন জ্ঞানে জ্ঞানী করিয়া জ্ঞানময় মহাপ্রভু তন্মুখ-নিঃসৃত এই অমূল্য জ্ঞানরত্ন গ্রহণ করিতেছেঃ—

প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার ?
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥
কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্ত্তি ?
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি ॥
সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার, সেই বড় ধনী ॥
দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?
কৃষ্ণভক্তি-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি আর ॥
মুক্তমধ্যে কোনজনে মুক্তবলি মানি ?
কৃষ্ণপ্রেম যার, সেই মুক্ত শিরোমণি ॥

*　　　*　　　*　　　*

"কহ কৃষ্ণ কহ রাধা রাধাকৃষ্ণ সার।" এই বাক্য তাঁহার শিক্ষা তত্ত্বের এক-তমক্ষেত্রে স্থান পাইবার সামগ্রী বলিলেও বলা যাইতে পারে, সাধনার পথ পরিষ্কার করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব সমুদয় কণ্টকাকীর্ণ পথ পরিস্কার করিয়া ফুল ছড়াইয়া গিয়াছেন। আমরা গোবিন্দদাসের করচা হইতে ছয়টী ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে একটী মাত্র পদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে পাঠক দেখিতে পাইবেন—মহাপ্রভু ভক্তির স্ফূরণ কি অলৌকিক ব্যাপার !

(১)　এখানে শ্রীবাস-গৃহে মহাসংকীর্ত্তন।
করিতে লাগিল প্রভু হৈয়া অচেতন ॥
কীর্ত্তনে মাতিয়া গোরা নাচিতে লাগিল।
অমনি বসন তাঁর খসিয়া পড়িল ॥
কদম্ব-কুসুম-সম হইল শরীর।
অজ্ঞান হইয়া নাচে মোর ধর্ম্মবীর ॥
শোণিতের ধারা বহে লোমকূপ দিয়া।
বিক্ষত হইয়া অঙ্গ আছাড় খাইয়া ॥

(২)　নাচিতে লাগিল প্রভু মাতাইলা দেশ।
কোথায় কৌপিন ডোর আলু থালু বেশ ॥
আছাড় খাইয়া প্রভু পড়য়ে ধরায়।
মুখে লালা ইতি উতি গড়াগাড় যায় ॥

(৩)　হরি হরি বলি প্রভু উচ্চ-রব করি।
আছাড় খাইয়া পড়ে ধরণী উপরি ॥

প্রেমে গদ্ গদ্ হৈয়া গড়াগড়ি যায়।
বসন ভূষণ গিয়া পড়িল কোথায়॥
মহাসাত্ত্বিকের ভাব আসি উপজিল।
প্রেমে লোমকূপ দিয়া শোণিত ছুটিল॥
প্রেমভাব ভক্তি দেখি আশ্চর্য্য সকলে।
দেবতা বলিয়া সবে পড়িলা ভূতলে॥

(৪) নাচিতে লাগিল প্রভু বলি হরি হরি।
লোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি॥
আছাড়িয়া পড়ে নাহি মানে কাঁটা খোঁচা।
ছিঁড়ে গেল কণ্ঠ হৈতে মালিকার গোছা॥
না খাইয়া অস্থিচর্ম্ম হইয়াছে সার।
ক্ষীণ অঙ্গে বহিতেছে শোণিতের ধার॥

(৫) জড় সম কখন থাকে না বাহ্য জ্ঞান।
পুলকিত কলেবর কদম্ব সমান॥
আধ নিমীলিত চক্ষু যেন মৃতদেহ।
এমন আশ্চর্য্য ভাব না দেখেছে কেহ॥
ত্রিরাত্রি চলিয়া গেল বৃক্ষের তলায়।
অনায়াসে উপবাসে কিছু নাহি খায়॥
বহিছে হৃদয়ে দর-দর অশ্রুধারা।
শতডাকে কথা নাহি পাগলের পারা॥

(৬) হরিনামে মত্ত প্রভু প্রেম উপজিল।
কদম্বের মত অঙ্গ শিহরি উঠিল॥
মুখে লালা বহেকত জল নাসিকায়।
জড়ের সমান পড়ি রহে গোরা রায়॥

একদা রথযাত্রার সময় জগন্নাথের রথাগ্রে উদ্দণ্ডনৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভুর যে অবস্থা হইয়াছিল, কৃষ্ণদাস গোস্বামী তাহা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

"উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাব উদয় সমাকার॥
মাংস ব্রণসহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলের বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥

এক এক দণ্ডের কম্প দেখিয়া লাগে ভয়।
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাহে রক্তোদগম।
জজ গগ জজ গগ গদ্ গদ্ বচন ॥
জলযন্ত্র ধারা যৈছে বহে অশ্রুজল।
আশে পাশে লোক যত ভিজিল সকল ॥
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভুকান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্প সম ॥
কভু স্তম্ভ, প্রভু কভু ভূমিতে লোটায়।
শুষ্ক কাষ্ঠ সমহস্তপদ না চলয় ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্তখণ্ড।

মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনের ভাবে আমরা বুঝিয়াছি যে, নামসংকীর্ত্তনও রস আস্বাদন জীবের প্রধান সাধন। নাম সুধা ও রসসুধাপানে জীব নির্ম্মল হয়, ও ভগবানের প্রেমরূপ ধন প্রাপ্ত হয়। তিনি যেমন কর্ত্তব্য করে শিক্ষা দিয়াছেন, তেমনি কোন কোন বিষয়ে নিষেধও করিয়াছেন, মহাপ্রভু মুরারিকে বলিয়াছিলেন, "মুরারি অধ্যাত্ম ভাবের চর্চ্চা করিও না, তাহা হইলে আমাকে পাইবে না।" আরও তিনি শিখাইলেন,—

"হস্তপদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
এইমতে বেদে মোরে করে বিলম্বন ॥" শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

অর্থ অধ্যাত্ম চর্চ্চায়, যাগযজ্ঞে, ও মায়াবাদে সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাওয়া যাইবে না।

মহাপ্রভু আর যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য প্রকটিত হইল। পৃথিবীতে নাস্তিকতার অতিশয় বৃদ্ধি হইবে। কেহ ভগবানের প্রতি আস্থাস্থাপন করিবে না; আর যদি কেহ মুখে তাঁহাকে মানে, তবে তিনি যে "সুন্দর" তাহা ভুলিয়া তাঁহাকে অসুর ভাবে পূজা করিবে; প্রকৃত পক্ষে তখন দেখিবে যে, সমস্ত জগৎ কেবল নাস্তিকতায় পূর্ণজগতের এইরূপ দুরবস্থা হইবে। চৈতন্যদেব ইহা জানিয়া শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া "আমি তাঁহার তিনি আমার।" এই বিশ্বাস নিত্যানন্দের সহিত আপনি কার্য্যে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহার পরে প্রভু আর একটী শিক্ষা দিয়াছিলেন,—মহাপ্রভু নিত্যানন্দের নীলাচলে আছেন। নিতাই নীলাচলে থাকেন, ইহা প্রভুর ভাল লাগিতেছে না, অতএব তিনি—

বিরলে নিতাইয়ে পেয়ে, নিজকাছে বসাইয়ে,
মধুভাষে কহে ধীরে ধীরে।

জীবেরে সদয় হয়ে, হরিনাম বিলাও গিয়ে,
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে ॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ, জীব সব হৈল অন্ধ,
কেহ ত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবা যারে,
কৃপাকরে লওয়াইবে নাম ॥
কৃত্ত পাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর,
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়, জীবের যেন নাহি হয়, ইত্যাদি—

এখন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মহৎ উদ্দেশ্য বুঝা যাইতেছে। তাহার পর, (১) মহাপ্রভু চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া দেহমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও বৃন্দাবন স্থাপন করিলেন। (২) মাধুর্য্য সাধন কি ? মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নিজে সাধন করিয়া জীবগণকে শিখাইয়াছিলেন। (৩) রাধার প্রেম কি ? তাহা ধারণা করা কোন জীবের সাধ্য ছিল না, মহাপ্রভু স্বয়ং সেই প্রেম হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবকুলকে শিখাইয়া গিয়াছেন।

তৎকালে বেদের জটিলতায় ভারতবর্ষ বিভ্রান্ত হইতে ছিল, শ্রীমদ্ভাগবতেও এই মায়াবাদ ও অধ্যাত্মচর্চ্চার আভাষ খণ্ডন করিয়া কি করিলেন ?

"ব্রজের নিগূঢ় রস বিলাইয়া ঘরে ঘরে
সুধাময় মোক্ষফল সমার্পিলা করে করে।"
"আমার গৌরাঙ্গের গুণে,
কলুষিত জীবগণে,
নাচিয়া গাইয়া হইল সোণা"

অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ, "সাধন কণ্টক পথে ফুল ছড়াইলা।" যথা—

যোমার্গোদূর শূন্যেবত ইহ বলবৎকণ্টকোযোতিদুর্গো
মিথ্যার্থভ্রামকো য সপদি রসময়ানন্দ নিঃস্যন্দকোষ।
সদ্যঃ প্রদ্যোতয়ংস্তং প্রকটিত মহিমস্নেহবানন্তুদগুহায়াঃ
কোহপ্যশ্চর্য্যস্তহস্তা সজয়তি নবদ্বীপদীপ্যৎ প্রদীপঃ॥ চন্দ্রামৃত।

অর্থাৎ—দূরশূন্য শুষ্ক জ্ঞান ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মাদির আগ্রহরূপ অতি কণ্টকাকীর্ণ মিথ্যা বিষয় ভ্রান্তিজনক যে মার্গ, তাহাকে যিনি রসময় আনন্দ নিস্যন্দীরূপে উদ্দীপ্ত করিবার নিমিত্ত, হৃদয় গুহার অন্ধকার নাশক স্নেহপূর্ণ উজ্জ্বল নবদ্বীপ স্বরূপ, সেই প্রভূত প্রভাবশালী গৌরহরি জয়যুক্ত হউন, মহাপ্রভু আপনি আচরিয়া শিক্ষা দিয়াছেন যে, জীবে জীবে অতি-গাঢ় সম্বন্ধ, আর পতিত জীবকে ভক্তিপথে আনয়ন করা জীবের প্রধান ধর্ম্ম। আরও তিনি কয়েকটী মূলতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন যথা—

(১) আমি আছি। (২) পরকাল আছে। (৩) আমার সহিত চিরমিলন জীবের পরম সৌভাগ্য। (৪) জীবের আমার সহিত মিলনের দুই উপায় আছে, ভক্তি ও প্রেম।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার অভাবে ধর্ম্মভাব ও শাস্ত্রানুমোদিত নৈতিক জ্ঞান এককালে শিথিল হইয়া আসিতেছে ;—

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃঃ) প্রাদুর্ভূত হইয়া ১৪৫৬ শকে (১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে) শ্রীশ্রীনীলাচলে অর্থাৎ জগন্নাথ ক্ষেত্রে তিরোহিত হনঃ—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরী।
অষ্ট-চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত ছাপ্পান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

ভক্তিভাবে চৈতন্য-লীলা বর্ণন করিয়া চৈতন্য ভক্তবৃন্দ যে, সুধাময় জ্ঞানরত্ন সকল রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি পরম উপাদেয়। প্রকৃত ধর্ম্মভাবে উদ্দীপিত হইয়া যাঁহারা সঞ্জিবনী সুধা সদৃশ চৈতন্য চরিত্র, ভক্তিভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন, জীবের প্রতি কৃপা করিয়া সেই মহাভবসিন্ধু পারে যাইবার কেমন সুন্দর পরিস্কার পথ মহাপ্রভু দেখাইয়া গিয়াছেন। চৈতন্য চরিতামৃত আস্বাদন করাই প্রেম ও ভক্তি পিপাসু জীবগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রোক্ত।

শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ।

প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী-সঙ্কলিত।

২৭। ('হরের্নাম'—শ্লোকের কৈল অর্থ-বিবরণ॥—)
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত-নিস্তার॥
দাঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥
'কেবল'-শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ।
জ্ঞানযোগ-তপ-কর্ম্ম-আদি নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
'নাহি নাহি নাহি' এই তিন প্রকার॥ ১৭ পং।৬১ পৃষ্ঠা।

২৮। তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভৎসন-তাড়নে কারে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয়॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাক ফল খাইব॥
সদা নাম লইব—যথালাভেতে সন্তোষ।
এই ত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ॥ ঐ

২৯। জ্ঞান-কর্ম্ম যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক প্রেম-ভক্তি রস॥ ঐ। ৬২ পৃষ্ঠা

৩০। হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥ ঐ ৬৪ পৃষ্ঠা

৩১। প্রভু কহে—গোদুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহো পিতা॥
পিতামাতা মারি খাও—এবা কোন্ ধর্ম্ম?।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম?॥
কাজী কহে—তোমার যৈছে বেদ-পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র—কেতাব-কোরান॥
সেই শাস্ত্রে কহে—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গভেদ।
নিবৃত্তিমার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ॥ ঐ। ৬৪পৃষ্ঠা
প্রবৃত্তিমার্গে গো-বধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ ভয়॥
তোমার বেদেতে আছে গো-বধের বাণী।
অতএব গো-বধ করে বড় বড় মুনি॥
প্রভু কহে—বেদে কহে গোবধ-নিষেধে।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গো-বধে॥
জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।
বেদপুরাণে ঐছে আছে—আজ্ঞাবাণী॥
অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন॥
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার।
তাতে তার বধ নহে, হয় উপকার॥

কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গো-বধ কেহো না করে এখনে।।
তোমরা জীয়াইতে নার, বোধ মাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার।।
গো-অঙ্গে যতেক রোম, তত সহস্র বৎসর।
গো-বধী রৌরব মধ্যে পচে নিরন্তর।। ঐ ৬৫ পৃষ্ঠা

৩২। তোমার মুখে কৃষ্ণনাম—এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল, হৈলা পরম পবিত্র।।
'হরি কৃষ্ণ নারায়ণ' লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি বড় পুণ্যবান্।। ঐ। ৬৬ পৃষ্ঠা

রক্ত আমাশয়ে কুড়চি।

লেখক, কবিরাজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধন্বন্তরি।

রক্ত আমাশা বড় সাংঘাতিক পীড়া। অজীর্ণ হইতে যে সকল পীড়া উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে আমাশা একটী। প্রথমে অজীর্ণ, পরে আমাশা তৎপরে রক্ত আমাশা দেখা দেয়। অজীর্ণের সূচনা হইতে যদি প্রতিকারের ব্যবস্থা করা না যায়, তবে আমাশা দেখা দেয়। সময় মত এই আমাশার চিকিৎসা না করিলে রক্ত আমাশা দেখা দেয়। প্রায় লোভী ব্যক্তিরাই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ভুক্ত বস্তু সম্যকরূপে পরিপাক হইলে আর কোন পীড়া জন্মিতে পারে না; ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই নানা প্রকার পীড়ার উৎপত্তি হয়। আমাশয় পীড়ার কয়েকটী কারণ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

১। গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ।
২। ঘৃত তৈলাদি অতিশয় স্নিগ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ।
৩। তৈলাদি বিহীন রুক্ষ দ্রব্য ভক্ষণ।
৪। হঠাৎ শৈত্য বা হঠাৎ শরীরে শীতল অবস্থায় উষ্ণতা প্রয়োগ।
৫। দুগ্ধ, মৎস্য, মাংসাদি একত্র ভক্ষণ অর্থাৎ বিরুদ্ধ ভোজন।
৬। আহারের তারতম্যে অর্থাৎ কোন দিন অল্প আহার, কোন দিন অধিক আহার, আবার কখন বা সকালে ও কখন বা বৈকালে আহার।
৭। বিষ ভক্ষণ করিলে।
৮। ভয় পাইলে।
৯। আত্মীয় স্বজন বা অর্থাদির ক্ষয় জন্য শোক পাইলে।
১০। দূষিত জল পান করিলে।
১১। অতিরিক্ত মদ্য পান করিলে।

১২। মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করিলে;

১৩। কৃমি দোষ থাকিলে।

১৪। ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়ে।

রক্ত আমাশায়ে বেশী দিন ভুগিলে রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে। আহারে রুচি থাকে না। স্বভাব অত্যন্ত খিটখিটে হয়।

যেরূপ রক্ত আমাশা হউক না কেন কুড়চির ছালের ঘন কাথ নিয়মিত ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই রক্ত আমাশা সারিয়া যায়।

কুড়চি-গাছ পাড়াগাঁয়ের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। ইহার বীজকে ইন্দ্রযব কহে। এই গাছের ছাল এক পোয়া আন্দাজ লইয়া পাঁচসের জল দ্বারা মৃদু জালে সিদ্ধ করিয়া পাঁচ ছটাক থাকিতে নামাইতে হইবে। এই ঘন কাথ প্রত্যহ প্রাতে এক ছটাক খাইলে শীঘ্রই পীড়ার উপশম হইতে থাকে। এই পীড়া যত দিন থাকিবে ততদিন আহারের বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাহা চিবাইয়া খাইতে হয়, তাহা দেওয়া কোন রূপে উচিত নহে।

ইউরোপীয় আহার বার্লি, এরারুট প্রভৃতি লঘু দ্রব্য—

দেশীয় আহার—

(ক) সিঙ্গাড় বা পানীফলের গুঁড়া সিদ্ধ,

(খ) কাঁচকলার গুঁড় (পাউডার) ইহা উত্তম খাদ্য,

(গ) গেঁড়ির (শম্বুক জাতীয়) ঝোল; সাবধান যেন মাংস দেওয়া না হয়।

(ঘ) গেঁদালির (গন্ধ ভেদালি) ঝোল;

কুড়চি ছাড়া আরও কয়েকটি ঔষধ আছে, নিম্নেলিখিত হইল—

১। আমাশয়ের প্রথম অবস্থায় কচি বেলের কাথ ও বেলপোড়া (চিনির সহিত) উৎকৃষ্ট ঔষধ;

২। দাড়িমের কুঁড়ি মধুর সহিত খাইলে;

৩। সময়ে সময়ে আফিং দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে যদি হঠাৎ বাহ্যে বন্ধ হয় তবে পা ফুলিতে পারে।

৪। আমন ধান কিম্বা ইহার চাউল কাট খোলায় ভাজিয়া ছাই করিয়া অল্প জলে ফেলিয়া তাহাতে অল্প চিনি কিম্বা মধু দিয়া খাইলে আমরক্ত ভাল হয়।

৫। বটের পাতা বাটিয়া বাসি জলের সহিত খাইলে রক্ত আমাশা ভাল হয়।

৬। ছোট চারা তেঁতুলের শিকড় ও ৬টী গোল মরিচ একত্র বাটিয়া প্রাতে খাইলে রক্ত আমাশা নিশ্চয়ই সারিয়া যাইবে। ইহা দ্বারা আমরা অনেক ফল পাইয়াছি।

ইহা মনে রাখা উচিত যে কুড়চির কাথের অপেক্ষা রক্ত আমাশার ভাল কোন ঔষধ নাই এমন কি, ইহার গুণ দেখিয়া ডাক্তারেরা পর্য্যন্ত ইহার ব্যবহার করিতেছেন।



"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৭শ বর্ষ। | ১৩১৬ সাল, ভাদ্র। | ৫ম সংখ্যা।

ভারতে হোমিওপ্যাথি।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হ্যানিম্যান সাহেব আমেরিকা খণ্ডে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, অল্পে অল্পে পৃথিবীর চারিখণ্ডে উহা প্রচলিত হইতে থাকে, হোমিওপ্যাথি ঔষধে ফল সন্তোষকর বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে জ্ঞানবান পণ্ডিতেরা এবং কঠিন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা ক্রমে ক্রমে তাহা উপলব্ধি করিতে থাকেন। কোন সময়ে ভারতবর্ষে ঐ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না, কিন্তু স্থানে স্থানে উহার প্রচলনে সুফল ফলিয়াছে—দিন দিন ফলিতেছে, গৌরব করিয়া তাহা বলিতে পারা যায়।

অনুমান ৭০ বৎসর পূর্ব্বে মিশনরী অথবা সিবিলিয়ান সাহেবেরা এতদ্দেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, ডাক্তার মুলেন্স নামে একজন সাহেব কলিকাতাস্থ ভবানীপুর লণ্ডনমিশনরী সোসাইটি বিদ্যালয়ে বাসা করিয়া নিকটাবর্ত্তী স্থান সমূহে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেন। জেলা ২৪পরগণা তদানীন্তন জজ মিঃ এডিগিলাটুর সাহেব তাঁহার চৌরাঙ্গির বাসায় দরিদ্র রোগীগণকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিতেন। ডায়মণ্ড হারবার অঞ্চলে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে তিনি দুইজন ডাক্তারকে উপযুক্ত ঔষধ সহ তথায় প্রেরণ করিয়া অল্প দিবসের মধ্যে সেই সংক্রামক রোগের উপশম করিয়াছিলেন, অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। ডাক্তার শ্রীশ্রীহরি ঘোষ কয়েক খানি হোমিও প্যাথিক পুস্তক সংকলন করিয়া প্রচার করিয়াছেন, তন্মধ্যে একখানি পুস্তকে হোমিওপ্যাথির অনেকটা ইতিহাস পাওয়া যায়। ফোর্টউইলিয়ম দুর্গের দুইজন ডাক্তার এই সহরে ও সহর গুলিতে ইয়োরোপীয় রোগীগণের চিকিৎসায় হোমিও প্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করিতেন, সেই ডাক্তারদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম কুপার, দ্বিতীয়ের নাম রসেল। ১৮৪৮—৪৯ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপ খণ্ডে সংক্রামক বিসূচিকা প্রবল হইলে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিয়া ডাক্তার রসেল বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রণীত অনেকগুলি হোমিওপ্যাথিক পুস্তক আছে—তন্মধ্যে The History and Heroes of medicine নামক হোমিওপ্যাথিক পুস্তক খানি বিখ্যাত।

মিঃ বাইপার নামক একটি সৈনিক সাহেবের কুলিবাজারে বাসা ছিল, পেন্সন গ্রহণ করিয়া সেই টাকা হইতে নিজ খরচ চালাইয়া উদ্বৃত্ত টাকায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ক্রয় করিয়া তিনি দরিদ্রগণকে বিনামূল্যে প্রদান করিতেন। কাপ্তেন "মে" আপন চাকরির পেন্সনের টাকায় রাইপারকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক কিনিয়া দিতেন, তাঁহারও কুলিবাজারে বাসা ছিল, তিনি অতি সদাশয় লোক ছিলেন। ডাক্তারটনিয়ার সেই সময় তাহার ফ্যামিলি ডাক্তার ছিলেন। ১৮৬৮-৬৯ অব্দে ডাক্তার টনিয়ার কলিকাতার হেল্‌থ আফিসার নিযুক্ত হইলে কাপ্তেন সাহেব আমাদের ডাক্তার শ্রীহরি ঘোষকে তৎপদে মনোনীত করেন। ডাক্তার শ্রীহরি ৪০ বৎসরের অধিককাল হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিয়া বিশেষ যশোলাভ করিয়া আসিতেছেন, তিনি প্রথমে বোম্বাইপ্রদেশে থাকিয়া হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেন, তিনি কলিকাতায় আসিলে বহুবাজারের বাবু রাজেন্দ্র দত্ত বিশেষ আগ্রহে তাঁহার নিকট হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করেন, শিক্ষা ও দয়াগুণে রাজেন্দ্র বাবুএ

চিকিৎসায় বহু লোকের বন্ধু হইয়াছিলেন, রাজেন্দ্র বাবুর সাহায্যে নগরে ও উপ-নগরে ডাক্তার টনিয়ারের পশার বিস্তার হইয়াছিল। রাজেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে গরাণ হাটাতে একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সহরের অনেক বড় লোক তজ্জন্য চাঁদা দিয়াছিলেন, ডাক্তার টনিয়ার সেই ঔষধালয়ের তত্ত্বাবধারক ছিলেন, তিনি হেল্‌থ অফিসার হইলে সেই উপকারী ঔষধালয়টি উঠিয়া যায়।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ডাক্তার বেরিণী সাহেব কলিকাতায় আইসেন। বাবু রাজেন্দ্র দত্ত তাঁহার সহায় হন। লালবাজারে বেরিণী সাহেবের হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী সংস্থাপিত হয়। ডাক্তার বেরিণী সহরে ও প্রদেশে অনেকগুলি উৎকট রোগ অচিরে আরাম করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন, হোমিওপ্যাথি হাইড্রোপ্যাথি ও অন্য প্রকার চিকিৎসায় তিনি সুপণ্ডিত, খিদির পুরের গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন নিবাসী বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় পৃষ্ঠশূল ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতে ছিলেন, সহরের প্রায় সমস্ত ড.ক্ত.র কবিরাজ হারি মানিয়া যান, নীলমণি বাবুর স্ত্রী পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়াও স্বামীকে আরাম করাইতে পারেন নাই, অবশেষে ডাক্তার বেরিণীকে আহ্বান করা হয়। তিনি দুই তিন দিন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন, বিশেষ ফল কিছুই হইল না, পরিশেষে অনেক বিবেচনা করিয়া মন্ত্রপুত জলপাই তৈল মালিশ করিবার ব্যবস্থা করেন, ডাক্তার শ্রীহরি ঘোষ সেই চিকিৎসার সময় রোগীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন, জলপাই তৈলের গুণে আশ্চর্য্য প্রকারে ব্যাধির উপ-শম হইয়া আইসে, একদিন প্রাতঃকালে ডাক্তার বেরিণী ও শ্রীহরিবাবু ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বাবু রাজেন্দ্র দত্তের বৈটকখানায় উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার সেই সময় সেইখানে দর্শন দেন, তিনিও উক্ত নীলমণি বাবুর রোগের চিকিৎসায় হতাশ হইয়াছিলেন, বেরিণী সাহেব চিকিৎসা করিতেছেন, ইহাও শুনিয়াছিলেন, শ্রীহরি বাবুকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো তেল পড়াতে নীলমণি বাবুর কিরূপ উপকার হইল?" শ্রীহরি বাবু উত্তর করিলেন, "বিশেষ আশ্চর্য্য উপকার।" হোমিওপ্যাথির উপরে তখন ডাক্তার মহেন্দ্র লালের বিশ্বাস ছিল না, তিনি উপহাস করিয়া বলিলেন, "কখনই সম্ভব নয়; পূর্ব্বের অন্যান্য ঔষধের ক্রিয়া এখন উপকার দেখাইতেছে। তর্কবিতর্কের পর ডাক্তার বেরিণীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কয়েকদিনের ঘনিষ্ঠতায় হোমিওপ্যাথির আশ্চর্য্য

গুণ বুঝিতে পারিয়া তিনি বেরিণীসাহেবের ছাত্র হন। ক্রমশঃ বন্ধুত্ব জন্মে। ডাক্তার সরকার তদবধি এলোপ্যাথি ছাড়িয়া হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন, সময়ে সেই চিকিৎসায় তিনি বিলক্ষণ সুখ্যাতি ভাজন হইয়াছিলেন। পাঠক মহাশয়েরা তাহা অবগত আছেন, হোমিওপ্যাথির আশ্চর্য্য শক্তি ও ডাক্তার সরকারের সর্ব্বত্র উচ্চ সুখ্যাতি শ্রবণে এলোপ্যাথিক ডাক্তার মহাশয়গণের সহিত তাঁহার মহাবিরোধ উপস্থিত হয়। বিস্তর বাক্‌যুদ্ধ ও লিপি যুদ্ধ চলিয়া ছিল, এখানে ও বিলাতে সরকার মহ শয়ের নিন্দা রটিয়া ছিল, ডাক্তার বেরিণী সাহেবের প্রসাদে সেই মহাযুদ্ধে ডাক্তার সরকার বিজয়ী হইয়াছিলেন।

এখন আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথির প্রসার কিরূপ? শ্লাঘা করিয়া বলা যাইতে পারে, তাহার বিজয় পতাকা উড়িয়াছে। যে সকল এলোপ্যাথিক ডাক্তার কিছুদিন পূর্ব্বে হোমিওপ্যাথির নামে বিদ্রূপ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন হোমিওপ্যাথির প্রশংসাকারী বন্ধু হইয়াছেন; অনেকেই স্থল বিশেষে রোগ বিশেষে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থা করিতেছেন, কেহ কেহ এককালে এলোপ্যাথি পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন হোমিওপ্যাথির সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের মুখে হোমিওপ্যাথির মহিমা কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বাস্তবিক আমরা আনন্দিত হইতেছি। সহরে ও মফঃস্বলে অনেকগুলি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হইয়াছেন, অনেক স্থলে হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী ও হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতাল সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৃহস্থগণেরও বিশেষ উপকার হইয়াছে—এ চিকিৎসায় ব্যয়াধিক্য নাই, অথচ উপকার অধিক, ইহা অনেকেই বুঝিয়াছেন, এখন এই প্রণালীর প্রতি সদাশয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কৃপা দৃষ্টি হইলেই হোমিওপ্যাথির জয় জয়কার হয়। সম্প্রতি নগরী মধ্যে একটি হোমিওপ্যাথি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি।

ডাক্তার শ্রীহরি ঘোষের লিখিত ইতিহাস পাঠে আমরা অনেক তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছি, তাঁহাকে ধন্যবাদ, তিনি দীর্ঘ জীবী হইয়া দেশের উপকার করুন, ঈশ্বরের নিকট ইহাই প্রার্থনা। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়া যে সকল এতদ্দেশীয় সুচিকিৎসক স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, এই অবসরে আমরা তাঁহাদের কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিব।

ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র বারাণসীধামে থাকিয়া হোমিপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেন, কাশ্মীরনরেশ বাহাদুর ৺কাশীধামে একটি হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া লোকনাথ বাবুকে সেই হাঁসপাতালের কর্ত্তা করিয়াছিলেন। অনেক বড় বড় লোকের বাড়ীতে চিকিৎসা করিয়া ডাক্তার লোকনাথ বিশেষ প্রতিপত্তি

লাভ করিয়াছিলেন, একবার বেনারস কলেজের একজন অধ্যাপক পীড়াগ্রস্ত হন, লোকনাথ বাবু তাঁহার চিকিৎসা করেন, অধ্যাপক আরোগ্য লাভ করিয়া কলেজে উপস্থিত হইয়া নিদর্শন স্বরূপ লোকনাথ বাবুর প্রদত্ত একখানি সার্টিফিকেট দাখিল করেন, কলেজের প্রিন্সিপল মহাশয় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের সার্টিফিকেট অগ্রাহ্য করিয়া অধ্যাপক মহাশয়কে কর্ম্মচ্যুত করিবার ভয় দেখান। এক মাসের বেতন বাজেয়াপ্ত করেন, অধ্যাপক মহাশয় কাশীর মুন্সেফী আদালতে কলেজের প্রিন্সিপলের নামে ৩০০৲ টাকার দাবিতে নালিশ করিয়াছিলেন, মুন্সেফ মহাশয় সে মোকদ্দমা ডিস্‌মিশ্‌ করেন। পরপর দুইটি উচ্চ আদালতে আপিল হইলেও মুন্সেফের রায় বাহাল হয়। অতঃপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপিল হইল। সেখানে দুইজন বিচার পতির মতভেদ হওয়াতে মোকদ্দমাতে হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে অর্পিত হইয়াছিল। পাঁচ জন জজ বিচার করিয়াছিলেন, তখনকার বিজ্ঞতম চিপ্‌ জষ্টিস্ সার্‌ বার্ণেশ পিকক্‌ সাহেব রায় দিলেন, আপিল ডিক্রি। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা প্রিন্সিপলের উচিত ছিল, ডিক্রী হইল। ফরিয়াদী অধ্যাপক মহাশয় সম্পূর্ণ দাবির টাকা ও সমস্ত আদালতের খরচা প্রাপ্ত হইলেন, ডাক্তার লোকনাথ পরলোক গত হইয়াছেন! তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত ডাক্তার দ্বিজেন্দ্র নাথ মৈত্র আমাদের মেয়ো হাঁসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জ্জন আর কয়েক জন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের নাম নিমে দেওয়া গেল, তাঁহারাও ইহ-জগতে নাই।

ডাক্তার ৺কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী এল, এম, এস, কৃষ্ণনগর নদীয়া।
ডাক্তার গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত এম, বি, হুগলী।
ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র লাহিড়ী কলিকাতা
ডাক্তার শ্যামা চরণ লাহিড়ী এল, এম, এস, বরাহ নগর।
ডাক্তার বসন্ত কুমার দত্ত কোন্নগর,
ডাক্তার ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, ডি, কলিকাতা।
ডাক্তার বিহারী লাল ভাদুড়ী এল, এম, এস্, কলিকাতা।
ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার M. D. কলিকাতা।
ডাক্তার মহেশ চন্দ্র ঘোষ এম, বি, বারুইপুর ২৪ পরগণা

এক্ষণে যাঁহারা জীবিত থাকিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন,

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার M. D.
" " চন্দ্র শেখর কালি L. M. S.

" " ডি এন রায় M. D.
" " অক্ষয় চন্দ্র দত্ত L. M. S.
" " জে, এন, মজুমদার M. D.
" " অমৃত লাল সরকার L. M. S.
" " জে, এন, ঘোষ M. D.
" " নৃপেন্দ্রনাথ শেঠ L. M. S.
" " জি, এল, গুপ্ত M. D.
" " আর, সি, নাগ M. D,
" " এ, এন, মুখার্জ্জি M. D.

প্রভৃতি কয়েকটি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া দেশস্থ লোকের উপকার করুন আমরা এইরূপ প্রার্থনা করি।

সুদ শুদ্ধ আদায়।

লেখক, শ্রীঅমূল্যচরণ দত্ত।

দেবনারায়ণ বাবু একজন ডেপুটী। তাঁহার অধীনস্থ লোকদিগের ও দেশের লোক দিগের উপর তাঁহার অত্যন্ত ক্ষমতা। তাঁহার বয়স অনুমান ত্রয়স্ত্রিংশ। তিনি প্রায় ৭।৮বৎসর ডেপুটীগিরী করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বেশবুদ্ধিমান ও সুচতুর লোক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তিনি অত্যন্ত অর্থপিশাচ। সামান্য অর্থের লোভে তিনি যে কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন কত লোককে যে পথের ভিকারী করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই, এক্ষণে তাঁহাকে একটী গুপ্ত দস্যুদলের সর্দ্দার বলিলেও বলা যাইতে পারে। তাঁহার অধিকার ভুক্ত প্রদেশে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। এক্ষণে তিনি সামান্য একটী ডেপুটী হইলেও অতুলঐশ্বর্য্যের অধিপতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার কোনও সন্তানসন্ততি হয় নাই। যে সময়কার কথা বলা যাইতেছে, যে সময় দেবনারায়ণ বাবু প্রদেশে ডেপুটীগিরি করিতেছিলেন, তথায় প্রতি বৎসর একটী করিয়া মেলা হয়, সেই মেলাতে নানা দেশ বিদেশ হইতে লোকজনের সমাগম হয় ও নানাদেশ দেশান্তর হইতে লোকজন অন্য দ্রব্যাদি লইয়া আসে ও দোকান পাঠ বসে। এ বৎসরেও সেইরূপ বসিল। এক জন প্রবীণ হীরক ব্যবসায়ী প্রায় ৪।৫ লক্ষ মুদ্রার মূল্যের চুনিপান্না ইত্যাদি নানা

প্রকার রত্নাদি লইয়া সেই বৃহৎ মেলাতে উপস্থিত হইয়া দোকান খুলিলেন। সেই প্রদেশের প্রথানুযায়ী যখন তিনি যে প্রদেশে ডেপুটী থাকেন, তখন তিনিই সেই মেলার প্রধান তত্ত্বাবধারণকারী-রূপে নিরূপিত হন। সুতরাং এবারে দেববাবু প্রধান তত্ত্বাবধারণকারী হইলেন, কিন্তু দেববাবু ভাবিতেছেন যে কিসে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ হয়, এমন সময় তাঁহার সেই দস্যুদলস্থ একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, মহাশয় ভজনলাল নামে একজন জহুরী প্রায় ৪।৫ লক্ষ টাকার জহরতাদী লইয়া আসিয়াছে। এই সংবাদ পাইবামাত্র দেববাবু হুকুম দিলেন যে প্রকারে হউক, তাহার সেই সকল রত্ন ছলে বলে কিম্বা কৌশলে হস্তগত করিতে হইবে। তিন চারি দিবস পরে, দেববাবুর নিকট সংবাদ আসিল যে, অদ্য ভজনলাল হীরক জহরতাদি বিক্রয় করিয়া নগদ দেড় লক্ষ ও সাড়ে তিন লক্ষ টাকার বহুমূল্য রত্নাদি লইয়া রওনা হইবে। অন্যান্যবার দেববাবু বাটীতে থাকিতেন, তাঁহার দস্যুদল ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করিত, তিনি স্বয়ং তাহা ভাগ করিয়া দিতেন, কিন্তু এবার তিনি ভাবিলেন, তাই ত এত টাকার মাল কি করিয়া সামান্য লোকদের হাতে ছাড়িয়া দি, তাহারা যদ্যপি আমাকে ফাঁকি দেয়, এই প্রকার চিন্তা করিয়া নিজেই সঙ্গে যাইতে মনস্থ করিলেন।' দুর্ভাগ্য বশতঃ ভজন লালের তথা হইতে রওনা হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইল ষ্টেশনে। এ যাইতে হইলে একটী জঙ্গল পার হইতে হয়। ডেপুটী বাবু স্বীয় দলবল সহ সেই জঙ্গল মধ্যে গুপ্ত ভাব অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভজন লালের আসন্ন কাল উপস্থিত। ভজনলাল সেই জঙ্গলে র অর্দ্ধাংশ অতিক্রম করিতে না করিতে কয়েকজন লোক আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। ভজনলাল বিস্তর কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল বলিতে লাগিল, আমার যাহা কিছু টাকাকড়ি আছে আমি সমুদায় তোমাদের দিতেছি আমাকে প্রাণে মারিও না আমি তোমাদের কাহারও পরিচিত নহি যে আমা হইতে তোমাদের বিপদ হইবার সম্ভাবনা অতএব আমাকে ছাড়িয়া দাও। এই সংবাদ দেববাবুর নিকট পৌছিল দেববাবু বলিলেন, "শত্রুর শেষ রাখিতে নাই বেটাকে মারিয়া ফেল, হুকুম যাহা কার্য্যেও তাহাই হইল, ভজনলাল ইহ সংসার হইতে প্রস্থান করিল।

এবার দেববাবু লইলেন বার আনা এবং বাকি চারি আনা তাঁহার অন্যান্য সহকারী দস্যুদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে দেব বাবুর স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হইল। এপর্য্যন্ত দেববাবুর কোনও সন্তান সন্ততি না হওয়ার জন্য দেব বাবুর পত্নী নানা

দেব দেবীর নিকট পূজা মানিতেন। ও পতিপত্নী সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, এইরূপে দশমাস অতীত হইলে দেববাবুর পত্নী একটী পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। দেববাবু অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও সন্তান সন্ততি না থাকা বশতঃ অত্যন্ত দুঃখে কালযাপন করিতেছিলেন, এক্ষণে একটী পুত্ররত্ন লাভে মহা সমারোহে ষষ্ঠী পূজা সমাপন করাইলেন। ক্রমে ক্রমে যেন শশিকলার ন্যায় সেই পুত্র দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ছয়মাসে তাহার অন্নপ্রাসন হইল। কত দরিদ্র অন্ন বস্ত্র লাভ করিল কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভেট পাইল। ক্রমে ক্রমে যখন শিশু পাঁচ বৎসরের হইল, তখন দেববাবু শুভদিন দেখিয়া তাহার হাতে খড়ি দিলেন নানাদেশ দেশান্তর হইতে পণ্ডিত আনাইয়া পুত্রকে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত শিক্ষকদের গুণে পুত্র সর্ব্বগুণে গুণান্বিত হইয়া উঠিল। এইরূপে যখন তাহার বয়স পঞ্চদশ বৎসর তখন দেববাবু তাহার বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিলেন, নানাস্থান হইতে নানা প্রকার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। পরিশেষে একটী সৎপাত্রী দেখিয়া দেববাবু পুত্রের বিবাহ দিলেন। শুভলগ্নে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, হঠাৎ একদিন বৈকালে দেববাবুর পুত্রের জ্বর হইল। প্রথমে জ্বর অল্প হওয়াতে সকলে মনে করিল যে, অল্পে অল্পে তাহা সারিয়া যাইবে কিন্তু যতই রাত্রি বাড়িতে লাগিল জ্বরের প্রকোপও ততই বাড়িতে লাগিল। দেববাবু একমাত্র পুত্রের এইরূপ কঠিন পীড়াতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রাতে গ্রামে যত ভাল ভাল বৈদ্য ছিল সকলকে ডাকাইলেন, সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন জ্বরের প্রকোপ সমানই রহিল কিছুই কমিল না। দেববাবুও তাঁহার পত্নী পুত্রবধু ও আত্মীয় কুটুম্ব যে যেখানে ছিল, সকলেই রোগীর বিছানার নিকট বসিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। বাটীতে হা-হাকার পড়িয়া গেল দেববাবুর সবেমাত্র একটী ছেলে তাহারও এরূপ অবস্থা হওয়ায় তিনি মাটিতে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ৫ টার সময় বোধ হইল যেন রোগীর পুনরায় জ্ঞান সঞ্চার হইতেছে। তাহাতে সকলেরই মন কিছু আশ্বস্ত হইল। কিয়ৎকাল পরে পুত্র মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মা! বাবাকে একবার আমার কাছে পাঠাইয়া দাও তোমরা কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে যাও, তাঁহাকে আমার কিছু বলিবার আছে। দেববাবু সেই মুহূর্ত্তেই দুই হস্তে দুই চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে আসিয়া পুত্রের বিছানার নিকট

বসিয়া বলিলেন 'বাবা! আমাকে ডাকিতে ছিলে কেন?' পুত্র জিজ্ঞাসা করিল তুমি কাঁদিতেছ কেন? দেববাবু বলিলেন, কি বল বাবা, তুমি আমার একমাত্র পুত্র, সাধেরধন নীলমণি, তোমার এই শক্ত পীড়া, আমি কাঁদিব না? পুত্র বলিল, কে তোমার পুত্র আমি তোমার পুত্র নই আমি তোমারশত্রু। এই কথা শুনিয়া দেববাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন বলিতে লাগিলেন সে কি বাবা? এত করিয়া আদর যত্ন করিয়া লালন পালন করিলাম, এখন তুমি বলিতেছবে— তুমি আমার পুত্র নও আমার শত্রু! কেন তুমি শত্রু, তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও।

পুত্র বলিতে লাগিল ষোল বৎসর পূর্ব্বে এক অযোধ্যা মধ্যে ভজন লাল নামক একজন জহরীকে খুন করিয়াছিলে, তাহা কি মনে পড়ে? এই কথা শুনিয়া দেববাবুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, তিনি চিত্রার্পিত পুত্তলির ন্যায় নিশ্চিষ্ট হইয়া রহিলেন কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন—হাঁ মনে পড়ে বটে, কিন্তু আমি সে কথা কাহাকেও বলি নাই, এমন কি তোমার গর্ভধারিণী সে কথা জানে না; তবে তুমি কি প্রকারে জানিলে? পুত্র বলিল—আমি আর কি প্রকারে জানিব, আমিই সেই ভজন লাল। তুমি আমার যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিলে, তাই তোমার বাটীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুদ শুদ্ধ আদায় করিতে আসিয়াছি। আমার যে পাঁচ লক্ষ মুদ্রা তুমি লইয়া ছিলে তাহা এই ষোল বৎসরে আমি আদায় করিয়া লইলাম এবং তুমি যে আমার পাঁচ লক্ষ টাকা এই ষোল বৎসর ধরিয়া ভোগ করিতেছ, সেই পাঁচ লক্ষ টাকার ষোল বৎসরে যে সুদ হয়, তাহা আদায় করিবার জন্য বিধবা পত্নী তোমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া চলিলাম এই বলিয়া সেই বালক জন্মের মতন নয়ন মুদ্রিত করিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়, দেখিয়া দেববাবুর পত্নী দরজা ঠেলিয়া দেখেন, যে দেববাবু বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন পুত্রটি বিছানার উপর রহিয়াছে জননী আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তদবধি দেববাবু সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলেন যে, ইহ-সংসারে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের প্রধান কার্য্য পিতামাতার ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করা কিম্বা পিতামাতার কাছে পূর্ব্বঋণ আদায় করা। সেই কার্য্য শেষ হইলেই তাহারা ইহ-সংসার ত্যাগ করে। এক জন্মে শেষ না হইলে পরজন্মে পুনরায় আইসে; অতএব এই ঘোর কলিযুগে পুত্র কন্যার অকাল মৃত্যুতে—শোক করা উচিত নহে।

স্বর্গীয় নবীন চন্দ্র সেন।

বঙ্গের কাব্য কুঞ্জের একটি মধুরকণ্ঠ কোকিল জন্মের মত নীরব হইয়াছে। কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্রসেন ইহ-সংসার ত্যাগ করিয়া, শত শত আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে কাঁদাইয়া যোগ্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে তিনি সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। উপরেই আমরা বলিলাম, "বঙ্গের কাব্য-কুঞ্জের মধুর-কণ্ঠ কোকিল।" কাব্য রসের আস্বাদনে যাঁহারা প্রমোদিত হন, আমাদের এই অভিনন্দনকে তাঁহারা অবশ্যই অনুমোদন করিবেন।

বাবু নবীন চন্দ্র সেন গণনায় দ্বাদশ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে একাদশ খানি কাব্য, এবং কেবল একখানি মাত্র গদ্যে বিরচিত ; কাব্যগুলি অতি সুললিত, সুগভীর ভাবপূর্ণ, কবিত্বের উজ্জ্বল দীপ্তির পরিচায়ক। সাময়িক পত্রিকাবলীতে তাঁহার সমস্ত পুস্তকই যথাযথ সময়ে আলোচিত হইয়াছে, অতএব তাঁহার সকল গুলির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কেবল পলাসীর যুদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের দু-একটি বিশেষ কথা বলিবার আছে। পলাসীর যুদ্ধ কাব্যে নবীন চন্দ্রের প্রতিভার পূর্ণ পরিচয়। মুর্শীদাবাদ রণক্ষেত্রে ভেরী বাদিত হইবার অগ্রে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তেজস্বিনী রাণীভবানীর যুক্তি গর্ভ কথোপকথন কবিবরের লেখনী হইতে যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমাদের কাব্য সংসারে অতুল্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দ্বিতীয়তঃ অন্তরীক্ষ পথে আবির্ভূতা ভারতের রাজলক্ষ্মীর সকরুণ দৃশ্য, কবিবর যেরূপে পরিপাটি রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, অহরহঃ তাহা আমাদের স্মৃতি পথে সমুদিত হইয়া নয়নে অশ্রু আনয়ন করে। অপরাপর বঙ্গীয় কবিগণের বিরচিত কবিতার সহিত নবীনচন্দ্রের কবিতার তুলনা না করিয়া আমরা কেবল এই মাত্র বলি, নবীনচন্দ্রের কবিতাই নবীন চন্দ্রের কবিতার উপমা। কবিবর রামনিধি গুপ্তের (নিধু বাবুর) মধুময় বাক্যানুসারে আজ আমরা বলিতে পারি, "গঙ্গাপূজা গঙ্গা জলে।"

১২৫৩ বঙ্গাব্দের ২৯শে মাঘ বুধবার চট্টগ্রাম নগরে কর্ণফুলী নদী তীরস্থ নয়াপাড়া গ্রামে কবিবর নবীন চন্দ্রের জন্ম। তাঁহার পিতার নাম গোপীমোহন সেন। বাবু গোপী মোহন প্রথমে আদালতের সরেস্তাদার ছিলেন, তাহার পর মুন্সেফ হন, অবশেষে ওকালতী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। নবীন

হন নাই। নবীনচন্দ্র প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় যথাসম্ভব শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় আনীত হন, এখানে ইংরাজী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রেসেডিন্সী কলেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষা দেন, অনন্তর জেনেরাল এসেম্বিলিজ কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করেন, প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হন, বঙ্গবিহার উড়িষ্যার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কার্য্য করিয়া তিনি বিলক্ষণ যশস্বী হইয়াছিলেন। বি, এ, পাশ করিবার তিনমাস পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়, পুত্রের সৌভাগ্য তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

অপ্রাপ্তবয়স্ক নবীন চন্দ্রের একটি কার্য্যের উল্লেখ করা আবশ্যক। যখন তিনি এফ্ এ ক্লাসে পড়েন, সেই সময় চট্টগ্রামের একটা খুনি মামলা তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টে বিচারার্থ আইসে, সেশনের বিচার পতি ছিলেন, জষ্টিস নর ম্যান। কৌসুলী ছিলেন মিষ্টার উডরফ। চট্টগ্রামের সাক্ষীরা যে ভাষায় জবানবন্দী দিয়াছিল, বিচারক অথবা ব্যারিষ্টার এবং তাহার ইন্টারপিটার বাবু শ্যামাচরণ সরকারও তাহাতে হারিমানিয়া ছিলেন, জষ্টিস্ নরম্যান তখন জিজ্ঞাসা করেন, চট্টগ্রাম বাসী ইংরাজী ভাষাবিৎ কোন ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত আছেন কি না? একজন বলিয়াছিল, গুটিকতক কলেজের ছাত্র উপস্থিত আছেন।' সেই উত্তর প্রাপ্ত হইয়া বিচক্ষণ বিচারপতিমহাশয় সেই ছাত্রগণকে আহ্বান করেন, তাহাতে পুরো-বর্ত্তি হন নবীন চন্দ্র সেন। বিচারপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নিবাস চট্টগ্রামে, তুমি তোমার মাতৃ ভাষা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বুঝাইতে পারিবে? নবীনচন্দ্র বলিলেন, বোধ হয় পারিব।' বাবু শ্যামাচরণ সরকার নবীনকে পার্শ্বে বসাইয়া অভয় দিলেন, বালক নির্ভয়ে চাটগেঁয়ে সাক্ষীগণের বিকৃত বাঙ্গালা ভাষা মস্ত মস্ত ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিয়াছিল। জষ্টিস্ নরমান ও ব্যারিষ্টার উডরফ তৎশ্রবণে সেই এফ, এ, শ্রেণী বালকের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এইস্থলে যৎকিঞ্চিৎ সামাজিক বিবরণ। একজন সন্ন্যাসীর নিকটে নবীন চন্দ্রের দীক্ষা হইয়াছিল, সন্ন্যাসী দত্ত মন্ত্রের প্রকরণে তিনি ধর্ম্ম উপাসনা করিতেন, একখানি সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হয়, বিজাতি স্পৃষ্ট একখানি পাউরুটি ভক্ষণের লোভে নবীনচন্দ্র কিছুদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন আশা পরিতৃপ্ত হইলে পুনরায় তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু হন। হিন্দু ধর্ম্মের সেবাতেই তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হইয়াছে।

পেন্সন গ্রহণ করিয়া সরকারি কার্য্য হইতে অবসর লইয়া তিনি স্বগ্রাম বাসী হইয়াছিলেন। মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া একদিন তিনি নির্জ্জনে একখানি কাগজে

ভগবানের স্তব ভগবতীর স্তব ও গায়ত্রীর অর্থ-লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার সমাদরে নিত্যপাঠ্য চণ্ডীকাব্য ও ভগবদ্‌গীতার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন, অতঃপর পরিজনগণ সেই গৃহে প্রবেশ করিলে তিনি তাঁহার একটি পিতৃব্যপুত্রকে বলেন, যে সময় আমার অন্তকাল উপস্থিত হইবে, সেই সময় ঐ মন্ত্র গুলি আমার কর্ণে শ্রবণ করাইও। আরও বলিয়াছিলেন, আমার জীবনান্তে আমার অঙ্গে বিভূতি চন্দন লেপন করিয়া গৈরিকবাস পরাইয়া শিব বাড়ীর পূর্ব্বদিকের বাগানে আমার পিতামাতার শ্মশানের নিকটে ঘৃত চন্দন কাষ্ঠে এই দেহ ভস্মসাৎ করিও। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সহসা একজন মহাপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হন, তিনিই নবীন চন্দ্রের মন্ত্রদাতা গুরু, নাম স্বামী বীর গিরি। গুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া নবীনচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নিমীলিতনেত্রে যোগমগ্ন ছিলেন, তাহার পর গৃহস্থিত রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে চিরদিনের মত নয়ন মুদ্রিত করিলেন, সংসারের সমস্ত খেলা ফুরাইল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ইহ-সংসারে আর নাই? বাতাসে যেন কাহার কথার প্রতিধ্বনি হইতেছে, নবীনচন্দ্র মরেন নাই, অমর কবি অমরধামে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

—:•:—

মা-দুর্গা।

এসো মা আনন্দময়ি, হরমনোরমা—
হৈমবতি! পাদপদ্ম করিব অর্চ্চনা।
অন্ধকার বঙ্গভূমি, নানা উপদ্রবে—
উৎপীড়িত বঙ্গবাসী, সন্তান তোমার।
অন্নবিনা হাহাকার প্রতি ঘরে ঘরে—
গৃহস্থের। অবসন্ন সবার শরীর।
দয়া করি দয়াময়ি দরিদ্রের প্রতি,
উর মা আঁধার বঙ্গে, উজলিয়া দিশি,
আলোকিত হো'ক সব আনন্দ আলোকে;
দূরে যাক নিরানন্দ, সদানন্দ প্রিয়ে!

আলো হোক অন্ধকার রাজার প্রাসাদ,
আলো হোক তমোময় দরিদ্র কুটীর,
আলো হোক ভকতের মানস মন্দির,
তিরোহিত হয়ে যাক সর্ব্ব মলিনতা।
সম্বৎসর অবসানে তিন দিন তরে—
আবির্ভাব হয় তব ভকত আবাসে,
আনন্দে মগন হয়, বঙ্গবাসিগণ;
নৃত্য করে শিশু দল নববাস পরি,
তোমার প্রতিমাহেরে করতালি দিয়া;
সবার বদনে খেলে হাস্তের লহরী,
হরষে নিরখি দূরে পালায় বিষাদ।
এ আনন্দ সবাকার তব আগমনে,
এই বঙ্গ তিন দিন আনন্দ বাজার।
ভুলে যায় শোক তাপ, কঠোর যন্ত্রণা,
ভুলে যায় শত্রুভাব কলহ বিবাদ,
তব আবির্ভাবে সবে ভাসে সুখনীরে,
ভক্তিভরে পূজা করে অভয় চরণ।
আমারা নিরক্ষ বাঙ্গা বাঙ্গা-বিধারিনি,
প্রেমানন্দে পূজা করি রাঙ্গা পা দু-খানি।
কি দিয়ে করিব পূজা, কি পাব কোথায়,
তাই ভাবি জগদম্বে, আমি দীনহীন;
মানস কুসুমে মাখি ভকতি চন্দন—
সমর্পিব শ্রীচরণে কুসুম অঞ্জলি;
যূপে বাঁধি রিপু দলে দিব বলিদান,
সত্যবলি শুভঙ্করি, এ মম বাসনা।
বাসনা সফল কর হর-বরাঙ্গনে!
প্রতিমাতে আবির্ভূতা রাজ-রাজেশ্বরি,
সিংহ পৃষ্ঠে আরোপিয়া দক্ষিণ চরণ,
নাশিতে মহিষাসুরে ভয়ঙ্কর বেশে;

দশ হস্তে দশবিধ প্রহরণ ধরি,
অসুরে দেখাও ভয়, ভবভয় হরা ;
অভয় প্রদান কর ভকত হৃদয়ে,
অভয়-দায়িনী তুমি, অভয়া-অম্বিকা।
যে মুখে অসুরে দেখে ভীষণ মুরতি,
আমি হেরি সেই মুখে শান্তি-সুধাময়ী।
ত্রি-নয়নে ত্রি-নয়নি, কর দরশন,
কি কষ্টে কাটিছে কাল তব পুত্রগণ।
নাশো পাপ, মনস্তাপ, ত্রিতাপহারিণি,
তুমি বিনা ত্রি-জগতে কেতারে সঙ্কটে?
দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা, এ নাম তোমার—
জগতের দুরিতের দুর্গতি নাশিতে।
ত্রি-দিবস, ত্রি-যামিনী, ত্রিলোক ঈশ্বরি,
তোমার প্রসন্ন মুখ করি বিলোকন,
পাসরে সকল ক্লেশ দুঃখের সংসারে,
দুঃখভোগী দীনজনে প্রসাদে তোমার।
এসেছ মা কৃপাকরি বৎসর বিগতে,
রহিবে না নবমীর নিশি পোহাইলে।
যাইবে কৈলাসে চলি কৈলাস ঈশ্বরি,
এ আঁধার বঙ্গভূমি হইবে আঁধার!
গিরিপুরে মেনকারে কাঁদায়ে যেমন,
লয়ে যান ত্রি-পুরারি ত্রিযামিনীগতে,
তেমতি বঙ্গের বালা বিচ্ছেদে কাঁদিবে,
বিজয়া উৎসবে হবে নিরুৎসব-ধ্বনি!
শুভঙ্করি! যাহা কর, তাহাতেই শুভ,
মনে মনে আছে মম নিশ্চিত ধারণা।
বিজয়া উৎসবে আমি বাজনা বাজাই,
মনে জানি মা তোমার বিসর্জ্জন নাই।
বিশ্বব্যাপি নিত্যরূপ, নিত্য অধিষ্ঠান,

বিসর্জ্জন কোথা তাঁর, অজ্ঞানের কথা!
যেয়ো মা কৈলাসাচলে শুভ দশমীতে,
নিবেদন—বৎসরান্তে এসমা আবার।

কাশ্মীর যাত্রা।

লেখক, কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী।

বৃহস্পতির বারবেলাটা কাটাইয়া, (১৩১৫) ২৯শে মাঘ দশটার গাড়ীতে কাশ্মীর যাত্রা করি। পাঠক এ যাত্রাটাকে ভ্রমণ মনে করিবেন না। নানারূপ যান সাহায্যে গমনাগমন এবং যৎকিঞ্চিৎ দর্শনই—আধুনিক যাত্রার বাচ্য অর্থ। বিশেষতঃ আমার যাত্রা আর একটু স্বতন্ত্র রকমের। আমি এক মহাজনের চিকিৎসক রূপে গমন করি। আমার হস্তপর আরও বদ্ধ। সুতরাং এ যাত্রার ফল যে পাঠকের তৃপ্তি-প্রদ হইবে এমন বুঝি না।

হাওড়া ষ্টেশনে আসিলাম। সঙ্গে একটী ছাত্র এবং পঞ্জাবাধিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ পরিচারক। ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিচারকের কার্য্য কিরূপে চলিবে ভাবিতে ছিলাম। গয়াতে পৌছিয়া দেখিলাম বহু ব্রাহ্মণই এরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। সে কথা যাউক। হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম, আমার যাহার সহিত যাইবার কথা তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তবে তিনি একজন পরিচারক রাখিয়া গিয়াছেন। সেই লোকই টিকিট করিয়া জিনিষপত্রের সহিত আমাকে লইয়া গাড়ীতে বসাইল। গাড়ীতে দেখিলাম নীচের একটী আসন মাত্র খালী। অন্য সমুদায় গুলিই শয়নার্থ বিভিন্ন লোক কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছে। এই সমুদায় অন্য পূর্ব্ব আসনে কতিপয় পশ্চিম দেশীয় ও একজন ইংরেজের নাম অঙ্কিত ছিল। যাই হউক বসিলাম। রাত্ত-টাও বসিয়া কাটাইতে হইবে কি না তাই ভাবিতে ছিলাম। শয্যা বিছাইয়া গড়-গড়াতে তামাক সাজিয়া অর্দ্ধ নিমীলিতনেত্রে সেবন করিতে লাগিলাম। আমার যে বন্ধুগণ আমাকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কার্য্যান্তরে অন্যত্র গিয়াছিলেন। তাঁহারা আসিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে নানা উপদেশ শ্রবণ করিয়া ক্রমাগত উত্ত্যক্ত হইতে ছিলাম। যেমন পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের গেলান বিদ্যা, তেমনি আজ তাহাদের বহুদর্শিতা জনিত উপদেশ কর্ণে পশিতে ছিল। মন

"উড়্ উড়্"। ক্রমাগত অমুক করবে, তমুক কর না, তখন ভাল না লাগুক, পরে কিন্তু বুঝিয়াছি তাঁহাদের বহুদর্শিতার কথাটা লিখিয়া রাখিলে ২।১ স্থানে ঠকিতে হইত না। সময় হইল। বন্ধুদের নিকট হইতে সহাস্য মুখে বিয়োগ জনিত শোক-ভরা বুকে বিদায় লইলাম। আমাদের গাড়ীতে আমরা পাঁচজন হইয়াছি। একজন ইংরেজ এবং তিনজন উত্তরপশ্চিম দেশীয় ও আমি। দেশীয় গণের সহিত পরিচয় সূত্রে জানিলাম একজনের কলিকাতায় কাপড়ের কারবার আছে। আলাপ হইতে বুঝিলাম আমি তাঁহার কনিষ্ঠকে চিকিৎসা করিয়াছিলাম। পরিচয়ে বড় সুবিধা হইল। খুব খাতির জমিয়া গেল। আর একটী ভদ্রলোক পক্কেশ পক্কদাড়ী গৌর বর্ণ। শিব তুল্য কান্তি। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে শিক্ষা বিভাগে সাব্ ইন্স্পেকটার। গল্প করিতে বড় পটু। সাহেব চুরুট ফুকিতেছিলেন। আমি সেই এবং সাব্ ইন্স্পেক্টার তামাক টানিতে ছিলাম। আর একজন দেশীয় তিনি গাড়ীতে উঠিলেন, শয্যা বিছাইলেন, এবং কাপড় দিয়া সমুখ শরীর আচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিলেন। তাহার পোষাক ছিল ইংরেজী ধরণের। এত করিয়াও তিনি সাব-ইন্স্পেক্টর মহাশয়ের হাত এড়াইতে পারিলেন না। উনি ক্রমাগত বাড়ী কোথা, কি নাম, যে গ্রামে বাস সেখানে অমুককে চিনেন কি না, কি কাজ করা হয় প্রভৃতি প্রশ্ন করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। ইনিও বেহারার বাড়ীর বেলজ্জ। মুখ ঢাকিয়াই এতক্ষণ উত্তর দিতে ছিলেন। পরে যখন ইনস্পেক্টার বলিলেন আমি অমুক স্থানে মাষ্টার ছিলাম, তুমি বোধ হয় আমার নিকট পড়েছ; তখন সে মুখ খুলিয়া সেলাম ঠুকিল। তখন ইনি ও বলিলেন, যাও তুমি শোওগিয়া। নানা কথা বার্ত্তায় রাত্রিপ্রায় ১১টা হইল। তারপর—

গল্পেনহন্যতে কালঃ গল্পংজৃম্ভয়াহন্যতে।
তন্দ্রয়াহন্যতে জৃম্ভা তন্দ্রা নিদ্রয়াহন্যতে ॥

তারপর নিদ্রার পালা। একটী কথা ভুলিয়াছি। ইতিমধ্যে আমাদের দেশলাই খুঁজিয়া পাই নাই। সঙ্গীয় সাহেব তাহা বুঝিতে পারিলেন তিনি তখন সন্তোষ সহকারে নিজের দেশালাইটী দিলেন। আমি ও Thau ks বলিয়া তাহার দান স্বীকার করিলাম। ইনি হিন্দী বুঝিতে পারেন তাই আমাদের গল্পে যোগ-দান করিয়াছিলেন।

প্রাতঃকাল। সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎকাল পরে আমরা বাঁকী পুর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে বাঁকী পুর হইয়া গয়া যাইতে হইবে। সহযাত্রীগণের

যথাযোগ্য অভিবাদন ও করমর্দ্দন প্রভৃতি দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলাম। লটবহর লইয়া অবতরণ করিয়া আমরা সকলে একত্র হইলাম। ষ্টেশনে খোজ করিয়া জানিলাম রাজা বাহাদুরের গাড়ী এখনও আসে নাই। এদিকে গয়া যাইবার প্রথম গাড়ী প্রস্তুত। তখন পরিচারকের সহিত পরামর্শ করিয়া সেই গাড়ীতে যাওয়াই স্থির করিয়া তাহাতে উঠিলাম। মহারাজা বাহাদুর যে পুন্ পুন্ তীর্থ করিবেন তাহা আমি জানিতাম না। যখন পুন্ পুন্ ষ্টেশনে আসিলাম তখন পরিচারক আসিয়া বলিল "মহারাজা বাহাদুর এখানে নামিবেন।" এবং এখানেও পিণ্ড দিতে হইয়া থাকে। যদি ইচ্ছা হয় আমরা এখানে নামিতে পারি। তখন সেইখানে নামা স্থির করিয়া যেমন নামিতে যাইব অমনি গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমার ছাত্র ও ব্রাহ্মণ পরিচারক গাড়ীতে রহিল। আমি ও পরিচারক পুন্পুন্ তীর্থ করিতে অবতরণ করিয়াই ষ্টেশনে দেখিলাম গয়ার পাণ্ডাগণ এখানে আসিয়া ছাউনী করিয়াছে এবং মহারাজের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা করিয়াছে। আমি যাহার সঙ্গে যাইতেছি তখন তাঁহার পাণ্ডাকেই স্থির করিয়া তীর্থ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

পাঁণ্ডা বলিল নূতন কাপড় চাই। আমি বলিলাম যে নূতন কাপড় ত গয়ায় চলিয়া গিয়াছে। তখন পাণ্ডা বলিল "আপনি ত বাঙ্গালী এখানে স্বদেশী গামছা পাওয়া যায় তাই কিনিয়া কাজ করাই।" আমি বলিলাম পাওয়া না পাওয়া কিছু জানি না স্বদেশী সব ঠিক করুন। তখন দুই খানা গামছা ক্রয় করিয়া আনিলেন। আমরা ষ্টেশনের নিকটে একটী ঘরে বসিয়াছিলাম। সেখান হইতে তীর্থস্থান এক মাইল হইবে। এক মাইল পথ চলিয়া একটী বাজার দেখিলাম। এক দোকান হইতে পিণ্ড দানোপযোগী দ্রব্য সমুহ ক্রয় করা হইল। বাজার ছাড়িয়া দেখিলাম মহারাজার জন্য পটাবাস প্রস্তুত। নদীগর্ভে বালুকারাশি তদুপরি পটাবাস। সেই বালুকা রাশি অতিবাহিত করিয়া দেখিলাম এক ক্ষীণ জল রেখা বহিয়া যাইতেছে। সেইখানে পিণ্ডদান করিতেছে। কাহারও বা কেশ মুণ্ডন হইতেছে। কোথাও বা পরামাণিক উপস্থিত। মস্তক মুণ্ডনের ব্যবস্থা পাইলাম। ক্ষৌর কর্ম্ম নখচ্ছেদাদি হইল মুণ্ডিত মস্তক হইলাম। ব্রাহ্মণ ভোজনের পয়সার জন্য নানারূপ কথা হইল। ঘাটে আসিয়াই প্রথমে হস্ত মুখ প্রক্ষালন নিত্যক্রিয়া ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া এক ঘটী জল লইয়া সংকল্প করিতে বসিলাম। অনেক বার অনেক সংকল্প মন্ত্রপাঠ করিয়াছি অনেক শুনিয়াছি কিন্তু এত ঘটা শুনি নাই।

শ্বেতবরাহ কল্পে সপ্তম মন্বন্তরান্তর্গত কলিযুগস্থ মেবে জম্বুদ্বীপে ভারত খণ্ডে আর্য্যাবর্ত্তান্তর্গত পুণ্যস্থান মগধ প্রদেশে কোলাহলপর্ব্বতান্তর্গত গয়াতীর্থান্তর্ভূত পুন পুনাখ্যপুনপুনাখ্যনদ্যাং * * * *

অহংকরিষ্যে। তৎপর যথাদেশ পিণ্ডদানকার্য্য সমাধা করিয়া (দীপার্থং সূর্য্যং ধূপার্থং জলং) পুর্ব্ব বাসগৃহে আসিলাম সেখানে আসিয়া একটা সুফলের পালা দেখিলাম। কাশ্মীর যাত্রার পুনঃপুনঃ সুফল আরম্ভ হইল। তৎপর কার্য্য সমাধা হইয়াছে শুনিয়া একটু দুগ্ধ পান করিলাম কিয়ৎকাল পরে মাহারাজ বাহাদুর পুনপুন তীর্থে আসিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল ইহাদের গয়া যাইতে রাত্রি ১১টা হইবে। এইরূপ নিশীথে নূতন স্থানে গেলে কেমন হইবে ভাবিতে ছিলাম এমন সময় শুনিলাম বেলা ১॥ টার সময় এক মটর সার্ভিস্ আসে। তাহাতে গয়া যাইতে পারি। তাহাই ভাল মনে করিয়া পরিচারকদের সহিত মটর সার্ভিসে যাত্রা করিলাম। বেলা ৪॥ টার সময় গয়াতে পৌছিলাম। ষ্টেশনে আসিয়া সঙ্গীয়দিগের অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম তাহারা বথা স্থানে গিয়াছে। তখন একটু নিশ্চিন্ত হইলাম। ষ্টেশনে শুনিলাম আমাদের বাসস্থান নিকটেই। পদব্রজে গেলে খুবই নিকট। তখন পদব্রজে আসিয়া দেখিলাম সঙ্গীরা এক অন্ধকার গৃহে স্থান পাইয়াছে। আমার পরিচারক এই স্থান দেখিয়া চটে লাল। সে এক তাঁবুতে আমাদের জিনিষ পত্র নীয়া গেল। শুনিলাম এথানে আমাদিগকে কয়েক দিন থাকিতে হইবে। তথায় জিনিষ পত্র ভালরূপ গোচাইয়া হাতমুখ ধুইতে গেলাম। রাত্রিতে কিঞ্চিৎ জলপান করিয়া রহিলাম। সেদিন রাজবাটীর কেহ আমাকে অনুসন্ধান করে নাই। রাত্রি ১২ টার সময় মহারাজ বাহাদুর সবলবাহনে উপস্থিত হইলেন। কলরবে নিদ্রা ভাঙ্গিল। তবে শয্যা ত্যাগ করিলাম না। গয়াতে আমাদের স্থান হইয়াছিল টিকারীর রাজবাটী। স্থানটী গয়ার এক প্রান্তে রামশিলার দক্ষিণস্থ নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত। সুতরাং কেমন সেৎসেতে বোধ হইল তদুপরি মশকের উৎপাত।

প্রাক্‌পাদয়োঃ পতিতি খাদতি পৃষ্ঠমাংসং
কর্ণে—বিরৌতি সততং মধুরং বিচিত্রং
ছিদ্রংনিরূপ্য সহসা বিশত্যশঙ্কঃ
সর্ব্বংখলস্য চরিতং মশকঃকরোতি।

মশকের উৎপাত শেষ রাত্রে কিছু বেশী বোধ হইল। আমাদের সঙ্গে মসারি ছিল না পরে শুনিলাম যাহাদের মশারি ছিল তাহারাও তুল্য কষ্টই পাইয়াছিল।

খাটিয়ার উপর মসারি ঠিক থাকে নাই মশক ছিদ্র পাইয়া সহজেই তাহাতে প্রবেশ করিয়াছে। গয়াতে ৫ দিন থাকিতে হইবে।

প্রভাত হইল। প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া আমি যাহার সহিত যাইতেছি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। প্রথম অনুসন্ধানে জানিলাম তিনি শয্যা ত্যাগ করেন নাই। পরে যখন তাঁহার সহিত দেখা হইল তখন পরস্পর কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর প্রথমেই মশকের কথা উঠিল। তার পর তীর্থ যাত্রার পালা। গাড়ী ও পাণ্ডা প্রস্তুত। (আমি যাহার সহিত আসিয়াছি এখন হইতে তাঁহাকে বাহাদুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিব) বাহাদুরের সহিত গাড়ীতে আরোহন করিয়া কতক দূর গিয়া অবতরণ করিলাম। আর গাড়ী যাইবে না। এবার পদব্রজে চলিলাম। পুরোহিত মুখে শুনিলাম প্রথমে ফল্গুতে স্নান শ্রাদ্ধ তর্পণ ও কার্য্য করিতে হইবে। ইতঃপূর্ব্বে আমি কখনও গয়াতে আসি নাই। ফল্গু সম্বন্ধে নানা কথা শুনিলাম। বঙ্গের মত সুনাব্য দেশের তুলনায় ইহা শুষ্ক বটে, তবে পার্ব্বত্য দেশে এমন নদী অনেক। বালি খুড়িলে জল পাওয়া টা বিচিত্র কথা নহে। বাল্যকালে নৌকারোহণে দূর পথে যাইতে যখন চড়ায় লাগাইয়া আহারাদি করিতে হইত তখন আমাদের কাজ ছিল বালি খুড়িয়া জল বাহির করা। সুতরাং ফল্গু দেখিয়া বড় মুগ্ধ হই নাই। তবে নদী যত অতিবাহিত করিতে লাগিলাম গয়ার সৌন্দর্য্য তত বাড়িতে লাগিল। দূর হইতে গয়ার সীমা দেখা যাইতে লাগিল। ৺কাশীধামের মত ইহাও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। দূর হইতে স্বর্ণোজ্জল কলস পরিশোভিত মন্দির চূড়া সকল প্রভাত সূর্য্য কিরণে বড়ই সুন্দর দেখাইতে ছিল। ঘাটের পারিপাট্য কিছু নাই। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিলাম আমাদের বসিবার জন্য পর্ণশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। মহারাজ তখনও আসেন নাই। আমরা তল্পীতল্পা রাখিলাম। বালি খুড়িয়া যেখানে খাত নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার জল তত পরিষ্কার নহে। পুরোহিত প্রস্তুত। স্নান করিতে আদেশ করিলেন। তখন আমি নিত্য ক্রিয়ার আপত্তি তুলিলাম। তাহাতে তিনি সম্মত হইলেন। আমরা প্রথমে নিত্যকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে আদিষ্ট হইলাম। নিত্য কর্ম্মসমাধানান্তর আবার সেই সুদীর্ঘ সংকল্প আরম্ভ হইল। সংকল্প কালে সিকিপয়সা, আধলা, পয়সা, দুয়ানি, সিকি প্রভৃতি সাধ্যমত হাতে লইতে হয়। ইহা ওখানকার নিয়ম। ফুল ও পয়সা হাতে করিয়া সংকল্প বাক্যপাঠ করিলাম

পিতরো বাক্যমিচ্ছন্তি।

কথার সার্থকতা দেখিলাম গয়াতে। সংকল্পের পয়সা পুরোহিতের প্রাপ্য। আর

প্রাপ্য হইয়া থাকে। পাণ্ডার লোকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যে পুরোহিত একটী পয়সা ঠকাইয়া না নেয়। পুরোহিতও সময় পাইলে ছাড়েন না। ইহা আমি বহুবার দেখিয়াছি। কলহ হয় হয় হইত, কেবল বড়লোক যজমান অই শ্রাদ্ধ গড়াইত না।

একটী কথা বলিতে ভুলিয়াছি। যখন গয়া ষ্টেশনের গাড়ী বাড়েণ্ডাতে উপস্থিত হইয়া ছিলাম, একজন পাণ্ডা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আপনার পাণ্ডা কে? আমি উত্তর করিয়াছিলাম গদাধর। বচনে তুষ্ট হইয়া পাণ্ডা আর কিছু না বলিয়া পশ্চাৎ আসিয়া ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল আপনার বাড়ী কোন জেলা, গ্রামের নাম কি? আমি গ্রামের নাম ছাড়া আর সব বলিলাম। খুড়া-মহাশয় ও খুল্ল পিতামহ গয়া আসেন জানি। তাহারা কাহাকে পাণ্ডাস্থির করেন মনে নাই। পুনুপুনে অতটা ভাবি নাই। এখন আর পাণ্ডা পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা হইল না। পরিচয় দিলাম না। কিন্তু শ্রাদ্ধকালে আবার সেই আপদ উপস্থিত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাতা লইয়া দুই পাণ্ডা উপস্থিত। দু-জনকেই 'স' এর ঘরের গ্রামের নাম পড়িতে বলিলাম। আমাদের গ্রামের নাম কিন্তু পাইলাম না। তখন তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলাম। পিতার নাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম গরজ থাকে শ্রাদ্ধকালে আসিয়া শুনিও কোন কথা থাকিবে না। দেখিলাম তাহারা অত কষ্ট করিতে রাজী নহে। থাক্ আমি আমার নাব নিযুক্ত পাণ্ডা দ্বারাই কাজ করাইতে লাগিলাম।

ফল্গুতে স্নান ও তর্পণ সমাধা করিলাম। তৎপর দইওয়ালা ও দুধওয়ালা দই ও দুধ লইয়া উপস্থিত হইল। তাহাও দিলাম। এবার পিণ্ডদানের ব্যাপার। স্থান স্থির হইল। বসিলাম। পুরোহিত কুশ পাতিয়া এটা ওটা করিতে ফরমাইস্ দিয়া আবার সেই সুদীর্ঘ সংকল্প বাক্য আরম্ভ করিলেন। তাহার ইচ্ছা সংকল্পটা তারাতারি সারিয়া যান্ এবং আমি নমো নমঃ করি। তাহা পারিলাম না। স্পষ্ট করিয়া সংকল্পটা শুনিলাম এবং বলিলাম। তৎপর তাহার নির্দ্দেশ মত কার্য্য করিতে লাগিলাম। এবার দাক্ষিণার পালা। এপর্য্যন্ত ধুপার্থং জলং দীপার্থং সুর্য্যং হইয়াছে। অথচ পাণ্ডার লোক ধুপ দীপনৈবেদ্যাদির পয়সা নিয়াছে। তখন আমি দাক্ষিণার্থং জলং বলির্থং ভাবিয়া ছিলাম। পিতৃকার্য্য স্মরণ করিয়া বিরত হইলাম। যথাসাধ্য দক্ষিণা করিলাম। তৎপর ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যাপার। সেটা রফা হইলে সর্ব্বশেষে দিব। কার্য্য শেষে পাণ্ডার লোককে বলিলাম দেখ

আর ও বহু স্থানে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ধূপদীপ চাই, তা না হইলে দাক্ষিণ্যং জলং। তারপর নানারূপ দাবী চলিতে লাগিল। দুধওয়ালী, অমুক ওয়ালা ইত্যাদি। সকলকে কিছু কিছু দিয়া নমস্কার করিয়া ফল্গু ত্যাগের ব্যবস্থা হইল॥ ফল্গুরপরের কৃত্য রামশিলাতে পিণ্ডদান। আবার পথ চলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া রামশিলাভিমুখে গেলাম। প্রথমে ইচ্ছা ছিল কেবল ফল্গুগাধর পাদপদ্ম, অক্ষয়বটও প্রেতশিলা এই স্থানে পিণ্ড দিব। এখন দেখিলাম দিদৃক্ষা নিবৃত্তির জন্য সর্ব্বত্র আমাকে যাইতে হইবে। অথচ জিনিষ পত্রের বোঝা আমাকে বহিতে হইবেক না। তখন সেই সংকল্প ত্যাগ করিয়া রামশিলাতে পিণ্ডদান করিব স্থির করিলাম। গাড়ী আমাদের বাসস্থানের নিকট দিয়া অনেকটা ঘুরিয়া রাম-শিলার পাদদেশে উপস্থিত হইল। গাড়ী হইতে নামিলাম। সেখানে এক কুণ্ড। আমাদের দেশের ছোট পুকুর দেখিলাম গয়ার ২টী পুকুর ব্যতীত সমুদায় পুকুরই এক একটী তীর্থ। নাম অমুক কুণ্ড অমুক কুণ্ড ইত্যাদি। একটী পুকুরের তিন স্থানে তিন নাম এখনও আছে। রাম কুণ্ডতে তর্পণ করিলাম। দেখিলাম অনেকে সেখানে পিণ্ড দিতেছেন। বাহাদুরও পিণ্ডদান করিলেন। তখনও আমরা স্নান করি নাই। পরে মহারাজ আসিলেন তিনি আসিয়া নিজেই স্নান করিলেন এবং সকলকে স্নান করিতে বলিলেন। কাজেই সকলকে স্নান করিতে হইল। আমি স্নান করিব না ভাবিতে ছিলাম। বিশেষতঃ কুণ্ডের জল দেখিয়া বাহাদুর ছাড়িলেন না। আমি হাসিয়া বলিলাম, "তারপর শেষ রক্ষা করিবে কে?" বাংলা বুঝিতে না পারিয়া বাহাদুর থত মত খাইলেন। আমি বুঝাইয়া দিলাম আমার ধাতে স্নান সইবে না। আর সওয়া না সওয়া জোড় করিয়া ধরিয়া লইয়া চলিলেন। তখন দু-জনেই জলে নামিলাম। একহাটু জলে মাথা ডুবাইয়া ডুব দিলাম। এবার শকটারোনের পালা। আমি বাঙ্গালী ত ভোলাগাড়ীর সিড়ি ভাঙ্গিতে হাঁপাইতে হয়। তথনি শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া উঠিতে লাগিলাম। গয়ে উৎসাহে তত শ্রম বোধ করিলাম না। বড় সিঁড়ি খোলা হাওয়া এত কষ্টের কারণ ছিলা না। এই সুন্দর সিঁড়ির নির্ম্মাতা ভূতপূর্ব্ব টীকারী রাজ। মহাত্মার পুণ্য কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া মস্তক নত হইয়া আসিল। রামশিলায় আরোহন করিয়া চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলাম। কি সুন্দর দৃশ্য! অদূরে পর্বত শ্রেণী নিম্নে শস্য শ্যাম ক্ষেত্র। পর্ব্বতের দক্ষিণে গয়া সহর। পূর্ব্বে সৌরকিরণোজ্জলা ফল্গু নানারূপ দৃশ্যে মন আনন্দে পূর্ণ হইল। এইবার পিণ্ডদান আরম্ভ। সেই মন্ত্র সেই

সংকল্প সেই "দক্ষিণা চড়হাইয়ে।" কার্য্য সমাধা করিলাম। যেখানে বসিয়া পুরোহিত শ্রাদ্ধ করাইলেন সেই স্থানেই কর্ম্ম সমাধা হইল না। অনতি দূরে এক চত্বর তাহাতে সমতল একটী প্রস্তরোপর পিণ্ড রাখিতে হইল। তজ্জন্য কিছু দক্ষিণারও আবশ্যক হইল। সর্ব্বত্রই দক্ষিণার হার পাই পয়সা হইতে আরম্ভ। আর একটী কথা বলিব। শ্রাদ্ধকালে প্রাচীনারীতি ধারণ করিতে হয়। এইজন্য পুরোহিত আমাকে বলিলেন, "অপসব্যম্।" অন্যত্র শুনিলাম "জনুছে থব্য হো জাইয়ে।" সব্যম্ স্থলে জনুছে ঠিক হোলা। তারপর দ্বাদশ পুরুষের পিণ্ডদান কালে পুরোহিতের মুখে যেন খই ফুটিতে লাগিল। এক নিশ্বাসে তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন পিতাকা নাম দাদাকা নাম, পর দাদাকা নাম মাকা নাম দাদীকা নাম পরদাদীকা নাম। ইত্যাদি এইরূপে একটা বলিয়াই তার্পতে স্বধা। আমি ধীরে ধীরে কার্য্য করিতে বলিলাম। পুরোহিত বাধ্য হইলেন।

সম্ভাষণ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ।

আজি বঙ্গবাসী, প্রেমনীরে ভাসি কহে হাসি হাসি জননী এলো,
মাতিয়াছে সবে, আনন্দ উৎসবে, কহিতেছে সবে, জননী এল॥
এলে কি জননী, ত্রিলোক-তারিণি, দ্যুলোক-দায়িনি, এলে কি তুমি।
এতদিন পরে, পিতৃগৃহ স্ম'রে, তিনদিন তরে, এলে কি তুমি॥
পাষাণের মেয়ে, পাষাণী হইয়ে, তনয় নিচয়ে, ছিলে মা ভুলে।
পড়েছে কি মনে, পুনঃ এতদিনে, সুচারুহসনে, স্ব-সুত দলে॥
এস এস দেবি, তব পদ-সেবি,, মনঃসাধে সেবি রাঙ্গা চরণ।
কুসুম তুলিয়ে, চন্দনে চর্চ্চিয়ে, চরণে অর্পিয়ে, তোষি নয়ন॥
তব আগমনে, তব দরশনে, তব আরাধনে, তব সেবনে।
কত শান্তি পাই, মরমে জুড়াই, কতসুখী হই কব কেমনে॥
মায়ার শৃঙ্খলে, ছিঁড়িয়া সবলে, ছুটিছে সকলে পূজিতে তোরে।
নব নব সাজে নরনারী সাজে, আনন্দ বিরাজে, দেশ-ভিতরে॥

বাজে ঢাকঢোল, আনন্দের রোল, উৎসব হিল্লোল বহিছে রঙ্গে।
মঙ্গল কলসে, পত্রপুষ্পরাশে, বঙ্গপুরী হাসে আজি সুরঙ্গে॥
যেন দুঃখক্লেশ, মোহের আবেশ, অভাবের লেশ নাই এদেশে।
এ সুখ বাসরে, মানসোপচারে, পূজিবে মায়েরে ভকতি বশে॥
আছে মনপদ্ম, প্রেমভক্তি সদ্ম, ভুলি ছার ছদ্ম দিব বসিতে।
পূতসহ স্মারে, পাদ্যবারি ক'রে অর্পিব তোমারে, ভকতি চিতে॥
মনঃঅর্ঘ্য হবে, চিত্তপুষ্প তবে, দিয়ে মা পূজিবে এদীন সুত।
তেজ নিরমল, দীপ সমুজ্জ্বল, নাসিক যুগল ধূপ সে পূত॥
দিব সুধাবুধি, নৈবেদ্য সুবিধি সুখের অবধি না রবে মোর।
দুষ্ট রিপুগণে, অর্পি বলিদানে, তব স্তবগানে হইব ভোর॥
মুদিয়ে নয়ন, হ'য়ে একমন, পূজিব যখন ভকতি ভরে।
ডাকি মা, মা ব'লে শোকনীরে গলে, আঁখি ছলছলে বলিব তোরে॥
মরমের ব্যথা, শোক দুঃখ কথা, বলিব গো মাতা বলিব তোরে।
বারমাস ধ'রে, দুঃখহার গ'ড়ে, আছি হৃদে ধ'রে, দিতে তোমারে॥

১। নমো নারায়ণি, সর্ব্ব-স্বরূপিণি, শিবে সনাতনি দেবি নমস্তে।
কুরু করুণাং শিবে রক্ষমাং তারয় আশ্রিতে নিজ কৃপাতে॥

২। জয়দেবি জয়, শীঘ্র কর ক্ষয়, অভাব নিচয়, করি করুণা।
দাও তত্ত্বজ্ঞান, মান অভিমান, হ'ক অন্তর্দ্ধান যত যাতনা॥

—:•:—

পরিণাম।

লেখক, শ্রীযুক্ত অমরনাথ বসু, এফ্, আর্, এচ, এস্,
(লণ্ডন) এম্, আর্, এ, এস্, ই।

ভাবিনিত পরিণাম এত দুঃখময়।
ভাবিনিত মমসুখ পাইবেক লয়।
ভাসায়ে দেছিনু দেহ রমণী প্রেমেতে।
এখন ডুবিছি শুধু দুঃখের স্রোতেতে॥

রমণী কটাক্ষে ওগো ভুলেছিনু সব ;
এখন করিছি শুধু হা হুতাশ রব ॥
কুটিলতা মাখা শুধু—কটাক্ষ নয়নে।
নাহিত তুলনা তার বিশাল ভুবনে ॥
অকপট চিতে যারে বেসেছিনু ভাল।
উল্লাসে ত্যজিয়া মোরে সে তো চলে গেল ॥
নারীর মুখেতে সুধা, হৃদেতে গরল।
অধরে সরস হাসি,—ছলনা কেবল ॥

* * * *

আগে যদি জানিতাম রমণী ভীষণ।
হ,তো নাতো পরিণাম দুঃখের এমন ॥

—:•:—

বেরি-বেরি ।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ রায় সেনগুপ্ত।

বেরি-বেরি যে শোথ রোগ, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এখন ঐ শোথ সংক্রামক ভাবে কেন হইতেছে, বাতাদি দুষ্যরূপ তাহার বিশিষ্ট কারণও জানিবেন।' যাঁহারা পাশ্চাত্য ডাক্তার-গণের প্লেগ সম্বন্ধে মূষিক (ইন্দুরের) থিওরি এবং ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে পঙ্কিল জল ও মশক থিওরি শুনিয়া বাহবা দিতেছেন, তাঁহারা একবার চক্ষু চাহিয়া দেখুন যে, আর্য্য ঋষিগণ কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন। তদ্রূপ তথ্য অনুসন্ধান করিয়া ইহাও বেশ বুঝিবেন যে, যে সকল রোগীকে এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ নূতন রোগ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তাহা যথার্থপক্ষে নূতন ব্যাধি নহে ; আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ কোন্ অতীত যুগে তাহার নির্ণয় মীমাংসা ও চিকিৎসা বিধির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

যদিও উপরে সংক্রামক ও জন-পদ-ধ্বংসকারী শোথের বিশিষ্ট কারণ এবং শোথের সামান্য কারণ দেখাইয়াছি, তথাপি ঐ সকল বিশিষ্ট কারণ গুলির সহিত আজকাল দেশাদির কি অবস্থা হইয়াছে, তাহার সামঞ্জস্য দেখাইব।

প্রথম বায়ু। পূর্ব্বোক্ত পুঁতিগন্ধ বাষ্পসিকতা পাংশু ধুলি ও ধূমযুক্ত দূষিত বায়ু জনপদধ্বংশের একটী বিশিষ্ট কারণ। কলিকাতার ন্যায় সহরের উত্তর বিভাগের অপ্রশস্ত গলির মধ্যে সারি সারি সজ্জিত বাড়ীগুলির অধিবাসগণের পক্ষে পুঁতি গন্ধ প্রতিহতগতি দূষিত বায়ু ভিন্ন জীবনধারনোপযোগী বিশুদ্ধ বায়ু কোথায়? কলকারখানার ভূষা ধূম এবং গৃহে গৃহে প্রজ্জলিত পাঁথুরিয়া কয়লার ধূমে যে দেশের বায়ু দূষিত হইয়াছে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? তাহার প্রমাণ—কলিকাতার দক্ষিণাংশে ইউরোপীয়ানদের পাড়ার প্রশস্ত রাস্তার মুক্ত বায়ু সেবনে কয়জনের এ ব্যাধি হইতেছে?

দ্বিতীয় জল। যদিও কলিকাতার জল ক্লেদবহুল ও দুর্গন্ধি নহে, তথাপি পলতার জল পরিস্কৃত হইয়াও বদ্ধ ও আচ্ছাদিত অবস্থায় বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণীতে (ট্রাঙ্ক) থাকে, এবং যে পাইপের মধ্য দিয়া চালিত হইয়া সহরের রিজারভায়ারে, এবং তথা হইতে বাড়ী বাড়ী প্রেরিত হইতেছে। সে পাইপ ও ট্রাঙ্ক রিজারভায়ারে কখন সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করে না। কাজেই কলিকাতার কলের জল পরিস্কৃত হইলেও সূর্য্যতাপের অভাবে নিশ্চয় বিকৃত হইয়া যায়। সম্ভবতঃ সেইজন্যই কলিকাতা মিউনিসিপালিটী এখন উর্দ্ধস্তম্ভের উপর জলাধার Over head resaıvior, স্থাপনের সুবন্দোবস্ত করিতেছেন। কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে ঐরূপ উচ্চস্থানে জলাধার স্থাপন, কলের জলের প্রথম সৃষ্টি হইতেই স্থাপিত হইয়াছে। এখন বুঝুন, আমাদের প্রাচ্য স্বাস্থ্যতত্ত্ব পাশ্চাত্য সায়েণ্টিস্ট (Scientists) গণের অধুনাতন জ্ঞান হইতে কত উচ্চ। যাহা বৈদ্যগণ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্থির-করিয়াছেন, ডাক্তারেরা—হেল্‌থ ও হাইজীন (Health and Hygichl) তত্ত্বে এখন ধীরে ধীরে তাহারই অনুকরণ করিতেছেন।

তৃতীয় দেশ। দেশ দূষিত হইবার যে সকল লক্ষণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে; সেই সকল লক্ষণের মধ্যে অনেক লক্ষণ আজকাল মিলিতেছে। কলিকাতার মশক মাছি ও ইন্দুরের অভাব নাই, পল্লীগ্রামে যতই জনপদ ধ্বংস হইয়া আসি-তেছে ততই শৃগাল ও পেচকে গ্রাম পুরিয়া যাইতেছে। মহামারীর পূর্ব্বে যে যে, লক্ষণ হওয়ার কথা বৈদ্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, প্রায় বর্ণে বর্ণে তাহা মিলিয়াছে ও মিলিতেছে। নূতন জাতীয় পক্ষী লতা ও গুল্মের কথা পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া নব্য সম্প্রদায়ের অনেকে হয় ত হাসিবেন, কিন্তু যখন উলো,

রাণাঘাট, কাচড়াপাড়া, খানাকুল, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে প্রথম ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে এক প্রকার নূতন (লাল ভেরেণ্ডার) গাছে দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। (এখন ঐ গাছ দেশে পল্লীগ্রামে বিস্তর) যে বৎসর অধিক ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়, সে বৎসর আরও অধিক জন্মায়। ইহা জয়পাল বীজের ন্যায় চতুঃপল বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলান্বিত এরণ্ড জাতীয় ছোট ছোট গাছ, কচি অবস্থায় উহার পত্র খুব লাল হয়, এবং ক্রমশঃ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়া যায়; এবং ঐ সময়ে একজাতীয় অদৃষ্টপূর্ব্ব বড় বড় পক্ষী সেই সময় দেখা দিয়াছিল এবং উচ্চ বৃক্ষে থাকিয়া গভীর রাত্রে খুব উচ্চ ও গম্ভীর স্বরে হু হু শব্দ করিত। যদি এ ঋষিবাক্যতে কাহারও অবিশ্বাস হয়, প্রথম ম্যালেরিয়া মারী-ভয়ের সময়ের অনেক লোক জীবিত আছেন, তাঁহাদিগকে ইহার সত্যাসত্যের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ-ভঞ্জন করিয়া লউন, ইহাই আমার অনুরোধ। তাহা হইলে দূরদর্শী ঋষিগণের বাক্যে প্রত্যয় এবং বৈদ্যশাস্ত্রে সকলেই আস্থাবান্ হইবেন।

চতুর্থ-কাল। দূষিত কালের বিষয় যাহা উল্লেখ করিয়াছি, সকলগুলিই এখন বর্ণে বর্ণে মিলিতেছে—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতু আজকাল নিয়মিতরূপে হয় কৈ? সাবেক রকমের শীত ত দেশে নাইই। আমাদের বাল্যকালে হুগলীর নিকট মাঠে এত তুষারপাত হইত যে, সেখানে বরফ জমিত; একখানা নূতন সরায় খড়ি ঘসিয়া বা কতকগুলি বিচালি শীতকালের রাত্রে মাঠে রাখিয়া আসিলে তাহাতে বরফ জমিয়া থাকিত, কিন্তু কালে ঋতু বিপর্য্যয় বশতঃ এখন আর তদ্রূপ হয় না। কোন বৎসরে আদৌ শীত নাই, কোন বৎসর আদৌ বর্ষা নাই, গ্রীষ্ম ও মার্ত্তণ্ড-দেবের প্রচণ্ড তাপে সমস্ত শস্য দগ্ধ ও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে; কোন বৎসর বা অতি বর্ষার প্লাবণ হইয়া দেশ ভাসিয়া গিয়া সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ব্যাধি ও এককালে বহুলোক ধ্বংসের—এইগুলিই হইল বিশিষ্ট কারণ।

এখন পূর্ব্বের লিখিত শোথ রোগের সামান্য কারণ গুলির মধ্যে কোন্ কোন্ কারণে আজকালকার এই শোথ বেরি-বেরি হইতেছে, তাহাও সন্ধান করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে আছে,—অনাহার বা অল্পাহার নিবন্ধন কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির শোথ হয়, অভুক্ত কৃশাবলানাং এখন দেখুন নিঃস্ব বাঙ্গালীর মধ্যে কতলোক অন্নাভাবে কাতর, কোন রকমে যাহা তাহা খাইয়া তাঁহারা নিজ নিজ ক্ষুন্নিবারণ করিয়া থাকেন; আবার অপর পক্ষে যে সকল ভাগ্যবান বাঙ্গালীর অর্থের অভাব নাই, তাঁহারাও

কিন্তু তৃপ্তিপূর্ব্বক উদর পুরিয়া খাইতে পান না—অজীর্ণরোগে কলিকাতা ছাইয়া গিয়াছে, খাইবার সংস্থান থাকিতেও অনেক অর্থবানকেও রোগের জ্বালায় অর্দ্ধেক দিন খই দুগ্ধ সাগু বার্লি খাইয়া কাটাইতে হয়। অতএব উভয় পক্ষেই অল্পাহার বা অনাহারে লোক ক্রমশঃ কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং অতঃপর শোথগ্রস্থ হইতেছে। উষ্ণ তীক্ষ্ণবীর্য্য ও গুরু-ভোজনেও তীক্ষ্ণোষ্ণগুরুপ সেবায় শোথরোগ হইয়া থাকে। বাঙ্গালী কেরাণীদের ত উষ্ণ আহার নিত্যই করিতে হয়। ৯টা বাজিয়া গিয়াছে, গৃহিণী গরম ভাতের থালা সম্মুখে বসাইয়া দিলেন, গরম গরম অতি গরম ভাত ঢালিয়াই পাতে দিয়াছে, বেলা হইয়া গেলে, আফিস মাষ্টারের তাড়নের ভয়ে বা ঝোল মাখিয়া গরম ভাতই সপাসপ্ খাইয়াই আফিস ছুটিলেন। আমাদের ভাতকে ঈষদুষ্ণ করিয়া লইবারও অবকাশ নাই; গুরুলঘু বিচার ত পরের কথা। আজকাল খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গুরু লঘু সাত্ম অসাত্ম্য বিচার করে কে?

এখন সাত্ম্য অসাত্ম্য কি তাহারই আলোচনা করিব। সাত্ম্য অর্থে যাহা সেবনে কোন অসুখ হয় না। বাতিক শ্লেষ্মিক ও পৈত্তিক প্রভৃতি পৃথক পৃথক প্রকৃতিগত মানুষের পৃথক পৃথক সাত্ম্য। যাহা বাত প্রকৃতির সাত্ম্য, তাহাই আবার পিত্ত প্রকৃতির অসাত্ম্য। "যদ্ বায়োঃ পথ্যং তৎপিত্তস্যা পথ্যন্।" সুশ্রুতঃ

এত বড় বিষম কথা হইয়া দাঁড়াইল। এরূপ হইলে ত আর কাহারও আহার করা চলে না—এক সংসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-সম্পন্ন তিন জন লোকের জন্য তবে কি তিন প্রকারের খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইবে? না তাহা কদাপি শাস্ত্রাভিপ্রায় নহে। সেই জন্যই ধন্বন্তরি সুশ্রুতঋষি জাতিসাত্ম্য সম্বন্ধে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই এস্থলে দেখাইব।

মনুষ্যের অল্পাধিক ব্যক্তিগত সাত্ম্য, তাহাকেই জাতিসাত্ম্য বলে, এবং সেই সকল দ্রব্যই পান ভোজনে প্রশস্ত।

যথা—

"ইহ খলু যদ্দ্রব্যাণি স্বভাবতঃ সংযোগতশ্চৈকান্তহিতান্যেকান্তাহিতানি হিতাহিতানি চ ভবন্তি।" দ্রবের মধ্যে স্বভাবতঃ প্রকৃতি বা জাতিগত অবস্থায় অথবা মিশ্রিত অবস্থায় কোন দ্রব্য মনুষ্যজাতির একান্ত হিতকর, এবং কোন দ্রব্য বা হিতাহিতকর অর্থাৎ শেষোক্ত দ্রব্যগুলি কখন হিতকর কখন অহিতকর হইয়া থাকে।

জাতিসাত্ম্য অর্থাৎ সকল মনুষ্যের হিতকর দ্রব্যের মধ্যে—জল, ঘৃত ও দুগ্ধ; এবং জাতীয় অসাত্ম্যের মধ্যে যাহা সকলেরই অহিতকর। অগ্নি, ক্ষার ও বিষ প্রধান।

জাতিসাত্ম্যাৎ সলিল ঘৃত দুগ্ধৌদন প্রভৃতিনী একান্তহিতানি। একান্তাহিতানি তু দহন-পচন-মারণাদিষু প্রবৃত্তাগ্নি-ক্ষার-বিষাদীনি।" সুশ্রুতঃ—
ঐ প্রকার বহুজাতীয় ধান্য, যব, গোধুম প্রভৃতি শালিধান্য; মুগ কলাই, মসুর ছোলা, অরহড় প্রভৃতি ডাইল বা সমী ধান্য; এবং হরিণ, কুরঙ্গ, কপোত, লাব, তিত্তির প্রভৃতির মাংস; বেতো সুনস্নি, জীবন্তী চাঁপানটে প্রভৃতি শাক; গব্যঘৃত সৈন্ধব লবণ, দাড়িম ও আমলকী প্রভৃতি ফল সকল মনুষ্যেরই হিতকর বা জাতিসাত্ম্য।
এখন হিতাহিত আহারের কথা কিছু বলিব।

আহার বিহারীর পদার্থের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত জাতিসাত্ম্য ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ দ্রব্যই যাহা একজনের হিতকর প্রকৃতিভেদে তাহাই আবার অন্যের অহিতকর। আবার যাহা হয়ত সুস্থাবস্থায় অবিহিত, তাহাই আবার রোগে নিয়ত উপযোগী হইয়া থাকে।

"হিতাহিতানি তু যদ্বায়োঃ পথ্যং তৎপিত্তস্যাপথ্যমিতি। সুশ্রুতঃ, যদ্বায়োঃ রুক্ষত্বাম্লত্বাদিনা পথ্যং মাতুলুঙ্গং তত্তেনৈব পিত্তে সমানগুণতয়া অপথ্যম্; নহি দশমূলং ত্রিদোষহরমপি স্বাস্থ্যহিতম্। চক্রদত্তঃ রক্ষবায়ু সমতা করণার্থে অম্লাদিগুণ সম্পন্ন লেবু অপথ্য হইলেও পিত্তের সহিত সমান গুণ বিধানে লেবু পিত্তে অপথ্য। দশমূলপাচন রোগে ত্রিদোষনাশক হইলেও কদাপি উহা সুস্থাবস্থায় উপযোগী নহে, এখন সম্ভবতঃ বুঝিলেন যে আমাদের আহার বিহারে সাত্ম্যাসাত্ম্য বিচার নাই বলিয়াই নানাবিধ ব্যাধিতে ভুগিতেছি। বেরি-বেরিও সেই অসাত্ম্য বিহারের ফল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিষ জন্যও শোথরোগ হইয়া থাকে। বিষ কি তাহাই এখন বিচার্য্য। স্থাবর ও জঙ্গমভেদে বিষ দ্বিবিধ; সর্পাদি জীবের বিষকে জঙ্গম অমৃত দার্ম্মজ, সেঁকো প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ ও খনিজ বিষকে স্থাবর বিষ বলে। খাদ্য সংযোগে পাকস্থলিতে প্রবেশ করিলে ঐ সকল বিষ হইতে ভেদ ও বমি হইয়া থাকে, এবং তাহা হইতে নানাবিধ অপর ব্যাধিও হইয়া থাকে। শোথ রোগও বিষভক্ষণে বা বিষ সংযোগে হইয়া থাকে, তাহা বহুবার কহিয়াছি। কিন্তু স্থাবর ও জঙ্গম বিশ হইতে আরও একটী তৃতীয় বিষের এস্থলে উল্লেখ করিব

এবং এই শেষোক্ত বিষ হইতেই যে অধিকাংশ অধুনাতন শোথ (বেরি-বেরি) হইতেছে তাহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছি। সে তৃতীয় বিষ কি ?— সংযোগ বিরুদ্ধ আহার। যে দ্রব্যের সহিত যে দ্রব্য খাইতে নিষেধ সেই সেই দ্রব্য একত্র সম্মিলনে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে অভিনব দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাই তৃতীয় বিষ। সে দ্রব্য যে বিষতুল্য তাহাতে আর কোন সংশয় নাই।

"সংযোগাদপরাণি বিষতুল্যানি ভবন্তি। সুশ্রুত। এস্থলে বিষতুল্যানি অর্থে বিষবৎ অনিষ্টকারী দ্রব্য।

"এবমাদি স্বভাবতো হিতং তথা সংযোগতা চ সমাংসং তৈলতক্রাদি সংস্কারাদ্বায়োঃ পথ্যং তত্তৎ পিত্তশ্লাপথ্যাম্। চক্রদত্তঃ। অর্থাৎ স্বভাবতঃ সকল মনুষ্যের সাত্ম্য যে মাংস, তাহা তৈলতক্রাদির সহিত রন্ধন করিলে বায়ুরোগেই সুপথ্য হইয়া থাকে কিন্তু পৈত্তিক রোগে কুপথ্য হইয়া দাঁড়ায়।

সংযোগ হেতু যে সকল দ্রব্য বিষতুল্য হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করিতেছি।

"বল্লীফল করক কন্নীরাম্লফল লবণ কলথ পিণ্যাক দধি তৈল বিরোহি পিষ্ট শুষ্কশাকাজাবীক মাংস মস্তু জাম্বব চিলিচিম মৎস্য গোধা বরাহাশ্চ নৈকধ্যমশ্নীয়াৎ পয়সা। সুশ্রুত। বল্লীফল, লাউ, কুমড়া, সীম, বাঁশের কোঁড়, আমড়া, পিটালি, লবণ দধি, তৈল, মাংস, মস্তু, মৎস্য প্রভৃতি দুগ্ধের সাহিত খাইলে বিরুদ্ধ আহার বশতঃ বিষতুল্য হয়। ইহা সুশ্রুতবাক্য। এখন দেখুন দেশী কুমড়া, লাউ, বাঁশের কোঁড় ও শাকের ঘণ্ট রাঁধিবার সময় লবণ গুড় বা চিনি এবং দুগ্ধ দিয়াই পাককরা হয়, এবং তাহাই আমরা উপাদেয় বলিয়া আহার করিয়া থাকি। মাছের ঝোল ডাল্‌না অম্ল-মাছ প্রভৃতি আহার করিয়াই দুগ্ধের বাটীতে চুমুক দিই। ধন্বন্তরি যাহা পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন, সেই নিষেধকেই আমরা এখন ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছি।

সংযোগ হেতু অহিতকর আরও কতকগুলি পদার্থের উল্লেখ করিব।

নববিরূঢ়ধান্যৈর্বসা মধুপয়ো-গুড়-মাষৈর্ব্বা গ্রাম্যানূপৌদকপিশিতাদীনি নাভ্যবহরেৎ মৎস্যৈঃ সহেক্ষুবিকারণার্থঃ মধুনামূলকম্। ক্ষীরেণ মূলকম্ আম্রজাম্বগোধাশ্চ সর্ব্বাংশ্চ মৎস্যান্ পয়সা। কদলীফলং তালফলেন পয়সা দধ্না তক্রেণ বা। লকুচফলং মাষসূপেন। কপোতান্ সর্ষপতৈলভৃষ্টান্নাশ্নাৎ। মৎস্যপরিপচেন...।সুশ্রুত—

গ্রাম্য অনূপ বা জলচর জন্তুর মাংস নূতন ...

সংযোগে খাইতে নাই। ঐরূপ চিনি বা গুড়ের সহিত মৎস্য; মধু বা দুগ্ধের সহিত মৎস্য; গোধা, জাম, আম্রের সহিত দুগ্ধ; মৎস্যের সহিত দুগ্ধ; দুগ্ধ, দধি তক্র ও তালের সহিত কদলী; মাসকলাইয়ের সহিত মাদার; জরাম মৎস্য যেমন নোনামাছ; এবং কপোত মাংস সরিষার তৈলে রাঁধিয়া খাইতে নাই। এই সকল বিরুদ্ধ আহার নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর অথবা ঐ সকল আহারেই আমরা সর্ব্বদা রত, তখন আমাদের ব্যাধি হইবে না ত কাহাদের হইবে?

অপিচ পরিভাষাকার গোবিন্দ সেন বলিয়াছেন—

"কৃতান্নঞ্চ কশায়ঞ্চ পুনরুষ্ণীকৃতং ত্যজেৎ)"

পক্ক অন্ন বা কষায় (পাচনাদি) পুনশ্চ উষ্ণ করিয়া কদাচ সেবন করিবে না। অথচ অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে, পূর্ব্ববেলায় উদ্বৃত্ত অন্ন অপর বেলায় চাউলের সহিত মিশ্রিত করিয়া একত্র সিদ্ধ করতঃ পুনঃ অন্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। এবং ডাল তরকারী যাহা পূর্ব্ব বেলায় প্রস্তুত পুনশ্চ ফুটাইয়া সন্তলন করিয়া সেই ডাল ব্যঞ্জন রাত্রে ব্যবহৃত হয়। এই সকলও ব্যাধির উৎপাদক।

যেমন বিভিন্ন জাতীয় বহু প্রকারের মাংস একত্রে আহার করিলে সংযোগ বিরুদ্ধ হয়, তদ্রূপ ঘৃত তৈল বসা মজ্জা প্রভৃতি বিভিন্ন স্নেহ পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও শরীরের অহিতকর হইয়া থাকে।

এখন দেখুন আমাদের আহার্য্য বস্তুর মধ্যে প্রধান উপাদান ঘৃত ও তৈল আজকাল কি উপাদানে প্রস্তুত হইতেছে। যে ঘৃতের অমৃত তুল্য গুণ-সেই ঘৃতে আজকাল কিরূপে ভেজাল চলিতেছে। হয়ত উহাতে মনকরা ১০।১৫ সের ঘৃত বাকি চর্ব্বি ও চীনে বাদামের বা মউয়ের তৈল। বহু স্নেহ পদার্থের বিরুদ্ধ সংযোগ হইয়া এক অপরূপ বিষ খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে, তা আবার সে চর্ব্বি কিসের? মৃত ও পচা জীবদেহ হইতে সেই চর্ব্বি সংগৃহিত--কুকুর শৃগাল ইন্দুর বিড়াল কোন জন্তু আর ফেলা যায় না। উত্তমরূপে প্রস্তুত ঘৃত খাদ্য বা বিষ তাহা আপনারাই বিচার করুন।

আবার প্রধান উপকরণ সরিষার তৈল। আজকাল সে তৈলই বা কিসে প্রস্তুত হইতেছে? কোঁচড়া সোড়গুজিয়া এবং নানাবিধ তৈল-বহুল বীজ হইতে ঝাজ করিবার জন্য লঙ্কা সংযোগে এই অভিনব তৈলের সৃষ্টি হইতেছে। এক্ষণে কোন্ কোন্ ঘৃত ও তৈল ব্যবসায়ী প্রকাশ্যভাবে "ভেজাল ঘৃত" ও "মিশ্রিত সরিষার তৈল" সাইন বোর্ড দিয়া আইনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছেন। তৈল

বা ঘৃত না হইলে বাঙ্গালীর একদিন ও চলে না, কাজেই লোক পয়সা দিয়া বিষ ক্রয় করিয়া খাইতেছে এবং রোগে ভুগিতেছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে কৃত্রিম ঘৃত ও ভেজাল সরিষার তৈলই বেরি-বেরির একটা প্রধান কারণ বলিয়া আমার ধারণা।

চরক বলিয়াছেন—

সংযোগ বিরুদ্ধ আহারে—ক্লীবতা, অন্ধতা, বিসর্প, জলোদর বিস্ফোট, উন্মাদ, ভগন্দর, মূর্চ্ছা, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, গ্রহণী, শোথ অম্লপিত্ত এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। ক্রমে ঘটিতেছে ও তাহাই।

তবে এ স্থলে এক সন্দেহ বা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সংযোগ-বিরুদ্ধ আহারেই রোগ হয়, তবে বহুদিন হইতেই ত আমরা ঐরূপ অসাত্ম্য আহার করিয়া আসিতেছি, এবং কৃত্রিম ঘৃত তৈলাদি ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, তবে এতদিন অন্য ব্যাধি না হইয়া বেরি-বেরি বা শোথরোগ হইতেছে কেন?

"সাত্ম্যাতোঽল্পতয়া ব্যাপি দীপ্তাগ্নেস্তরুণস্য চ।
স্নিগ্ধব্যায়াম-বলিনাং বিরুদ্ধং বিততং ভবেৎ॥"

অভ্যাস হইয়া গেলে (অভ্যস্ত হইলে) অথবা অল্পমাত্রায় ভক্ষণ করিলে দীপ্তাগ্নি স্নিগ্ধ ধাতুবিশিষ্ট ব্যায়ামশীল বলবানের পক্ষে বিরুদ্ধ ভোজনও বিফল হয়, অর্থাৎ শীঘ্র রোগোৎপাদক হয় না। আমরা বহুদিন হইতে এই সকল বিরুদ্ধ ভোজন করিয়া আসিতেছি কাজেই উহাতে অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছি; অপিচ ভেজাল ঘৃতাদি খাইতেছি বটে, কিন্তু তাহা মহার্ঘ বিধায়ে ভুরিমাত্রায় উক্ত দূষিত ঘৃতাদি সর্ব্বদা পড়ে নাই; প্রথম প্রথম স্বাস্থ্য ভাল ছিল, শরীরে বল ছিল, অগ্নির তেজ ছিল কাজেই বিরুদ্ধভোজনে এতদিন রোগ সকল হয় নাই; এখন ক্রমশঃ বলের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নির তেজ কমিয়াছে, আমরা অজীর্ণ ও অম্লপিত্তাদি রোগগ্রস্ত হইয়া হীন বল হইয়া পড়িয়াছি, এখন আর বিরুদ্ধ ভোজন জীর্ণ করিবার ক্ষমতা নাই, কাজেই শরীর রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণ ও শোথান্বিত হইয়া পড়িতেছি। দেশ, কাল, বায়ু ও পাত্র চতুসাগরী যোগ পাইয়া রোগও প্রবল প্রতাপে কার্যক্ষেত্রে নামিয়াছে।

এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বেরি-বেরি যে শোথ রোগই হইতে পারে, (ইহার সহিত অন্য উপদ্রবও বর্ত্তমান থাকে) প্রকার ভেদে তাহা বোধ হয় প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং কি জন্য বা ইহা সংক্রামকভাবে বহুলোকের হইতেছে, তাহারও

অভাস পাইয়াছেন, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লিখিত হওয়ায়, উহার উৎপত্তির কারণের প্রতি মুখ্যজ্ঞান সহজে হইবার জন্য কারণগুলির এ স্থলে পুনরুল্লেখ করিতেছি।

১। পৃথক্ দ্বন্দ্ব সন্নিপাত ত্রিদোষজ ভেদে বাতাদি দোষ হইতে।

২। বিষ ভক্ষণ, বিষ সংস্পর্শ এবং বিষবৎ অনিষ্টকারী সংযোগ বিরুদ্ধভোজনে।

৩। জল বায়ু দেশ কাল ও সাধারণ স্বাস্থ্যের বিকৃতি বশতঃ এই শোথের উৎপত্তি বিস্তৃতি ও মারত্মক।

——:•:——

পূজার গল্প।

(দরিদ্র ব্রাহ্মণের দুর্গাপূজা।)

পল্লীগ্রামের একজন দরিদ্র ভট্টাচার্য্য প্রতি বৎসর ভিক্ষা করিয়া দুর্গাপূজা করিতেন। নিজে প্রতিমা গড়িতেন, নিজেই চিত্র করিতেন, নিজেই পূজা করিতেন, সে বিষয়ে কাহারও সাহায্য লইতে হইত না; কিন্তু পূজার তিনদিন অনেক গুলি গরীব লোককে অকাতরে অন্নদান করিতেন; মা দুর্গার প্রসাদে ভিক্ষার ধনে তাঁহার অপ্রতুল হইত না।

দুর্ভাগ্যক্রমে একবৎসর শ্রাবণ মাসে তাঁহাকে ম্যালেরিয়াধরে, ভাদ্রমাসের শেষ পর্য্যন্ত তিনি শয্যাগত থাকেন; আশ্বিন মাসে একটু একটু আরাম বোধ হয়, কিন্তু অতিশয় কাহিল, দূর দুরান্তরে ভিক্ষা করিতে যাওয়া তাঁহার শক্তির বহির্ভূত।

ব্রাহ্মণ কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, মা-দুর্গার উদ্দেশে করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "মা! জগদম্বে! এবৎসর আমি তোমারে আনিতে পারিলাম না! কি পাপ করিয়াছি, এবৎসর আমার কুটিরে, তোমার অধিষ্ঠান হইবে না! মা! দয়াময়ি! গরীবের প্রতি দয়া কর!"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া দয়া প্রার্থনা করিতে করিতে ব্রাহ্মণের মনে হঠাৎ এক নব-ভাবের উদয় হইল। পুনর্ব্বার তিনি জগৎ জননীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা আমি তোমারে ছাড়িব না; ঘট, প্রতিষ্ঠা করিয়া গঙ্গাজল, বিল্বপত্র সমর্পণ করিব।" আর কিছু করিতে পারিব না, তিনটি দিন তোমার শ্রীপাদপদ্মধ্যান করিয়া মান-

সম্বল কিছুই ছিল না, কিছু সম্বল চাই, তাহাই বা কোথা হইতে আইসে? অকস্মাৎ আকাশ পথ হইতে কি যেন প্রত্যাদেশ হইল, ব্রাহ্মণ উঠিয়া ব্রাহ্মণীর সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, "ভাবনা কি? আনন্দময়ী তোমারে নিরানন্দে রাখিবেন না। তুমি এক কাজ কর। তোমার জামাই বড়-মানুষ, লাঠি ধরিয়া গুটিগুটি তাহার কাছে যাও, দুঃখের কথা জানাও, জামাই অবশ্য তোমার পূজার খরচটি দিবে।"

ব্রাহ্মণ একটু উৎসাহ পাইলেন; জামাইবাড়ীতে কিছু না কিছু পাইবেন, এইরূপ আশা জন্মিল। জামাইবাড়ী সেখান হইতে আটক্রোশ দূর, অত্যন্ত দুর্ব্বল, ততদূর চলিয়া যাইতে পারিবেন কি না, একবার সেই ভয় আসিল; তৎক্ষণাৎ সাহসে ভর করিয়া, দুর্গা দুর্গা স্মরিয়া, একগাছি লাঠি ধরিয়া, গৃহ হইতে বাহির হইলেন; যথাশক্তি হাঁটিয়া হাঁটিয়া, অনাহারে ক্লান্ত হইয়া, দুই দিনে আটক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেন।

সম্মুখে জামাইবাড়ী। ফটকের দ্বারে উপস্থিত হইয়া, ব্রাহ্মণ একবার উর্দ্ধ-দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, তিনটি সহচরের সহিত জামাইবাবু বারাণ্ডার উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। এখনি সাক্ষাৎ হইবে, এই ভরসায় তাঁহার আহ্লাদ হইল, টলিয়া টলিয়া চলিয়া চলিয়া তিনি দেউড়ির নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন।

জামাইবাবুও উপর হইতে গরীব শ্বশুরটিকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে সরিয়া গিয়া, একজন সহচরকে বলিলেন, "ওই সেই শালা এসেছে, কিছু মথিবার চেষ্টা, শালা আমাকে বারবার জ্বালাতন করে। শীঘ্র তুমি নিচে যাও, দরোয়ানদের দিয়ে বল, তারা যেন শালাকে উপরে আস্‌তে না দেয়; বলে যেন, বাবু বাড়ীতে নাই, দেখা হবে না।"

সহচর মোসাহেব ত্বরিৎ পদে দেউড়িতে আসিয়া, দরয়ানদের টিপিয়া দিয়া, তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল, ব্রাহ্মণ তাহা জানিতে পারিলেন না। দেউড়ির জমাদার নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বাবুর আদেশ পালন করিল, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রবেশ করিতে দিল না। তাৎপর্য্য বুঝিতে ব্রাহ্মণের একটুও বিলম্ব হইল না, ভাবিয়া ভাবিয়া জমাদারকে তিনি বলিলেন, "তুমিত আমাকে জান, যাইতে দাও, মেয়েটিকে একবার দেখিয়া আসি।"

ইতস্ততঃ করিয়া জমাদার বলিল, "দাঁড়াও, হুকুম লইয়া আসি।"

জমাদার উপরে গিয়া উঠিল, তখনি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দেখা হবে না, মাজি বেমার।"

ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিলেন; দুইদিনে আসিয়াছিলেন, তিন দিনের দিন বাড়ীতে গিয়া পৌছিলেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া ব্রাহ্মণীকে সকল কথা বলিলেন। নিশ্বাস ফেলিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন, "মহামায়ার মায়া! বুঝিলাম, এ বৎসর আমাদের উপর মহামায়ার দয়া হইল না।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি কিন্তু ছাড়িব না; যেমন করে পারি, মায়ের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিবই দিব।"

পূজার আর দশ-দিন বাকি। ব্রাহ্মণ স্বহস্তে বাঁশ কাটিয়া বাড়ীর বাহিরে একখানি চালা বাঁধিলেন, নারিকেল পাতা দিয়া ছাইলেন, প্রতিমা-গঠন আরম্ভ করিয়া দিলেন, চারিদিন রৌদ্রের উত্তাপে প্রতিমার কাঁচা মাটি শুকাইয়া, রং দিয়া চিত্র করিলেন। গরীব লোকেরা তখন ডাকের গহনা কিনিতে পারিত না, মাটির গহনা ও মাটির কাপড় চিত্র করিয়া দিত। ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন, পায়রার পালক দিয়া প্রতিমার চালাখানি সাজাইলেন, কেবল কার্ত্তিক গণেশকে দুইখানি ছোট কাপড় কিনিয়া পরাইলেন।

পঞ্চমী আসিল। রুগ্নব্রাহ্মণ যথাশক্তি পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। ষষ্ঠির প্রভাত সমাগত। সায়ংকালে অধিবাস হইবে, ব্রাহ্মণ তাহারও আয়োজন করিলেন।

বৈকালে ব্রাহ্মণেরকুটির দ্বারে একখানি পাল্কি নামিল, পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে দুইজন কিঙ্করী। পাল্কিতে কে?—ব্রাহ্মণের কন্যা। কন্যা ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে কিঙ্করীদের সহিত বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন, পাল্কির বেহারারা বিদায় হইয়া গেল। প্রকাশ থাকুক ব্রাহ্মণের কন্যাটির নাম দুর্গা।

কন্যাকে দেখিয়া দরিদ্র-দম্পতির আনন্দের সীমা রহিল না। পিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুর্গা বলিলেন, "বাবা! তুমি গিয়াছিলে, মিথ্যা কথা বলিয়া তাহারা তোমাকে ফিরাইয়া দিয়াছে, শেষকালে আমি তাহা শুনিয়া তাহাদের অমতে নিজেই আমি চলিয়া আসিয়াছি। কোন চিন্তা নাই, সকল লোককে নিমন্ত্রণ কর, বাদ্যকর ডাকাও, খুব ঘটা কর। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি। সমস্ত জিনিষপত্র লইয়া দশজন ভারী আসিতেছে, তাহারা তোমার হুকুম মত সকল কাজ করিবে, চারিজন মিঠাইকর ব্রাহ্মণ আসিতেছে, তিনদিন তাহারা থাকিবে। যত ইচ্ছা তত লোককে তুমি নিমন্ত্রণ কর। কোন চিন্তা নাই, সমস্তই আমি নির্ব্বাহ করিব।"

দুর্গা যাহা বলিলেন, আনন্দ উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। সন্ধ্যা হইল, ডাকঢোল জগঝম্প সানাই বাজিতে লাগিল। ভারীরা ও মিঠাইকরেরা আসিয়া পৌছিল। যথাসময়ে মা-দুর্গার অধিবাস হইয়া গেল। আনন্দে আনন্দে ষষ্ঠি-নিশা সু-প্রভাত।

ষষ্ঠি, সপ্তমী, অষ্টমী, তিন দিন মহা সমারোহ। মিঠাইকরেরা মিঠাই ভাজিল। দুর্গা স্বয়ং রন্ধন করিলেন, শতসহস্রলোক পরম পরিতোষে ভোজন করিল। প্রতি-বাসীরা মহা বিস্ময়াপন্ন।

বিজয়ার দিন ভগবতীর অর্চ্চনা, ভোগ ও সমস্ত লোকের আহারাদি সমাপ্ত হইলে বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় দুর্গাবতী নিজের দুইজন পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরের পুষ্করণীতে অঙ্গ প্রক্ষালন করিতে গেলেন, সূর্য্যদেব রশ্মি সম্বরণ করিয়া অস্তাচলে চলিলেন, তখনও পর্য্যন্ত দুর্গাবতী ফিরিয়া আসিলেন না। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কাতর হইলেন, ব্রাহ্মণী তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "হয়ত পলাইয়া গিয়াছে। না বলিয়া আসিয়াছিল, মনে ভয় ছিল, না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছে। ভাবিলে কি হইবে, মা-দুর্গার কৃপায় কার্য্য উদ্ধার হইল, দশদিন পরে মেয়েকে আবার আনিব।"

নিতান্ত দুঃখিত অন্তকরণে ব্রাহ্মণ বিজয়াকৃত্য—সমাধা করিলেন; বিজয়া রজনীতে বিজয়ানন্দ সম্ভোগ করিতে হয়, ব্রাহ্মণের গৃহে সে উৎসব হইল না; উদ্বেগে উদ্বেগে ব্রাহ্মণ দম্পতি অতিকষ্টে নিশা যাপন করিলেন।

দুই তিন দিন পরে দুইহাঁড়ী মিঠাই লইয়া ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ হাঁটিয়া হাঁটিয়া জামাই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পূজা ফুরাইয়া গিয়াছে, সেদিন আর কেহ প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল না, ব্রাহ্মণ অবাধে সরাসর অন্দর মহলে গিয়া প্রবেশ করিলেন। কন্যার সহিত সাক্ষাত হইল। হাঁড়ী দু-টি নামাইয়া রাখিয়া কন্যাকে তিনি বলিলেন, "মা! যেমন আনন্দ দিয়াছিলে, তেমনি আবার বিষাদে কাঁদাইয়া চলিয়া আসিয়াছ। তিনদিন ছিলে, বিজয়ার দিন কিছুমাত্র মুখে না দিয়া, কোন কথা না বলিয়াই পলাইয়া আসিয়াছ। তোমার গর্ভধারিণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুলা। সেই জন্যই আমি এই কাহিল শরীরে ছুটিয়া আসিয়াছি।

দুর্গাবতীর তখনকার বিস্ময় বর্ণনাতীত। মহাবিস্মিতা হইয়া তিনি বলিলেন, "বাবা! ওসব কি কথা বলিতেছ? কবে আমি গিয়াছিলাম, কবে পলাইয়া আসিয়াছি, কিছুই আমি জানি না। এখানে আমার বাড়ীতে পূজা,—পূজার সময় আমি কোথাও যাই নাই, তুমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখিয়াছ।

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "সে কি কথা মা?" ষষ্টির দিন বৈকালে তুমি গেলে, ঘটা করিয়া আমাকে পূজা করাইলে, এখন সে কথা গোপন করিতেছ কেন? আমি তোমারে উচিত মত যত্ন করিতে পারি নাই, সেই জন্যই কি অভিমান হইয়াছে?"

দুর্গাবতী বলিলেন, "না বাবা! অভিমানের কথা নয়; আমি তোমার পা-ছুঁইয়া বলিতে পারি, সত্য সত্য পূজার সময় কোথাও আমি যাই নাই। তুমি আসিয়াছিলে, তোমার জামাই তোমাকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, আমার সঙ্গেও দেখা করিতে দেয় নাই সেই দুঃখেই আমি বরং কাঁদিয়াছিলাম।"

সহসা যেন ব্রাহ্মণের চমক ভাঙ্গিল! কন্যা বলিলেন, স্বপ্ন, সত্যই যেন স্বপ্ন, ইহাই তখন ব্রাহ্মণের মনে উদয় হইল, কন্যাকে তিনি লইয়া আসিতে চাহিলেন, কন্যা সম্মত হইলেন না; পিতাকে থাকিতে বলিলেন, পিতা তাহা শুনিলেন না; সজল নয়নে বাহির হইয়া আসিলেন।

পথে আসিতে আসিতে বিস্ময়াকুল ব্রাহ্মণ মনে মনে তর্ক করিতে লাগিলেন, কি চমৎকার! কাহার মায়া?—দুর্গা বলিল যায় নাই, তবে কে?—বুঝিতেছি, এ দুর্গা নয়, সেই ব্রহ্মময়ী দুর্গা। মা দুর্গা আমারপ্রতি কৃপা করিয়া, আমার কন্যারূপ ধরিয়া তিনদিন আমার মুখ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন! ময়াময়ীর দয়ার সীমা নাই! ঠিক যেন স্বপ্ন! কিন্তু স্বপ্ন নয়; আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া দীন তারিণী দয়াময়ী দুর্গা, এই খেলা খেলিয়াছেন। ওঃ! আমার কি সৌভাগ্য!

ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ গৃহে আসিলেন; পুলক-পূর্ণ নয়নে ব্রাহ্মণীর ফুল্ল বদন নিরীক্ষণ করিয়া জামাই বাড়ীর সংবাদ বলিতে ছিলেন, অর্দ্ধেক কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই ব্রাহ্মণী বলিলেন, "তাহাই সত্য, তাহাই সত্য,—সত্যই সে দুর্গা আইসে নাই, যিনি ত্রিজগতের দুর্গা, তিনি মায়া করিয়া মায়াখেলা দেখাইয়া গিয়াছেন। নিদর্শন পাইয়াছি। যে ঘরে সন্দেশ মিঠাই সঞ্চিত হইয়াছিল, তুমি চলিয়া যাইবার পর সেই ঘরটি পরিষ্কার করিবার সময় আমি দেখি, এক কোনে কলাপাতা ঢাকা রাশীকৃত স্বর্ণ-মোহর।

ব্রাহ্মণ অকস্মাৎ বসিয়া পড়িলেন; বিস্ময়ে, কৌতূহলে ও অত্যধিক উল্লাসে তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, ক্ষণকাল তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না, ব্রাহ্মণীও যেন অদৃশ্য। ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত।

পাঠক মহাশয়! কি শুনিলেন?—ভাবিয়া দেখুন, অকপট ভক্তির জোর কত! ভক্তবৎসলা মহামায়া ভক্তের নিকট ভক্তিডোরে বাঁধা। এই দরিদ্র

ব্রাহ্মণ আন্তরিক ভক্তিতে বর্ষে বর্ষে ভিক্ষা করিয়া মায়ের পূজা করিতেন, সে বৎসর ভিক্ষা করিতে পারেন নাই, নিজের জামাতা কপটে তাঁহাকে বিমুখ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ভক্তিভাবে পূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। অন্তর্যামী তাহা জানিতে পারিয়া কন্যারূপ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন।

রাশীকৃত মোহর। মা দুর্গার দান, ব্রাহ্মণের আর ভগ্নকুটীর রহিল না, দিব্য অট্টালিকা প্রস্তুত হইল, দাসদাসী রাখিয়া বিপ্রদম্পতি পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। বর্ষে বর্ষে মহা সমারোহে দুর্গাপূজা হইতে লাগিল, বৃদ্ধ বয়সে ব্রাহ্মণী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। সুখের সীমা পরিসীমা রহিল না। হৃদয়ে প্রকৃত ভক্তি থাকিলে এইরূপ সৌভাগ্যোদয় হয়। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'ভক্তি বিনা মুক্তি নাইরে ভাই।' চরমে এই ব্রাহ্মণ দম্পতির অবশ্য সদ্গতি লাভ হইয়াছে, তাহাতে আর কথাটি নাই।

ইলোরার শোভা।

লেখক, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল,

কারু-কার্য্য অপরূপ, মূর্ত্তি হেরি নানারূপ,
কে তোমরা কতকাল, রয়েছ অঙ্কিত?
গিরি গাত্রে স্তম্ভসারি, নর-কীর্ত্তি বলিহারি,
দ্বিতল ত্রিতল গৃহ রয়েছে খোদিত॥
শৈল-দেহে বুদ্ধ মূর্ত্তি, প্রশান্ত বদন স্ফূর্ত্তি,
কতকাল কেটে গেল, রহিয়াছে তপে।
মানবের বংশাবলী, কত এলো গেল চলি,
নাহি আর অবসান গৌতমের জপে॥
কোথা হেরি স্বয়ম্বর, মধ্যে ভোলা দিগম্বর,
পুর-নারী শিরে শোভে বরণের ডালা।
না হয় বরণ শেষ, গৌরী দেবী মুক্ত কেশ,
কেয়ূর কঙ্কণ করে, গলে মুক্তামালা॥
তাণপুরা লয়ে হাতে, সঞ্চালি অঙ্গুলী তাতে,
নীরবে রমণী এক গাহিতেছে গান।

কর্ণে শ্রুত সেই গান, মিষ্ট বটে লাগে তান,
ততোধিক লাগে মিষ্ট, অশ্রুত সুতান॥
কর্ণ না শুনিতে পায়, হৃদয় তন্ত্রীত যায়,
মরম করিয়া ভেদ, পশে সেই গীত।
কে তুমি নব যোগিনী, যৌবনেতে সন্ন্যাসিনী,
অনন্ত যৌবন তব হবে না অতীত॥
শিশু কৃষ্ণ কুতূহলে, চূড়া শিরে মালা গলে,
বেণু বাজাইয়া গোঠে চরাইছে ধেণু।
শিরে কদম্বের ছত্র, নাহি ঝরে কোন পত্র,
ঝরিয়া না পড়ে কভু কদম্বের রেণু॥
কৃষ্ণচন্দ্র বংশীকরে, ধেনুগুলি গোঠে চরে,
সে নীরব গোষ্ঠলীলা নাহি হয় শেষ।
নীরবে বাজিছে বাঁশী, মানস কলুষ নাশি,
কত যুবা কালগত হয়ে পক্ককেশ॥
রাজা এক গজোপরে, ঢাল খাঁড়া ধরি করে,
পাছে পাছে সেনাদল ধায় সারি সারি।
গজবাজী সমাবেশ, যুদ্ধের নাহিক শেষ,
কে হারিল, কে জিনিল, বলিতে না পারি,
তোরা কীর্ত্তি মানবের, পুরাতন জগতের,
প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তি, সুন্দর অমর।
আমরা যাইব চলি, ভবিষ্যৎ বংশাবলী,
ইলোরার শোভা হেরি করিবে আদর॥

নদী।

লেখক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্র।

১

পাষাণের দেহ ভেদি,
ধরণীর গাত্র ছেদি,
চলিয়াছে প্রবাহিনি সাগরে মিশিতে—
দোলাইয়া দেহ-লতা-তাড়িৎ গতিতে

শোভে তব দুইধারে,
শ্যাম ক্ষেত্র তীরে তীরে,
পল্লবিত তরুরাজি রহে থরে থরে,
কুসুমিতা বনলতা তরু শাখা ঘেরে ॥

২

খেলিছে বালকগণ—
কতই উল্লাস মন—
হেথা হোথা সুশোভিত উদ্যান মাঝারে;
কৃষিবল দেয় চাষ ক্ষেত্রের উপরে;
তুমি ওগো প্রবাহিনি
কিছুই না মনে গণি,
নামিতেছ হাঁসি হাঁসি সাগরে মিশিতে,
দোলাইয়া দেহলতা তাড়িৎ গতিতে ॥

৩

মানবের হৃদি ভেদী,
সংসারের গেহ ছেদি
নামিছে জীবন-নদী মরণে মিশিতে,
দোলাইয়া দেহলতা তাড়িৎ গতিতে;
শোভা তার ক্রোড়ে ক্রোড়ে
কতই সংসার ঘিরে
পিতা, মাতা, ভাই, বোন, তাহার ভিতরে;
নারী-লতা নর-শাখা রহে ঘেরে ঘেরে ॥

৪

খেলিছে মানবগণ—
কতই উল্লাস মন
মোহ ভুলে হাঁসিমুখে সংসার মাঝারে,
ছড়াইয়া আশা-বীজ হৃদয় উপরে।
তুমি ওগো প্রবাহিনি
কিছু না মনে গণি
চলিয়াছ হাঁসি হাঁসি মরণে মিশিতে,
দোলাইয়া দেহ তব তাড়িৎ গতিতে ॥

—:০:—

সমালোচনা।

দুর্গা।—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অন্তর্গত স্তবমালা অবলম্বনে সরল উপন্যাসচ্ছলে এই পুস্তকখানি বিরচিত হইয়াছে। চণ্ডীর স্তবের অবিকল বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ সহজ সাধ্য নহে, পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিশেষ যত্নে বিশদ্ ভাষায় দুর্গামহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা পরম সুখী হইলাম। ভাষা এত সরল হইয়াছে যে, বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতা অনায়াসে তাহা পাঠ করিয়া অর্থবোধ করিতে পারিবেন। দুর্গাভক্তিতে ভক্ত-হৃদয় নৃত্য করিতে থাকিবে। আমরা আশা করি, এই শরৎকালে আনন্দময়ীর আগমনে বঙ্গবাসী পাঠক মহাশয়েরা বঙ্গবাসী পাঠিকা ঠাকুরাণীরা এই দুর্গামহিমা পাঠে আনন্দামৃত পানে পরম পরিতোষ লাভ করিবেন; অভক্তহৃদয়েও ভক্তির সঞ্চার হইতে পারিবে।

মুলুকচাঁদ।—শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র প্রণীত। মূল্য আট আনা। এখানি উপন্যাস। মুলুকচাঁদের চরিত্র অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে, ভাষা প্রাঞ্জল, বর্ণনাও সুন্দর, নদীতীরে দুটি বালকবালিকার শেফালিকা পুষ্প সংগ্রহ বৃত্তান্তটি অতি চমৎকার হইয়াছে। শেষের কবিতাগুলিও উপদেশগর্ভ।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা।—শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত, শোভারামবসাকের ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মল্লিক স্বীয় পরলোকগতা জননীর স্মরণার্থ এই গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুগৌরাঙ্গ-দেব, প্রভুনিত্যানন্দ ও গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি পরম ভাগবত বৈষ্ণবগণের বন্দনা-মালা এই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট। বন্দনাগুলি ভক্তিরসোদ্দীপক এবং প্রকৃতিসঙ্গত। পণ্ডিতপ্রবর অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বিষ্ণুভক্তি ও রচনা প্রণালী বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের অবিদিত নাই! বিশেষ করিয়া তাহার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। বৈষ্ণবধর্ম্মে যাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, এতৎপাঠে তাঁহারা আনন্দ-লাভ করিবেন।

নারায়ণী।—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। সিপাহী বিদ্রোহের সম-কালীন ছোটনাগপুরের একটী ঘটনা উপলক্ষ করিয়া এই উপন্যাস বিরচিত হইয়াছে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপন্যাস প্রণয়ন এই প্রথম, তথাপি ইহার রচনা, ভাব ও ভাষা সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় অনুরাগ ও চিত্তাকর্ষক।



"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৭শ বর্ষ।	১৩১৬ সাল, আশ্বিন।	৬ষ্ঠ সংখ্যা।

কবিত্ব।

লেখক, শ্রীমোহিত লাল মজুমদার।

প্রত্যেক সভ্য জাতির জীবনে যে অনেকটা কবিত্ব আছে,—শুধু তাহার সাহিত্যে নহে,—তাহার ধর্ম্মে, তাহার কথায়, তাহার কার্য্যে এবং তাহার চিন্তায়, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। মানব-হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি এই কবিত্বের দ্বারাই পরিপুষ্ট, মনুষ্যত্বের সর্ব্বপ্রধান উপাদানও এই কবিত্ব। আমি এই কবিত্বকে বলি—বাহ্য-জগতের সহিত অন্তর্জগতের স্বভাবগত সামঞ্জস্য, যাহা সৃষ্টির প্রতি ক্ষুদ্র কোণে স্ফুট ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে, যাহা ক্ষুদ্র তৃণ হইতে মানবের আত্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র একটা আত্মীয়তা-সূত্র প্রসারিত করিয়াছে; এক কথায় যাহা বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরতম সত্য—একটা সুন্দর সু-বিপুল একতান তাহাই কবিত্ব।

আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিব কিনা জানি না; বস্তুতঃ ইহা বাক্যের দ্বারা নির্দ্ধারণের অতীত। যে অনধিগম্য নিয়মের প্রমাণ, গ্রহ-উপগ্রহের অশ্রান্ত সুনিয়ত উদয়ে এবং অস্তগমনে, আমরা দেখিতে পাই; যাহা অনন্তকালের মধ্যে তাহাদিগকে কক্ষচ্যুত করে নাই, যাহা বৎসরের পর বৎসর লইয়া আসে, ঋতুগুলিকে এক্রাদিক্রমে ঘুরাইয়া দেয়, যাহা ফলে-পুষ্পে, আলোক আঁধারে, বিম্বে-প্রতিবিম্বে, তরলে ঘনে, হ্রসে-দীর্ঘে একটা গুহ্যতম একতার পরিচয় দেয় এবং সর্ব্বশেষে যাহা জড় হইতে সচেতনে একটা সহানুপ্রাণতা প্রবাহিত করে, তাহাই কি কবিত্ব নহে? ইহা সনাতন—ইহাই বিশ্বের সুর; মনুষ্য-হৃদয়ে ইহার উপলব্ধিকেই আমরা কবিত্ব বলি।

জানি না সে পুণ্যমুহূর্ত্ত অতীতের কোন্ অঙ্ক সুশোভিত করিয়াছিল, যখন প্রকৃতির মোহন-ভীষণ ছবিগুলি কোন মানব-সন্তানকে অব্যক্ত আনন্দ-বিস্ময়ে অভিভূত ও আত্মহারা করিয়াছিল,—অভ্রভেদী বিরাটগম্ভীর শৈলশৃঙ্গ, কলমুখরা স্রোতস্বিনী, উন্মত্ত বেলাতাড়িত সাগর-তরঙ্গ, অথবা বিচিত্র বর্ণের শিশিরসিক্ত পুষ্পরাশি তাহার প্রাণে একটা বিপুলতা ও মাধুর্য্যের আভাস জাগাইয়াছিল! সে কবে? সভ্যতার নির্ম্মল প্রভাতেরও বুঝি আগে! যখন প্রাণে শিশুর মত সারল্য ও বিশ্বাস ছিল, যখন হৃদয়ে একটা স্বচ্ছতা ও কোমলতা ছিল, বিজ্ঞতালোক উদ্ভাসিত হয় নাই, তখনই বুঝি কবিত্বের বিকাশ হইয়াছিল। Aristotle এই সরল কবিত্ব-প্রবণতার একটী সুন্দর কাল্পনিক চিত্র দিয়াছেন। মনে করুন, গর্ত্তে শিশু একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তারপর যখন ঊষার পূর্ব্বদিক অরুণিভ করিয়া স্নিগ্ধ-লোহিত রাগে সূর্য্য উঠিতেছে, তখন তাহাকে একেবারে সম্মুখে স্থাপন করুন! কি অপূর্ব্ব মহান্ দৃশ্য! এ কোথা হইতে আসিল! কে আনিল! তখন কি তাহার সর্ব্বশরীর একটা অজ্ঞাত মহিম-জ্ঞানে অনির্ব্বচনীয়তার বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে না? শুধু তাহাই নহে, একটা মহোচ্চ শক্তি ও বিরাট প্রভুত্বের চেতনায় সে তৎক্ষণাৎ অভিভূত হইয়া আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণত করিয়া দিবে। আমরা ত' সেই সূর্য্যোদয় প্রতিদিন দেখিতেছি, আমাদের কাছে তাহা নিত্য-নৈমিত্তিক। আমরা এই মানবটির মত ইহার আদিকারণ নির্দ্দেশে তেমনই অসমর্থ, কিন্তু তবুও তাচ্ছিল্যভরে তাহাকে 'স্বাভাবিক' এই আখ্যা প্রদান করিয়া, আমাদের চিন্তা হইতে দূর করিয়া দিয়াছি। এই কবিত্বপ্রবণতার আর একটি বাস্তব চিত্র আমরা দিতে পারি। শিশুকে যখন সন্ধ্যাকাশে নবোদিত পূর্ণচন্দ্র

দেখান হয়, তখন কি তাহার মুখের দিকে কেহ তাকাইয়াছেন? সেই বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ দুটি! ঈষৎ বিযুক্ত ওষ্ঠাধর,—আর তাহার প্রান্ত হইতে প্রবাহিত হাসির ধারায় উচ্ছলিত মুখখানি দেখিলে কি মনে হয় না যে, তাহার ক্ষুদ্র শিশুহৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় কবিত্বরসে আপ্লুত হইয়া গিয়াছে? ইহাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতা হইতে দূরে আসিয়া আমরা ঈশ্বর হইতেও দূরে আসিয়া পড়ি।

মনুষ্য-মাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে কবি হইলেও প্রকৃত কবি ঈশ্বরানুগৃহীত, প্রকৃত কবিত্ব-শক্তি ঈশ্বরের দান। তাই সারল্য, আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও বিশ্বাস প্রভৃতি কবিজীবনের সম্পত্তি। পরিণত বয়সেই কপোতবধূর বিরহ-কাতরতায় কবিগুরু বাল্মীকির হৃদয় মথিত করিয়া বাণীময় ছন্দ নিঃসৃত হইয়াছিল। উল্লেখ-বিরল হইলেও জগতের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা নিশ্চয় ঘটিয়াছে। কি সুন্দর! ইহাই ত কবির হৃদয়! কি গভীর সহানুভূতি! কি মহান্ অন্তর্বেদন! অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই স্বতঃ প্রতিবাদ—ঋষিকণ্ঠোচ্চারিত অভিশাপোক্তি, ইহার মূল কোথায়? সরল কবিত্ব-প্রবণতায়।

এখন কবি কে? এক কথায় যাঁহার গূঢ় অন্তর্দৃষ্টি আছে, (অবশ্য এই অন্তর্দৃষ্টি সারল্য সহানুভূতি প্রভৃতি কবিগুণ প্রসূত) বস্তুর মধ্যে যিনি Harmony বা সামঞ্জস্য দেখেন, বাহ্য প্রকৃতির অন্তরালে যিনি সঙ্গীতের আভাস পান—বিশ্বরাগিণীতে যিনি আত্মহারা। কবির কথায় বলিতে হইলে,—কবি সেইজন—

যে জন শুনেছে সে অনাদিধ্বনি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়-তরণী
জানে না আপনা জানে না ধরণী
সংসার কোলাহল।

যিনি সেই রাগিণীতে তন্ময়;—

যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া
হোমশিখা সম উঠিছে কাঁপিয়া
অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া
বিশ্বতন্ত্রী হ'তে;
যে রাগিণী চির জন্ম ধরিয়া
চিত্ত-কুহরে উঠে কুহরিয়া
অশ্রু হাসিতে জীবন ভরিয়া
ছুটে সহস্র স্রোতে।

তিনিই কবি ;—কিন্তু কথাটার আরও বিস্তারিত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। টেনিসন তাঁহার নবজাত পুত্রে দেখিয়াছেন—সৌরজগতের একটি যমজ ভ্রাতা। জগতের যে আদি-কারণপুঞ্জের ঘূর্ণাবর্ত্তে বিধূনিত হইয়া এই সৌরজগত প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহার শিশুপুত্রটির আগমন-কারণও সেইখানে নিহিত আছে। বাস্তবিক, জড়জগতের সহিত চেতন-জগতের এমন একটা নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যেন একটার ভিতরে যাহা গুমরিয়া উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছে, অপরের মধ্যে তাহার একটু না একটু ক্ষীণতর প্রতিধ্বনিও বর্ত্তমান আছে। বাহ্য প্রকৃতির সহিত মানবের অন্তঃপ্রকৃতির একটা নিকট আত্মীয়তা আছে ; কবি-হৃদয়ে ইহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। প্রকৃতির এই বিচিত্র বিশাল প্রসার যে বিধাতার অপূর্ব্ব ও দুর্ব্বোধ্য লিখন, তাহা আমরা বুঝি না ; কিন্তু কবি ইহাকে ভাল বাসেন তাই বুঝেন। গেটের কথায় তাঁহার কাছে ইহা Open Secret বা স্পষ্ট-রহস্য। নক্ষত্রখচিত আকাশ হইতে মৃত্তিকাজাত ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড পর্য্যন্ত যে বাহ্য-আবরণে এই ঐশ রহস্য আবরিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহার অগোচর নহে—"তিনি ঈশ্বরের চিন্তাকে' আয়ত্ত করিয়াছেন।

কবির প্রতিভা ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে। সেক্সপীয়ার তাঁহার নিজের সুখ-দুঃখময় জীবন সংগ্রামের মাঝে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই সেই বিরাট মানব-জীবনের ইতিহাস—মানুষের হাসি-কান্না, আশা-দুরাশা, উত্থা-পতন অন্তর্যামীর মত চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। শেলি যে বিশ্বকে একটি অনাদি, অখণ্ড প্রেমের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহার মূলেও সেই কবির অন্তর্দৃষ্টি। তাহা ছাড়া কবি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, সেই যুগের ইতিহাস তাঁহার ভিতর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। মধ্য যুগের ধর্মপ্রাণতা দান্তের কবি-জীবন অধিকার করিয়াছিল। কবি তাহার প্রভাবে বিশ্বরহস্য-সম্বন্ধে যে গভীর সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার Divina Commediaতে জলন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার চিত্রগুলিও কি জীবন্ত, কি স্পষ্ট ! কবি যেন তাহা চোখের সম্মুখে দেখিতেছেন। কোনও বিখ্যাত সমালোচকের কথায় দান্তের চিত্রগুলি শুধু স্পষ্ট নহে ; অন্ধকার রাত্রে অগ্নিশিখার মত, কিম্বা অনন্ত তমসকলকে ইন্দ্রধনুবর্ণে চিত্রিতের মত ! ইহাও কবির হৃদয়ের গভীরতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক।

বাস্তবিক বিশ্বের এই প্রচ্ছন্ন রাগিণীর প্রতিধ্বনি যাঁহার হৃদয় হইতে বাহির হইয়া সমসাময়িক মানবের চিন্তায় এক একটি মহান্ ভাবের বন্যা ছুটাইয়াছে ;

তিনিই কবি। কবি এবং ঋষি বা prophet একই, উভয়েই জগৎরহস্যের অর্থকারক—মহাসত্যের প্রচারক। তবে prophet ঐ রহস্য হইতে মঙ্গল অমঙ্গল ও কর্ত্তব্য-ধারণাটুকু প্রচার করেন, কবি তাহার ভিতর যে বিশ্বোন্মাদকারী সৌন্দর্য্যের আভাস পান, তাহারই ধ্যানে নিমগ্ন, তাহাই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন। Wordsworth নিম্নলিখিতরূপে এই ধ্যান বর্ণনা করিয়াছেন:—

"That serene and bless'ed mood,
In which th'affections gently lead us on,—
Until, the breath of this corporeal frame,
And even the motion of our human blood
Almost suspended, we are laid asleep
In body, and become a living soul;
While with an eye made quiet by the power
Of harmony, and the deep power of joy,
We see into the life of things."

—বাস্তবিক কবি এবং কবিত্ব-সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু বলা যায় না।

poetry বলিতে কবিত্ব ও কবিতা উভয়ই বুঝিতে হইবে। কবিত্ব ও কবিতা যে ভিন্ন জিনিষ, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। কবিত্ব প্রাণে, কবিতা ভাষায়। সকলে কবিতা লিখিতে পারে না, কিন্তু সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে কবি। মানুষের প্রাণের অতি সামান্য ভাবগুলিও কবিত্ব-প্রসূত; কিন্তু এই ভাবগুলিকে ভাষায় ছন্দোবদ্ধ করিতে সকলের ক্ষমতা নাই; তবে ভাবগুলি যত গভীর হইবে, ততই আপনা আপনি ছন্দোময় হইয়া উঠিবে। গভীরতার সহিত একটা সুর নিত্যসংযুক্ত আছে; তাই প্রকৃত কবিকে অর্থাৎ যাঁহার ভাবগুলির যথেষ্ট গভীরতা আছে, তাঁহাকে ছন্দের জন্য খুব চেষ্টা করিতে হয় না; আবার যাঁহাদের ভিতর কবিত্বের গভীরতা নাই, তাঁহারা অনৈসর্গিক উপায়ে ছন্দ রচনা করিতে গিয়া বিড়ম্বিত হন। সকলের ভিতর কবিত্ব ব্যক্ত করিবার একটা চেষ্টা আছে। কবিতা নামে সভ্যজাতির সাহিত্য ও ভিন্ন ভিন্ন যুগের বিবিধ বিবিধ কলাবিত্তায় তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

কবিত্ব অনাদি, অনন্ত, পূর্ণ এবং নিত্য। বিশ্বচিত্রে তাহা পূর্ণ ব্যক্ত, কবির লিখনে তাহার আংশিক ও মহাকবির কাব্যে তাহার প্রায় স্পষ্ট বিকাশ পায়।

এদিকে কবিতার যাহা ছন্দ, কবিত্বের তাহা সঙ্গীত—ইংরাজীতে ইহাকে Music বা Melody বলে। সঙ্গীত মূল, ছন্দ তাহার শাখা; অথবা সঙ্গীত উপাদান, ছন্দ বিভিন্ন প্রকারের গঠন মাত্র। আমরা যে বিশ্বরাগিণীর কথা বলিয়াছি, তাহাই কবিত্ব; ইহাই বৈদিক ঋষির সামগান—ইহারই উপলব্ধি কবির প্রাণের প্রথম মূর্চ্ছনা—কবিত্বের প্রথমোন্মেষ। গম্ভীর সাগর-কল্লোলে, বসন্ত-বায়ুর মধুরোচ্ছ্বাসে, পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্নাধারায় ইহার নীরব এবং সরব প্রতিধ্বনি পাইবে; উন্নতানত গিরিশৃঙ্গে, উচ্ছ্বসিত সিন্ধুর তরঙ্গভঙ্গে, এমন কি মানব-জাতির ভিতর নৃত্যে ইহাকে মূর্ত্ত দেখিবে। তাই কবি যখন বলেনঃ—

"To me
High mountains are a feeling."

কিম্বা,

"There's a pleasure in the pathless woods
There's a rapture on the lonely shore."

তখন আমরা বুঝি তিনি এই বিশ্বব্যাপ্ত সঙ্গীতকে পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছেন। বস্তুতঃ যদি এমন কিছু থাকে, যাহা বিশ্বের মানব প্রাণকে সমভাবে একটী একতানে আকর্ষণ করে, তবে তাহা সঙ্গীত। কার্লাইল বলেন, এই সঙ্গীত আমাদের বাক্যোচ্চারণে—এমন কি accent অর্থাৎ হ্রস্ব দীর্ঘ মাত্রায় পর্য্যন্ত আছে। তাহার মধ্যে যথেষ্ট আবেগ ও ভাবের গভীরতা থাকিলে, গদ্য ও পদ্য হইয়া উঠে। কার্লাইলের নিজের রচনাই ইহার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। কবিতা পাঠ করিবার সময় মিষ্ট ছন্দে শ্রবণতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবটি তাহাতে গ্রথিত হইয়াছে, তাহা সুন্দর এবং গভীর কিনা বুঝিতে সতর্ক থাকি, কিন্তু সঙ্গীতের অন্তরালে একটা গম্ভীর প্রাণস্পর্শী ভাব সদাই জাগ্রত রহিয়াছে;—মিষ্ট সুর আমাদিগকে সত্যই অজ্ঞাতে বিহ্বল করিয়া তোলে। কবিতা পাঠ করিতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক চিন্তাশীল ব্যক্তিই অধিকারী, কিন্তু বিশ্বসভায় সঙ্গীতের আলাপন হইতে পারে।

আবার কোন জাতির সাহিত্যের ইতিহাসে পদ্য ও গদ্যের স্থান আলোচনা করিলে এতদূর যাহা বলা হইয়াছে তাহারই স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাই। সাধারণ বিষয় হইতে যাহা কিছু উচ্চতর ও গভীরতর এবং যাহা কিছু সুন্দর, তাহা প্রাচীন মানবের কণ্ঠে পদ্যে উচ্চারিত হইয়াছে। প্রমাণস্বরূপ গ্রীক পুরাণ, Scandinavian দিগের সাগা (Saga) সাহিত্য, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায়

সমগ্র অংশ ও যাবতীয় প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। গদ্যটা কিছু আধুনিক, যেন কৃত্রিম উপায়ে মাজিয়া ঘসিয়া খাড়া করা হইয়াছে। আর পদ্য? তাহা যেন আপনা আপনি আসিয়া পড়িয়াছিল। তাই মনে হয়, আমরা যেন সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকতা হইতে ক্রমে দূরে যাইয়া, কৃত্রিমতাকে প্রাণপণে আশ্রয় করিতেছি। যাহা আমাদের ছিল, সেই সারল্য ও বিশ্বাস, সেই ভক্তি ও কবিত্ব প্রবণতা, যাহা ক্ষুদ্র নীহারবিন্দুতে একটা অনন্তের আভাস ও ঐশ মহিমা হৃদয়ঙ্গম করাইত—তাহা আমরা হারাইতেছি।

আমরা এক্ষণে মানবহৃদয়ে কবিত্বের ও তৎসঙ্গে চিন্তার ক্রমানুবদ্ধ-ইতিহাসের একটি যথাসম্ভব চিত্র দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আদি মানব-সমাজে প্রথম চিন্তাবিকাশের মূলে যে বাহ্য প্রকৃতির পূর্ণ প্রভাব ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। মানুষ যখন তাহার পশু-প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়াছে, পাশব স্বভাব যখন তাহার চিন্তাকে অধিকার করে না, তখন সে মুক্ত প্রকৃতির অতি সম্মুখে দাঁড়াইল। আবর্ত্তমান জ্যোতিষ্কপুঞ্জ, আলোক, আঁধার, বিচিত্র কলরোল তাহার প্রাণের ভিতর এক অননুভূত পূর্ব্ব-ভাবের উদ্রেক করিল; কিন্তু তখনও ভাষা সম্পূর্ণ হয় নাই, কত ভাবের তরঙ্গ জাগিল, ডুবিল। ক্রমে ভাবগুলি ঘনীভূত পুঞ্জীভূত হইয়া নিত্য ব্যবহৃত নীরস শব্দসঙ্কেতের মত এলোমেলো কথাগুলির সহিত একটা সুর সংযুক্ত করিয়া দিল।*

---

* সঙ্গীতের উৎপত্তি সম্বন্ধে হাবার্ট স্পেন্সার বলেন,—"আবেগময়ী বক্তৃতায় বক্তা কণ্ঠস্বর কখনও উচ্চ কখন নিম্ন করিয়া যে এক প্রকার সুরের সৃষ্টি করেন, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, সঙ্গীতের প্রথম বিকাশ এই ভাষার উদ্দীপনায়; কিন্তু কথা হইতেছে, এই সুর কেন আবেগময়ী বক্তৃতায় ব্যবহৃত হইল। অন্য কোন পদার্থ না থাকায় আমরা ডারউইন্ (Darwin) এর মত এস্থলে গ্রহণ করিতে পারি। তিনি বলেন, "মানবজাতির জন্মদাতা আদি পুরুষ বা স্ত্রী অন্যোন্যকে মুগ্ধ করিবার জন্য কতকগুলি বিচিত্র সুর প্রাপ্ত হইয়াছিল।" তাহা হইলে মনুষ্য-হৃদয়ের সর্ব্বপ্রধান বলবতী বাসনার সহিত সঙ্গীতের একটা নিকট সম্পর্ক আছে এবং সেই জন্য হৃদয়ের আবেগ ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে, সুর ব্যবহার করিতে হইবে।

ইহাই কবিত্বের প্রথম প্রকাশ। ক্রমে ভাষার উন্নতি হইল; ভাবগুলি তখন একে একে ব্যক্ত হইয়া সুপরিণত হইলে, সুর হইতে একটু দূরে গিয়া আপনাপন উপযোগী ছন্দ গঠন করিয়া লইল। তারপর আদি কবি এবং ভাবুক প্রাকৃতিক সমস্ত ব্যাপারেই তাঁহার সরল বিশ্বাস লইয়া একটা ঐশ্বরিক ভাব প্রত্যক্ষ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জগতের ও মানবজীবনের একটা অর্থের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন বহু প্রাকৃতিক দেবদেবীর অস্তিত্ব ও উপাখ্যানবার্ত্তা ভণিত হইল। এই বিশ্বাসে কতকাল গেল, এদিকে সৌন্দর্য্যবোধ ও কবিত্বের ক্রমবিকাশ অগ্রসর হইতে লাগিল। সৌন্দর্য্যকে কবিতা অপেক্ষা আরও কিছু স্পষ্টতর মূর্ত্তি প্রদান করিবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইল; তখন নানাবিধ কলা-বিত্তার জন্ম ও ক্রমোন্নতি আরম্ভ হইয়া গেল। কল্পনা, কবিত্ব ও সৌন্দর্য্যবোধ এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মজীবন গঠিত করিয়া তুলিল। পুরাণবর্ণিত স্বগবাসী দেবতাদিগের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ মর্ত্ত্যবাসীর বিস্ময়রোমাঞ্চের সৃষ্টি করিল।

তারপর সে যুগও কাটিয়া গেল, ভাবনা ও কবিত্বে একটা পূর্ণ পরিণতি আসিল। ভাবুক তখন বুঝিয়াছে, এই বিশ্বসংসার একই সুরে বাঁধা, একই সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম সর্ব্বত্র তাহার মঙ্গলময় শাসন বিস্তার করিতেছে। এই ভাবটা যখন মানুষের প্রাণে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তখন সেই মিলিত-হৃদয়গীতির প্রতিধ্বনি লইয়া কোনও ঋষিকবি আবির্ভূত হইয়াছেন এবং মহান্ অদ্বৈতবাদের ভেরী বাজাইয়া মানবকে স্তম্ভিত ও জগতে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। ইহাই শ্রেষ্ঠ কবিত্বের বা মহান্ ভাবের ভাবুকতার চরমোৎকর্ষ। ইহার পর কবিত্বের ক্রমাবনতি এবং ইহাই স্বাভাবিক। একটা ভাব যখন উচ্চতম মাত্রায় পৌঁছিয়াছে, তখন মানবের চিরচঞ্চল নূতনত্বাভিলাষিনী ভাবনা একটা নূতন পথে ধাবিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, অবিশ্বাস কাপট্য ও জ্ঞানাভিমান জগতের বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে মানব-হৃদয় আক্রমণ করিয়াছে। ঋষিকণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্রে আমরা আর সে ভাবোদ্দীপ্ত হৃদয়ের মহান্ আবেগের চিত্র দেখি না—আমাদের কাছে তাহা জড় কথার সমষ্টি! তাহার সহিত যে অনাদ্যনন্তের মহিমা গান ধ্বনিত হইতেছে, তাহা আমরা আর শুনিতে পাই না। আমরা সে সরল কবিত্ব-প্রবণতা হারাইয়াছি। যাহা প্রাণের দ্বারা বুঝিতে হইবে, তাহা বুদ্ধি ও মস্তিষ্কচালনার দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করি। আমাদের প্রাণের ভিতর যে সুর আপনা আপনি বাজিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে কোনও রূপে স্তম্ভিত করিয়া কৃত্রিমতার সুদীর্ঘ জাল বয়ন করিতেছি।

স্বপ্ন লব্ধ।

লেখক, শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসু।—

এফ, এ, ফেল হইয়া ভাবিলাম কৃতবিদ্য হইয়াছি। সুতরাং এক বন্ধুর সহিত কাশী বেড়াইতে চলিলাম। সঙ্গে চিরসহচর ভৃত্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস ওরফে কেষ্ট। কাশীধামে মাসিমাতা ঠাকুরাণী বাস করেন, ত্রিমূর্ত্তি তাঁহার স্কন্ধে গিয়াই ভর করিলাম। দারুণ গ্রীষ্ম, কাশীতে তখনও বর্ষা আরম্ভ হয় নাই, সমস্ত দিন ছট্ ফট্ করিয়া শেষে সন্ধ্যাকালে দুই বন্ধুতে ঠিক করিলাম যে, অদ্য রাত্রে গৃহে শয়ন/অসম্ভব। সন্ধ্যার পর শীতল বায়ুর অনুসন্ধানে দুইজনে গঙ্গাতীরে গেলাম। কৃষ্ণচন্দ্র তখন কালাচাঁদের প্রেমে মগ্ন। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বসিয়া দেখিলাম যে, গঙ্গার ঘাটের উপরেও বাতাসের অত্যন্ত অভাব। বন্ধু ভাবিলেন যে গঙ্গার অপর পারে বাতাস আছে, ও প্রস্তাব করিলেন যে, অদ্যরাত্র নৌকার উপরে কাটান হউক। প্রস্তাব হইবামাত্রই কার্য্যে পরিণত হইল! রাত্রি ১১টার সময় বাসায় ফিরিয়া আহারাদির পর কৃষ্ণকে দুই জনের বিছানা লইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে যাইতে বলিলাম, পরে প্রায় রজনী দ্বিপ্রহরের সময় কাশীর অপর পারের চড়ায় নিকটে একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় নিদ্রাদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে বোধ হইল যে, জাগরিত হইয়াছি ও সূর্য্যোদয় হইয়াছে। নৌকা-খানি একখানি বৃহৎ বজরায় পরিণত হইয়াছে। বজরা-খানি মণিকর্ণিকার ঘাটের নিম্নে বাঁধা আছে। একটি নির্ব্বাণপ্রায় চিতা হইতে উগ্রগন্ধ ধূম আসিয়া নাসিকায় প্রবেশ করিতেছে। ঘাটে নানা জাতীয় স্ত্রী-পুরুষ স্নানে বা পূজাদিতে ব্যস্ত রহিয়াছে। বন্ধু তখনও নিদ্রামগ্ন। হঠাৎ তামাক খাইবার ইচ্ছা হইল, মাঝিকে তামাক সাজিতে বলিয়া একখানি খবরের কাগজের কিয়দংশ লইয়া হুঁকা প্রস্তুত করিতেছি এমন সময় ঘাটের উপরে একটি লোক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ইহার পরই নৌকা হইতে কয়েকজন মাঝি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, একটী বালিকা সন্তরণ করিতে করিতে হঠাৎ তলাইয়া গিয়াছে। ক্রমশঃ অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। অন্বেষণকারীরা বিফল মনোরথ হইয়া একে একে জল হইতে উঠিল। বৃদ্ধ বালিকার নাম করিয়া আরও চেঁচাইতে লাগিল। বিষম একটা গোলমাল উপস্থিত হইল। আর থাকিতে পারিলাম না; নৌকা হইতে নামিলাম। ভাবিলাম একবার জলে নামিয়া অন্বেষণ

করিয়া দেখিতে পাই, ভালই না হয়, প্রাতঃস্নানটা হইয়া যাইবে। পরে গরম বেশী হইলে বাসার নিকটে কোন ঘাটে স্নান করা যাইবে। একটু গঙ্গামৃত্তিকা লইয়া মাথায় মাখিতে মাখিতে জলে নামিলাম ও ধীরে ধীরে স্ত্রীলোকদের ঘাটের নিকটস্থ একটা "রাণার" দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম পরে সাঁতরাইয়া কিয়দ্দূর ঘুরিয়া আসিলাম। "রাণার" গায়ে বজরা বান্ধিবার জন্য বড় বড় লোহার কড়া গাথা থাকে, তাহারই একটা ধরিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। সে স্থলে খুব কম করিয়া বিশ হাত জল হইবে এবং স্রোতও অত্যন্ত খর। ক্ষণেক পরে নরম বালিশের মত কি একটা তলাইয়া ভাসিয়া আসিয়া পায়ে ঠেকিল। পদাঘাতে বোধ হইল, কোন জলজন্তু-ভয় হইল, উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু বোধ হইল কি যেন একটা পায়ে জড়াইয়া গিয়াছে। কড়াটা ছাড়িয়া দিয়া পায়ে হাত দিয়া দেখি একখানা কাপড়। কাপড়ের সঙ্গে যেন কাহার একটা দেহ আসিয়া গায়ে লাগিতেছে। বাল্যকাল হইতেই জলে ডুবিয়া থাকিতে অভ্যস্ত ছিলাম। ডুবিয়া অল্পক্ষণ অন্বেষণের পর একখানা হাত পাইলাম। সে খানা ধরিয়া টানিতেই জলের ভিতর হইতে এক অনিন্দ্য সুন্দরী কিশোরীর দেহ ভাসিয়া উঠিল। দেখিলাম বালিকা সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্যা, তখনও আমরা "রাণা" হইতে চল্লিশ হাত তফাতে আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের দেখিতে পাইয়া দুই তিন খানা নৌকা খুলিয়া আসিল ও একখানা আমাদের তুলিয়া লইল। নৌকার উপরে উঠিয়া বালিকাকে বসাইয়া উঠাইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করাইয়া নানা প্রকারে বালিকাকে বমন করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল, দেখিলাম বৃদ্ধের সঙ্গে দুই তিনজন দরোয়ান ও আরও দুই তিনটি ভদ্রলোক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সকলে মিলিয়া চেষ্টা করার পর বালিকা কতকটা জল বমি করিয়া ফেলিল। তাহাকে একখানি ডুলি করিয়া গৃহে লইয়া যাওয়া হইল, আমিও নৌকার দিকে চলিলাম। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি সেই আর্ত্তনাদকারী বৃদ্ধ ও অপর একটি প্রাচীন ভদ্রলোক আমার অনুগমন করিতেছেন। নৌকায় উঠিয়া দেখি বন্ধুবরের নিদ্রা তখনও শেষ হয় নাই। প্রথমেই মনে হইল লোকটা নিশ্চয়ই নেশা করিয়াছে, কারণ সে সময় রৌদ্র প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। বন্ধুকে উঠাইয়া বাসায় ফিরিবার বন্দোবস্ত করিতেছি এমন সময় দেখি যে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধদ্বয় নৌকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, বন্ধুবর উঠিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কে? উত্তরে আমি সমুদায় ঘটনা বলিলাম। বর্ণনা শেষ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে

তীর হইতে প্রাচীন ভদ্রলোকটি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "মহাশয়! অনেক ক্ষণ আর্দ্রবস্ত্রে আছেন, আর বিলম্ব করিলে অসুখ হইতে পারে।" ইহার পর মালির স্কন্ধে বিছানা গুলি দিয়া উভয়ে বাসার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি, এমন সময় প্রাচীন ভদ্রলোকটি নিকটে আসিয়া অনেক অনুনয় বিনয়পূর্ব্বক আমাদিগকে তাহার সহিত যাইতে বলিলেন। পরিচয়ে জানিলাম আমি যে বালিকাটিকে উদ্ধার করিয়াছি সে তাঁহার পৌত্রী ও আর্ত্তনাদ-কারী বৃদ্ধটি তাঁহার পুরাতন ভৃত্য। ভৃত্য সমভিব্যাহারে স্নানে আসিয়া সন্তরণ কালে পায়ে কাপড় জড়াইয়া বালিকা ডুবিয়া গিয়াছিল। বালিকার মাতা ও পিতা তাহার শৈশবেই পরলোক গমন করিয়াছেন। বৃদ্ধ সপরিবারে একমাত্র পৌত্রীকে লইয়া তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়াছেন। কথায় কথায় আমরা চকের দিকে বৃদ্ধের বাসার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বৃদ্ধ একটি হিন্দুস্থানীর নাম করিয়া ডাকিবা মাত্র একজন বৃহদাকার দরোয়ান কবাট মুক্ত করিয়া দিল ও আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম, প্রবেশ করিয়া দেখি যে "বাসাটী" একটী বৃহৎ-অট্টালিকা চারিদিকে হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী দাস দাসীগণ ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। বৃদ্ধ আমাকে ত্রিতলের এক প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। আমি কাপড় ছাড়িয়া সেখানে বসিলাম। কতক্ষণ পরে একটী দাসী-জল খাবার লইয়া আসিল। জলযোগ শেষ হইলে গৃহস্বামী আসিয়া অনেকক্ষণ নানাবিধ গল্প করিতে লাগিলেন ও ক্রমে ক্রমে আমার পরিচয় জানিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি আমার পিতার নিকটে কোন বিশেষ কারণে অত্যন্ত ঋণী আছেন। পরে তিনি বালিকার উদ্ধারের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন ও বলিলেন যে, আমি যদি ধনীর সন্তান না হইতাম, তাহা হইলে তিনি যথাসাধ্য অর্থদানে আমার মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতেন। দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে উভয়ে আহারার্থ অন্দর মহলে গেলাম। আহারান্তে একজন দাসী আসিয়া বলিল যে, গৃহিণী আপনাকে ভিতরে ডাকিতেছেন। তাহার সহিত ভিতরে গিয়া দেখিলাম যে, একটী বৃহৎ গৃহে শয্যা রচিত হইয়াছে। বৃদ্ধা গৃহিণী আমাকে বসিতে বলিয়া নানাবিধ সদালাপের পর একটী আশ্চর্য্য প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। তিনি বলিলেন যে, "যখন বালিকার জীবন আমি রক্ষা করিয়াছি, তখন উহাকে আজীবন রক্ষা করিবার ভার আমারই লইতে হইবে। প্রস্তাব শুনিয়া আমার যেন বাক্-রোধ হইয়া গেল। আমাকে লজ্জিত দেখিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, যে, "তাহার এই অনুরোধ আমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। নতুবা তিনি অনাহারে

প্রাণত্যাগ করিবেন" ইত্যাদি। ইহার পর তিনি চলিয়া গেলেন ও সেই পূর্ব্ব পরিচিতা বালিকাটির হাত ধরিয়া লইয়া আসিলেন। তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া তিনি গমনোদ্যতা হইলে, আমিও উঠিলাম, কিন্তু তিনি দিব্য দিয়া আমাকে বসাইয়া বলিলেন যে, "চির জীবন যাহার সহিত একত্রে চলিতে হইবে, তাহাকে পূর্ব্বেই ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া উচিত ; পরে যেন তাহাকে নিন্দা না করি। ভাবিলাম, কোর্টসিপ করিতেছি। বড়ই স্ফূর্ত্তি হইল। ইহার পর বৃদ্ধা চলিয়া গেলে বালিকাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। আমি কথা কহিবা মাত্র বালিকা যেন আরও জড়সড় হইয়া গেল। দুই তিনবার জিজ্ঞাসার পর কি একটা নাম বলিল। তাহার নামটি মনে নাই বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মনে আছে যে, নামটি দুই অক্ষরে ও অত্যন্ত কোমল। তাহার পরে সে কি পড়ে, তাহাদের বাটী কোথায়, দেশের কাহারও জন্য তাহার মন কেমন করিতেছে কি না, ইত্যাদি নানারূপপ্রশ্ন করিয়া বালিকার হাত দেখিতে চাহিলাম ; বাল্যকালে বটতলার সামুদ্রিক গ্রন্থ পড়িয়া গণনায় পারদর্শী হইয়া ছিলাম (অন্ততঃ নিজের কাছে)। বালিকা এতক্ষণ অতিকষ্টে উত্তর করিতে ছিল, হাত দেখিতে চাহিলে, সে আরও সঙ্কুচিতা হইল। অনেকক্ষণ পরে বালিকা বহুকষ্টে মৃণালের ন্যায় শুভ্র ও কোমল একটুখানি ক্ষুদ্র হস্ত বাহির করিয়া দিল। তাহার হস্ত স্পর্শ করিবামাত্রই আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এমন সময়ে দূরে কে যেন গাহিয়া উঠিলঃ—

"এনেছে গো তৃণদল, ভেসে আসা ফুল ফল
এ যে ব্যথা ভরা মন মনে রাখিও।"

হঠাৎ বালিকার হস্ত ছিন্ন করিয়া তাহাকে যেন কে লইয়া গেল। আমাকে উঠাইয়া সে গৃহ এবং অট্টালিকা হইতে বাহির করিয়া শূন্যপথে কোন এক অপরিচিত স্থানে আসিয়া কঠিন ভূতলে নামাইয়া দিল। অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হইতে লাগিল ও পুনরায় চিতাধূমের ন্যায় উগ্র গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। কোথা হইতে একটা উজ্জ্বল অসহ্য আলোক আসিয়া চক্ষে লাগিল। চক্ষু মেলিয়া দেখি কেষ্টা বলিতেছে, "বাবু! উঠুন আপনার আজ কি হইয়াছে, আপনাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া ডাকিবার পর ঠেলিতে আরম্ভ করিয়াছি, বড়ই রাগ হইল ভাবিলাম বেটাকে ঠেলিয়া জলে ফেলিয়া দিই। পরক্ষণেই আবার শুনিতে পাইলাম কে যেন গাহিতেছেঃ—

আমার পরাণ লইয়া কি খেলা খেলিবে ওগো পরাণ প্রিয়!

মনে আশার সঞ্চার হইল, ভাবিলাম হয়তঃ স্বপ্ন সত্য। সবটা সত্য না হইলেও অন্ততঃ কতকটা হইতে পারে। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া দেখি রৌদ্র প্রখর হইয়াছে। নৌকার মধ্যেই শয়ন করিয়াছি, সুদুর মনিকর্ণিকার ঘাট হইতে শবদাহের গন্ধ আসিতেছে। এমন সময় পুনরায় গীত শ্রুত হইল—

"কোথা হতে ভেসে কূলে লেগেছে চরণ মূলে;
তুলে দেখিয়ো।"

এবার যেন গায়কের কণ্ঠস্বর পূর্ব্ব পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। ভাবিলাম যদি খুঁজিয়া পাই, তবে তুলিয়া দেখিব কি না বিবেচনা করিতে পারি। গীত বলিতে লাগিল:—

কেন আসে কেন যায় কেহ না জানে।
কে আসে কাহার পাশে কিশের টানে॥
রাখ যদি ভালবেসে চির প্রাণ পাইবে সে
ফেলে যদি যাও তবে বাঁচিবে কি ও!

নৌকা হইতে বাহির হইয়া দেখি, বন্ধুবর বালির চড়ায় বসিয়া এক মনে দাঁতন করিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে গান গাহিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই গাহিয়া উঠিলেন—

আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলিবে ওগো পরাণ প্রিয়!

মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলাম, প্রকাশ্যে বলিলাম, "চল আজ মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিয়া আসি"। মাঝিরা গঙ্গার পরপারে চৌষট্টিযোগিনীর ঘাটে নৌকা লাগাইল। কৃষ্ণচন্দ্র বিছানা রাখিতে ও শুষ্ক বস্ত্রাদি আনিতে বাসায় গেলেন। আমরা গঙ্গার ধারে ধারে দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিলাম। পরে কৃষ্ণ আসিলে সকলে মণিকর্ণিকাভিমুখে গমন করিলাম। কাশীতে প্রত্যেক ঘাটে জলের উপরে বাঁশ এবং তক্তা দ্বারা এক প্রকার মাচা থাকে। স্নান করিয়া অনেকেই এই মাচার উপরে বসিয়া পুজাদি করিয়া থাকেন। আমি একটী মাচার উপর দিয়া আসিয়া মাচার শেষভাগে জলে নামিলাম। সে স্থলে জল অন্যূন দশ হস্ত গভীর হইবে। জলে নামিয়া কিয়দ্দূর সাঁতরাইয়া আসিলাম, পরে পুনরায় সেই মাচার তলায় আসিয়া খুঁটি ধরিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে শৈবাল দলের ন্যায় কি যেন একটা আসিয়া পায়ে ঠেকিল, ভাল করিয়া স্পর্শ করিয়া দেখিলাম, বোধ হইল যেন কাহার চুল। ডুব দিয়া টানিবামাত্র একটী ক্ষুদ্র দেহ ভাসিয়া

উঠিল। দেখিলাম দেহটী অতিশয় কৃশাঙ্গী একটি বালিকার। এমন সময় শুনিতে পাইলাম কে যেন ক্রন্দন করিতে করিতে ঘাটের দিকে আসিতেছে। বালিকাকে পাইয়াই আমার গতরাত্রের সমুদয় স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে পড়িল। বালিকা আবার না স্বপ্নের মত মিশাইয়া যায় সেইজন্য দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহার উত্তর পাইলাম না। সম্ভবতঃ তাহার তখন তন্দ্রা আসিয়াছিল—কারণ সে দুই বেলায় অহিফেন সেবন করিয়া থাকে। আমার চীৎকারে তীরস্থ কাহারও মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছিল কি না জানি না। কিন্তু মাচার উপর হইতে একটী স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে!" আমি তাঁহাকে বালিকার দেহ দেখাইবামাত্র তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চীৎকারে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া পড়িল। তাহারা সকলে মিলিয়া তাহাকে উপরে তুলিল ও চেতনা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতে থাকিল। বালিকা তখন সম্পূর্ণ অচৈতন্য হয় নাই, সামান্য চেষ্টাতেই তাহার জ্ঞান হইল; তাহা দেখিয়া আমি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে কৃষ্ণের নিকটে গেলাম, গিয়া দেখি, সে ঠিক এক অবস্থাতেই বসিয়া আছে; তাহাকে ঠেলা দিলে শেষে তাহার চমক্ ভাঙ্গিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বন্ধু আসিয়া বলিলেন যে, বালিকাটী হাঁটিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। আমি মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "আমার সন্ধান কেহ করিয়াছিল কি?" বন্ধু বলিলেন, "না"। অবসন্ন-হৃদয়ে গৃহে ফিরিলাম। আহারাদির পর বন্ধুকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলাম। বন্ধু ত হাসিয়াই আকুল। আমার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। বন্ধু সমস্তদিন আমাকে বাক্যযন্ত্রণায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন, সন্ধ্যাকালে কেদার ঘাটে বেড়াইতে গেলাম, কেদারের আরতি পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়া থাকিলাম। আরতিশেষ হইলে গৃহে প্রত্যাগমন কালে দেখি সেই বালিকাটী একটী যুবতীর হাত ধরিয়া কেদারের মন্দির হইতে বাহির হইতেছে। আমাকে দেখিয়া যুবতী সরিয়া দাঁড়াইলেন। বালিকা বলিয়া উঠিল, "দিদি! দেখ লোকটা কি মোটা, উহার পেটটা যেন উহার আগে আগে চলিতেছে। বন্ধুর হাসি ত অদ্যাবধি থামে নাই। নেশা ছুটিবার ভয় স্বত্বেও কেষ্টা বেজায় হাসিয়াছিল। গল্প শুনিয়া মাসিমাতাও হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। হাসি নাই কেবল আমি, তখন রাগে ও ক্ষোভে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতে ছিল। আমি তখন জনসাধারণের অকৃতজ্ঞতার বিষয় চিন্তা করিতে ছিলাম।

সেই অবধি স্বপ্নের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি।

—:•:—

বিধু যেন শোনে না !

রত্নপুর গ্রামের হারাধন মজুমদারের দুই পুত্র ; জ্যেষ্ঠ শশীভূষণ, কনিষ্ঠ বিধু-ভূষণ। । দারিদ্র্যতাবশতঃ হারাধন ঐ দু-টি পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। শশীভূষণের বয়স যখন দ্বাদশ বর্ষ, বিধুভূষণের নবম বর্ষ, সেই সময়ে হারাধনের মৃত্যু হয়, তাঁহার স্ত্রী পদ্মাবতী বিধবা হইয়া, পুত্র দুটি লইয়া অত্যন্ত কষ্টে পড়েন। ঐ রত্নপুর গ্রামেই পদ্মাবতীর পিত্রালয় ; পিতা বর্ত্তমান ছিলেন না, একমাত্র ভ্রাতা পার্ব্বতীচরণ বসু মল্লিক সেই সংসারের কর্ত্তা। তিনি তালুকদার, তালুকের বার্ষিক উপস্বত্ব অনূনেক পাঁচ হাজার টাকা ; ভগ্নির কষ্টে সহানুভূতি দেখাইয়া তিনি তাহাদের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন। কেবল তাহা নহে, গ্রামে একটী গভর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত এণ্ট্রেন্স স্কুল ছিল, ভাগিনেয় দুটিকে তিনি সেই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় উভয়েই কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছিল, ইংরাজী স্কুলে বিধুভূষণ শীঘ্র শীঘ্র প্রোমোশন পাইতে লাগিল, শশিভূষণ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

লেখাপড়ায় শশিভূষণ নিতান্ত অনাবিষ্ট, স্কুলে সোমবার যাহা পড়িয়া আইসে, মঙ্গলবার তাহার একটি বর্ণও মনে থাকে না ; ফলকথা তাহার কিছু শিক্ষা হইল না, বিধুভূষণ তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া জলপাণি পাইয়া হুগলিকলেজ হইতে দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তাহাতেও জলপাণি পাইল, চিত্র পরীক্ষার ফলও সন্তোষকর হইল। প্রতিপত্তিশালী মাতুলের বিশেষ চেষ্টায়, বিদ্যার জোরে ও ভাল সুপারিসের জোরে বিধুভূষণ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাইলেন। ষাণ্মাসিক পরীক্ষার পর বর্দ্ধমান বিভাগের একটী জেলার সদর ষ্টেশনে তিনি বর্দ্ধিত বেতনে কার্য্য করিতে লাগিলেন। এণ্ট্রেন্স স্কুলের চতুর্থশ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া শশি-ভূষণ আউট হইয়াছিলেন, তাহার আর ভবিষ্যৎ উন্নতির কোন আশা রহিল না।

বিধুভূষণ বিশেষ প্রশংসার সহিত তিন বৎসর চাকরি করিলেন। বাড়ীতে তৃণাচ্ছাদিত তিনখানি ঘর ছিল, সেই ঘরগুলি ভাঙ্গিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একতলা বাটী নির্ম্মান করা হইল। রাজমিস্ত্রিরা যতদিন কাজ করিল, পদ্মাবতী ততদিন জ্যেষ্ঠপুত্রকে লইয়া ভ্রাতৃভবনে অবস্থান করিলেন, ছুটি পাইয়া বিধুভূষণ যখন যখন বাটী আসিতেন, তিনিও সেই সময় মাতুলালয়ে থাকিতেন।

বাটী নির্ম্মিত হইবার পর পদ্মাবতী শাস্ত্রমত গৃহযাগ করিয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করি-লেন। এক বৎসর পরে দুটি পুত্রেরই বিবাহ দিলেন। জ্যেষ্ঠা বধূ যখন সপ্তদশী

কনিষ্ঠা ত্রিয়োদশী সেই সময়ে সুশীলা সতী সাধ্বী পদ্মাবতী সংসার-লীলাসম্বরণ করিলেন। সম্ভবমত ঘটা করিয়া ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট বিধুবাবু জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত মিলিত হইয়া মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিলেন।

এইখানে বলিয়া রাখা উচিত, মাতা যত দিন বর্ত্তমান ছিলেন, বিধুবাবু ততদিন কর্ম্মস্থলে আপন পদোচিত সম্ভ্রমানুরূপ খরচপত্রের জন্য মাসিকবেতন হইতে এক শত টাকা নিজে রাখিয়া বাকী সমস্ত টাকা মাতার নামে মাসে মাসে রেজিষ্টারী করিয়া বাড়ীতে পাঠাইতেন। মাতৃবিয়োগের পরেও তাহার অন্যথা করিলেন না। শশিভূষণের নামেই টাকাগুলি আসিত। মাতৃবিয়োগের এক বৎসর পরে বিধু-বাবু পূর্ব্বস্থান হইতে অন্যস্থানে বদলী হইলেন, তখন তিনি মেদিনীপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ মহকুমায় পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট।

এই সময়ে শশিভূষণের ব্যবহারের পরিচয়।—রত্নপুর গ্রামে সে সময়ে অনেক গুলিখোর ছিল। তাহাদের মধ্যে ভদ্রলোকের সন্তান নিতান্ত অল্প ছিল না। সেইদলে মিশিয়া আট-দশ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই শশিভূষণ একজন বেয়াড়া গুলি-খোর হইয়াছিলেন। বিধুবাবু যখন বর্দ্ধিত বেতনে সুনাম লব্ধ হাকিম, সেই সময় তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার দাদামহাশয় সকলের মুখেই বড় বাবু! সর্ব্বত্রই যেমন দস্তর, সেই দস্তর মতে বড় বাবুর পাঁচ সাতজন ইয়ার জুটিয়াছিল। ইয়ারেরা সকলেই মুর্খ ও নেশাখোর, তাহারা শশিভূষণকে বাবু করিবার জোগাড় করিল; তাহারা পরামর্শ দিল তুমি এখন ডেপুটির দাদা, নিরবচ্ছিন্ন গুলিরমৌতাত এখন আর তোমার ভাল দেখায় না, একটু একটু ব্রাণ্ডি ধর, এখনকার দিনে বাবু হইলেই ব্রাণ্ডি খাইতে হয়, তুমিও তাহাই কর, তাহা না হইলে বাবুলোকের কাছে মান পাইবে না। শশিভূষণ ব্রাণ্ডি ধরিলেন, ব্রাণ্ডির তেজে অতি শীঘ্রই বিলক্ষণ বাবু হইয়া উঠিলেন।

শশিভূষণ মজুমদার যথার্থই বড় বাবু। একে বড় বাবু, তাহাতে আবার ডেপুটির দাদা। ভ্রাতার বেতন বাড়িয়াছে, বড়বাবুর হস্তে অনেক টাকা আইসে, বিধুবাবু একশত টাকার অধিক রাখেন না, অবশিষ্ট সমস্তই বড়বাবুর হাতে। তিনি তখন নিত্য নিত্য রকমওয়ারি পোষাক পরেন, ইয়ার দলের সহিত বোদল বোদল মদ খান, মৃগয়া শিক্ষা করিয়া বনে বনে পাখী মারেন, খরগোস্ মারেন, বাটির বাহিরে ঋষিবাবুর্চ্চি দ্বারা সেই সকল মাংস রন্ধন হয়, নিত্য ইয়ারের ভোজ হয়, ভোজের ঘটা দেখে কে?

পাঠক মহাশয়! ঋষিবাবুর্চ্চির অর্থ বুঝিতে পারিলেন কি? পূর্ব্বকালে মুনি ঋষিগণ দীর্ঘ দীর্ঘ শ্মশ্রু ধারণ করিতেন, এখন যাহারা চাঁপদাড়ি রাখিয়া বাবুলোকের এবং বাবুর্চ্চিগিরী চাকরী করে তাহারাই ঋষীবাবুর্চ্চি নামে বিখ্যাত।

বাবু শশিভূষণ এখন বড় বাবু অথচ তাঁহাকে বাজার করিতে হয়। নিজে বাজার না করিলে ভোজনে তৃপ্তি হয় না, সেই কারণে চাকর সঙ্গে করিয়া নিত্য নিত্য তিনি বাজারে যান। পূর্ব্বেও তিনি বাজার করিতেন; তখনকার বাজারে আর এখনকার বাজারে অনেক প্রভেদ। তখনকার বাজারে দুই পয়সার চিংড়ি তিন পয়সার তরকারী দুই পয়সার তৈল এক পয়সার লবণ একপয়সার ঝালমসলা একপয়সার পানসুপারি ইত্যাদি বরাদ্দ ছিল, এখন তিনি ডেপুটির দাদা সে প্রকার বাজার কর্ত্তে লজ্জা হয়, সুতরাং ভাল ভাল মৎস্য ভাল ভাল তরকারি ভাল ভাল ফল ভাল ভাল সন্দেশ না হইলে চলে না, ডেপুটির দাদার পক্ষে তাহা মানায়ও না; কাজেকাজেই নিত্য বাজারে দুইতিন টাকার ফর্দ্দ হয়, তাহার উপর নিজের খরচ খাতে অতি কম চার পাঁচ টাকার ব্রাণ্ডি।

নূতন বাটীর কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রণালী বলা হয় নাই। অন্দর মহলে সাত আটটি কুটরী সদর মহলে সদর দরজার উভয় পার্শ্বে দুটি প্রশস্ত বৈটকখানা প্রাঙ্গনের পূর্ব্বাংশে পূজার দালান হইবার স্থান আছে সেই স্থানে তখন লাউ গাছ পুঁই গাছ জন্মে দালানের পত্তন হয় নাই, পশ্চিম দিকে সদর দরজা পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া সদর দরজায় প্রবেশ করিতে হয়; অতএব উত্তর দিকে একটি বৈটকখানা দক্ষিণ দিকে একটি বৈটকখানা। উত্তরের বৈটকখানাটি বড় বাবুর, সেটি নিত্য ব্যবহারে আইসে, দক্ষিণের ঘরটি প্রায় এগার মাস চাবি বন্ধ থাকে, সেটি ছোট বাবুর।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তাহার দুই বৎসর পরে দুর্গাপূজার ছুটির সহিত এক মাসের অতিরিক্ত ছুটি লইয়া, বিধুভূষণ বাড়ী আসিয়াছেন. পূজার ষষ্ঠির দিন সন্ধ্যার পর দুটি বৈটকখানায় মোমবাতি যুক্ত দুটি সেজ জ্বলিতেছে। একটি ডেস্কের সম্মুখে বসিয়া নিজের বৈটকখানায় বিধুভূষণ একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন। উত্তরের বৈঠকখানায় বৃহৎ একখানা লানক্লথের চাদর মুড়ি দিয়া বড় বাবু চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন, দরজা ভেজান আছে।

রাত্রি আটটা। হঠাৎ একজন লোক আসিয়া বড় বাবুর বৈটকখানার দরজা

ঠেলিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল, নাকি সুরে চীৎকার করিয়া বলিল, "কি গো বড় বাবু, আজ দুর্গাপূজার ষষ্ঠি, কতদিকে কতলোক কত প্রকার আমোদ আহ্লাদ করিতেছে, তুমি আমাদের ডেপুটির দাদা, তুমি কি না শ্মশান ঘাটের গঙ্গাযন্ত্রীর মত নিঃশব্দে পড়িয়া আছ, ব্যাপারখানা কি ? ঘরে আলো না থাকিলে আমি হয়ত, তোমাকে মাড়াইয়া ফেলিতাম, সত্য সত্যই অর্দ্ধজলির আয়োজন করিতে হইত।

মুখের চাদরখানা একটু সরাইয়া এক হাতের পাঁচটি অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন, "চুপ চুপ, আস্তে কথা কও, বিধু যেন শোনে না। চুপ করে বোসো, দরজা বন্ধ কর।"

যে লোকটি আসিল সে লোকটি বড় বাবুর একজন সখের ইয়ার, নাম রসিকলাল। বাবুর ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে দরজা ভেজাইয়া, রসিকলাল কাঁচুমাচু মুখে বড় বাবুর পার্শ্বে গিয়া বসিল, বড় বাবু পূর্ব্বের ন্যায় মুখ ঢাকিলেন, দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, সে নিশ্বাসের শব্দ রসিকলালের কর্ণে গেল। ভাব বুঝিতে না পারিয়া, ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বাবুর মুখের চাদরের কাছে মুখ লইয়া রসিকলাল চুপি চুপি বলিলেন, "বদ্ রং বদ্ রং! বলি কিছু আছে কি ? দুর্গাপূজার ষষ্ঠি, সাদা চোখে থাকতে নাই, বলি কিছু আছে কি ?"

আর একবার মুখের চাদর খুলিয়া চুপিচুপি বলিলেন, "চুপকর ভাই, চুপ কর, বিধু যেন শোনে না!"— আমি— বলিতে বলিতে তাকিয়ার নীচে হইতে একটা চাবির রিং বাহির করিয়া, রসিকের হাতে দিয়া বলিলেন, "আলমারিতে আছে, বাহির কর; কিন্তু দেখ ভাই বিধু যেন শোনে না!"

রসিকলাল চাবি লইয়া আলমারি খুলিয়া বোতল গ্লাস বাহির করিল, পূর্ণ এক পাত্র ঢালিয়া গর্ভে দিয়া, আরামে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল আঃ!

উভয়েই চুপ। পাঁচ মিনিট পরে রসিকলালের উদরে আর এক পাত্রের প্রবেশ; মুখে বাক্য নাই। আর পাঁচ মিনিট পরে তৃতীয় পাত্র। মুখে বাক্য নাই।

এই সময় তাকিয়ার উপর একটু উচু হইয়া বড় বাবু চুপি বলিলেন বাঃ! তুমি বেশ ঠাণ্ডা আছ। তিনবার খেয়েছ, চুঁ শব্দটি নাই। খুব বাহাদুর! তবে আমি একটু—

আহ্লাদে মুখ ফুলাইয়া রসিকলাল বলিল, স্বচ্ছন্দে খাও, কুচ্ পরওয়া নাই! দেখছ তো আমি কেমন ঠাণ্ডা!

আস্তে ব্যস্তে বড়বাবু উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, বালিসের উপর হইতে

মাথাটি আধহাত উচু হইল, রসিক সেই অবসরে একপাত্র পূর্ণ করিয়া বড় বাবুর হস্তে অর্পণ করিল। পাত্রটি হস্তে লইয়া অতি মৃদুস্বরে বড়বাবু বলিলেন, "খাই তবে ? দেখ ভাই বিধু যেন শোনে না!"

ইয়ারকে এইরূপ সাবধান করিয়া বড়বাবু একনিশ্বাসে পূর্ণ পাত্রটি উদরস্থ করিলেন ; উর্দ্ধে চাহিয়া বলিলেন, "দোহাই মা দুর্গা ! দোহাই বাবা রসিক লাল। সাবধান সাবধান বিধু যেন শোনে না।"

মৃদুহাস্য করিয়া রসিক বলিল, "বিধু আর শুনবে কি ? তেমন মুখ রাখি না, তেমন পেট রাখি না, সব আমার পেটে পেটে। তুমি আবার খাও। আমার তিন পাত্র হইয়াছে, তুমিও তিন পাত্র বউনি কর, কোন ভয় নাই!"

এই কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ পাত্র সুরেশ্বর রসিকলালের জঠরস্থ। পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে আরও তিন পাত্র বড়বাবুর জঠরস্থ।

এক ঘণ্টা অতীত। একে একে আরও পাঁচটি ইয়ার সেই বৈটকখানায় জমা হইল, সকলেই চুমকে চুমকে মদ খাইল, "কথায় কথায় বড়বাবু সকলকেই সমভাবে সাবধান করিয়া বারবার বলিয়া রাখিলেন, বিধু যেন শোনে না।"

এক বোতল ফুরাইল, দ্বিতীয় বোতল আসরে নামিল, সব জনেই সমান অংশ গ্রহণ করিল, সকলেরই নেশা-ভোরপুর। বড়বাবুর মুখে কাকাতুয়াপক্ষীর ন্যায় একবুলি নিরন্তর। 'বিধু যেন শোনে না।"

রাত্তি ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে শশিভূষণ বন্দুক ধরিতে শিখিয়াছিলেন, গানবাজনাতেও সখ হইয়াছিল, বৈটকখানার দেওয়ালের গায়ে অনেক রকমের অনেকগুলি বাদ্যযন্ত্রও ঝুলান ছিল, একজন মাতাল আর এক পাত্র মদ্য পান করিয়া সেইদিকে চাহিয়া বলিল, "সরাবি রবাতি" সরাপের সঙ্গে গীতবাদ্য দরকার, এস আমরা একটা গীত ধরি, বড়বাবু বলিলেন, ধরিতে পার কিন্তু খুব মিহি আওয়াজে গাও, বাজাও, সবকর কিন্তু বিধু যেন শোনে না।"

একজোড়া তবলা পাড়িয়া লইয়া আস্তে আস্তে বাজাইতে বাজাইতে মাতালেরা সরু সুরে গাহিতে আরম্ভ করিল, "বিধু যেন শোনে না, বিধু যেন শোনে না বিধু যেন শোনে না।"

আবার সকলে মদ খাইল। তখন একজন সর্দ্দার মাতাল বলিয়া উঠিল, তবলার সঙ্গে সরু সুরে কি গীতের জোর হয় ? বলিতে বলিতে টলিতে টলিতে উঠিয়া বৃহৎ একটা মৃদঙ্গ পাড়িয়া গলায় ঝুলাইয়া বলিল, "এইবার কীর্ত্তন ধর। সকলে

উঠিয়া দাঁড়াইল সর্দ্দার মাতাল খোল বাজাইতে লাগিল, কীর্ত্তনের সুরে সকলেই গলা ছাড়াইয়া গাহিয়া উঠিল, "বিধু যেন শোনে না, বিধু যেন শোনে না, রাধা সনে কদমতলে নাচ্‌তেছে কেলেশোনা।"

• ঊর্দ্ধে বাহু তুলিয়া একজন মাতাল হুঙ্কার করিয়া বলিল, ভারি গরম বাহিরে চল।

সকলে বাহির হইয়া উঠানে নামিল, জোরে জোরে খোল বাজিতে লাগিল, উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। মাতালেরা নাচিতে নাচিতে বাজাইতে বাজাইতে কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে ছোট বাবুর বৈটকখানায় প্রবেশ করিল, পদে পদে মণ্ডলাকারে ছোটবাবুকে প্রদক্ষিণ করিয়া অতি উচ্চকণ্ঠে গাহিতে লাগিল, বিধু যেন শোনে না, বিধু যেন শোনে না, রাধাসনে কদমতলে নাচ্‌তেছে কেলেশোনা। খোলওয়ালা মাতাল, মাথা ঘুরাইয়া তালে বেতালে খোল বাজাইতে আরম্ভ করিল, বড় বাবু শশীভুষণ স্বয়ং সেই কীর্ত্তনের অধিকারী।

পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া বাতি নিবাইয়া ঘৃণায় লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বিধুভূষণ নিঃশব্দে অন্তঃপুরে পলায়ন করিলেন; কিছু বেশী দিন বাড়ীতে থাকিবেন আশা করিয়া বেশীদিন ছুটি লইয়াছিলেন, ছুটি মাথায় রহিল, সপ্তমী পূজার দিন স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া তিনি কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। তদবধি দাদার খরচের জন্য মাসে কুড়ি টাকা করিয়া আসিতে লাগিল। দাদার ইয়ারের দল বিদায় হইল, ব্রাণ্ডির মৌতাত কমিল, প্রথম অবস্থার গুলির মৌতাত বাড়িয়া উঠিল।

এই দৃষ্টান্তটিকে যাঁহারা, উপদেশটিকে যাঁহারা উপদেশ বলিয়া গ্রহণ করিবেন প্রাণখুলিয়া তাঁহাদিগকে আমরা সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিব।

—:•:—

কেরাণী তত্ত্ব।

লেখক, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিদ্যাম্বুধি।

কেরাণী এই শব্দটী বাঙ্গালা শব্দ নহে, হিন্দি শব্দ, ইংরাজীতে ইহার প্রতিশব্দ Clerk; সেকালে চার্চ্চে যিনি লেখাপড়ার কাজ করিয়া প্রধান ধর্ম্ম যাজকের সহায়তা করিতেন, তাঁহাকেই ক্লার্ক বলা হইত, কিন্তু এখন যে কোন দপ্তরের প্রধান ব্যক্তির নিয়স্থ প্রায় সকল কর্ম্মচারীই ক্লার্ক নামে পরিচিত। সুতরাং

এখন রাজদপ্তরে, সওদাগরের বাণিজ্য স্থলে, বিচারালয়ে, কবর স্থানে ছোট ছোট দোকানদারের দোকানে, বিস্থালয়ে যেখানে যেখানে লেখাপড়ার কাজ হয়, সেই-খানেই যাঁহারা লেখাপড়ার কার্য্য পরিচালনা করেন, তাঁহাদিগকেই সাধারণতঃ ক্লার্ক বা কেরাণী বুঝায়, তবে কর্ম্মের প্রকৃতিও বিভিন্নতা অনুসারে এক ক্লার্ক শব্দই ইংরাজী ও বাঙ্গালায় ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। মুহুরী, মুন্সী নকল নবীস, খাতাঞ্জী, নায়েব, গোমস্তা, পেস্কার, 'কপিষ্ট' (Copyist)'চেকার'(Checker) 'পাসার' (passer) 'বিল্‌মেকার' (Bill-maker) ইত্যাদি শব্দ বিভিন্ন হইলেও মূলে জিনিষ একই-সকলেই কেরাণী।

বাঙ্গালায়—কেবল বাঙ্গালায় কেন, প্রায় সমস্ত ভারতেই কেরাণী অনেক দিন হইতেই আছে; তবে ইংরাজ বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মসীজীবীর সংখ্যা এতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, ভারতের জনসমাজে কেরাণী নামক এক সুবৃহৎ সম্প্রদায় বা জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, এই কেরাণী নামক সুবৃহৎ সম্প্রদায় বা জাতির প্রকৃতি ও অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সাধারণতঃ, কেরাণী-জাতির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। কেরাণী বলিলেই একটা মনুষ্যত্ব-বিহীন অপদার্থ জীব বলিয়া মনে হয়। দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি, নিজ পরিজনবর্গের প্রতি, এমন কি নিজের প্রতিও যে একটা কর্ত্তব্য আছে, কেরাণীকে সে কর্ত্তব্য জ্ঞান-বিহীন একটা তুচ্ছ হেয় জীব বলিয়াই মনে হয়। কর্ত্তব্য জ্ঞান বিশিষ্ট, উচ্চ হৃদয়, উদারচেতা কেরাণী যে নাই এমন কথা বলা যায় না, তবে অধিকাংশই যে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত তাহা নিঃসন্দেহ; এবং যাঁহাদের মনুষ্যত্ব এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই অনেক সময় নিরুপায় হইয়া, ইচ্ছাসত্বেও, কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের মনুষ্যোচিত সহৃদয়তা, উদার চিত্ততা ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারেন না।

এখন কথা হইতেছে যে কেরাণীজাতির অবস্থা এত হীন হইবার কারণ কি? কেরাণীর যে পূর্ণমাত্রায় আহার জোটে না। কেরাণী যে অশন-বসনের বিলাস পরিতৃপ্ত করা দূরে থাকুক, তৎসম্বন্ধীয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাবও মোচন করিতে অসমর্থ; কেরাণী অবিবাদে ও অকাতরে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অবমাননা সহ্য করে। কেরাণী যে এই নাম মাত্র শ্রবণেই যে সাধারণতঃ লোকে ঘৃণাব্যঞ্জক ও নাসিকা কুঞ্চন করে, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়,

যে কেরাণী অনন্যজীবী। এক কলম-পেশা ছাড়া অপর কোন পেশার উপযোগী শক্তি বা গুণ তাহাদের মধ্যে নাই, অথবা থাকিলেও মার্জ্জনা ও পরিচালনা দ্বারা তাহার বিকাশ করিবার অভিরুচি নাই। এক রসাভ্যাসে দেহের দুর্ব্বলতা জন্মে, ভোজনকর্ত্তার অরুচি জন্মে; তাহাই স্বাস্থ্যনীতিবেত্তারা এক রসাহারকে ঘৃণা করেন। কেরাণীর অধিকাংশ অনন্যোপজীবী। কেরাণী কার্য্যের আগা-গোড়াই একঘেয়ে করুণরসের নাকিসুরে ঘ্যান্‌ঘ্যানানি তাই লোকে কেরাণীকে একরসাহারের মত ঘৃণা করে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে যেমন অন্যবর্ণের সেবায় শূদ্রের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অন্য কোনও উচ্চতর কর্ম্ম বা উচ্চতর ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের অনুপযোগী বলিয়া অধিকার প্রদত্ত হয় নাই এবং সেব্য ধর্ম্মের চিরাভ্যাসবশতঃ মানসিক বৃত্তিনিচয় সঙ্কুচিত হওয়াতে কোন উচ্চতর অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তদ্রূপ জীবিকাশ্রম ধর্ম্মেও পর পদসেবাই কেরাণীজাতি তাঁহাদের একমাত্র ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন এবং অভ্যাসদোষে কোনও উচ্চতর সাংসারিক হিতকর অনুষ্ঠানে তাঁহাদের প্রবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষা নাই, থাকিলেও তাহার স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

এককালে কেরাণীগিরির খুব আদর ছিল। অন্যান্য দেশবাসী যখন প্রথম এ দেশে আসিয়া ব্যবসার পত্তন করিলেন, তখন তাঁহারা এদেশের ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন, এ দেশের লোকও ইংরাজী ভাষা জানিত না, অথচ যাঁহাদের মধ্যে কারবার চলিবে তাহারা যদি পরস্পর পরস্পরের ভাষা না বুঝে তাহা হইলে কারবার চলিতে পারে না। সুতরাং ব্যবসায়ীরা দোভাষীর সাহায্যে তাঁহাদের ব্যবসাকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। আমাদের দেশের যাঁহারা সেই সময় ইংরাজী শিখিয়া-ছিলেন—ইংরাজী ভাষায় বুৎপন্ন না হইলেও কোন রকমে—কতক বা ভাষায় কতক বা অঙ্গভঙ্গীতে মনোগতভাব বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিতেন, ব্যবসায়ীর নিকট তাঁহাদের বড়ই আদর ছিল, ব্যবসায়ীগণ তাহাদিগকে তাঁহাদের দপ্তরে প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ইংরাজী শিখিয়া ব্যবসায়ীর দপ্তরে কর্ম্ম করা তখন সাধারণের পক্ষে একটা প্রলোভনের সামগ্রী হইয়া উঠিল, এ দিকে ব্যবসায়ীগণ নিজের বাণিজ্যব্যবসা প্রসার বৃদ্ধি করিবার জন্য এ দেশে পসার প্রতিপত্তি লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং সে বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইলেন।

যখন ব্যবসায়ীগণের কর্ম্মস্থান সঙ্কীর্ণ ছিল; তখন কেরাণীর সংখ্যা কম ছিল। আদরও যথেষ্ট ছিল। ক্রমে ক্রমে কর্ম্মস্থলের বৃদ্ধি সহকারে কেরাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি

হইতে আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ যাজনবৃত্তি ছাড়িয়া ইংরাজী শিখিলেন কেরাণীগিরির জন্য, বৈদ্য চিকিৎসা বৃত্তি ছাড়িয়া প্রস্তুত হইলেন কেরাণীগিরির জন্য। তাঁতীর তাঁতগড়া গেল, কামারের কামার শালা গেল, ছুতোরের কারখানা গেল, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই কেরাণীবৃত্তি অবলম্বন করিতে ছুটিল—কেরাণীর আদরের হ্রাস হইল। ক্রমে যখন কেরাণী সংখ্যার অতি বৃদ্ধি হইল, তখন কেরাণীবৃত্তির প্রতিযোগিতা ও কেরাণার প্রতি অসম্মান, অবিচার অনাদর আরম্ভ হইল; কেরাণীও অনন্যোপায় হইয়া নিঃশব্দে ওজর আপত্তি বাতিল ও নামঞ্জুর কবুলতি লিখিয়া দিয়া সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে শিখিল, সেই শিক্ষা অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে এবং সেই অভ্যাসের দোষেই কেরাণী সাধারণের চক্ষে হেয়, সেই অভ্যাসদোষই কেরাণীর অনিবার্য্য, অপ্রতিকার্য্য ও শোচনীয় অবস্থার কারণ।

কেরাণীর অবস্থা শোচনীয় একথা সর্ব্ববাদী সম্মত, কিন্তু কেরাণী নির্ব্বিবাদে লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহ্য করে বলিয়া যে সাধারণ লোকে বিশিষ্টরূপে কেরাণীকে হেয় ও অপদার্থ বলিয়া ঘৃণা করে সেটা ন্যায়সঙ্গত কি না বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। সাংসারিক সামাজিক নৈতিক কার্য্য করিবার, কথা কহিবার, এমন কি চিন্তা করিবারও অবসর হইতে কেরাণী বঞ্চিত, অশনেবসনে, শয়নে স্বপ্নে, নিত্যনৈমিত্তিক যাবতীয় ব্যাপারে যাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, পরের অনুগ্রহ লাভই তাহাদের জীবনের প্রধান স্বার্থ এবং তাহাদের হৃদয় স্বভাবতঃই বড়ই সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে। প্রভুর সন্তোষ সাধনই তাহাদের একমাত্র সাধনা এবং সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম বৃত্তিনিচয়কে বলিদান দিতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় না। আমরা সেই অনভিজ্ঞ জাতি—নীচ ব্যক্তিগত স্বার্থ আমাদের জাতিগত স্বার্থ ভুলিবে এরূপ আশা করাই ভুল—যাহা জাতিগতধর্ম্ম তাহা সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। স্বার্থপরতা বা সঙ্কীর্ণ চিন্তা বাঙ্গালীর জাতিগতধর্ম্ম, ইহার ব্যতিক্রমের সংখ্যা এত অল্প যে তাহা ধর্ত্তব্য নহে। সুতরাং কেরাণীর প্রতি যে দোষারোপ করা হয় তাহা ন্যায় সঙ্গত নহে বরং তুলনায় কেরাণীর দোষের ভাগই অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া মনে হয়। কারণ কেরাণীর অধিকাংশই অল্পশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত তাহাদের অধিকাংশের রীতিমত চরিত্রগঠন হয় না, এ অবস্থায় যে তাহাদের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা থাকিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি?

কিন্তু যাঁহারা সমাজে শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করেন, দেশের ও সমাজের যাঁহারা

মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান বলিয়া পরিচিত ; দেশের ও সমাজের যাঁহারা প্রকৃত আশার স্থল, তাঁহাদের মধ্যে যদি সেই সেই দোষ কেরাণীদিগের অপেক্ষা অধিক মাত্রায় বিদ্যমান্ থাকে তবে কেরাণীকে অপদার্থ, হেয় বলিয়া ঘৃণা করা কি ন্যায় সঙ্গত ? ক্ষুদ্রপ্রাণী কেরাণী লক্ষ্মী সরস্বতীর ত্যজ্যপুত্র সহজেই পরপ্রত্যাশী, পরের তোষামোদ করিয়া, পরনির্য্যাতন সহ্য করিয়া নিজের জীবিকারূপ স্বার্থসিদ্ধিকরা তাঁহাদের পক্ষে ততটা দূষনীয় নহে, কিন্তু যাঁহারা লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়েরই আদরের সন্তান তাঁহারা যদি তোষামোদকারী হন, প্রভুর বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কায় ন্যায় ও সত্যের অবমাননা করেন, তাঁহাদের সে অপরাধের মার্জ্জনা আছে কি ? তাঁহাদের তুলনায় কেরাণীর দোষ অনেক লঘু। কেরাণী তোষামোদ করে, অবমাননা সহ্য করে নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষনের উপায়ান্তর নাই বলিয়া ;—কেরাণী যদি অপমান না সহ্য করে তাহাতে তাহার নিজেরই ক্ষতি অপরের কোন ক্ষতি হয় না।

কেরাণীর প্রতি অবিচার হয়, কেরাণী তাহা অবিবাদে সহ্য করে, একথা সাধারণে এত প্রকাশ কেন ? কেরাণী নিজমুখে তাহা প্রকাশ করে বলিয়া অনেক স্থলে কেরাণীর প্রতিবাদ প্রকাশের কারণ হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রভু ও ভৃত্য সম্বন্ধ যেখানে আছে, সেই খানেই ভৃত্যের প্রতি প্রভুর অত্যাচার আছে, সুতরাং কেরাণী ছাড়া অন্যনামে পরিচিত হইয়া যাহারা দাসবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহাদের উপরও সমানভাবে অবিচার হয়, তবে এক রসাহার দোষে কেরাণীর পাচিকা-শক্তি বড় কম।

উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের অল্পাধিক্য অনুসারে সেই দ্রব্য, মহার্ঘ বা সুলভ এবং মূল্যও প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে দ্রব্যের আদর বা অনাদর হইয়া থাকে। উৎপন্ন যদি অল্প হয়, বাজারে সে দ্রব্যের আমদানী কম হয়, খরিদদারকে তখন গরজ দেখাইয়া চেষ্টাপূর্ব্বক বিক্রেতার নির্দ্দিষ্ট মূল্যেই খরিদ করিতে হয়, আর যদি উৎপন্ন প্রচুর হয়, তাহা হইলে উৎপাদনকারীকে তোষামোদ করিয়া খরিদদার ডাকিতে হয় এবং খরিদদারের মূল্যেই তাহাকে বিক্রয় করিতে হয়, নতুবা অবিক্রীত থাকিয়া ঘরের জিনিষ ঘরেই পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। কেরাণীরও এখন ঠিক সেই অবস্থা ঘটিয়াছে।

উপজীবিকা ক্ষেত্রে কেরাণী উৎপন্ন হয়। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কর্ম্মস্থান তাহার খরিদ-

দায়। যখন কেরাণী সংখ্যা অল্প ছিল তখন কর্ম্মস্থান কেরাণী খুজিত, কেরণীও নিজের মুল্যে বিক্রীত হইত। কিন্তু এখন কেরাণীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে কর্ম্ম আর কেরাণী খোজে না, কেরাণীকে কর্ম্ম খুজিয়া বেড়াইতে হয়। অন্নকষ্ট ফেরিওয়ালা আবেদনের ঝাঁকার উপর কেরাণীকে সাজাইয়া কর্ম্মস্থলের আনাচে কানাচে হাঁকিয়া বেড়ায়। কর্ম্মস্থলের সংখ্যা যত ফেরিওয়ালার সংখ্যা তাহার শতসহস্রগুণ অধিক,—কেরাণীর সংখ্যা ততোধিক, সুতরাং খরিদদারের নিকট তাহার আদর, এবং যদিও বিক্রীত হয় তাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর তাহা সহজেই অনুমেয়।

কেরাণী সংরক্ষনী বা তদ্রূপ কোনও সামিতির গঠনে কেরাণীর অবস্থা পরিবর্ত্তন ঘটিবে না—ঘটিতে পারেও না। প্রয়োজন অপেক্ষা যে জিনিষের উৎপন্ন অধিক সে জিনিষের মূল্য বা আদর বৃদ্ধি করিতে গেলে উৎপন্ন হ্রাসের ব্যবস্থা করা উচিত। অথচ তাহার কোন লক্ষণই নাই—বিদ্যাশিক্ষার এখন চরম উদ্দেশ্য কেরাণীগিরি করা। পিতা পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠান তাহার চরম লক্ষ্য কেরাণীগিরি। পুত্র পাঠশালায় গুরুর নিকট যত উপদেশ লাভ করুক বাড়ীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাহার পিতার নিকট বা অন্য অভিভাবকের নিকট এই উপদেশ লাভ করে, "বাপু আর যত কিছু হউক বা না হউক, হাতের লেখাটা যেন ভাল হয়—হস্তাক্ষরই কেরাণীর প্রধান সুপারিস্"। বাড়ীতে পিতার নিকট, বাহিরে প্রতিবেশীর নিকট, অপর আত্মীয় কুটুম্বের নিকট, তাহার ঐ এক উপদেশ, ঐ এক শিক্ষা। গৃহে গৃহে, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে যদি ঐশিক্ষার, ঐ উপদেশের বিস্তার হয়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর কতগুলি কেরাণী আমাদের দেশে জন্মিতেছে তাহার তুলনায় উৎপন্নের আধিক্যে মূল্যহ্রাস এই সাধারণ নিয়ম অনুসারে কেরাণী সংরক্ষনী সভার গঠনের সম্ভাবনা ও তাহার উপযোগিতার অকিঞ্চিৎকরতা কত কেরাণী চরিত্রের ছিদ্রান্বেষী মহোদয়গণ, একবার বিচার করিবেন।

যখনই কোন কেরাণীর অপমানের সংবাদ সাধারণে প্রচারিত হয়, তখনই জনসাধারণে কেরাণীর পদত্যাগের অক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়া কেরাণীজাতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে ও রঙ্গালয়ে, যাত্রার অভিনয় প্রহসনচ্ছলে বা বৈটকখানার মজ্‌লিসি খোস গল্পের মধ্যে কেরাণীর অযথা নিন্দাবাদের স্রোত বহিতে থাকে।

একদেশদর্শীর নিন্দাবাদের কথা ছাড়িয়া যদি সূক্ষ্ম ও সর্ব্বদর্শী মহোদয়দিগের নিকট ইহার বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করা যায় তাহা হইলে তাহারা ইহার কিরূপ বিচার করেন ?

কেরাণী সখের স্বেচ্ছাসেবক নহে, নিজের পেটের দায়ে, পরিবারবর্গের লজ্জা সরম রক্ষারদায়ে, সমাজশাসনকে সাধ্যমত অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য, নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা ও মান ইজ্জৎকে জীবনের মত বিসর্জ্জন দিয়া কেরাণী তাহার জীবনব্যাপী এক দাসখতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছে। কেরাণী যদি সাংসারিক ভাবে সঙ্কীর্ণ-চিত্ত হইত, নিজের সুখস্বচ্ছন্দতাই যদি তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে তাহার এ চিরদাসবৃত্তিঅবলম্বনের আবশ্যক হইত না। অথবা ইচ্ছা করিলে অর্থ ব্যতীত সংসার চলে না। সেই অর্থের জন্য নানালোক নানা জীবিকা অবলম্বন করে। কেরাণীগিরি তাহার অন্যতম। উপার্জ্জন-ক্ষেত্রে একটা পথ কন্টকাকীর্ণ হইলে লোকে অন্যপথে যাইবার চেষ্টা করে কিন্তু যদি দ্বিতীয় পথ উন্মুক্ত না থাকে তবে বাধ্য হইয়া তাহাকে কাঁটাপথেই চলিতে হয়; কাঁটায় বিক্ষতপদ হইলেও সে পথ হইতে আর ফিরিবার যো নাই। কেরাণীরও সেই অবস্থা। তাঁহারা ঐ এক পথ ছাড়া অন্য পথ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কাজেই বাধ্য হইয়া কেরাণীকে লাঞ্ছনা গঞ্জনারূপ কণ্টকে পদে পদে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও সেই পথে চলিতে হয়। যদি কখনও বর্ত্তমান শিক্ষার স্রোত ফিরিয়া যায়; কেরাণীবৃত্তিই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য না হয়, কেরাণাগিরি ছাড়া অন্য কোনও বৃত্তির শিক্ষালাভ করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সংসার-ক্ষেত্রে বাহির হইতে পারে, জাতীয়শিক্ষা পরিষৎ যে ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা যদি ভগবানের ইচ্ছায় কখনও সফল হয়, তবেই কেরাণীর উৎপন্ন হ্রাস হইবে, কেরাণীর আদর বাড়িবে, কেরাণীর লাঞ্ছনা কমিবে, নতুবা কেরাণীর যে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশা চিরকালই রহিয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীকালী।

লেখক, শ্রীনকড়ি রায়।

কিবা অপরূপ, হেরে শ্যামারূপ,
ভাবে ভাবকূপ উথলে উঠে।
শিবে শিবজায়া, ধ'রে কোন মায়া,
মহামায়া আজি হৃদয় পাঠে॥
বিকট দশনা, বিলোল-রসনা,
ত্রি-নয়না অয়ি ভীষণ বেশে।
ঘোরা উলাঙ্গিনী, যেন উন্মাদিনী,
করাল বদনী শোভে এলোকেশে॥
রুধিরে প্লাবিত, গলিত পলিত,
জানু-বিলম্বিত-নৃমুণ্ড গলে।
নরমুণ্ড করে, কিবা শোভা ধরে,
নৃভুজ মেখলা কাঁকালে দোলে॥
বাম করে অসি, ধরেছে যোড়শী,
দক্ষিণেতে বর, অভয় দানে।
ভয় বিহ্বলিত, ভকত কম্পিত,
আশ্বাসিত করে সেবক গণে॥
পদে মহাকাল, ভীষণ ভয়াল,
কালরূপা কালী নাচিছে রঙ্গে।
চরণে নূপুর, বাজিছে মধুর,
কাঁপে সুরাসুর ভ্রূকুটী ভঙ্গে॥
ভয়া কি অভয়া, না পাই ভাবিয়া'
কেমন করিয়া তোষি মা তোরে।
শ্যামা শবাসনা, পুরাও বাসনা,
আর মা ছলনা করোনা মোরে।

——:•:——

আকাশের শকুনি।

লেখক, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

অনন্ত আকাশে দেখ, পক্ষ বিস্তারিয়া।
উড়ে যায় কত পাখি ; কোকিল, পাপিয়া—
পারাবত, রাজহংস, সারস' ভারুই।
চাতক, চকোর, টিয়া, ময়না, বাবুই।
হংস, ঘুঘু, চক্রবাক্, সালিক, চটাই।
ঝুন্ঝুনি, শ্বেতমান, ফিঙ্গে, বাজপাই॥
নাম দিব কত আর, অসংখ্য বিহঙ্গ।
মনসুখে উড়ে যায়, করে কত রঙ্গ।
উড়ে যায় যত উর্দ্ধে, উর্দ্ধে থাকে চোক্।
ভুলে যায় পৃথিবীর মায়া, মোহ, শোক॥
উড়ে যায় যত উচ্চে, উচ্চে আঁখি রাখে।
অনন্ত ঘুরিয়া যেন, অনন্তেরে ডাকে।
শকুনি নামেতে পাখি, সে ধাতুর নয়।
যত উর্দ্ধে উড়ে যায়, নীচে আঁখি রয়।
উড়িতে উড়িতে তারা, যত উচ্চে উড়ে॥
পৃথিবীর দিকে তার, চক্ষু তত পড়ে।
শ্মশানেতে মৃতদেহ, বিশ্বামরা পশু।
দৃষ্টিতে আসিলে, তথা নেমে যায় আশু॥
মলিন পূরীষ বিষ্ঠা পচা হাড়মাস।
দৃষ্টিমাত্র নেমে এসে, করে তাহা গ্রাস।
অতএব ভেবে দেখ বুদ্ধিমান ভাই।
উর্দ্ধেও উঠিলে, মুক্তি ধ্রুব নাই।
চিলের মতন উর্দ্ধে উঠে, কিবা ফল পায় ?
"নরকে তাহার স্থান," শাস্ত্রে ইহা কয়॥

কাশ্মীর যাত্রা—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী।—

পিণ্ডদান কার্য্য সমাধার পর অবরোহনের পালা। অবরোহন কালে ক্রমাগত মাথা নিচু রাখাতে শেষে বোধ হইতে লাগিল কোগা ঠেলিয়া ফেলিতেছে। নীচে

আসিলাম। গাড়ী প্রস্তুত ছিল। উঠিলাম। ভাবিলাম এখানেই বুঝি শেষ। পরে শুনিলাম আজই প্রেত শিলার আরোহণ করিতে হইবে। পরিশ্রমে অনভ্যাস পূর্ব্বদিনের পথক্লেশও অনাহার, অন্ধকার বেশাতীরেক। অন্য পর্ব্বতারোহনের জন্য আমাদের সমুদায়ই প্রতিবৃত্ত। এদিকে তর্ক বিতর্কে গাড়ী আসিয়া প্রেতশিলার পাদদেশে উপস্থিত। রামশিলা হইতে প্রেতশিলা ৩।৪ মাইল হইবে। সেখানে নামিয়া দেখিলাম অন্য এক কুণ্ড বর্ত্তমান। ইহার নাম ব্রহ্মকুণ্ড। এখানেও তর্পণ পিণ্ডদান করিতে হয়। আমি তর্পণ করিলাম পিণ্ডদান করিলাম না। সকলের পিণ্ডদান কার্য্য সমাধা হইলে প্রেতশিলার আরোহনের পরামর্শ করা যাইবে। সকলের পিণ্ডদান কার্য্য সমাধা হইল। নানাকথার পর প্রেত শিলারোহনে সাব্যস্ত হইল। সকলেই একসঙ্গে বসিলাম। অনেকেই বহুদূরে উঠিয়া গেল বাহাদুর একজন কাশ্মীর পণ্ডিত ও আমি আমরা এই তিনজন পশ্চাতে রহিলাম। আমাদের পশ্চাতে একখানা খালি পাল্কী। বাহাদুরের জন্য খালি পাল্কী রাম শিলাতেও সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। কিন্তু কাজে আসে নাই। অতি কষ্টে অর্দ্ধপথ গেলাম। বাহাদুর পশ্চাতে আরোহন করিলেন বিষম স্থানে পাল্কিতে আরোহণও এক কষ্টকর ব্যাপার। আমরা দাঁড়াইয়া একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। প্রেতশিলার আরোহনের কর্ত্তব্যমান হইল। কতকগুলি শোকার্ত্ত ঘটনা স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে মন ক্ষিন্ন হইল বটে, কিন্তু তাহাদের আত্মার সুখ্যাতির কামনায় যেন এক নূতন বলের সৃষ্টি করিল। আর বিশ্রামের আবশ্যক রহিল না। যাহারা আমাদের ছাড়িয়া ২০।২৫ সিড়ি উর্দ্ধে উঠিয়াছিল, তাহাদিগের সহিত পর্ব্বতের শীর্ষদেশে এক সময়েই উপস্থিত হইলাম। প্রেতশিলায় আরোহন করিয়া দেখিলাম এখানে অনেক লোক। ষোড়ষবর্ষীয় যুবক হইতে সপ্ততি পর বৃদ্ধ ও রমণী অনেক। শ্রাদ্ধ কালে ইহাদের মুখোদ্গীর্ণ শোকাবহ ঘটনা শুনিয়া নিজের শোক লঘু হইল। কোনও বৃদ্ধ পিতা উদ্বন্ধনে মৃত স্বীয় পুত্রের আত্মার সদ্গতিলাভ কামনায় পিণ্ডদান করিতেছে। কেহ অগ্নিদগ্ধ কেহ সর্পদুষ্ট কেহ মৃতগর্ভিণী কেহ জাতঃমাত্র মৃত কেহ বা নিরুদ্দেশ আত্মার ও আত্মীয়ের পারলৌকিক সদ্গতির জন্য বিশেষ নাম ও মৃত্যুর অবস্থা বিজ্ঞাপন করিয়া পিণ্ডদান করিতেছে। স্বীয় শোক ভুলিবার এই অতি উৎকৃষ্ট স্থান। অধিক কালব্যয় না করিয়া পিণ্ডদান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আর শোক ভার নাই। সুতরাং কার্য্যে কোনরূপ বিঘ্ন হইল না। পিণ্ডদান কার্য্য সমাধা করিয়া কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলাম। সকলেরই স্ব স্বকার্য্য সম্পন্ন হইলে এবার অবরোহনের পালা আরম্ভ হইল। অবরোহনে বিশেষ ক্লেশ হয় নাই।

অবরোহণের পর ভাবিলাম বুঝি আজিকার মত কার্য্য শেষ হইল। গাড়ীতে চলিলাম। পুরোহিত বলিলেন, "আর একটী কার্য্য আছে। তাহা আমাদের বাসস্থানের নিকটে। কাকবলী তীর্থে পিণ্ডদান না করিলে আজিকার সমুদায় কার্য্য নিস্ফল হইবে। কে এমন বোকা যে এত করিয়া একটুর জন্য খুঁৎ রাখিবে। সুতরাং সেখানে গিয়া পিণ্ড দিলাম। সেখানে মাত্র ৩টী পিণ্ড দিতে হইল। উদ্দেশ্য কাক, কুকুরও লইয়া যায় পিণ্ডদান কার্য্য নষ্ট না হয়। কাকবলী সম্পন্ন করিয়া বাসস্থানে আসিলাম। সকলেই ক্লান্ত। মুখ শুষ্ক—স্বর ক্ষীণ শরীর অপটু। তাবুতে আসিয়া হাত পা ধুইয়া ভরপুর এক ছিলিম তামাক টানিলাম। কলিকাতা থাকিতে গয়ার তামাকের বড় সুনাম শুনিয়াছিলাম। পাণ্ডা মহাশয় আট আনা সেরের আধসের গয়ার তামাক পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাওয়াতে সাজাইয়া সেবনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গয়ার তামাক, গয়ার কল্কী, গয়ার টীকা তথাপি আমার যেন তত ভাল বোধ করিলাম না। সেই কলিকাতার গয়ার তামাকের বোট্কাগন্ধ ইহাতেও ছিল।

বৈকালে কার্য্য ছিল না। বাঙ্গালীর অন্বেষণে বাহির হইলাম। ব্যবসার সূত্রে গয়ার ডাক্তার শ্রীযুক্ত মেঘনাদ বাবুর নাম জানাছিল। গাড়ী করিয়া তাঁহার ওখানে গেলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ডাক্তার বাবুকে তাহার বাসায়ই পাইলাম। কালো বাঙ্গালী স্থূলকায়। কথা বার্ত্তায় বেশ সরল প্রকৃতি বলিয়া বোধ হইল। অল্প পরিচয় প্রদানের পরই বেশ আলাপ হইল। তাহার সহিত আলাপ সূত্রে জানিলাম যদু বাবু এখানে আছেন। ইনিও আমার স্বজাতি ও বিক্রমপুর বাসী। বাল্যকাল হইতে আমাদেরও বন্ধুতা আছে। লোক দ্বারা তাঁহাকে সংবাদ দিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আলাপটা বেশ জমিয়া গেল। রাত্রি হইলে ফিরিয়া বাসায় আসিলাম। আহারাদির পর সারাদিন শ্রমের ফলে বেশ গাঢ় নিদ্রা হইল।

আজ গয়াতে দ্বিতীয় দিন। গয়ায় যেখানে পুকুর সেখানে কুণ্ড। যেখানে কুণ্ড সেই খানেই শ্রাদ্ধ করিবার বিধি। এত বিধি সুরক্ষিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং যথাসম্ভব তর্পণ ও পিণ্ডদান করিলাম। আজ উত্তর মানস, উদীচি, কনখল দক্ষিণ মানস ও জিহ্বালোম তীর্থ সমূহের কার্য্য সমাধা করিয়া সরস্বতী অভিমুখে চলিলাম। গাড়ীতে বহুদূর আসিয়া একস্থানে দেখিলাম আমাদের জন্য নানাবিধ যান প্রস্তুত। শ্রীযুক্ত বাহাদুর ও পুরোহিত পাল্কীতে আরোহণ করিলেন।

আমরা তিন জন চলিলাম এক্কাতে। অন্যান্য সকলে পাদচারে যাইতে লাগিল। ফল্গু পার হইয়া একটী মাঠ দেখিলাম। স্থানটী বেশ পরিষ্কার। একটী আম্র কাননে অবস্থিত। এখন বড় কেহ থাকে না। পূর্ব্বে শঙ্কর শিষ্যগণ-নাকি এই স্থানে থাকিতেন। দেখিলাম বহু সাধুর সমাধি রহিয়াছে। একটী মন্দির আছে। তদভ্যান্তরে সরস্বতী মূর্ত্তি। বস্তুতঃ ইহা স্ত্রী মূর্ত্তি কি না সেই বিষয়েই আমার সন্দেহ হইল। গয়ার শিল্প, স্থাপত্য এবং মূর্ত্তি সম্বন্ধে অন্য একটী প্রবন্ধ লিখিব এইরূপ অভিলাষ আছে। তৎপর সরস্বতী নদী দর্শনে চলিলাম। ইহা ফল্গুরই একটী শাখা। ইহার জল ফল্গুরই মত। পুরোহিতের আদেশে সেখানে ব্রাহ্মস্নান ও তর্পণ সমাধা করিলাম। বস্তুতঃ অবগাহন করিয়া বারুণ স্নান সম্পাদনের সুবিধা সেখানে তখন ছিল না। তৎপর পঞ্চরত্ন মূল্য রৌপ্য খণ্ড প্রদান করিয়া মাতঙ্গবাণী দর্শনে চলিলাম। সরস্বতীর পশ্চিম তীর বাহিয়া চলিতে হয়। বহুদূর যাইয়া মাতঙ্গবাণীর দর্শন পাইলাম। এখানেও ব্রাহ্মস্নান, তর্পণ এবং পিণ্ডদান করিলাম। এবার ধর্ম্মারণ্য যাত্রা। পাঠক মনে করিবেন না যে ইহা এক গহন কানন। মাতঙ্গবাণীর পর ২।৩ খানা ছোট ছোট মাঠ। তৎপর ধর্ম্মারণ্যের প্রাচীর। ধর্ম্মারণ্যে কাহার এক সমাধি আছে। সঙ্গী গয়াবাসীরা ইহাকে মুসলমানের সমাধি বলিল কিছুই বুঝিলাম না। তৎপর ধর্ম্মারণ্যের জল হীন কূপ ও যূপ প্রস্তরের মধ্যে বসিয়া পিণ্ডদান করিলেন। আজ বুদ্ধ গয়া দেখিতে হইবে। রাজা অশোকের কীর্ত্তি দেখিবার জন্য চলিলাম। এক্কায় উঠিয়া একখানা ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্য দিয়া চলিলাম। পথের দুই ধারে শস্য শ্যামল ক্ষেত্র নিচয়ে কে যেন প্রকৃতি অর্চ্চনার জন্য লাজহোম করিয়াছে। অহিফেনের শ্বেত পুষ্প গুলি প্রৌঢ়া বিধবার মত অকারণ ফুটিয়া রহিয়াছে। এই পুষ্পে ফল হয় না। পুষ্প ও ফলকাণ্ড স্বতন্ত্র। গাছগুলি বেশ সোজা হইয়াছে। আজ যদি আমার অহিফেন সেবী প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বন্ধুগণ এখানে আসিতেন তাহা হইলে তাহাদের আনন্দের সীমা থাকিত না। এত শুভ্র পুষ্প ও এত সরল শস্যের বিষময় পরিণতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। পক্ষান্তরে ইহার বীজের মাধুর্য্য ও পুষ্টি কারিত্ব ও প্রসিদ্ধ। মানব চরিত্রে ইহার উদাহরণ অল্প নহে।

বেরি-বেরি চিকিৎসা।

বারাণসী হইতে শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন,—আজকাল বেরি-বেরির উপদ্রবে কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থান সমূহ প্রতিদিন জনশূন্য হইতেছে। প্রায় অধিকাংশ অধিবাসী এই উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হইতেছেন। ততোধিক দুঃখের বিষয় এই যে, এপর্য্যন্ত কেহ ইহার কোনও-রূপ প্রতিষেধক ঔষধ বাহির করিতে সক্ষম হন নাই।

কলিকাতা নগরীতে দেড়মাসাবধি এই রোগে ভুগিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাবশতঃ অত্যন্ত নিরাশ-হৃদয়ে এখানে আসিয়াছি। এখানে পিতার সহিত স্বামী শ্রীশ্রীবালাজী মহারাজ নামক জনৈক বিচক্ষণ সন্ন্যাসীর আলাপ ছিল। তিনি খুব স্বদেশহিতৈষী এবং উৎকট রোগসমূহের ঔষধ অবগত আছেন। যে দিবস এখানে আগমন করি, সেই দিবসেই বৈকালবেলা আমি পিতাঠাকুরের সহিত বালাজী মহারাজের ভবনে গমন করি। তিনি আমাকে স্ফীতপদ দেখিয়া কতকগুলি ঔষধ বলিয়া দিলেন। সেই ঔষধ দুই দিবস মাত্র ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। এখন সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছি। আমার দুইজন আত্মীয় আমার সহিত এখানে আসিয়াছেন। তাঁহারাও বেরি-বেরি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলেন। ঐ ঔষধ ব্যবহারে তাঁহারাও সাক্ষাৎ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ঔষধ ও অনুপানাদি নিম্নে বিবৃত হইল। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা আপনার সর্ব্বজন-প্রশংসিত ও বহুদূর-ব্যাপৃত মাসিকপত্রে উদ্ধৃত করিয়া চিরঋণজালে আবদ্ধ করিবেন।

ঔষধাদি।

১। জ্বরশূন্য বেরি-বেরি :—

[ক] পক্ব ও শুষ্ক মাকালফল (Macal) কিছু জল-মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে বাটিয়া যতখানি পর্য্যন্ত ফুলা আছে, ততখানি পর্য্যন্ত উত্তমরূপে প্রলেপ দিতে হইবে। ৩।৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উহা রাখিতে হইবে, প্রতিদিন দুই বার প্রলেপ দিলেই যথেষ্ট।

২। জ্বরসংযুক্ত বেরি-বেরি :—

[ক] ১ক এর মত।

[খ] শিরঃপীড়া কিংবা বুকের যন্ত্রণা থাকিলে সামান্য আদার সহিত মেথী-পাতা বাটিয়া বুকে প্রলেপ দিতে হয়।

[গ] ২। খ এতে লিখিত অবস্থা যদি না হয়, তাহা হইলে প্রত্যহই কেশুর্ত্তে পাতা ছেঁচিয়া উহার রস নির্গত করিয়া খাইতে হইবে। খাইবার অগ্রে মুড়ী খাইয়া যেন খাওয়ান হয়।

পথ্যাদি—লবণ তরীতরকারী মৎস্য মাংস একেবারে নিষিদ্ধ। দুগ্ধ ও ভাত রাত্রে রুটী ও দুগ্ধ খাওয়া অত্যন্ত প্রশস্ত। স্নানাদিও নিষিদ্ধ।



"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৭শ বর্ষ।	১৩১৬ সাল, কার্ত্তিক।	৭ম সংখ্যা।

বেহুলা।

(২)

লেখক, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

নখিন্দরের মৃত দেহ ক্রমেই পচিয়া সড়িয়া দুর্গন্ধ নির্গত করিতে লাগিল,—পচা মাংসের কুঘ্রাণে মক্ষিকাকুল আকৃষ্ট হইয়া আর এক উৎপাত বাড়াইল, বেহুলা যত্ন সহকারে যথাসাধ্য প্রতিকারের উপায় করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, প্রকৃতির নিয়ম বশে নখিন্দরের শব পচিতে লাগিল, ক্রমে অস্থি হইতে মাংস পৃথক্ হইতে আরম্ভ করিল দেখিয়া বেহুলা হতাশ হইতে লাগিলেন না। সাধ্বী সতী অনড় অটল। পাঠক কবির ভাষায় এই বীভৎস ব্যাপারের বর্ণনা পাঠ করুন,—

মজ্জামাংস জলে গলে বিপরীত ঘ্রাণ।
চকিত চঞ্চল নহে বেহুলার প্রাণ॥
প্রাণেতে-দ্বিগুণ প্রেম বেহুলার বাড়ে।
মড়া সঙ্গে বৈসে মাছি ঘন ঘন তাড়ে॥
দিবসে দিবসে তাহে কীট কৃমি বাছে।
ঘন ঘন বৈসে ঘন মড়া সঙ্গ কাছে॥
বেহুলা তাড়নে মত নহে নিবারণ।
পুলকে প্রবেশে তাহে মশক নন্দন॥
অস্থি-চর্ম্ম পচে তার কি কহিব কথা।
মাছেশ্বর মড়া সঙ্গে পড়িল মেছেতা॥
বেহুলা ভাঙ্গিল যত পুনরপি হয়।
ঠাঁই ঠাঁই মেছেতা সকল অঙ্গময়॥
প্রভুর সঙ্গেতে মাছি করে ডিম্ববাসা।
বেহুলা কান্দেন মনে জপিয়া মনসা॥
গলিয়া পচিয়া গেল সে তনু সুন্দর।
আর কি পাইবে প্রাণ প্রভু নখিন্দর॥

এই শব কোলে লইয়া বেহুলা কুকুরঘাটায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, একটা কৃষ্ণকায় কুকুঁর পচা মড়ার গন্ধ পাইয়া জলে ঝাঁপ দিয়া কলার মান্দাস আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল, বেহুলা বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন—"তোকে কুম্ভীরে খাউক "বলিয়া অভিসম্পাত করিলে সতীবাক্য সার্থক হইল বাস্তবিকই কুকুরটাকে কুম্ভীরে ধরিল, ইত্যবসরে বেহুলা কুকুরঘাটা অতিক্রম করিলেন।

কুকুরের অত্যাচার হইতে স্বামীর মৃতদেহ রক্ষা করিয়া বেহুলা সুন্দরী জগাতি ঘাটায় উপনীত হইলেন—জগাতি খেয়া ঘাটার অধিকারী—দস্যুপতি, সে অপরূপ রূপলাবণ্যবতী যুবতী বেহুলাকে দেখিয়া কামোন্মত্ত হইল—নানা কথায় তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা পাইল। অবশেষে জলে ঝাঁপ দিয়া তাঁহাকে আক্রমণে উদ্যত হইল। বেহুলার মনে তৎকালে স্বামীর জীবন লাভ ভিন্ন অন্য চিন্তা ছিল না—পার্থিব বিষয় বৈভব, সুখসমৃদ্ধি ভোগ-বিলাস কিছুই তাঁহার মনে লাগে নাই। কেবল পতিচিন্তা, পতিধ্যান, পতিজ্ঞান। তিনি বিনয় বাক্যে জগাতিকে বলিতে

অকারণে কেন তোরা ঝাঁপ দিবি জলে।
পাঁচ মাসের পচা মড়া প্রাণনাথ কোলে ॥
এতদিন ভাসি যাই জীয়াবার আশে।
আর একমাস যাবো মন অভিলাষে ॥
তবে পতি জীয়াইব দেবী অনুবলে।
পূর্ব্বের সাধন মত লিখিল কপালে ॥
বেহুলার কথা শুনি যতেক জগাতী।
করজোড়ে বলে তুমি পতিব্রতা সতী ॥

বেহুলার কষ্টের সীমা নাই একে বৈধব্য যাতনা—সম্বল শূন্য, তাহাতে নানাপ্রকার উৎপাত অত্যাচারের আশঙ্কা, জলে স্থলে কতই হিংস্র পশু দিবা দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড উত্তাপ--নদীতীরবর্ত্তী বনজঙ্গলের ভীতিপ্রদ দর্শন, কুত্রাপি বিপুল বিস্তৃত প্রান্তরের আতঙ্কদায়িনী নির্জ্জনতা কখন বা অমাতমস্বিনীর বিকট অন্ধকার-- কোথাও বা দুর্জ্জনের দুরভিসন্ধিসাধনের উৎকট আগ্রহ—এই সকলের কিছুতেই বণিকনন্দিনী বেহুলাকে বিচলিত করিতে পারে নাই,—তিনি তন্ময় চিত্তে ইষ্ট দেবতাকে আত্মসমর্পণ করিয়া গাঙ্গুর নদীর জলপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেনঃ— তাঁহার চরিত্রবলে যত কিছু উৎপাত অত্যাচার সকলই পরাভূত হইতে লাগিল।

মন্দ মন্দ বায়ুভরে কলার মান্দাস গাঙ্গুরের জলে ধীরেধীরে ভাসিয়া চলিল, দেবীর কৃপায় শ্বাপদেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইল না, সত্য কিন্তু শবের দুর্গন্ধে শৃগালের দল আসিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইল, তাহাদের লালসা দেখিয়া বেহুলা সাতিশয় কাতরোক্তিতে তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন—তাঁহার কথা শুনিয়া বনের পশুও বশীভূত হইয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু ইহাতেও বিপদের অবসান হইল না, বোয়ালিদহ নামক স্থানে উপস্থিত হইলে রঘু বোয়াল নামে বৃহৎ জাতীয় মৎস্য নখিন্দরের পায়ের মালাই চাকি খাইয়া ফেলিল। ইহাতে বেহুলার আশায় নিরুৎসাহ আসিল, ইহা মানব মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেখান হইতে হাসন হাটী এবং হাসন-হাটী হইতে নারিকেলডাঙ্গায় পহুছিয়া তিনি যথাবিধানে দেবী বিষহরির পূজা করিলেন, স্বামীরজীবন লাভার্থ যথোচিত স্তবস্তুতি করিতে করিতে মনোমধ্যে দেবীর প্রসন্নতা উপলব্ধি করিলেন। নারিকেল ডাঙ্গা হইতে বেহুলা গাঙ্গুর তীরবর্ত্তী বৈদ্যপুর নামক গ্রামে উপস্থিত হইলে এক স্নাতক বৈদ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বৈদ্য তাঁহার অসাধারণ সৌন্দর্য্যে প্রলুব্ধ হইয়া প্রস্তাব করিলেন—

তাঁহার সতীত্বের বিনিময়ে যদি স্বামীর জীবনলাভে সম্মত হয়েন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত পতিকে তিনি বাঁচাইতে পারেন এই কথা বলিতে না বলিতে—

"বেহুলা বলেন বৈদ্য তোর মুখে ছাই।
মনসা জপিয়া আমি জলে ভেসে যাই॥"

উপযুক্ত উত্তর পাইয়া বৈদ্য অপ্রস্তুত হইয়া অধোবদনে অবস্থিত হইলেন, তাঁহার সাময়িক চিত্তচাঞ্চল্য দূর হইল। কলার মান্দাস ভাসিয়া চলিল,—সেখান হইতে পিড়িতলী এবং পিড়িতলী হইতে গহর পুরে আসিয়া সগরবংশ উদ্ধারকারিণী ভাগীরথির জলে ভাসিতে লাগিল। গঙ্গা পবিত্রসলিলা—আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ শতমুখে গঙ্গাজলের পবিত্রতা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, গঙ্গাস্নানে, গঙ্গার জলপানে অশেষ পুণ্য সঞ্চারের কথা বলিয়াও যেন ফুরাইতে পারেন নাই। আজি কালিকার নিরপেক্ষ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও উহার পবিত্রতার কথা সহস্র সহস্র বৎসর পরে মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহারাও বলিতেছেন, গঙ্গাজলের জীবাণুনাশিনী শক্তি আছে, আমরাও দেখিতেছি যে, কলের জল তুলিয়া দুই চারিদিন রাখিলেই তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট জন্মে, কিন্তু গঙ্গাজলে দুইচারি মাসেও সেরূপ কীট জন্মে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত তৎকালে জানিতে না পারিলেও বেহুলা ঋষিবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গঙ্গাজলে স্বামীর শব উত্তমরূপে ধৌত করিলেন। গহরপুর হইতে তিন দিনকাল বিস্তৃতাঙ্গী ভাগীরথির বিশাল-বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে তিনি মুক্তবেণী ত্রিবেণীতে আসিয়া পঁহুছিলেন। ত্রিবেণীর সৈকতভূমিতে বহুল ওকড়ার বন, বেহুলা সেই স্থানে কলার মান্দাস বাঁধিয়া স্বয়ং গঙ্গাজলে অবগাহন করিলেন, অদূরে এক রজকী বস্ত্রক্ষালন করিতেছিল, তাহার একটী শিশু পুত্র সঙ্গে ছিল, রজকী তাহাকে বারবার ঘরে যাইবার কথা বলিতেছিল, সে তাহাতে মনোযোগ না করিয়া কেবলই কাঁদিতে ছিল। তাহাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া রজকী এক চপেটাঘাতে নিহত করিল। শিশুর শব পড়িয়া রহিল, রজকী অবিচলিতচিত্তে কাপড় কাচিতে লাগিল। বস্ত্রক্ষালন সমাপ্ত হইলে সে মৃতপুত্রকে জীবিত করিল। অন্তরাল হইতে ইহা দেখিয়া বেহুলা বিস্মিত হইলেন, এবং রজকী যে তাঁহার ইষ্টসিদ্ধির প্রধান সহায় হইতে পারেন, ইহা স্থির করিয়া তিনি নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন এবং অশ্রুজলে তাহার পদযুগল সিক্ত করিয়া ফেলিলেন—রজকীর নাম নেতো রজকী সেই কমনীয়-কান্তী কামিনীকে পায় বিলুণ্ঠিত দেখিয়া বলিতে লাগিল ;—

না কাঁদ না কাঁদ বলি, নেত তারে ধ'রে তুলি,
নিবেদয়ে শোক পরিহরে।
বেহুলা বলেন সতি, যদি কর অবগতি,
নিবেদিব পূর্ব্বের কাহিনী।
অকথ্য আমার কথা, সায় সদাগর পিতা,
নাম মোর বেহুলা নাচনী ॥
মঙ্গল বিভার রাতি, কাল সর্পে খাইল পতি,
ছয়মাস ভেসে আসি জলে।
দৈব হৈল মোর সখা, তোমার সঙ্গেতে দেখা,
পতি পাব তোমা অনুবলে ॥
তুমি গো পরমা দেবী, তোমারি চরণ সেবি,
আজি হৈতে তুমি মোর মাসী।
দুঃখ না ভাবিও তুমি, শিশুকাল হৈতে আমি,
কাপড় কাচিতে ভালবাসি ॥

বেহুলার বিনয়ে বশীভূত হইয়া রজকী তাঁহাকে কয়েক খানি কাপড় কাচিতে দিল, কাপড় গুলি যে কৌশেয় কবি তাহার পাকা পরিচয় দিয়াছেন,—

কৃমিসূত্র বিরচিত, বস্ত্র সব আনে নেত,
সন্ধ্যাকালে সুরপুরে যায়।
যতেক দেবতাগণে, বসে থাকে একমনে,
রজকিনী কাপড় যোগায় ॥

বেহুলা যে কয়খানি বস্ত্র ধৌত করিলেন, তাহার উজ্জলতায় যেন সৌদামিনী লজ্জা পাইল। নরলোকের রজকী হইলে আপন প্রতিপত্তিহানির সম্ভাবনা ভাবিয়া ঈর্ষান্বিতা হইত। নেতো হীন রজকজাতীয়া হইলেও স্বর্গের রজকী, দেবগণের সংস্রবে থাকে, তাহার মনে সংকীর্ণতার ছায়া পড়িবে কেন, সে সাদরে বেহুলাকে লইয়া সুরপুরে উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে স্বর্গের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রাখিয়া দেবলোকে প্রবেশ করিল, তথায় সে বিধিবিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্রাদি দেবগণের বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিল। বেহুলার কাচা কাপড় গুলি সমধিক চাকচিক্যময় দেখিয়া দেবাদিদেব মহাদেব রজকীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এতদিন আমাদের কাপড় কাচিতেছ, কিন্তু বল দেখি আজি কেন কাপড় গুলি এত সুন্দর হইয়াছে।"

রজকী গললগ্নীকৃতবাসে বলিল—"দেবাদিদেব, এ কাপড় গুলি আমার কাচা নহে, আমার এক ভগ্নীতনয়া আমার বাড়ীতে আসিয়াছে তাহারই কাচা!"

এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতীপতি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেবসভায় উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিলেন—রজকী হৃষ্টচিত্তে স্বর্গের প্রবেশদ্বারে যেথানে বেহুলা দণ্ডায়মান ছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেবাজ্ঞা জানাইল এবং উভয়ে দেবসভায় উপস্থিত হইলেন। দেবসভায় রজকী বেহুলার তৌর্য্যত্রিকী বিদ্যার পরিচয় প্রদানকরিলে নৃতগীতাদি-প্রিয় দেবগণ প্রসন্নমনে বেহুলাকে নৃত্যগীত করিবার অনুমতি দিলেন। বেহুলা নৃত্যগীতে দেবসভাস্থ সমস্ত দেবদেবীকে পরিতুষ্ট করিলেন। প্রসন্ন চিত্ত দেবদেবীরা বেহুলার পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইলে তিনি আপনার স্বভাবসিদ্ধ বিনীত ভাবে ও করুণ স্বরে আপন অবস্থার আদ্যোপান্ত পরিচয় দিয়া তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলি পুটে স্বামীর জীবন ভিক্ষা করিলেন। সভাস্থ সকলেই দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া মনসাদেবীর নিকট রজকীকে প্রেরণ করিলেন, দেবগণের প্রার্থনা পরিপূরণার্থ মনসাদেবী আসিয়া উপস্থিত হইলে সকলেই সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন—বেহুলা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, দেবী আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে মহাদেব সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন, এবং নখিন্দরকে বাঁচাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, দেবী ভগবতীও মনসাদেবীকে বিশেষ লজ্জা দিলেন, অতঃপর মনসাদেবী তাঁহার প্রতি চাঁদ সদাগরের দুর্ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া যথোচিত তিরস্কার করিলে বেহুলা কৃতাঞ্জলি পুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শ্বশুরের দ্বারা তাঁহার পূজা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। বেহুলার স্তবস্তুতিতে মনসা প্রসন্ন হইলেন এবং দেবদেবীগণের উপরোধ অনুরোধে বাধ্য হইয়া নখিন্দরের জীবন দানে সম্মত হইলেন, কিন্তু তাঁহার শব অস্থি মাত্রে পরিণত হইয়াছিল। দেবী সেই অস্থি গুলিকেই অবলম্বন করিয়া নখিন্দরের অভিনব দেহের সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে মৃতসঞ্জীবনী সেচন করিয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন। দেব সভায় আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল—দেবদেবীগণ মনসাদেবীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন, বেহুলার পতিপ্রাণতার ও একাগ্রতার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। বেহুলা অবনত মস্তকে তাঁহাদের সুখ্যাতিবাদ শিরোধার্য্য করিয়া শ্বশুরের ছয় পুত্র ও সাত ডিঙ্গা পুনরুদ্ধারের প্রার্থনা জানাইলেন। মনসার নিগ্রহেই তাহাদের বিনাশ সাধন হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকেই যমপুরে গিয়া চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্রের

পুনর্জীবন জন্য যমরাজকে অনুরোধ করিতে হইল। যমরাজও প্রফুল্ল মনে অনুরোধ রক্ষা করিলেন। চাঁদের ছয় পুত্র পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইল, ইহার পর বেহুলা আর একটী বরে মনসার নিকট কালীদহে নিমজ্জিত শ্বশুরের সাত খানি ডিঙ্গার পরিবর্ত্তে চৌদ্দ খানি ডিঙ্গা প্রার্থনা করিলেন তাহাই পাইলেন।

বেহুলা পতি নখিন্দরকে লইয়া এক ডিঙ্গায় এবং অন্যান্য স্বামী সহোদরেরা সকলেই এক একখানি নৌকায় আরোহণ করিয়া গাঙ্গুর নদীর উপর দিয়া চাম্পাইনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বেহুলার জনক জননী, জন্মভূমি, ছয় ভ্রাতা সকলকেই মনে পড়িল, তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন প্রাণ ব্যাকুল হইল। ইহা স্বভাবসিদ্ধ—দুঃখের পর সুখের দশা আসিলে অতীতের স্মৃতি মনে জাগরূক হয় বলিয়া অতীত ঘটনার স্থান, তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়। বেহুলারও তাহাই হইয়াছিল, তিনি স্বামীকে আপন মনোভাব ব্যক্ত করিয়া পিতৃভবন দর্শনের ইচ্ছা অবগত করিলেন, স্বামীও তাহাতে সম্মতি দিলেন, তখন কিরূপে পিত্রালয় গমন করিবেন তাহারই পরামর্শ স্থির হইল। এইখানে কবি আপনার একটু কৃতিত্ব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—হারাণ জীবন পুনপ্রাপ্তির বিষয় অবগত হইলে পিতামাতা আত্মীয় স্বজনেরা মোহমুগ্ধতা প্রযুক্ত যদি তাহাকে অন্যত্র যাইতে না দেন, তজ্জন্য উভয়েরই যোগী ও যোগিনীর বেশ ধারণ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল, কবি এইখানে বেহুলাকে যেরূপে যোগিনী সাজাইয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা মূল গ্রন্থ হইতে কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম,—

বেহুলা প্রভুর বোলে, নানা অলঙ্কার ফেলে,
করে রামা যোগিনীর বেশ।
রক্তাবস্ত্র কটি পরে, শ্রবণে কুণ্ডল ধরে,
জটা কৈল মস্তকের কেশ॥
ধবল দশন পাঁতি, শোভে অঙ্গেতে বিভূতি,
ত্যজিয়া গলার মাতেশ্বরী *
বিভূতি মাখিয়া গায়, ছলিবারে বাপ মায়,
যোগিনী হইলা সে সুন্দরী॥

* বহুমূল্য কণ্ঠাভরণ (হার)

স্ত্রী পুরুষ যোগী ও যোগিনী সাজিয়া ভিক্ষা হেতু নিছনী নগরে যাত্রা করিলেন,—উভয়েরই মুখে পবিত্র শিব নামের ধ্বনি, তাঁহারা দুইজনে ভিক্ষা পাত্র হস্তে নিছনী নগরের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সায় সদাগরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী দম্পতিকে দেখিয়া বণিকগৃহিণী অমলা, ভিক্ষান্ন লইয়া তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্রে যতই দেন, কিছুতেই পাত্র পূর্ণ হয় না, দেখিয়া তিনি যোগিনীর মুখের দিকে চাহিবামাত্র তাহাকে বেহুলা বলিয়া চিনিতে পারিলেন, কিন্তু কন্যা ছয়সাত মাস পূর্ব্বে মৃত স্বামী লইয়া জলপথে যাত্রা করিয়াছে, পথে হিংস্র জন্তু তাহাদিগের অপেক্ষাও ভয়ানক দুর্জ্জন দুশ্চরিত্র মনুষ্য হস্তে তাহার অব্যাহতি নিতান্ত অসম্ভব বোধে একটু সন্দিহান হইলেন অমলা যোগিনীকে তাঁহার নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলেন,—

বেহুলা বলেন তুমি কি কর জিজ্ঞাসা।
যোগী ও যোগিনী মোরা তরুতলে বাসা॥
নগরে মাগিয়া খাই হাতে করি মালা।
সন্ধ্যাকাল হৈলে মোরা যাই তরুতলা॥
ইহা বিনা আর মোরা কিছুই না জানি।
ইহাতে বুঝিয়া লও অমলা বেণেনী॥

অমলা পুনঃ পুনঃ কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বেশ বুঝিলেন যোগিনী তাঁহার কন্যা বেহুলা বই আর কেহ নহে; যখন তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন, তখন বেহুলা অমলাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া পরিচয় মানিয়া লইলেন। অতঃপর পিতা ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ সকলকেই যথারীতি সাদর সম্ভাষণ করিয়া সকলেই আনন্দোৎসবে মত্ত হইলেন। পিতামাতার চরণ বন্দনার পর তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে চাঁপাতলার ঘাটে আসিয়া বহিত্র আরোহণ করিবার পূর্ব্বে দেবশিল্পি বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া এক খানি সুন্দর ব্যজনী প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে আপন শ্বশুর শাশুড়ি প্রভৃতি সমস্ত পরিজন বর্গের চিত্র চিত্রিত করাইয়া সঙ্গে লইলেন। সেই ব্যজনী সুবর্ণ শলাকায় রচিত, মণি মাণিক্য খচিত এবং সুরভি সমুদ্গীরিত,—

ব্যজনী-বাতাসে, চন্দ্রিকা প্রকাশে,
অপূর্ব্ব শীতল রশ্মি।
সোনার ছাটনী, সহজে আঁটনী,
বিশ্বকর্ম্মা গড়ে বসি॥

ভাঙ্গে স্বর্ণবিন্দু, রচে বিন্দু বিন্দু,
কনক কুসুম ফুল।
ভানু হেন দেখি, করে ঝিকিমিকি,
কিবা দিব তার তুল॥
কনক গুণেতে, তার চারিভিতে,
বিনোদ বন্ধনে বান্ধে।
ভানু পৃথিবীতে, ব্যজনী দেখিতে,
যেন ভূমে পড়ি কান্দে॥
দিয়া অপরূপ, সোণার বিম্বুক,
সাজে ব্যজনীর বুকে।
তাহে ঝলমল, রতন কমল,
ভাল শোভা চারিদিকে॥
কিবা মনোহর, দেখিতে সুন্দর,
লক্ষের ব্যজনী খানি।
আর লিখে তায়, বিশেষ উপায়,
পূর্ব্ব পরিচয় বাণী॥
চাঁদ সদাগরে, সনকার তরে,
চম্পক নগর বাড়ী।
ছয় পুত্র তার, চিত্র কৈল আর,
করে ছয় বধূ রাঁড়ী॥
নগর নিবাসী, এ পাড়া পড়সী,
লিখে প্রতি জনে জনে।
সাতালি পর্ব্বতে, লৌহ বাসরেতে,
বেহুলা নখাই সনে॥
কঙ্কন কুণ্ডল, লিখে অনুবল,
আর লিখে বেজী সাক্ষী।—
নখাই পদেতে, খাইল সাপেতে,
রবি শশী করি সাক্ষী॥

এই পরম সুন্দর ব্যজনী হস্তে বেহুলা ডোমনীর বেশ পরিগ্রহ করিলেন, এবং স্বামী নখিন্দরকেও ডোম সাজাইলেন। ডোমনীর সাজ সজ্জায় কবি বিলক্ষণ রচনা পটুতা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

রজকী মাকড়ী কাণে ঘন ঘন দোলে।
ডাগর রসের কাঁঠি গাঁথি দিল গলে ॥
নখিন্দর হইল ডোম বেহুলা ডোমনী।
সঘনে ফিরায় রামা লক্ষের ব্যজনী ॥
এইরূপে বেহুলা নখাই দুই জন।
চাঁদবেণের বাটীতে কিছু শুনহ কথন ॥

এইরূপে কবি ঘটনা—বৈচিত্র দেখাইবার,—চেষ্টা পাইয়াছেন। চাঁদবেণের ছয়টী বিধবা বধূ কলসী কক্ষে নদীতে জল আনিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যজনী দেখিয়া বিলক্ষণ লুব্ধা হইলেন—ছদ্মবেশ ধারিণী পতিব্রতা বেহুলাকে ব্যজনীর মূল্য জিজ্ঞাসিলে উত্তর পাইলেন,—"যদি লক্ষ টাকা পাই তাহা হইলে এই ব্যজনী বিক্রয় করি!" চাঁদবেণের ছয় বধূ বলিলেন,—

রঙ্গিনী ডোমনী তুমি লক্ষ তঙ্কা চাও।
কত ধন উপার্জ্জিবে ব্যজনীর বায় ॥

বেহুলা বলিলেন,—"পরম রসিক পুরুষে লক্ষ টাকার অধিক মূল্য দিয়াও এই পাখা কিনিতে পারেন, বিশেষ যিনি সাত পুত্রের জননী তিনি ইহা আদর করিয়া কিনিবেন। তখন চাঁদ সদাগরের বিধবা পুত্রবধূগণ সাগ্রহে বলিলেন,—"তাহা যদি হয়, তবে আমাদের শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীই ইহা ক্রয় করিবেন। তিনি সাত পুত্রের জননী।" এই কথা শুনিয়া বেহুলা ব্যজনী হস্তে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, আর আর বধূগণ জলের কলসী কক্ষে তাঁহার অগ্রগামিনী হইলেন। বধূগণ বেহুলাকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ব্যজনী বিক্রীয়ত্রীর সমস্ত কথা শ্বশ্রূ সনকাকে অবগত করিলে বেহুলা আপনার পিতামাতা শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী ও আপনার প্রকৃত নামের উপর কেবল ডোম ও ডোমনী শব্দ বোলে আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন—যথা পিতা সায় ডোম মাতা অমলা ডোমনী, স্বামী নখিন্দর ডোম আপনি বেহুলা ডোমনী ইত্যাদি পুত্র ও পুত্রবধূর নাম শুনিয়া সনকার সুপ্ত স্মৃতি জাগ্রত হইল, অশ্রুজলে চক্ষু ভাসিয়া গেল, তিনি লক্ষ টাকা মূল্যের ব্যজনী কিরূপ দেখিবার জন্য হস্তে লইলেন—ব্যজনীর চিত্রগুলি দেখিয়া স্তম্ভিত ও হত বুদ্ধি

হইলেন—তাহাতে যে সকল ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত তাহারা সকলেই তাঁহার স্বজন, যথা—স্বামী পুত্র, পুত্রবধূ, প্রভৃতি। সনকা তখন অতি বড় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন—"আমি তোমায় চিনিতে না পারিলেও তুমি সত্য পরিচয় দাও মা-তুমিই আমার পুত্রবধূ কি না ?"

বেহুলা তখন মোহমুগ্ধা নহেন—শাশুড়ীকে বলিলেন,—

বলেন ডোমনী, শুন ঠাকুরাণী,
মোরা ডোম জাতি হীন।
আমি যে তোমার, বধূর আকার,
কি পাইলে তার চিন ॥
ধুচনী-চুপড়ী, বেচি বাড়ী বাড়ী,
জেতের ব্যাভার যেন।
আমারে দেখিয়া, তুমি কি লাগিয়া,
রোদন করিছ কেন ॥

সনকা যখন পুত্রের জন্য শোকে অধীর হইয়া কান্দিতে লাগিলেন, তখন আর বেহুলা থাকিতে পারিলেন না, আত্ম পরিচয় দিয়া বলিলেন—"আপনার পুত্র জীবিত কি না সাতালির লৌহবাসগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করিলেই বুঝিতে পারিবেন। তিনি কৌতুহলাবিষ্ট চিত্তে অবিলম্বে সাতালী পর্ব্বতস্থ লোহার বাসঘর খুলিয়া দেখিলেন, কটাহে তৈল দীপ জ্বলিতেছে। অতঃপর বেহুলা শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা অবগত করিলেন, এবং শ্বশুর যাহাতে নানা উপচারে মনসা ঠাকুরাণীর পূজা দেন তাঁহার জন্য অনুরোধ করিলেন। সনকা পতিকে সকল কথা জানাইলে চাঁদ চৌদ্দডিঙ্গা ও সাত পুত্রের পুনর্জীবন লাভের সংবাদে অতি বড় উল্লাসিত হইয়া গাঙ্গুর তীরে সমস্তই প্রত্যক্ষ করিলেন। পত্নী মনসা পূজার জন্য অনুরোধ করিলে দুর্ম্মতি চাঁদ তখনও সর্ব্বতোভাবে সরল হইল না—"বলিল এই চৌদ্দটী ডিঙ্গা নদী হইতে দেবীকে আমার বাড়ীতে বহিয়া দিতে হইবে।"

বেহুলা দেবীকে স্তবস্তুতিতে পরিতুষ্ট করিলে ভক্তবৎসলা দেবী ভুজঙ্গমগণকে দিয়া নদী হইতে চৌদ্দটী ডিঙ্গা চাঁদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন—দেব প্রকৃতি এইরূপই উচ্চ, একবার তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিতে পারিলে তাহাদের দ্বারা সমস্ত কার্য্যই সাধন করা যায়। মা জগদম্বা আপনি কালকেতুকে ধনের ঘড়া বাহিয়া দিয়াছিলেন। এই অতি বড় অসম্ভব ব্যাপার চাঁদ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া

আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাহাতেও তিনি মনসার দেবশক্তি স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। সনকা অনেক বুঝাইলেন—পরিশেষে অগত্যা তাঁহাকে মনসার মাহাত্ম্য মানিয়া লইতে এবং দেবীপূজার সমস্ত আয়োজন অনুষ্ঠান করিতে হইল। মহা আড়ম্বরে চম্পক নগরে চাঁদ সদাগরের ভবনে মনসা পূজার মহামহোৎসব চলিতে লাগিল—সদাগর কৃতাঞ্জলিপুটে গললগ্নীকৃতবাসে ষোড়শ-পচারে দেবীর পূজা সমাপনান্তে স্তব করিতে লাগিলেন, মনসাদেবী স্তবে তুষ্ট হইয়া চাঁদের প্রত্যক্ষীভূতা হইলেন,—মনসার অনুগত কোটী কোটী ভুজঙ্গ সকলেই পূজা পাইয়া সন্তুষ্ট হইল। মনসা চাঁদ সদাগরে বিবাদ মিটিয়া গেল, দেবী আপন বাসস্থান সিজুয়া শিখরে প্রতিগমন করিলেন। চাঁদের মনসা পূজা হইতেই দেবীর পূজা সর্ব্ববাদী সম্মত হইল। মর্ত্ত্যলোকে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে সর্ব্বত্র সকলেই মনসার পূজা করিতে লাগিল, চাঁদ সদাগর সাত পুত্র, সাত পুত্রবধূ লইয়া কিছুকাল সুখ সমৃদ্ধি ভোগ করিলেন। বেহুলার অসাধারণ পতিভক্তি, অসামান্য একাগ্রতা ও অধ্যবাসায়-কাহিনী বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে প্রচারিত হইল। কবির লেখনী মনসা মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে অক্ষয় অমর হইলেন, গায়কেরা মনসামঙ্গল গ্রামে গ্রামে গান করিয়া বেড়াইতে লাগিল, মনসার মহিমার সহিত বেহুলার পতিপ্রাণতা গ্রথিত হইয়া রহিল। সতীর পতি ভক্তির এক অপূর্ব্ব চিত্র চিত্রিত হইল।

বেহুলা শাপভ্রষ্টা স্বর্গ-বিদ্যাধরী, মনসা মাহাত্ম্য প্রচার জন্যই নিছনী নগরে সায়বেণের কন্যা রূপে তাঁহার জন্ম পরিগ্রহ। চাঁদ সদাগর মনসাদ্বেষ্টা ছিলেন, মনসার নিগ্রহে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, সর্পাঘাতে তাঁহার সাত পুত্র কাল কবলিত হয়। একমাত্র পতিব্রতা বধূ বেহুলার একাগ্রতা ও অধ্যবসায় বলে চাঁদের সপ্ততরীর পুনরুদ্ধার ও সাত পুত্রের পুনর্জীবন লাভ ঘটিয়া উঠে। মনসা মাহাত্ম্য অনেকেই রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাস প্রণীত গ্রন্থই এদেশে সমাধিক প্রতিষ্ঠান্বিত। পূর্ব্ব বঙ্গের বরিশাল জেলার বিজয় গুপ্ত নামক কবিও "মনসার পাঁচালী" নাম দিয়া একখানি "মনসা মঙ্গল" রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আজ কালি অনেকে বলিতেছেন, মনসা মঙ্গলের নায়ক নখিন্দরের পিতা চাঁদ

---

* এস্থানে বোয়াইল মৎস্যে শবের পায়ের মালাই চাকী খাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম বেহুলা বোয়ালিয়া রাখিয়াছিলেন।

সদাগরের বাসস্থান চাম্পাই নগর নহে, ভাগলপুর জেলায়, সেখানে সাতালী পর্ব্বত, লৌহময় গৃহ সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা বিশেষ অনুসন্ধানে জানিয়াছি বর্দ্ধমানের চাম্পাই নগরই চাঁদ সদাগরের প্রকৃত বাসস্থান, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিব-লিঙ্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, বিশেষতঃ সাধ্বী সতী বেহুলা মৃতপতি নখিন্দরের শব ক্রোড়ে ধারণ করিয়া যে গাঙ্গুর নদীর তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে ভাগীরথীর ত্রিধারা ত্রিবেণীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন অধুনা সেই গাঙ্গুর নদীর স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইলেও একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, ঊনবিংশতাব্দীর প্রারম্ভে বর্দ্ধমান জেলার যে মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল তাহাতে গাঙ্গুর নদীর প্রবাহ স্পষ্টাকারে চিত্রিত দেখা যায়, আর ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাস গাঙ্গুরের তীরবর্ত্তী যে সকল গ্রামের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল গ্রাম অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহাদেরই পার্শ্ব দিয়া গাঙ্গুর নদীর প্রাচীন খাতের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। বেহুলা নখিন্দরের ঘটনার পর উহা বেহুলা নদী নামে পরিচিত হইয়াছে উপরিউক্ত গ্রন্থকারেরা বলিয়াছেন যে, যৎকালে বেহুলা পতির শব লইয়া গাঙ্গুর জলে ভাসিয়া যান তৎকালে বোয়ালিয়া, মাছেশ্বর, ও গোদাঘাটা গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না, প্রত্যাগমন কালে বেহুলাই ঐ সকল স্থানের নামকরণ করিয়াছিলেন যথা,—

বোয়ালিয়া * বলিয়া নাম বেহুলা থুইয়া।
জাগুলে বাহিয়া যায় চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া॥

* *

যে ঘাটে মড়ার অঙ্গে পড়িল মাছেতা।
প্রাণনাথে বেহুলা কহিল পূর্ব্বকথা॥
মাছেশ্বর বলিয়া তাহার নাম দিয়া।
পরে গেলা গোদাঘাটে বাহিয়া বাহিয়া॥
প্রভুরে কহিলা, পূর্ব্বে গোদার কাহিনী।
গোদাঘাট তার নাম থুইলা সীমন্তিনী॥

বেহুলার পতিপ্রাণতা ও একাগ্রতার তুলনা নাই। কবি তাঁহাকে শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা বলিয়া পরিচিত না করিলেও তিনি চরিত্র গুণে দেবী একথা কে না মানিয়া থাকিতে পারে। দেবশক্তি ব্যতীত এরূপ অসাধ্য সাধন হইবার নহে। আপাতদৃষ্টিতে এরূপ ঘটনাকে নিতান্ত অসম্ভব ও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে

কাজ অসম্ভব ছিল আজি বিজ্ঞানের উন্নতিসহকারে তাহা সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, এখন যাহা অসম্ভব আছে কে বলিতে পারে যে, কালে তাহা সম্ভব না হইতে পারে। হিন্দুর পুরাণাদি শাস্ত্রের নানা স্থানেই যখন পুনর্জীবন লাভের কথা পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাওয়া যায়, তখন ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য যে নিহিত আছে সে পক্ষে সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি সহকারে তাহা উদ্ভিন্ন হওয়াও বিচিত্র নহে। যদি নখীন্দরের পুনর্জীবন লাভকে কবিকল্পিত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ঘটনা বৈচিত্রে এবং বেহুলার চরিত্রে একাগ্রতার ও পতিপ্রাণতার চিত্র যে সুন্দর রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা মানিয়া লইতে হইবে।

প্রাচীন কবিগণ তাঁহাদের কাব্যোক্ত নায়িকা গণের চরিত্রের উৎকর্ষ প্রতিপাদনার্থ তাঁহাদিগকে অমানুষী শক্তিসম্পন্না, শাপভ্রষ্টা বা দেবাংশসৃষ্টা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দেবতাদের পক্ষে কিছুই অসাধ্য নহে, যাহা হইবার নয়, কাহার করিবার নয় তাহা দেবতাদের বা দেবাংশসমুদ্ভূত নরনারী ভিন্ন আর কাহার তাহা করনীয় নহে, কাজেই প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের সমস্ত নায়ক নায়িকার চিত্র উপরিউক্ত প্রকারে চিত্রিত না করিলে চলিত না। সে কালের হিন্দুর দেবচরিত ভিন্ন অন্য চরিত কথায় মন উঠিত না, তাহা শুনিতে ভালও বাসিতেন না, যে চরিত্রে দেবতার সম্বন্ধ সংস্রব থাকিত, বিনা উত্তেজনায় সকলে তাহা শুনিয়া শ্রবণ পবিত্র জ্ঞান করিতেন। দেবচরিত্রে বা দেবানুগৃহীতের চরিত্রে সকলই যখন সম্ভাবিতে পারে তখন সাতালী পর্ব্বতস্থ লৌহময় বাসগৃহে নকুলের প্রহরিত্বে সর্পের প্রবেশ, শব কোলে লইয়া ছয়মাস বেহুলার জলে জলে ভাসিয়া যাওয়া নানারূপ অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া বেহুলার সতীত্ব রক্ষা, স্বর্গ রজকীর পুত্রবধূ এবং তাহাকে পুনর্জীবন দান, তাহার অনুগ্রহে বেহুলার সুরপুরে প্রবেশাধিকার লাভ, ও দেবগণের কৃপায় কেবল মাত্র স্বামীর অস্থিময় দেহে রক্ত মাংসাদির সমাবেশ এবং তাহাতে জীবন সঞ্চারাদি মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব হইলেও দেবানুগৃহীতা বেহুলার পক্ষে সম্ভাবিতে পারিয়াছিল। কেবল আমাদের দেশে বা হিন্দুর বলিয়া নহে পাশ্চাত্য অনেক প্রাচীন কাব্যে এরূপ চরিতাখ্যান পাঠ করা যায়।

বেহুলা এই নাম শুনিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন ইহা বেদকোরাণ ছাড়া। হয়ত ইহা কবির স্বকপোলকল্পিত বেহুলার প্রকৃত নাম "বহুলা" বেহুলা নহে। বেহুলা নামের কোনই সার্থকতা নাই, বহুলা জগদ্ধাত্রী দুর্গার শত নামের মধ্যে একটী যথা,—

বহুলা বহুলপ্রেম্না সর্ব্ববাহন বাহিনী।
নিশুম্ভ শুম্ভ হননী মহিষাসুর মর্দ্দিনী ॥
বিশ্বসার তন্ত্র।

আমাদের বিবেচনা হয় প্রকৃত নাম বহুলা—ব্যবহার দোষে বেহুলা হইয়া থ করে। বেহুলা যে আদর্শ সতী সে পক্ষে বিন্দু মাত্র সংশয় নাই। ফুলশয্যার রাত্রিতে বিধবা হইয়া যে বণিকতনয়া পতিপরায়ণতায় প্রবীণাগণকে লজ্জা দিয়াছেন, তিনি যে তৎকালে নিতান্ত বালিকা ছিলেন তাহা মনে করাই ভ্রম। জনার্দ্দিন ঘটক নখিন্দরের বিবাহ সম্বন্ধ সংস্থাপনার্থ নিছনী নগরে উপস্থিত হইয়া অবিবাহিতা বেহুলাকে দেখিয়া বলিতেছেন,—

এত বড় যোগ্য কন্যা কেন অবিভায়ী।
*　　　*　　　*
সবার প্রধান তুমি বণিকের নাথ।
এ কন্যারে দেখিয়া কেমনে খাও ভাত ॥

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে—

"নবমে গৌরীকাপ্রোক্তা অত ঊর্দ্ধরজস্বলা।"

সায়বেণে এই মহাবাক্যের সম্মান রক্ষা করেন নাই, তৎকালে সমাজে বাল্য বিবাহের স্রোত প্রবাহিত হয় নাই। বিবাহ কালে বেহুলা যে প্রাপ্ত যৌবনা ছিলেন তাহা কবি অনেক স্থলেই উল্লেখ করিয়াছেন,—

"রাখ গো মান্দাস খানি শুনগো যুবতি।"

অন্যত্র,—

এ নব যৌবনে, কিসের কারণে,
মড়ারে লইয়া কোলে।
পতিহীনা নারী, শুনলো সুন্দরি,
ভেসে যাহ তুমি জলে॥

বেহুলার সতীত্বের তুলনা নাই। তাঁহার সতীত্বের সীমা নির্দ্ধারনার্থ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাকে সাবিত্রী সীতা দময়ন্তী প্রভৃতির উচ্চে স্থান দিতে ইচ্ছা হয়। হিন্দুর দেবচরিত্রে সন্দিহান হওয়ায় আমাদের পাতিত্য আছে। অতএব আমরা ছয়মাস পরে কেবল মাত্র কয়েকখানি অস্থি মাত্র অবশেষে নখিন্দরের পুনর্জীবন লাভ বিশ্বাস করিতে বাধ্য। এই অতি বিস্ময়কর ব্যাপার

বৈজ্ঞানিকের চিন্তা ও গবেষার বিষয়ীভূত। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না থানার বোগড়া গ্রামে কাহাকেও সর্পাঘাত হইলে সেই গ্রামের কেহই সর্পদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা না করাইয়া তাহাকে গ্রাম্য দেবতা বোগড়েশ্বরীর নাটমন্দিরে ফেলিয়া রাখে তাহাতেই সে আরোগ্য লাভ করে। আমাদের দেশের সর্পের ওঝাগণ "অসারে জলসার" এই সূত্র অবলম্বনে সর্পাহত ব্যক্তিকে কেবল জলে ফেলিয়া রাখিয়া সুস্থ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ এদেশে একটা প্রবাদ আছে সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে অহোরাত্র কাল-বিলম্বে দগ্ধ করা কর্ত্তব্য কেন না বিনা চিকিৎসায় এরূপে মৃত ব্যক্তির পুনর্জীবন লাভের কথাও শুনা গিয়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও ইহার সার্থকতা স্বীকার করেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ বিজ্ঞানবলেই হউক বা দেবানুগ্রহেই হউক নখিন্দর সর্পাঘাতে জীবন হারাইয়া তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহা যে তাঁহার প্রাণসমা পত্নী বেহুলার অসাধারণ অধ্যবসায় বলে সে পক্ষে সন্দেহ নাই। তিনি পূতিগন্ধনিঃসারী স্বামীর শব ছয়মাস কাল ক্রোড়ে লইয়া ছয়মাস কাল দুরাত্মাগণের দারুণ অত্যাচার, শ্বাপদ জন্তুর আক্রমণ, এবং নৈদাঘ রৌদ্রে, শীতের শিশিরে শ্রাবণের বারিধারায় কতই কষ্ট সহ্য করিয়াছেন তাহা বলিয়া ফুরাণ যায় না।

মনসা মঙ্গল উচ্চ শ্রেণীর কাব্য নহে, কিন্তু বেহুলা চরিত্রের ন্যায় স্ত্রী চরিত্র বর্ণনা বাঙ্গালা ভাষায় আছে কি না সন্দেহ। মনসামঙ্গলের কবিকে বিষয়ী লোক বলিয়া মনে হয়, সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল বলিয়া মনে করিবার কিছুই নাই। ভাল হাতে পড়িলে মনসা মঙ্গল বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। মনসামঙ্গলের ভাষা স্থানে স্থানে অনিন্দনীয়া না হইলেও মহাকাব্যের অনুযায়িনী নহে। তবে যদি উপাখ্যানের মৌলিকত্ব না থাকে, বেহুলা কবির কল্পনা সম্ভূতা হয়েন তাহা হইলে বেহলার চরিত্র সৃষ্টিতে কবিদিগের অসাধারণ কৃতিত্ব আছে সন্দেহ নাই।

কিয়দ্দিন পূর্ব্বে কেতকানন্দ ও ক্ষেমানন্দ দাস প্রণীত মনসামঙ্গলের একখানি হস্ত লিখিত পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, দুর্ভাগতঃ এখন তাহা হস্তান্তরিত হইয়াছে। পুঁথি খানির আকার আয়তন কবিকঙ্কণের চণ্ডী কাব্যের সদৃশ। তাহাতে কবিগণ আপনাদের বাসস্থান "শমন নগর" বলিয়া লিখিয়াছেন। হুগলী জেলার আঁটপুরের নিকট "সোম নগর" নামে একটী গ্রামের অস্তিত্ব আছে। যদি শমন নগরের অপভ্রংশে গ্রামের নাম সোম নগর হইয়া থাকে তাহা হইলে মনসা মঙ্গলের কবি হুগলী জেলার লোক বলিয়া স্বীকার করা যায়।

জননী।

লেখক শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

তুমি মা গো জন্মভূমি, করি নমস্কার—
তব পদে, জীবধাত্রী, এ মহীমণ্ডলে—
স্বর্গাদপি গরীয়সী তুমি মা জননী।
ভাগ্যফলে তব কোলে লয়েছি জনম,
ভুঞ্জিয়াছি কত সুখ, লভিয়াছি কত,
বাঞ্ছামত বস্তুরাজি তোমার প্রাসাদে।
অহো ? অকৃতজ্ঞ আমি। তব কৃপাভুলে—
আছি আমি বর্ষদ্বয় অজ্ঞানের বশে!
কল্পনায় ভ্রমিয়াছি অবনী মণ্ডল,
কত সৃষ্টি হেরিয়াছি, কত গিরিনদী,
কত বন, উপবন, পশুপক্ষী কত,
হেরিয়াছি কত স্থানে না পারি বর্ণিতে।
কত নর কত নারি হেরেছি নয়নে,
শ্রবণে শুনেছি কত মোহন সঙ্গীত,
কতশত তরুলতা নয়ন রঞ্জন,
সুন্দর সুন্দর কত প্রস্ফুটিত ফুল;
কিন্তু মা, তোমার কোলে যা কিছু নিরখি—
মনে হয় সুরপুরে নন্দন কানন;
যা কিছু শ্রবণ করি বসিয়া কুটীরে,
জ্ঞান হয় কর্ণে হয় সুধা বরিষণ;
তেমন সুখের সাধ কোন দেশে নাই।
তাই আমি জন্মভূমি বড় ভালবাসি।
দিওমা অঙ্কেতে স্থান, যে ক-দিন রব—

এ নশ্বর ভবধামে ; সুখ আশাকরি—
যেন নাহি যেতে হয় সুদূর বিদেশে ;
মা তোমার শান্তি কোল শান্তিনিকেতন ;
জন্মেছি তোমার কোলে, যাবত জীবন—
থাকিতে তোমার কোলে মনের উল্লাসে,
মরিব তোমার কোলে পূর্ণহলে কাল,
চলেযাব যেই দেশে, যে দেশের জীব—
জরে না, মরে না, কভু ; সদানন্দে রয় ;
সেইদেশ, যে দেশের শান্তিসুধা পিয়ে—
সংসার ছাড়িয়া মাগো হয়েছ অমর ;
সেই দেশে যাব আমি একান্ত বাসনা,
অন্তে যেন সে বাসনা হয় ফলবতী।
তথা গিয়া মা তোমারে হেরিব নয়নে
নিরখিব, বরষির নয়ন আশার,
অভিশিক্ত হবে তাহে শ্রীঅঙ্গ তোমার।
জন্মভূমি ! দিনদিন কাল হয় গত,
এইবেলা করে রাখি শেষ নিবেদন,
তাড়াইয়ে দিওনা মা অধম সন্তানে।
নিত্য হয় তববক্ষে ভাগীরথী লীলা,
লীলাতটে হয় যেন অন্তিম শয়ন।
জুড়ি কর বারবার নমস্কার করি,
জননী জন্মভূমির চির দাস আমি।*

* বিগত ১৩১৪ সাল ২৫শে কার্ত্তিক সোমবার মধ্যাহ্ন বেলা ১২টা ১০ মিঃ সময় পরমারাধ্য পরম পূজনীয়া স্নেহময়ী জননী আমাদিগকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া স্বর্গারোহন করেন। ৩য় বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে লিখিত, লেখক।

ক্ষুদ্ধা।

লেখক, সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

মোহ অজ্ঞান অন্ধকারে দুটি আঁখি হারা,
কে জানে কে হেন দেয় পথ দেখাইয়ে—
ঘুরিতেছি, অন্ধ হ'য়ে দেওয়ানা পারা,
পথের সম্বল হায় গেছে হারাইয়ে!
তুমি রবি তুমি শশী বিকাশ আলোকে—
আঁধার হৃদয় মম দেহ প্রকাশিয়ে!
তব প্রজ্ঞারূপ নিত্য নেহারি পুলকে—
সৎচিৎ আনন্দে আমিত্বে মিশাইয়ে।
আমি ছাড়া তুমি নহ, তোমা ছাড়া আমি—
কেহ কি করিতে পারে বিনা শয়তান,
যে পারে সে নরকের সম্রাটের স্বামী—
শাস্তি বুকে হাঁটা নারী প্রসবে সন্তান—
এ পাপ পুণ্যের রাজ্যে আমি অতি দীন,
হে বিভু করোনা মোরে বারিহীন মীন॥

—:•:—

বঙ্কিমচন্দ্রের দিগ্‌গজ চরিত্র।

লেখক, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিকে বুঝিতে পারিলে, যেমন তাহার কাব্য সহজে বুঝা যায়, সেইরূপ কাব্যকেও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা করিলে কবিকে সম্যক রূপে বুঝিতে পারা যায়। কুসুমের মধ্যে গন্ধের ন্যায়, কাব্য মধ্যে কবির আপন চরিত্র পরিস্ফুট হইয়া থাকে। রচনা কালীন তাহার হৃদয়উচ্ছ্বসিত ভাব রাশি, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে গ্রন্থ মধ্যে বিকাশ হইতে দেখা যায়। সেই বিকসিত ভাব, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের গ্রন্থস্থিত চরিত্র মধ্যে নিয়োজিত হইয়া, চরিত্র পরিস্ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রন্থকে সৌন্দর্য্য শোভায় সুশোভিত করিয়া তোলে।

চরিত্র চিত্রণ অনুসারে গ্রন্থকারের কৃতিত্বের পরিমাণ হইয়া থাকে। গ্রন্থকার একটী আদর্শ লইয়া, সেই আদর্শের পরিস্ফুটনোদ্দেশে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক চরিত্রের অবতারণা করিয়া থাকেন, চিত্রস্থিত প্রধান মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য যেমন তাঁহার চতুঃপার্শ্বস্থ দৃশ্য সমূহের সৌন্দর্য্যের উপর অনেকটা নির্ভর করে, সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্র গ্রন্থ মধ্যে আদর্শ চরিত্র বিকাশের সহায়তা করে। সেই ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিও গ্রন্থকারের হৃদয় নিহিত ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র।

দুর্গেশ-নন্দিনীর দিগ্‌গজ চরিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের সেই হৃদয়স্থিত একটী ভাবের বিকাশ বলিয়া আমাদের মনে হয়। এই চরিত্র প্রধান প্রধান চরিত্র বিকাশে কতদূর সাহায্য করিয়াছে বলিতে পারি না, কারণ আমরা গ্রন্থমধ্যে তাহার দুই বারের অধিক অবতারণা দেখিতে পাইব না। তাহাও আবার অতি সামান্য কার্য্যের নিমিত্ত। প্রথম—রাত্রে বিমলাকে শৈলেশ্বরের মন্দির পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া; দ্বিতীয় কতলুখাঁর কারাগারে বন্দী জগৎসিংহকে তিলোত্তমা ও গড়মন্দারণের সংবাদ দেওয়া। কার্য্য অতি সামান্য, তজ্জন্য এই দিগ্‌গজ চরিত্র গ্রন্থ হইতে একেবারে তুলিয়া দিলেই ইহার সৌন্দর্য্যের, বোধ হয় কোন হানি হইত না।

কিন্তু বেশ বুঝা যায়, হাস্যরসের অবতারণা করিয়া পাঠকের মনতুষ্টির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এই অদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি হাস্যরসের অবতারণা করুন, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই, বরং তাহাতে একটা না গভীর ভাব হইতে পাঠকের মনকে মধ্যে মধ্যে অনেকটা বিশ্রাম দিয়া গ্রন্থের মাধুর্য্য পূর্ণাঙ্ক বাড়াইয়া তোলে। কিন্তু বেচারা গরীব ব্রাহ্মণকে লইয়া গ্রন্থের হাস্যাস্পদ চরিত্র করাতে যেন সম্প্রদায় বিশেষের উপর গ্রন্থকারের ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সে সম্প্রদায় আর কেহ নয়—বাঙ্গালার পণ্ডিত ও পুরোহিত সম্প্রদায়কেই ঘৃণা ও বিদ্বেষ চরিতার্থ করিবার জন্য দিগ্‌গজের নাম, আকৃতি, বিদ্যা-উপাধি, বুদ্ধি ও প্রাণটাকে অদ্ভুত রকমের নিকৃষ্ট করিয়া তিনি পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছেন। নাম দিয়াছেন—গজপতি, অর্থাৎ মহাহস্তী, সেটা কিন্তু মূর্খতায়।—উপাধিটী দিগ্‌গজ—নামের উপযুক্ত খেতাব বটে। আকৃতি করিয়াছেন—সাড়ে চারি হাত লম্বা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মাংসহীন, একটু কুজো, মোটা নাক; কামানো মাথা দীর্ঘ আর্কফলা; যে চেহারা দেখিতে জগতে সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত; চলিত কথায় যাহাকে একখানি পোড়া-কাঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যার বহরটাও বেশ দেখাইয়াছেন; ছয়মাসে "মুগ্ধবোধ" আয়ত্ত করিয়া দিগ্‌গজপতি

"গোলে হরিবোলে" শব্দরূপ শেষ করিয়া ফেলিল; কিন্তু কিরূপে যে শেষ করিয়াছিল, তাহা রামশব্দের দ্বিতীয়ার রামকান্তই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। গ্রন্থকার তাঁহার বিদ্যার পরীক্ষায় দিগ্‌গজের নিজমুখ দিয়া অদ্ভুত উত্তর বাহির করিয়া তাহার মেষত্ব প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু ঐরূপ বিদ্যালাভ করিয়াও দিগ্‌গজের, বিদ্বান ও পণ্ডিতরূপে পরিচিত করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল; কারণ বিদ্যা শেষ করিয়াই সে গুরুর নিকট উপাধি চাহিতে ছাড়ে নাই। যোগ্য উপাধি পাইয়া সে পুনরায় কাশীতে স্মৃতি পড়িতে যাইতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। অধিকন্তু তাহার কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোকের বুকুনির বাদ যাইত না। আবার তাহাও স্বরচিত বলিয়া গর্ব্ব করা হইত। উদাহরণ স্বরূপ,—যখন দিগ্‌গজ তাহার গৃহে আসমানিকে দেখিয়াছিল পাছে, তাহাকে সেই সুন্দরী সুহাসিনী আসমানি, অরসিক বলে, এইজন্য সে "ওঁ আয়াহি বরদে দেবী" বলিয়া অভ্যর্থনাকরিয়া ফেলিল; এই সন্ধোক্ত গায়ত্রির আবাহন গজপতির মুখ দিয়া বলাইয়া গ্রন্থকার তাহাকে একটী প্রকাণ্ড মূর্খ সপ্রমাণ করিয়াছেন, কারণ তাহার পরের চরণটী মাতৃ সম্বোধন যুক্তা তার পর যখন কতলুখাঁর কারাগারে বন্দী জগতসিংহ দিগ্‌গজকে জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কি ব্রাহ্মণ" দিগ্‌গজ উত্তর করিল, "অসারে খলু সংসারে সারং শশুর মন্দিরং।" দিগ্‌গজ মনে করিল, সংস্কৃত শ্লোক না আওড়াইলে যদি বা মুর্খ মনে করিয়া ফেলে? সেই জন্য অসামঞ্জস্য ও অসংলগ্ন হইলেও দিগ্‌গজ এক শ্লোক ঝাড়িয়া দিলেন। মুসলমান হইয়াছি বলিল, তথাপি খুঙ্গি পুঁথি ছাড়ে নাই; বিমলা যখন তাহাকে পলাইয়া লইয়া যাইবার জন্য দিগ্‌গজকে অনুরোধ করিলেন, তখন দিগ্‌গজ স্বীকার পাইল, কিন্তু খুঙ্গি পুঁথি ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। পাছে তাহাকে আবার কেহ মুর্খ বলে! তাহার যে রসিকতার জন্য বিমলার নিকট আদরের সহিত রসিক রাজ রসোপাধ্যায় নামক মনের মত নাম লাভ করিয়াছিল; সেই "ঘৃত ভাণ্ডে" রসিকতায় আমাদের দীনবন্ধু বাবু বিয়ে পাগলা বুড়োর 'মৌমাছি খোঁচার' কথা মনে আসিয়া পড়ে। অথবা নবীন তপস্বিনীর জলধরের সেই "মালতি মালতি মালতি ফুল" স্মৃতি পথে উদয় হয়। এবং রসিকতা ব্যাপারে তিনটীকেই যেন একই উপাদানে গঠিত বলিয়া মনে ধারণা জন্মে। তিনজনেই বানর নাচ নাচিয়াছে—জলধরকে নাচাইয়া ছিল মল্লিকা ও মালতি; বিয়ে পাগলা বুড়োকে নাচাইয়াছিল, রতানাপিতেও পাড়ারছেলেরা; আর আমাদের দিগ্‌গজকে নাচাইয়াছিল—আসমানি ও বিমলা।

গজপতিকে গ্রন্থকার আকাট মুর্খ করিয়াও পরিতৃপ্ত হন নাই—তাহাকে বানর নাচাইয়া তবে ক্ষান্ত হইয়াছেন। একেত তাহার বুদ্ধি অতি অল্পই ছিল; নহিলে সে ব্যাকরণ ও রসিকতা শাস্ত্রে অতকৃত বিদ্যা হইত না—নহিলে আহার করিতে বসিয়া আস্‌মানির কথার উত্তর দিয়া বলিত না যে, আমি কই কথা কহিলাম। নহিলে যখন শৈলেশ্বর গমনোদ্যতা সজ্জিতা বিমলা তাহাকে বলিল, "আস্‌মানি ও আমি তোমার সহিত পলাইয়া যাইব, তুমি সত্বর হও" তখন সে বোকা বামুন না হইলে কি তাহার কথায় বিশ্বাস করে। গজপতি একবারো ভাবিল না—ইহারা কিজন্য পলাইয়া যাইবে—কেনই বা তাহার মত রূপবান বিশিষ্ট মহাপুরুষকেই প্রণয় পাত্র করিতে চাহিবে? মনে করিল—বিমলা বুঝি তাহার "দ্বৃত ভাণ্ডের রসিকতায় ও আস্‌মানি তাহার প্রেমে মজিয়া সুখ ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী হইতে চায়? কারণ পূর্ব্ব হইতে হৃদয়ে একটু আত্ম-শ্লাঘা ছিল—মনে করিত, "তাহার মত লোকের ভারতে কেবল লীলা করিতে আশা; এই তাহার বৃন্দাবন আস্‌মানি তাহার রাধিকা, এবং বিমলা তাহার চন্দ্রা-বলী।" যখন বিমলা শৈলেশ্বরের পথে রসিক দিগ্‌গজকে একটী গান গাহিতে বলিল, তখন সে সত্য সত্যই তার বিমলা রূপিণী চন্দ্রাবলী প্রেমে পড়িয়া কুল-ত্যাগিনী হইতেছে ভাবিয়া গান ধরিয়া ছিল—"কিক্ষণে দেখিনু শ্যামে কদম্বেরি মূলে; সেই দিন পুড়িল কপাল মোর কালি দিলাম কুলে, মাথায় চুড়া হাতে বাঁশী, কথা কয় হাসি হাসি বলে ওগয়লামাসি কলসি দিব ফেলে।" গানের ভাবটা বুঝিলেন কি? বুঝিলে কি দিগ্‌গজের কৃষ্ণ, গোপীদিগকে কি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে? প্রেমের সম্বন্ধ বিচারটা একবার দেখ? গ্রন্থকার, আস্‌-মানির অভ্যর্থনায়, যদিও সম্বোধনের সম্যক মত উহা রাখিয়াছিলেন, কিন্তু বিমলার নিকট, সঙ্গীতের মধ্য দিয়া গুরুতর পূজ্য সম্পর্কটা প্রকাশ করিতে ছাড়িলেন না। এই স্থানে দিগ্‌গজকে যেন নীতির নিম্নতম স্তরে ফেলিয়া দিয়া গ্রন্থকার পাঠককে একটু হাসাইয়াছেন।

এই সকল হাস্যোদ্দীপক প্রকরণ পাঠকের আনন্দ জনক হইলেও ইহা কত দূর সুনীতি সঙ্গত তাহা বলিতে পারি না? তারপর, গজপতি ভোজন ব্যাপারের দৃশ্য দেখিলে বাস্তবিক বড় মর্ম্মান্তিক দুঃখ হয়। আস্‌মানি আসিয়া ব্রাহ্মণকে আহারের সময় কথা কহাইল—তাহাকে অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় অন্নত্যাগ করাইল—শেষে তাহাকে ছলে কৌশলে আপনার উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত খাওয়াইল—অবশেষে

অরহর ডালের হাঁড়িটি পর্য্যন্ত তাহার মাথায় ঢালিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইল, ধরিয়া লইলাম—গ্রন্থকার দিগ্‌গজ চরিত্র চিত্রিত করিয়া কোন দোষ করেন নাই, কিন্তু তিনি নিজে ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ সমাজের আদর্শ শ্রেণী; সেই ব্রাহ্মণকে আহার ব্যাপারে ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করাইয়া আস্‌মানির উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত খাওয়ান তাঁহার মত ব্যক্তির পক্ষে কতদূর উচিত ও সঙ্গত হইয়াছে বলিতে পারি না। লোকের চক্ষে ব্রাহ্মণকে কতদূর হীন করা হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই হীনতার জন্য বঙ্কিম বাবুর উপর আমাদের স্বতঃই একটা অভিমান হয়। কারণ, অন্য কোন গ্রন্থকার যদি এ চরিত্র অঙ্কন করিত তাহা হইলে আমাদের কোন দুঃখ থাকিত না; কিন্তু যাঁহার অমৃতময়ী লেখনী হইতে, তেজস্বী আদর্শ ব্রাহ্মণ চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে—যাঁহার সর্ব্বতত্ব ভেদিনী কল্পনা হইতে মহাপুরুষ সত্যানন্দ তেজস্বী মাধবাচার্য্য রাজনীতিক চন্দ্রচূড়, প্রশান্ত চন্দ্রশেখর, দস্যু দেবতা ভবানী ঠাকুর, সুবিবেচক হরদেব ঘোষাল, সৃষ্ট হইয়াছে—যাঁহার প্রতিভা, ব্রাহ্মণকে লোক শিক্ষায়, সমাজ রক্ষায়, নিষ্কাম ধর্ম্মে, নিষ্কাম প্রণয়ে; বুদ্ধির প্রাখর্য্যে, চরিত্রের মাধুর্য্যে স্বভাবের সরলতায় এই আদর্শের উচ্চতায় স্থাপন করিয়া সমাজের সম্মুখে ধরিয়া তুলিয়াছে, তিনি যে ব্রাহ্মণকে হাস্যরসের নিকৃষ্ট তমস্তরে ফেলিয়া উৎকট রসিকতার অবতারণা করিবেন, ইহাই আমাদের দুঃখ ও অভিমানের কারণ।

সত্য বটে আস্‌মানি রূপবতী, তায় যুবতী, তায় আবার রসিকা; সত্য বটে দিগ্‌গজ আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞানে তাহাকে রাধিকা মনে ভাবিত। সত্য বটে, তাহার সেই রসিক রাজ, সেই রসরাজ, সেই রসমাণিক সম্বোধনে দিগ্‌গজ আত্মহারা হইয়া পড়িত; কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারি—কালো বোকা বামুন গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ কেন, আস্‌মানির সেই হাসির লহরে সেই রসের তরঙ্গে—সে বিলোল কটাক্ষে, অনেক সুন্দর কান্তি মহামহোপাধ্যায় গ্রন্থকারেরও মুণ্ড ঘুরিয়া যাইত, অনেকের প্রাণ রসেরসাগরে হাবুডুবু খাইত! রূপসীর রূপ যৌবন ত মুগ্ধ করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে—আর তাহা শুধু আপনি বিকশিত হইয়া ক্ষান্ত থাকে না, সোনার কাঠির মত পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত সুপ্ত সৌন্দর্য্যকে জাগাইয়া তোলে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। দিগ্‌গজ একে বামুন তায় বোকা আবার তায় কালো; সে যে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইহা ত সাধারণ নিয়ম। তথাপি তাহাকে উচ্ছিষ্ট খাওয়াইয়া, কাল হাঁড়ি মাথায় দেওয়াইয়া

বাহাদুরী হইল; বুঝিতে পারি না। যে আপনি মরিয়া থাকে, তাঁহাকে মারিয়া ফল কি, অন্ধকে কুপথে চালাইয়া খঞ্জকে খানায় ফেলিয়া কৌতুক দেখায় এমন কি পৌরষ আছে!

হইতে পারে সেই সময়ে কতকগুলি পণ্ডিত আখ্যাধারী মূর্খ—ব্রাহ্মণ বাহিরে অতীব নিষ্ঠা দেখাইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ বিগর্হিত অনেক কার্য্য গোপনে গোপনে আচরণ করিত; কিন্তু আবার অনেক শিক্ষিত বাবু সম্প্রদায় বাহিরে হিন্দুয়ানির বড়াই করিয়া হিন্দুর অস্পৃশ্য ও নিষিদ্ধ আহার্য্য দ্রব্য গোগ্রাসে গিলিয়া থাকে; কিন্তু গ্রন্থকার শেষোক্ত সম্প্রদায়কে ছাড়িয়া দিয়া প্রথমোক্ত সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিয়াছেন। যদি সমাজের দোষ দেখাইয়া, হাসির চাবুক দিয়া দুষিত সমাজকে শাসিত করিবার উদ্দেশ্য থাকিত; তবে তিনি দ্বিতীয় সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। আর দুর্গেশ নন্দিনীর মত গ্রন্থে তাহা হইতে পারে না। দুর্গেশনন্দিনী ত সমাজ চিত্র নহে ইহা তৎকালীন বঙ্গ সাহিত্য-উদ্যানের একটী অভূত-পূর্ব্ব নূতন কুসুমতরু। এ তরুতে যে সকল কুসুম ফুটিয়াছে পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কখন তা ফোটে নাই—বাঙ্গালী তাহার সৌন্দর্য্য কখন চক্ষে দেখে নাই, বঙ্গবাসী সে সৌরভের কখনো আঘ্রাণ পায় নাই। পাশ্চাত্য স্থপতিবিদ্যায় পারদর্শী নূতন কারিকর নূতন ছাঁচে নূতন ছবি গড়িয়া তুলিয়াছিল। অধিকন্তু রাজপুত ও পাঠান সংক্রান্ত ইতিহাস হইতে এই গ্রন্থের সারভাগ লওয়া হইয়াছিল। বাঙ্গালার সামাজিক ব্যাপারের সহিত ইহার কোন সংস্রব ছিল না- এখন দেখা যাইতেছে সমাজ সংস্কারোদ্দেশে এ চরিত্র লিখিত হয় নাই। আর যদি তিনি সংস্কৃত নাটক অনুযায়ী বিদূষক-চরিত্র অনুকরণে ব্রাহ্মণকে হাস্যরসের অবতারণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাও ঠিক খাপ খায় নাই বলিয়া মনে হয়। এক জাতিগত সাম্য ছাড়া আর কোন সামঞ্জস্যই দেখিতে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত নাটকে, বিদূষক নিজে বাক্য কৌশলে, দর্শকদিগকে হাসাইয়া থাকে। দিগ্‌গজ চরিত্রের ন্যায় অপরের দ্বারা হাস্যাস্পদ হয় নাই। বিদূষক, নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, প্রধান চরিত্রের কোন গুরুতর কার্য্যের কষ্টকর সময়কে হাস্যরসের দ্বারা সুকোমল ও সুখময় করিয়া সহায় স্বরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু দিগ্‌গজ চরিত্রে অতি সামান্য কার্য্যে সামান্য সহায়তা করা ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। বিদূষকের হাসির মধ্যে তরলচিত্ততার ভিতরে, চাঞ্চল্যে মধ্যে একটা গাম্ভির্য্য একটা ধৈর্য্য— একটা উদ্দেশ্য বেশ ফুটিয়া বাহির হয়। সাধারণ স্থূল চক্ষে তাহা

দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলেই, বালি: মধ্যস্থিত ফল্গুস্রোতের ন্যায় অন্তঃশিলা বহিতেছে, সম্যক উপলব্ধি হয়। শকুন্তলা ও মৃচ্ছকটিক নাটকের বিদূষক চরিত্র তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া ধরা যায়। তাহা হইলে সংস্কৃত বিদূষকের সহিত দিগ্‌গজের সাদৃশ্য কিছুই নাই বুঝা গেল।

এখন আমাদের অনুমান হয় গ্রন্থকার ইংরাজী নাটকের Clown অবলম্বন করিয়া এ চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকিবেন। বলিতে পারি না, বোধ হয় অনেক যেন খাপথায় তবে সম্পূর্ণ কিছুই মেলে না।

একটা কথা শুনিয়াছিলাম—সত্য মিথ্যা জানি না, বঙ্কিম চন্দ্র যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে নূতন অবতীর্ণ হন—তখন, তাঁহার সাধুভাষার সহিত কথিত বাঙ্গলাভাষার মিশ্রণ দেখিয়া, কতকগুলি উপাধিধারী পণ্ডিত তাঁহার উপর মহাক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি "রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য পালন ও অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।" এইরূপ বাঙ্গালা শিখিয়া চলিত সাধুভাষার সঙ্গে কথিত ভাব মিশাইয়া লিখিতেন, "যাহাকে ভাল বাস তাহাকে নয়নের আড় করিও না।" এই জন্য তাহাদের আক্রোশ; তাঁহারা ভাবিত, "হায় হায় এতদিনে বাঙ্গলা ভাষাটা পাষণ্ডের হাতে পড়িয়া বুঝি রসাতলে গেল; তাই বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাহারা দাঁড়াইয়া ছিল। তাই তিনি তাঁহার প্রথম পুস্তক উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া না বিদূষক না Clown একটা উদ্ভট রকমের চরিত্রের মধ্য দিয়া দিগগজ রূপে হাস্যস্পদ চরিত্রের অঙ্কিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সর্ব্ব বিষয়ে নিকৃষ্ট ভাবে চিত্রিত করিলে যাহা দাঁড়ায় দিগ্‌গজ ও ঠিক তাই। সেই লম্বা চেহারা, সেই বাঙ্গাল উপাধি—সেই অল্প বিদ্যার সংস্কৃতের অসংলগ্ন বুকনি। সেই অন্তরে বাহিরে বৈষম্য; সেই দীর্ঘ শিখা, সেই রসিকতা সেই গৃহিণীর আঁচল ধরাটী পর্য্যন্ত বজায় আছে। তবে দিগ্‌গজের গৃহিণী ছিল না, ব্রাহ্মণ কারায় আঁচল ধরিবে, তাই গ্রন্থকার শৈলেশ্বরের পথে ভয়েভীত দিগ্‌গজকে বিমলার আঁচল ধরাইয়াছেন। আস্‌মানীর রূপ বর্ণনা কালেও সেই পণ্ডিত শ্রেণীর দীর্ঘ সমাস-যুক্ত ভাষার উপর ও রূপ বর্ণনার ভঙ্গির উপর তীব্রকটাক্ষ করিয়া গ্রন্থকার বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার অতি লোভনীয় আর্কফলাটীতে শুদ্ধ ডালের রসুধারা না বহাইয়া, স্বর্গীয় কালি-প্রসন্ন সিংহের আদর্শে সেটীকে কর্ত্তন কিংবা উৎপাটন করিয়া দিলেই আক্রোশের

ষোলকলা পূর্ণ হইত ; সে অভিপ্রায় অনেকটা ছিল, বলিয়া বোধ হয় ; কিন্তু হয় সে বিষয়ের তিনি ভালরূপ সুবিধা পান নাই, অথবা নিজে ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণের উপর অতটা অত্যাচার করিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণেরতর অনেক গ্রন্থকার ঐ লোভটুকু সংবরণ করিতে পারেন নাই ; দীনবন্ধু মিত্রের নবীন তপস্বিনীতে "মন্ত্রীর মুখে, ব্রাহ্মণের শিখা উৎপাটন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মোটা রকমের দক্ষিণা দিয়া শান্তনা করার কথা উল্লেখ আছে। অমৃত লাল বসু "কৃপণের ধন" গ্রন্থে, কৃপণের দ্বারা পুরোহিত ব্রাহ্মণের সমস্ত কাড়িয়া লইয়া মাত্র ক্ষান্ত হন নাই-আক্রোশের বশে শিখাটী পর্য্যন্ত স্বজোরে উৎপাটন করাইয়া তবে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। যাক্ ধান ভানিতে শিবের গীতের আবশ্যক নাই ; তবে বঙ্কিম চন্দ্র যে উদ্দেশ্য বশে এ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা সিদ্ধ হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে,—এই দিগ্‌গজ চিত্র অঙ্কনের জন্য গ্রন্থকার সম্পূর্ণ রূপ দায়ী কি না ? আমি বলি তাহা নহে ; ইহার জন্য তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপ দোষী করিতে পারি না ; তখনকার সময় ও সমাজ আংশিক ভাবে এবং তিনি আংশিক ভাবে ইহার নিমিত্ত দায়ী।

প্রথমতঃ—দেশকাল সমাজ অনেক সময় কবির কল্পনাকেও নিয়ন্ত্রিত করিয়া আপন অনুযায়ী গঠন করিয়া তোলে। সেই কল্পনা প্রসূত ভাবের বিকাশ পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ নূতন রূপে প্রকাশ পায় ; তখন নূতন ও পুরাতনে একটা বিবাদ বিসম্বাদ হইতে আরম্ভ হয় ; সেই নূতন যতক্ষণ না হেয় উপহাস্য ঘৃণিত ও পরাজিত করিতে না পারে ততক্ষণ আপনার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় না। পুরাতনের ধ্বংস স্তুপের উপর নূতন আসন ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ধীরে ধীরে আপনার মহিমা গৌরব বিকাশ করিতে থাকে। যে সময় বঙ্কিম চন্দ্র তাঁহার প্রথম গ্রন্থ দুর্গেশ-নন্দিনী লিখিয়াছিলেন—তখন বাঙ্গালার সমাজ সর্ব্ব বিষয়ে একটা পরিবর্ত্তনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে রাজনীতি ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি প্রত্যেক বিভাগে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ভাব পরিলক্ষিত হইতে ছিল। সেই পরিবর্ত্তনের যুগে সেই জন্য ভাষার মধ্যেও একটা স্বাধীনতার ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল ; কারণ সাহিত্য জাতীয় আভ্যন্তরিক শক্তির ও ভাবের নিদর্শন মাত্র। ভাষাও তাই সেই পুরাতন, সংস্কৃতের দীর্ঘ সমাসযুক্ত বাক্য বিন্যাস প্রথা, ও পুরাতন ভাবরাশি দূরে নিক্ষেপ করিয়া নূতন উচ্চ ভাবের প্রকাশ জন্য সংস্কৃত বাক্যের সহিত সহজ প্রাঞ্জল চলিত কথার সংযোজনা করিয়া

নূতন রূপে সাহিত্যের শোভা বর্দ্ধন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তজ্জন্য গ্রন্থকার তৎকালীন ভাষাকে উপহাস করিয়া এবং সেই ভাষার সমর্থক ও পৃষ্ঠ পোষক দিগকে আক্রমণ করিয়া নূতন ভাব ও ভাষার প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। তখন আর লোকের ভারতচন্দ্র দাশুরথী রায়ে তৃপ্ত হইত না। কালস্রোত যেরূপ ফিরিতেছিল, আভ্যন্তরিক ভাব যেরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছিল—সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তিও সেইরূপ পরিস্ফুট হইতেছিল। সেই শক্তিতে শক্তিমান সেই ভাবের ভাবুক গ্রন্থকারের আপনাদের আদর্শের সোণার তরণী সেই স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা ছিল পূর্ণ জোয়ার, পাশ্চাত্য শিক্ষা অনুকুল পবন তখন সেই তরণীর কর্ণধার বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র নবীন চন্দ্র ও শ্রীমধুসূদন।

দ্বিতীয়তঃ—গ্রন্থকার ব্যক্তিগত ভাবে চরিত্রের জন্য কতটুকু দায়ী এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাক। মানুষ অবস্থার দাস, ঘটনা চক্রে পড়িয়া যে অবস্থায় পতিত হয়, ঠিক তাহারি দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চিত্র উপাধি প্রাপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যৌবনের লেখনী হইতে যাহা আশা করা যায়, আমরা তাহাই পাইয়াছি; তাঁহার নিকট আমরা কি তখন ধর্ম্মতত্ত্ব কৃষ্ণচরিত্র আনন্দমঠ আশা করিতে পারিতাম? বরং পরবর্ত্তী গ্রন্থ নিচয়ে প্রস্ফুটিত, নিস্বার্থ রূপে যে আত্মত্যাগ, বীরত্ব ও স্বদেশ প্রেমের অঙ্কুর দেখিতে পাইয়াছিলাম। তিনি যে আদর্শ ব্রাহ্মণ চরিত্র চিত্রিত করিয়াছিলেন তাহার আভাস আমরা দুর্গেশনন্দিনীর অভিরাম স্বামীতে যদিও কিছুমাত্র দেখিতে পাই বটে, কিন্তু তবু তিনি তাহাকে তেজস্বী ও বুদ্ধিমান করিয়াও দুশ্চরিত্র ও অনাচারী করিতে ছাড়েন নাই। ইহার কারণ সেই নূতন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা। তিনি তখন পাশ্চাত্যের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত স্বাধীন কল্পনা ও স্বাধীন প্রেমে উন্মত্ত। তাই তিনি হিন্দুকে যবনীর প্রণয় পাত্র করিয়াছিলেন, তাই তিনি নিভৃত কারাগারে ওসমান ও জগত সিংহের সমক্ষে গর্ব্ব ও তেজের সহিত আয়েসার মুখে বলাইয়া দিলেন "এ বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।" তাই তিনি বীরেন্দ্র সিংহের মধ্যে হিন্দুসমাজের বন্ধন শিথিল করিয়াছিলেন; বিমলার হৃদয়ে প্রতি-হিংসা বিষ দিয়া তাহার হস্তে শাণিত ছুরিকা দিয়া ছিলেন। এবং এই সকল নূতন ভাবের প্রতিষ্ঠার জন্য পুরাতন ভাবের ধ্বংস করিতে দিগ্গজ চরিত্র অঙ্কিত করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তিনি প্রথম যৌবনের, কল্পনা প্রসূত প্রথম গ্রন্থে যাহা আঁকিয়া-

ছিলেন, তাহার দোষ যেন তিনি পরবর্ত্তী গ্রন্থ নিচয়ে শোধরাইয়া দিয়াছেন। প্রথমে তিনি সমাজের মধ্যে না ঢুকিয়া সমাজকে ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই; পরে যখন তাঁর বৈদেশিক মোহ একটু কাটিল, পাশ্চাত্য নেশা অনেকটা ছুটিল, দেশকে বুঝিতে পারিলেন; তখন ঐ ব্রাহ্মণ চরিত্রকে আদর্শ করিয়া দেশের সম্মুখে ধরিলেন। তাহারি ফলে সত্যানন্দ চন্দ্রচূড় ভবানীঠাকুর মাধবাচার্য্যের সৃষ্টি হইল; তাহারি ফলে আফিংখোর ব্রাহ্মণ কমলাকান্ত, ভাবের আফিঙ্গে কল্পনার মৌতাত চড়াইয়া দেশের জন্য, সমাজের জন্য, প্রাণের মর্ম্মান্তিক আবেগ ছুটাইয়াছিল।

যৌবনে পাশ্চাত্য মোহে পড়িয়া অনেক গ্রন্থকারের ঐরূপ ভাব বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন—প্রথমে ইংরাজী কবিতা লিখিয়া বাণীর সেবা করিতেন; কিন্তু যখন তাঁর সে বৈদেশিক নেশা একটু ছুটিল, যখন তিনি আপনাকে একটু চিনিলেন, তখন ইংরাজী ভাষাবিদ্ কবি আপনার মাতৃ ভাষায় মনে মনে গাহিলেন, "হে বঙ্গভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন, তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি পরধন লোভে মত্ত।" তাহারি ফলে, বিলাতি আদর্শে, বাঙ্গালাভাষায় অমৃতাক্ষরে অপূর্ব্ব গ্রন্থ "মেঘনাদ বধের" সৃষ্টি হইল। কিন্তু তখন তাঁহার নেশা ভালরূপে কাটে নাই, তাই উহাতে রাম চরিত্রকে নীচু করিয়া ধর্ম্মভাব হীন করিয়া তিনি না কি বলিয়াছিলেন, "I hate Ram and his rebes." তারপর যখন প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগিল, যখন প্রাণে বিশ্ব-প্রেমের আস্বাদ পাইলেন, তখন খাঁটি পাশ্চাত্য শিক্ষিত বিধর্ম্ম কবি মনের আনন্দে গাহিয়া উঠিলেন—"নাচিছে কদম্ব মূলে বাজায়ে মুরলিরে রাধিকারমণ।" মনে হয় বুঝি তিনি জাতীয় ধর্ম্ম ত্যাগের জন্য শেষ জীবনে মনে মনে একটু অনুতাপও করিয়াছিলেন। আবার, কবিবর নবীন চন্দ্র সেন প্রথম যৌবনে তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ পলাশির যুদ্ধ কাব্যে যে সিরাজ চরিত্র চিত্রিত করিয়াছিলেন—তখনকার ইতিহাসে সে চরিত্র তাহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যখন, শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ আধুনিক সিরাজ চরিত্র লইয়া সম্পূর্ণ নূতন উপাদানে সিরাজদ্দৌলা নাটক লিখিলেন, তখন নবীন চন্দ্র ও গিরিশ বাবুকে এক্‌খানি পত্রে কি লিখিয়াছিলেন জানেন কি? তিনি লিখিয়াছিলেন, "ভাই গিরিশ, আমি ২০ বৎসর বয়সে যে সিরাজ চরিত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তুমি ৫০ বৎসর বয়সে তাহা লিখিয়াছ, আমি সিরাজের বিপক্ষ লিখিত পাশ্চাত্য ইতিহাস হইতে আদর্শ লইয়াছিলাম, তাই তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারি

নাই।" এই পত্রখানি হইতে বেশ বুঝা যায়, এখনকার সিরাজ চরিত্র হইতে আপনার সিরাজ চরিত্রের নিকৃষ্টতার জন্য নবীন বাবুর মনে যেন একটু আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, তাই তিনি গিরিশ বাবুকেও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বদেশবাসীকে আপনার ত্রুটীর কারণ অনুতাপের সহিত না জানাইয়া থাকিতে পারেন নাই।

এইরূপে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সমুজ্জ্বল আলোকে প্রথমে অনেকেরই চক্ষু ঝলসিয়া ছিল। তখন তাঁহারা ঝলসিত নয়নে বস্তুর ঠিক স্বরূপ দেখিতে পারেন নাই; সত্যের মধ্যে মিথ্যা, ও আলোকের মধ্যে অন্ধকার দর্শন করিয়াছিলেন। তাহারি ফলে বঙ্কিম চন্দ্রের দিগ্‌গজ চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছিল। তথাপি ইহার নিমিত্ত তাঁহার উপর একটু অভিমান হইয়াছে। এবং সেই অভিমানোদ্দীপ্ত হইয়া আমার মত অতিনগণ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম আজ তাঁহার লিখিত চিত্রের একটু কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত।

হে বঙ্কিম চন্দ্র, হে বঙ্গভাষানলিনীর নবীন সূর্য্য, হে লোক রক্ষক, সমাজ শিক্ষক, তুমি এখন স্বর্গে; তোমার অনন্ত সাগর সদৃশ কল্পনার একটী ক্ষুদ্র প্রবাহ পরিমাণ করিতে গিয়া যদি কোন ভ্রম করিয়া থাকি, তবে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি স্বর্গ হইতে আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার অন্ধ উপাসক; দ্বাদশ বৎসর বয়স হইতে তোমার আরাধনা করিয়া আসিতেছি, তুমিই আমার শিক্ষক ও গুরু। সেই বাল্যকাল হইতে তোমারে আমার হৃদয় মন্দিরের স্বর্ণ সিংহাসনে স্থাপনা করিয়াছি; হে আমার প্রাণের দেবতা যদি তোমার আলোচনা করিতে গিয়া কোন ভ্রম করিয়া থাকি, তবে তাহার জন্য আমার কোন দোষ হইবে না—তুমিই তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।

"মা"—

লেখক, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।—

"মা"—অক্ষরটী কি অমৃতময়! এমন সুধাময় অক্ষর কে সৃজন করিয়াছে? সন্তান মায়ের নিকট এই শব্দ একবার উচ্চারণ করিলে, তাঁহার হৃদয় তন্ত্রী যেন বাজিয়া উঠে—তাঁহার মন আনন্দে যেন নাচিতে থাকে। যদি প্রকৃত দয়াপূর্ণ ও সরলতা পূর্ণ স্থান কোথাও থাকে...

আত্মাধীনতা, সংসারে শান্তিজনক শুশ্রূষা, সদয় ভাবপূর্ণ সহায়তা, অকৃত্রিম সাহানুভূতি কোথাও থাকে—সে কেবল মায়ের প্রাণ। সংসারের প্রখর তাড়নে বিতাড়িত ও মর্ম্মাহত হইয়া ক্ষণিক শান্তির জন্য প্রাণ যখন ত্রাহি ত্রাহি করে, তখনই আমরা একবার "মা" বলে ডাকিয়া সন্তপ্ত প্রাণ শীতল করি, হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় শোক-বহ্নি যখন হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রধূমিত ও পরিশেষে প্রজ্জ্বলিত হইয়া হৃদয়-মন্দির অধিকার করে, তখন কেবল আমরা একবার "মা" শব্দ উচ্চারণ করিয়া সকল জ্বালার উপশম করি। মাকে দেখিলে হৃদয়-মন্দির আপনা হইতেই কোমলতায় পরিপূর্ণ হয়। দুঃখ, যন্ত্রণা, নিরাশা, মনস্তাপ ও ভয় প্রভৃতি শত্রুগণের বিভীষিকা একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়। তখন অনির্ব্বচনীয় মধুময় স্বর্গীয় ভাবে প্রাণ-মন্দির পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বিদ্যার্থী যুবকেরা সমস্ত দিন মানসিক শ্রমে উত্তেজিত হইয়া তাঁহার নিকট শান্তিলাভ করেন। পর সেবক সমস্ত দিন পরের পদলেহন করিয়া স্নেহময়ী জননীর নিকট শ্রম জনিত শান্তি দূর করেন। বাণিজ্য ব্যবসায়ী সমস্ত দিন ক্রয় বিক্রয়ে ক্লান্ত হইয়া, কৃষক স্বকার্য্যে কঠোর পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া মায়ের নিকট শান্তিলাভ করেন।

মায়ের মমতা ও বাৎসল্য ভাব কি অমূল্য ধন! কি রমণীয় পদার্থ! কম্পাসের কাঁটা যেরূপ সতত উত্তর দিকে থাকে, মায়ের মনও তদ্রূপ সতত সন্তানের উপর ন্যস্ত থাকে। জননী যাহা সন্তানকে একবার শিক্ষা দেন, তাহা যেমন সে আহ্লাদের সহিত শিক্ষা করে; তেমন আর কিছুই করে না। তিনি নবীন অরুণ কৈশোর অবস্থায় যে সকল উপদেশ সন্তানের অন্তরে রোপণ করেন, সে গুলি স্নেহময়ী মায়ের মৃত্যুর পরেও জীবনে কার্য্য করে। বাল্যকালে পুরুষের চরিত্র জননীর দ্বারা গঠিত হয়, এবং যৌবনকালে তাহা প্রিয়তমা প্রণয়িনীর দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই মূল চরিত্রই সংসার সমুদ্রের ভেলা স্বরূপ। অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী রণকেশরী নেপোলিয়ান্ বোণাপার্ট্ (১৭৬৯-১৮২৬) বলিতেন "বালকের ভবিষ্যৎ চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ সম্পূর্ণরূপে মায়ের উপর নির্ভর করে।" তিনি নিজে জননীর নিকট যে সকল সদ্‌গুণ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রভাবেই তিনি এত উন্নত হইয়াছিলেন। ইংরাজ কবি জর্জ্জ হার্বার্ট্ (১৫৯৩—১৬৩২) বলিয়াছেন "একজন সুশিক্ষিতা মাতা একশত শিক্ষকের সমান।" এইরূপ জীবনী পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, অধিকাংশ মহাত্মগণের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও মহত্ত্বের বীজ স্নেহময়ী মায়ের দ্বারা তাঁহাদের অন্তরে রোপিত হইয়াছিল।

সংসার-সমুদ্রে ঝটিকাহত ব্যক্তির পক্ষে মা-ই একমাত্র উৎকৃষ্ট বন্দর। এই পাপপূর্ণ সংসারে তিনিই মহা পদার্থ। জীবন মরুভূমের একমাত্র সরসী। তিনিই বিপদ সঙ্কুল সংসারের নিরাপদ দুর্গস্বরূপ। সংসারের নানা বিভীষিকাপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে তিনিই চালক এবং তাহাদের সহিত সাহসে সংগ্রাম করিতে তিনিই উৎসাহ প্রদান করেন। সূর্য্যের আকর্ষণে যেরূপ সৌরজগতের গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি স্ব স্ব স্থানে সুনিয়মে অবস্থিত থাকে; তদ্রূপ মায়ের প্রভাবে সংসার জগতের সকল বিষয় সুনিয়মে সন্নিবদ্ধ থাকে। সংসারের সমস্ত পরিজন তাঁহার কার্য্য কলাপ, রীতি-নীতি, অনুকরণ করিয়া চলেন। তিনি হৃদয়াকাশের একমাত্র শুকতারা। যে সংসারে মা নাই, তথায় কেবল কলহ, বিবাদ, বিসম্বাদ, দুঃখ, মনকষ্ট প্রভৃতি দিবানিশি বিরাজ করে। যে কখন মা-মাখা মাতৃভাষায় "মা" বলিয়া ডাকে নাই, তাহার মনুষ্য জন্ম বৃথা। বিগ্রহ শূন্য মন্দিরের ন্যায় সে সংসার শূন্যময়। সে সংসারে তাঁহারা বহু আত্মীয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিলেও উৎসাহ শূন্য হৃদয়ে মনে সুখ পান না। তিনি আত্মীয় পরিজনের কর্তৃত্ব ভার লইয়া নামে মাত্র কর্ত্তা হইয়া সুখে থাকিতে পান না। মাতৃ স্নেহের মত মধুর স্নিগ্ধ সুশীতল সুকোমল ভালবাসা এ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। এ সংসারে মায়ের প্রাণে অহোরাত্র অমৃতময় স্নেহের স্রোত ফল্গু-নদীর ন্যায় গুপ্ত ভাবে অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে। বন্ধু-বান্ধবে স্নেহ করে, কিন্তু মায়ের মত তেমন পবিত্র স্নেহ তাহাদের হৃদয়ে আছে কি? পুরুষ মস্তিষ্কের কার্য্যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, স্ত্রীলোক হৃদয়ের কার্য্যে পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরুষ বুদ্ধি ও নিপুণতার কার্য্যে তৎপর, স্ত্রীলোক স্নেহ, মমতা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণে নিরুপমা। পুরুষ রুক্ষ শাসন কার্য্যে সমর্থ, স্ত্রীলোক কোমলভাব দ্বারা হৃদয়াকৃষ্ট করিতে সক্ষম। তাই জননী যেরূপ কষ্ট সহ করিয়া সন্তান পালন করিয়া থাকেন, পিতার সে সহ্য গুণ নাই। তিনি সর্ব্বাবস্থায় ধাত্রী স্বরূপ। তাই সন্তান সর্ব্বসুখ প্রদায়িনী মায়ের ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারে না। সন্তান যেরূপ অবস্থার হউক, মাতার নিকট অমূল্য রত্ন স্বরূপ। সকল গুরুর মধ্যে জননীই পরম গুরু। মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর—পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর। মনুষ্য জীবনে যত কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে, মাতৃসেবা সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি একবার মাতৃস্নেহ অনুভব করিয়াছেন, তিনি সত্য সত্যই অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছেন। তাঁহার জীবন ধন্য ও জন্ম সার্থক হইয়াছে। মায়ের প্রাণে তাঁহার যে প্রেমলীলা, তাহার

তুলনা জগতে আর কোথায় নাই। মাতৃ প্রেমই অকৃত্রিম প্রেমের অমোঘ নিদর্শন। তিনিই জীবন্ত প্রত্যক্ষ প্রেম প্রতিমা! প্রেম রূপিণী মূর্ত্তিময়ী মাকে দেখিলেই স্বভাবতই অচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়। মায়ের প্রতি হৃদয়ের যে প্রগাঢ় ভক্তি, তাহা বড়ই প্রশংসনীয় গুণ। মহারাজ শিবজী, মহাবীর প্রতাপ সিংহ, মহাযশা বাজিরাও, মহামতি আকবর প্রভৃতি মহাত্মাগণ জগতে যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন; তাহা কেবল তাঁহাদের মাতৃভক্তি ও মায়ের প্রকৃত শিক্ষা গুণে। বর্ত্তমান সময়ে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪—১৮৮৩), জগৎ পূজ্য ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১), মহারাজ স্যার যোতীন্দ্র মোহন ঠাকুর (১৮৩১—১৯০৮), ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৩৯—১৮৯৪), উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪—১৯০৬), প্রভৃতি মহাত্মারা মাতৃভক্তির গুণে এত উন্নত হইয়াছিলেন। যাঁহারা সন্তানকে আত্মরক্ষা ও আত্মীয় প্রীতির শিক্ষা দিতে পারেন, ভারতে এখন সেইরূপ মায়ের প্রয়োজন; নচেৎ পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে সুনস্থানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

যাঁহার প্রসাদে জীবনলাভ—পরে আত্মীয় স্বজন। যিনি বাল্যকালে প্রসন্না হইয়া সর্ব্বদা পালন করেন, যিনি স্নেহ রত্নের একমাত্র পয়োনিধি, শৈশব জীবনের জীবন স্বরূপ, যিনি যত্নবতী হইয়া সন্তানকে পালন করিয়া বর্দ্ধিত করেন, যিনি সন্তানকে রোগাতুর দেখিলে পান, আহার, নিদ্রা ও হাস্য পরিত্যাগ করিয়া অনন্য কার্য্য হইয়া নিরন্তর সন্তানের সেবা করেন; জননী আধ্যাধারিণী সেই দেবীকে প্রণাম করি।—

পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভ ধারণ পোষণাৎ,
ততো হি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ!
নাস্তি ভার্য্যাসমং মিত্রং নাস্তি পুত্রসমঃ প্রিয়ঃ,
ন ভ্রাতৃসদৃশো বন্ধুঃ ন চ মাতৃসমো গুরুঃ!! সন্দর্ভ সারম্

বন্ধু যাবে কি?

লেখক, শ্রীঅমূল্য চরণ দত্ত।

কোনও গ্রামে চিন্তামণি ও অচিন্ত্যচরণ নামে দুইজন বাস করিত। অচিন্ত্য চরণের বয়স যখন দুই মাস, তখন তাহার মাতার বিসূচিকারোগে মৃত্যু হয় এবং তাহার

দশবারো দিন পরে তাহার পিতার মৃত্যু হয়, সেই সময় চিন্তামণির পিতা প্রিয় বন্ধু ও বন্ধু পত্নীর মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হইয়া বন্ধুপুত্র অচিন্তাচরণকে স্বীয় গৃহে আনয়ন করেন ও পুত্রবৎ স্নেহে লালন পালন করিতে থাকেন। চিন্তামণি অচিন্তাচরণ দুইজনেই বাল্যকাল হইতে একত্রে বাস, একত্রে খেলা ও একত্রে পাঠশালা গমন জন্য উভয়ে অত্যন্ত সদ্ভাব জন্মে। এই প্রকারে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাকালে পুষ্করিণী হইতে আসিবার সময় পথে চিন্তামণির মাতাকে সর্প দংশন করে, বহু চেষ্টাসত্বেও চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। বৃদ্ধের সংসারে কোনও অন্য স্ত্রীলোক না থাকা বশতঃ তিনি স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিলেন। কিছুকাল সুখে সচ্ছন্দে কালহরণ করিতে লাগিলেন। চিন্তামণির পিতা একদিন স্বীয় নাটমন্দিরে বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, তাঁহার গোলায় আগুণ লাগিয়াছে। পিতাপুত্র ও অচিন্তাচরণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সে সমুদয় ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। সেই শোকে কাতর হইয়া বৃদ্ধ বিছানায় শয়ন করিল, আর তাহাকে উঠিতে হইল না—দুই তিন দিন বিকারে ভুগিয়া তিনি ইহ-সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

সংসারের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া উভয়েরই মনে মনে সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মিল। একদা চিন্তামণি ও অচিন্তাচরণ নির্জ্জনে নানা কথা ও স্ব স্ব ভাগ্য পর্য্যালোচনা করিতে করিতে পরামর্শ করিল যে, আর সংসারে থাকিয়া কাজ নাই, চল আমরা দুইজনে সংসার ছাড়িয়া বিরাগী হইয়া চলিয়া যাই।

অচিন্তাচরণ বলিল, "দেখ ভাই যদি যাইবার ইচ্ছাই হইয়াছে, তবে চল কল্যই প্রভাতে উঠিয়া চলিয়া যাই।" যাইবার সময় চিন্তামণি বলিল, "দেখ ভাই, যখন চিরকালের জন্যই সংসার ছাড়িয়া যাইতেছি, তবে একবার গৃহিণীকে বলিয়া আসি।" তাহার স্ত্রী বলিল, "দেখ আমি পাঁচমাস অন্তঃসত্বা এরূপ অবস্থায় আমাকে ফেলিয়া তুমি কোথায় যাইবে, তোমাকে আমি এখন প্রাণ থাকিতে যাইতে দিব না, এই কথাগুলি চিন্তামণি অচিন্তাচরণকে বলিল, কিন্তু অচিন্তাচরণ যাইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সে কিছুতেই মত বদলাইল না, যাইবার সময় সে চিন্তামণিকে বলিল, "ভাই এখনত আসিলে না, তবে কবে যাইবে বল, আমি সেই সময় আসিব। চিন্তামণি বলিল, "আচ্ছা ভাই ছয়মাস পরে যাইব।" অচিন্তাচরণ বলিয়া চলিয়া গেল, মাসের পর

মাস যাইতে লাগিল, এইরূপে চারি মাস অতিবাহিত হইয়া গেল, পঞ্চম মাসে চিন্তামণির একটী পুত্র সন্তান হইল। ক্রমে সেটেরা পূজা ও আটকড়াই হইয়া গেল। এইরূপে মহানন্দে একমাস যেন কত শীঘ্র চলিয়া গেল। হঠাৎ একদিন রাত্রে চিন্তামণি আহারাদির পর শয়ন করিয়াছেন, এমন সময় একজন তাহার দরজা ঠেলিতে লাগিল, চিন্তামণি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখিল যে, তাহার প্রিয় বন্ধু আসিয়াছে। তাহাকে গৃহে বসাইয়া নানাপ্রকার কথোপকথনের পর অচিন্তাচরণ বলিল, "ভাই আমাকে তুমি বলিয়াছিলে যে, ছয়মাস পরে যাইবে তাই আজ আমি তোমাকে লইতে আসিয়াছি, তা কি বল বন্ধু যাবে কি?" তখন চিন্তামণি বলিল, "ভাই তোমার সঙ্গে যাইব, তাহার আর কথা কি, তবে কি জান যখন যাইতেই হইবে, তখন একবার বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" এই বলিয়া সে পার্শ্ববর্ত্তি গৃহে প্রবেশ করিয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল, তখন স্ত্রী বলিল, "সবে, এক মাসের ছেলে ফেলিয়া তুমি চলিয়া যাইতেছ, এই অপোগণ্ড শিশু লইয়া আমিই বা কোথায় যাই, এখনও ইহার অন্নপ্রাশন হয় নাই, এখন তোমার যাওয়া হইবে না।" তখন সে ভাবিল, তাই ত এরূপ অবস্থায় যাওয়া উচিৎ নহে, এবং স্বীয় মনোভাব বন্ধু সমীপে প্রকাশ করিয়া বলিল, "ভাই যে পর্য্যন্ত না এই শিশুর অন্নপ্রাশন হয়, সে পর্য্যন্ত যাইতে পারিব না, অতএব তুমি যদি আর ছয় মাস পরে আস ত আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" বন্ধুর মানোভাব বুঝিতে পারিয়া অচিন্তাচরণ বলিল, "আচ্ছা ভাই তাহাই হইবে, এই বলিয়া পরদিন প্রাতে অচিন্তাচরণ চলিয়া গেল। সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, দিনের পরদিন চলিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে ছয়মাস অতীত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে চিন্তামণির পুত্রেরও অন্নপ্রাশন হইয়া গিয়াছে, একদিন বৈকালে চিন্তামণি দরজায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিল, হঠাৎ মাঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে, বন্ধুবর অচিন্তাচরণ আসিতেছে। সাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল ও সাংসারিক নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর, অচিন্তাচরণ বলিল, "বন্ধুহে তুমি যে আমাকে ছয়মাস পরে আসিতে বলিয়াছিলে, আমি আসিয়াছি, তুমি যাবে কি?" তখন চিন্তামণি বলিল, "দেখ বন্ধু, আমারা বাল্যকাল হইতে একত্রে বাস করিয়া আসিতেছি, তোমার সঙ্গে যাইব তাহাতে আর আপত্য কি, তবে কি জান বন্ধু, সহধর্ম্মিনীকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" এই বলিয়া চিন্তামণি পত্নীকে

জিজ্ঞাসা করিতে গেল ; তাহার স্ত্রী বলিল, ''সবে একবৎসরের ছেলে, এখনও হাঁটিতে পারে না, এই শিশু লইয়া আমি কোথায় যাইব ? কে আমাকে স্থান দিবে, তুমিই যখন এরূপ অসাহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাইতেছ, তখন আর সকলের ত কথাই নাই। এখন তোমার যাওয়া হইবে না, এই শিশুকে মানুষ না করিয়া তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না, চিন্তামণি আসিয়া এই সকল কথা বন্ধুবর অচিন্তা-চরণের নিকট গোচর করিল ও বলিল, "ভাই, এক কাজ কর আর পাঁচ বৎসর পরে আসিও আমি যাইব।" অচিন্তাচরণ অগত্য চলিয়া গেল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গেল, সে সঙ্গে ন্তিচানণির পুত্রেরও হাতে খড়ি হইয়া গেল। একদিন বৈকালে চিন্তামণি বসিয়া আছে, এমন সময় তাহার পুত্র আসিয়া বলিল, "বাবা তোমাকে একজন সন্ন্যাসী ডাকিতেছে। চিন্তামণি বুঝিতে পারিল যে, তাহার বন্ধু আসিয়াছে, পুত্রকে বলিল, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।" চিন্তামণি অচিন্তাচরণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে লাগিল, কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে পর অচিন্তাচরণ বলিল, ''বন্ধুহে তুমি যে আমাকে পাঁচ বৎসর পরে আসিতে বলিয়াছিলে আমি ত আবার আসিয়াছি, "তুমি যাবে কি ?" তখন চিন্তামণি বলিল, "ভাই আমি ত এখনই যাইতে প্রস্তুত কি জান গৃহিণী আপত্তি করে বলিয়া যাইতে পারি নাই, এইবার গৃহিণীকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। গৃহিণী বলিল, ''যাবেই ত তবে এত তাড়াতাড়ি কেন ? এতদিন পরে একটী পুত্র হইয়াছে তাহাকে মানুষ করিয়া ছয় বৎসরের করিয়াছি, তাহার বিবাহ দিয়া সংসারের ভার তাহার উপর দিয়া তখন যাইও এখন যাওয়া হইবে না। চিন্তামণির আর যাওয়া হইল না, অগত্যা মনোভাব বন্ধুবর অচিন্তাচরণকে বলিল, " ভাই পুত্র-বধুমুখ না দেখিয়া যাইতে পারিব না, তবে তুমি এক কাজ কর, আর পনের বৎসর পরে আসিও তখন যাইব। অচিন্তাচরণ সে রাত্রি বন্ধু গৃহে যাপন করিয়া পরদিন প্রাতে চলিয়া গেল চিন্তামণির পুত্র ক্রমে ক্রমে যখন পঞ্চদশ বৎসরে পতিত হইল, তখন একটী সুন্দরী কন্যা দেখিয়া পুত্রের বিবাহ দিয়া সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল। একবৎসর অতীত হইতে না হইতে জ্বররোগে তাঁহাকে ইহ-সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইল। এইরূপে আরও ৩।৪ বৎসর অতীত হইয়া গেল। একদিন হঠাৎ একজন সন্ন্যাসী বেশধারী লোক আসিয়া চিন্তামণির পুত্রকে তাঁহার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, প্রায় ৩।৪ বৎসর

হইল সে মারা গিয়াছে। বন্ধু শোকে কাতর হইয়া অচিন্তাচরণ ফিরিয়া যাইতে ছিলেন, এবং সেই সময়ে চিন্তামণির স্ত্রী পুষ্করিণী হইতে বাটী আসিতেছিল। তিনি স্বামীর বন্ধুকে চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি বাটীতে আসিয়া পুত্রকে বলিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ডাক, তিনি তোমার পিতার পরম বন্ধু। তখন চিন্তামণির পুত্র অচিন্তাচরণকে বাটীতে ডাকিয়া আনিলেন ও বলিলেন মহাশয় আমিত আপনাকে চিনি না, সেজন্য অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। তাঁহাকে সেদিন তাহাদের বাটীতে ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলেন। আহারের আয়োজন হইতে লাগিল। অচিন্তা চরণ প্রাতঃকৃতাদি সমাপণ করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার বন্ধুর কথা তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল, তখন তিনি ভাবিলেন, তাইত যোগবলে একবার দেখাই যাক না যে বন্ধুবর এখন কোথায় এবং কিরূপ অবস্থাতেই বা আছেন। তিনি যোগবলে দেখিলেন যে, তাঁহার বন্ধু এখনও সে গৃহ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই এবং পুত্রের গৃহে কৃষিকার্য্যের বলদরূপে অবস্থান করিতেছেন। তখন অচিন্তাচরণ চিন্তামণির পুত্রকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "বৎস তোমাদের গোশালা কোথায় আমাকে একবার তথায় লইয়া চল।" তখন সে বলিল, "মহাশয় ঐ যে দেখিতেছেন, সম্মুখে খড়ের চালা ঐ-ই আমাদের গোয়াল ঘর, উহাতে তিন চারিটী বলদ আছে। অচিন্তাচরণ তখন তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার বন্ধুরূপ বলদটী তখনও তাঁহাকে দেখিয়া ঘাড় নাড়িতেছে। তিনি যোগবলে তাঁহার সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন ও বলিলেন, "বন্ধুহে এখনও যাবে কি? তখন সেই বলদরূপ চিন্তামণি বলিল, "ভাই আর কিছুকাল অপেক্ষা কর ছেলেটী একটী খেত করিয়াছে, এই খেতের চাষ উঠাইতে এখনও কিছু দেরী আছে, এই চাষটী না উঠাইয়া যাইতে পারিতেছি না, তখন অচিন্তাচরণ বলিল, "বন্ধুহে আর তোমার যাইবার আবশ্যক নাই। পুত্র কন্যার প্রতি পিতামাতার এরূপ ভালবাসা ও মায়া জন্মে যে তাঁহারা কিছুতেই পুত্র কন্যাকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। তাঁহাদের সংসারে যতই বৈরাগ্য উপস্থিত হউক না কেন, তাঁহারা কিছুতেই মায়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। এবং চিন্তামণির 'চাষ তোলা' দৃষ্টান্তের অবস্থায় সেই সংসারেই অবস্থান করেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত।

সাধারণ উপদেশ।

আদি-লীলা।

প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সঙ্কলিত।

১। যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণ-রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ-কৃপা করেন ভক্তগণে॥ ১ পঃ। ২ পৃঃ

২। শিক্ষাগুরুকে ত জানি—কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥ ঐ, ৩ পৃঃ

৩। জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্তরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ—মহান্তস্বরূপে॥ ঐ

৪। ঈশ্বর-স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥ ঐ

৫। অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব'।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছা-আদি সব॥ ঐ ৪ পৃঃ

৬। তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ ঐ

৭। কৃষ্ণভক্তির বাধক—যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥ ঐ

৮। তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন—সব আনন্দ স্বরূপ॥ ঐ

৯। এক ভাগবত বড়—ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তির সপাত্র॥ ঐ

১০। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম-মহত্ত্ব॥
'নন্দসুত' বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-গোঁসাই॥ ঐ ২ পৃঃ ৫ পৃঃ

১১। তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তাঁরে—ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥

চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ॥
কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥
আত্মান্তর্য্যামী যাঁর যোগশাস্ত্রে কয়।
সেই গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয়॥
অনন্ত স্ফটিকের যৈছে এক সূর্য্যভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥
সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই॥ ঐ
১২। ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞান-যোগ মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম-আত্মা-রূপে তাঁরে করে অনুভব॥ ঐ

বেরি-বেরি রোগের কারণ।

গত অক্টোবর মাসের "মেডিকেল রিভিউ" নামক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রে বেরি-বেরি রোগের কারণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক বলেন যে, আমরা উষ্ণ প্রধান দেশের রোগসমূহের চিকিৎসা বিষয়ে যতই উন্নতি-লাভ করি না কেন, বেরি-বেরি রোগের কারণ সম্বন্ধে আমরা এখনও সম্পূর্ণ অন্ধ-কারেই রহিয়াছি। সংপ্রতি সিরামবানের মিঃ লিওনার্ড ব্রাডন এই রোগ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ "জর্ণাল অফ ট্রপিকেল মেডিসিন" নামক সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া বেরি-বেরি রোগ সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন কথা বলিয়াছেন। অন্নভোজীদিগেরই বেরি-বেরি রোগ হইয়া থাকে, এ কথা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে এক শ্রেণীর অন্নভোজী এই রোগে আক্রান্ত হয় না অথচ অন্য শ্রেণীর অন্নভোজী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে। মিঃ ব্রাডন বলেন যে, কোন বিশেষ প্রকার অন্ন যাহারা ভোজন করে, তাহাদেরই এই রোগ হইয়া থাকে। মরলদ্বীপপুঞ্জে প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র তামিল ও চীনাম্যান গমন করিয়া থাকে। এই উভয় জাতীয় লোকই প্রায় একই প্রকার পরিশ্রম করে, একই প্রকার অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে, একই প্রকার কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করে। উভয় শ্রেণীরই অন্নই প্রধান আহার্য্য।

তবে প্রভেদের মধ্যে এইটুকু দেখিতে পাওয়া যায় যে, তামিলেরা সিদ্ধ তণ্ডুল ও চীনাম্যানেরা আতপতণ্ডুল ব্যবহার করিয়া থাকে। মলয়ের সরকারি হাঁসপাতালে বেরি-বেরি রোগে আক্রান্ত রোগীদিগের মধ্যে শতকরা ৯১ জন চীনাম্যান, কিন্তু তামিলের সংখ্যা শতকরা একজনও নহে। দুইশত রোগীর মধ্যে একজন মাত্র তামিল। আর এক কথা যাহারা নূতন তণ্ডুল ব্যবহার করে, তাহাদের বেরিবেরি রোগ হয় না। স্থানীয় মালয় ও ডিয়াক কৃষকগণ সাধারণতঃ নূতন তণ্ডুলের অন্ন গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে কাহারও বেরি-বেরি হইতে দেখা যায় না। এই সকল পার্থক্য দেখিয়া মিঃ ব্রাডন স্থির করিয়াছেন যে, সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্নে বেরি-বেরি রোগের বীজ থাকিতে পারে না। সম্ভবতঃ যে সময় ধান্য সিদ্ধ করা হয়, সেই সময়ে উহার বিষাক্ত পদার্থ কিয়ৎ পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। ধান্য পুরাতন হইলে উহার মধ্যে বেরি-বেরি রোগের বিষ স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। নূতন অথবা সিদ্ধতণ্ডুলের অন্নে এই বিষ উৎপন্ন হইবার কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতঃপূর্ব্বে কোন কোন চিকিৎসক বলিয়াছিলেন যে, আতপ তণ্ডুলের অন্নভোজীদিগের বেরিবেরি হয় না, কিন্তু মিঃ ব্রাডন সে মত খণ্ডন করিয়াছেন।

মুষ্টিযোগ।

লেখক কবিরাজ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধন্বন্তরি।

চক্ষু যে পরম ধন তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অনুভব করিতে পারে না। আজকাল অনেকে ইচ্ছা করিয়া এই রোগ আনয়ন করেন, বিশেষতঃ স্কুলের অপরিণামদর্শী বালকগণ ইচ্ছা করিয়া সুস্থ চক্ষুতে চশ্‌মা ব্যবহার করিয়া অকালে দৃষ্টি শক্তি হারাইয়া থাকেন। আবার অনেক অশীতিপর বৃদ্ধকেও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রখর দৃষ্টি শক্তির পরিচয় দিতে দেখা গিয়াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল একজন স্বভাবের বিরুদ্ধচারী আর অপর ব্যক্তি স্বভাবের বিরুদ্ধে কখন দেহকে চালিত করেন নাই।

নিম্নের কয়েকটী কারণে প্রধানতঃ চক্ষুরোগ হইয়া থাকে :—

১। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা,
২। অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রক্ষয়, (এইটী প্রধান কারণ)।
৩। কেরোসিন অথবা উক্ত প্রকার উগ্র তৈলের আলো ব্যবহার।
৪। শরীরে ফস্ফসের অভাব।
৫। পিতা মাতার কোন উৎকট পীড়া থাকিলে।
৬। শিরোরোগ থাকিলে,

৭। নিয়মমত চক্ষু প্রক্ষালন না করিলে।

৮। পরিশ্রমের অভাব, অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে।

৯। নাসিকার মধ্যের চুল তুলিলে।

১০। শরীরে তৈলাক্ত পদার্থের অভাবে।

১১। বার্দ্ধক্য হেতু।

১২। পারার বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে উপরে যে সমস্ত কারণ লিখিত হইল, সেই গুলির সহিত চক্ষুরোগের কারণগুলি মিলাইয়া সেই কারণগুলি পরিত্যাগ করিয়া নিম্নের ঔষধটী ব্যবহার করিলে চক্ষুর ময়লা কাটিয়া গিয়া দৃষ্টি শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

পুনর্ণবা শাক বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এই গাছের রস যতটা, ততটা জলের সহিত মিশাইয়া চক্ষু ধৌত করিলে চক্ষু প্রসন্ন হয়, চক্ষুর ময়লা কাটিয়া যায়। চক্ষুরোগে ত্রিফলার কাথও একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হরীতকী বয়ড়া ও আমলকী ইহাদিগকে ত্রিফলা কহে, এই তিন দ্রব্যকে বীজ রহিত করিয়া অল্প থেঁতো করতঃ একসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধসের থাকিতে নামাইয়া সেই জল ঠাণ্ডা হইলে তাহার জলে চক্ষু ধৌত করিলে চক্ষুর ক্লেদ পরিষ্কার হইয়া চক্ষু প্রসন্ন হয়।

নিম্নে আরও কয়েকটী চক্ষুর পীড়ার মুষ্টিযোগ লিখিত হইল।

গুগ্‌লির জল দিলে চক্ষুর ঝাপ্‌সা কাটিয়া যায়। পুকুর হইতে ভাল করিয়া ধুইয়া গুগ্‌লি গুলি (জীবন্ত হওয়া চাই) একটা পাথরের বাটিতে রাখিলে অল্পক্ষণ পরে দেখা যায় যে বাটীতে খানিকটা জল উক্ত গুগ্‌লি হইতে বাহির হইয়াছে, সেই জল গুগ্‌লির জল।

২। হাতি শুড়ার সমস্ত গাছটার রস বাহির করিয়া সেই রস চক্ষে ফুট দিলে চক্ষু ভাল হয়।

৩। পাতিলেবুর রসে পাতিলেবুর শিকড় বাটিয়া তাহা চক্ষের বাহিরে প্রলেপ দিলে চক্ষুর পীড়া ভাল হয়। কিন্তু উক্ত দ্রব্য যেন চক্ষের ভিতরে না যায়।

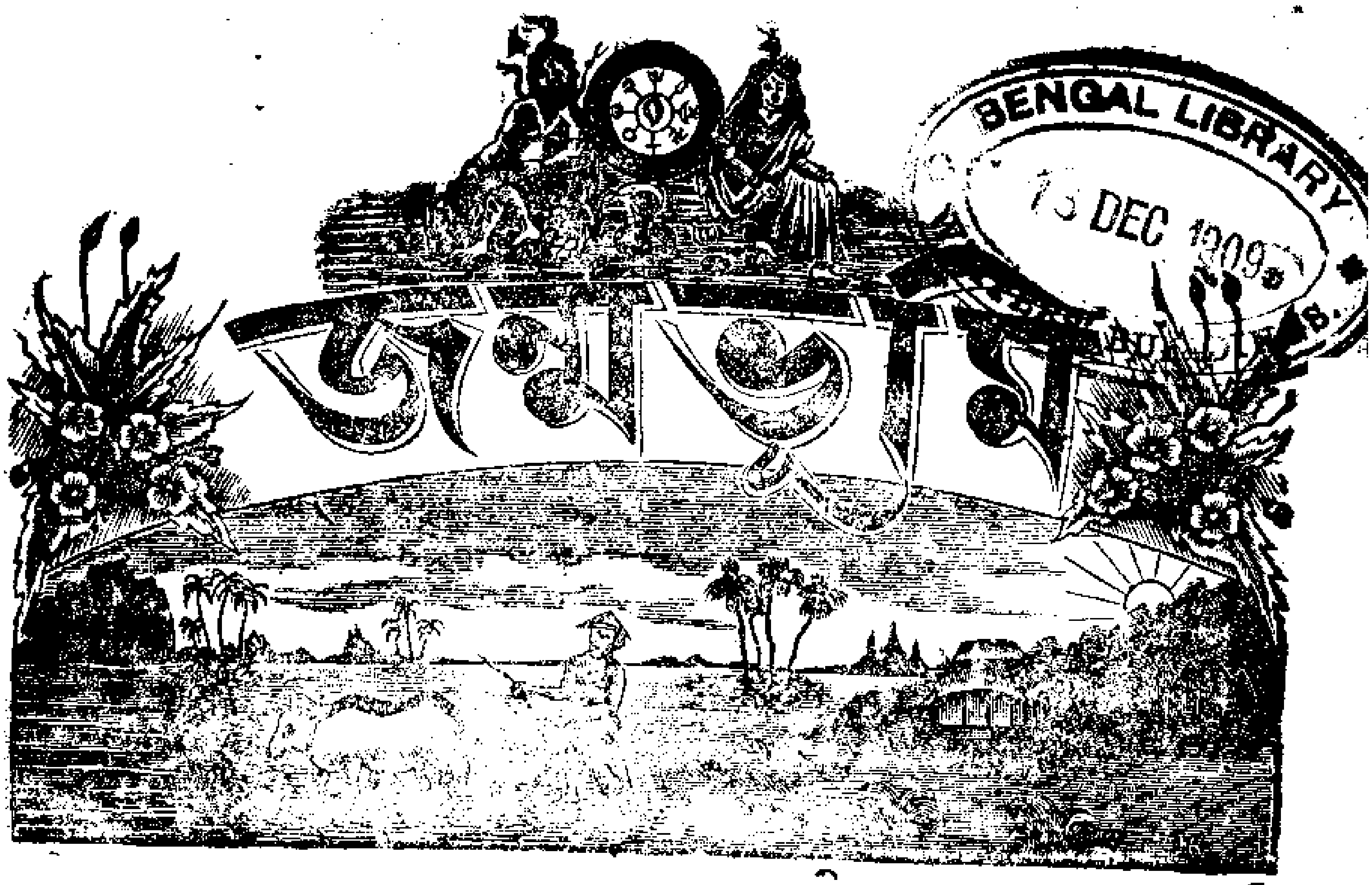
৪। গোলাপ জলে ফট্‌কিরী দিয়া সেই জলে নেকড়া ভিজাইয়া মধ্যে মধ্যে তাহার দ্বারা চক্ষু মুছিয়া ফেলিলে চক্ষু ভাল থাকে।

৫। প্রাতঃকালে মুখ ধুইবার সময় ঠাণ্ডাজল দ্বারা পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া তিন বার চক্ষে ঝাপটা দিয়া চক্ষু ধুইলে চক্ষুর পীড়া ভাল হয় ও দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৬। খাঁটি সরিষার তৈল স্নানের সময়ে চক্ষে ফুট দিলে চক্ষুর ঝাপ্‌সা কাটিয়া যায়।

৭। স্নানের সময় পায়ের বুড়া আঙ্গুলের নখে সরিষার তৈল দিলে চক্ষুর যাবতীয় পীড়া কাটিয়া যায়।

৮। হিন্দুস্থানীরা সুরমা ব্যবহার করিয়া থাকে। চক্ষের পক্ষে সুরমাও ভাল জিনিষ।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৭শ বর্ষ । ১৩১৬ সাল, অগ্রহায়ণ । ৮ম সংখ্যা ।

আদিরস ।

লেখক—প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী ।

আদিরসের কথা কহিলে, লিখিলে বা পড়িলে যিনি রুচিবিকৃতির ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠেন, বিধাতা তাঁহাকে কি উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, নির্ণয় করা কঠিন। অলঙ্কারশাস্ত্রে "ব্রহ্মস্বাদসহোদরঃ" বলিয়া রসের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সে রস আটপ্রকার—

"আদিমো হাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ কাব্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥"

আদি, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত, কাব্যের রস এই আটপ্রকার। সুতরাং করুণ, বীর, রৌদ্রাদি যেমন রস, আদিও তেমনি একটি রসের মধ্যেই পরিগণিত। সুচতুর রসজ্ঞ অন্যান্য রসের ন্যায় আদিরসের ভিতরেও সেই ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাইয়া থাকেন। রসাস্বাদ ও ব্রহ্মাস্বাদ, উভয়েই ত একই মায়ের সন্তান। যে হ্লাদিনী হইতে ব্রহ্মাস্বাদের বিকাশ, রসাস্বাদের জনয়িত্রীও সেই হ্লাদিনী শক্তি।

শ্রীচৈতন্যদেব একদিন এই আদিরসের সুধাতেই জগৎ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"তটস্থ হৈয়া হৃদে বিচার যদি করি।
সর্ব্বরস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥"

রুচিবাগীশেরা যাহাই বলুন, কথাটা সত্য নহে কি?

খ্রীষ্টানের যেমন বাইবেল, ইস্‌লামীয়ের যেমন কোরাণ, শক্তি-উপাসকের যেমন চণ্ডী, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের তেমনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। সুতরাং ইহার কথা বিশ্বতত্ত্বের মূলকথার সহিত জড়িত। সে কথাকে "হম্‌বাগিজম্‌" বলিয়া যাঁহারা হাসিয়া উড়াইতে চাহেন, সেই সকল হতভাগ্য স্থূলদর্শীদিগকে বুঝাইবার জন্য আমাদের এ প্রয়াস নহে।

"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্‌।"

রসই যাহার আত্মা, রসই যাহার প্রাণ, সেই বাক্যকে কাব্য বলে; সুতরাং রস লইয়া যাঁহার কারবার, তিনিই কবি,—আর কেহ নহে। সৃষ্টির আদি হইতে এপর্য্যন্ত জগতের যেখানে যত কবির আবির্ভাব হইয়াছে, সকলেই এই রসের কারবার করিয়া দিন কাটাইয়া গিয়াছেন। আবার সেই কবিদের মধ্যে আদিরসের কারবারে যিনি কৃতকার্য্য, তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি। এইজন্য কালিদাস শ্রেষ্ঠকবি, শেকস্পীয়র, শ্রেষ্ঠ কবি, ভবভূতি শ্রেষ্ঠ কবি, বায়রন্‌ শ্রেষ্ঠকবি, শ্রীহর্ষ শ্রেষ্ঠকবি, শেলি শ্রেষ্ঠকবি। এদিকে বাঙ্‌লায় আবার বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র,—ইঁহারাও কৃতী কবি এইজন্য। যে কাব্য আদিরসের গন্ধশূন্য, সে কাব্য, রুচিবাগীশ তুমি, তোমার ভাল লাগিতে পারে;—আমার কিন্তু তাহা ভাল লাগে না, অনেকের তাহা ভাল লাগে না;—প্রকৃত রসজ্ঞের নিকটেও তাহা তেমন আদরের নহে। যৌবনে অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলি যখন সজীব থাকে, যুবক তখন কাব্য পড়িতে বসিয়া আগেই খুঁজিয়া দেখে, সে কাব্যের

ভিতরে উজ্জ্বল-মধুর প্রেমের ধারা—আদিরসের স্রোত প্রবাহিত কি না। তোমার প্রাণের ভিতরে রসপ্রবাহ শুকাইয়া তলদেশের নুড়িগুলি কড়্‌কড়্‌ করিতেছে,—তুমি হয় ত তাহা খুঁজিয়া দেখিবে না; কিন্তু হৃদয়ে যাহার রঙ্গের তরঙ্গ বহিয়া চলিতেছে, সে ত খুঁজিয়া দেখে! ইহার কারণ কি?—

বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, প্রতিনিয়ত কি-এক হাহাকারধ্বনি, জগতের মর্ম্মের মধ্য হইতে উত্থিত হইতেছে। কবে সৃষ্টি হইয়াছে জানি না, কিন্তু যেদিন সৃষ্টি হইল, সেই দিন হইতেই এই দারুণ আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে;—আজ পর্য্যন্ত সে আর্ত্ত-নাদের নিবৃত্তি হইল না। চাহিতেছে সকলে সুখ, কিন্তু দুঃখ আসিয়া সকলকেই আলিঙ্গন করিয়া ধরিতেছে। সকলেই বলিতেছে,

"সুখং মে ভূয়াৎ
দুঃখং মে মা ভূৎ।"

দুঃখকে তাড়াইবার চেষ্টায় জগৎ বিব্রত, কিন্তু দুঃখ কাহাকেও ছাড়িতে চাহিতেছে না। এই দুঃখকে দূর করিবার চেষ্টায় কত দর্শন, কত বিজ্ঞানের উৎ-পত্তি হইল;—কিন্তু দুঃখ ঘুচিল কৈ? দুঃখ যে কি, দুঃখের আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ, এ কথার ঠিক মীমাংসা না হইলে দুঃখ ঘুচিবে কেন?

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া যেদিন প্রথম আমরা পৃথিবীর আলোক দেখি, সেই দিন হইতে কি-একটা আকাঙ্ক্ষা, কিসের একটা লালসা আমাদের অনুসরণ করিতে থাকে। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমশঃ সেই আকাঙ্ক্ষা স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইয়া উঠে। আমরা বুঝিতে পারি, একটা আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, কিন্তু কিসের আকাঙ্ক্ষা, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এই আকাঙ্ক্ষার বেগে জগৎ ঘূর্ণিত। এই অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষার বেগে, এমন সময় আসে—জীবনে এমন একদিন আসে, যখন মানুষ—কেবল মানুষ কেন, সমগ্র জীবজগৎ, জীবনের একটি চিরসঙ্গী খুঁজিয়া বেড়ায়। এই আকাঙ্ক্ষার বেগ হইতেই পাপের উৎপত্তি, এই আকাঙ্ক্ষার বেগ হইতেই পুণ্যের আবির্ভাব,—আবার এই আকাঙ্ক্ষার বেগেই মুক্তি।

বৈষ্ণবরসতত্ত্বের বিরহ এই আকাঙ্ক্ষারই রূপান্তর। যাহার বিরহ, তাহাকে যতদিন না পাইব, ততদিন এ আকাঙ্ক্ষার অনল নিভিবে না। জগতে সকলেই আমরা বিরহী। বিরহের এ তত্ত্ব যিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিয়াছেন, তিনিই আনন্দী, তিনিই সুখী। শ্রীচৈতন্যদেব জগজ্জনকে এই বিরহের তত্ত্বই বুঝাইতে আসিয়া-ছিলেন। জগতের জিনিষ লইয়া যতদিন আমরা ব্যাপৃত, ততদিন আমাদের এ

বিরহ ঘুচিবার নয়। জগতের সামগ্রী এ বিরহ ঘুচাইতে পারে না। যদি এ বিরহ ঘুচাইতে চাও, যদি এ আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে জগতের সামগ্রীকে ক্রমশ দূরে রাখিবার চেষ্টা কর। চিরদিন জগতের সামগ্রীকে রসের সামগ্রী মনে করিলে চলিবে না—

"রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"

জগতের সামগ্রীতে সে রসের ছায়া আছে বটে, কিন্তু সে রূপ নাই। যাহার ছায়া আমাদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলে, না জানি সে রস কেমন! কিন্তু ছায়ার ভিতর দিয়াও কায়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই রসজ্ঞেরা লৌকিক রসকেও বলিয়াছেন—"ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।" লৌকিক রসেও আস্বাদের ঘনীভূত অবস্থায়, যাহাকে আশ্রয় করিয়া রসের উদ্ভব, তাহাকে ভুলিয়া—আপনাকে ভুলিয়া রসিক রসাত্মক হইয়া যায়। তাই নীরস, শুষ্ক প্রাণ যাহার, সে দারুণ হতভাগা,—তাহার গতি নাই, মুক্তি নাই, সে সংসারের এই "অন্ধতম" নরকে চিরদিন পড়িয়া থাকিবে।

ভৃত্যের সেবায়, মাতার আদরে, সুহৃজ্জনের সৌহার্দে, বনিতার প্রীতিরসে আমরা আর্দ্র হইয়া পড়ি। এই সেবা, স্নেহ, সখ্য ও প্রীতি—বল দেখি কিসের মূর্ত্তি? ইহারা কি সেই রসের মূর্ত্তি নহে? বল দেখি, ইহার কোন্‌টিতে তুমি আনন্দ অধিক পাও? সংসারের কাহারও দিকে তাকাইতে চাও না, এরূপ উৎকট আগ্রহ ইহার কোন্‌টিতে আনিয়া দেয়? রসজ্ঞ যদি হও, রসের মর্ম্ম যদি বুঝিয়া থাক, তবে বল দেখি, ইহার কোন্‌টি না পাইলে জীবন বৃথা বলিয়া মনে হয়? যে উদ্দাম আবেগ, যে উন্মত্ত আকুলতা, যে বিশ্ববিস্মারক সুখ ইহার যেটিতে তোমাকে আচ্ছন্ন-অভিভূত করিয়া রাখে, বল দেখি, ভৃত্যের সেবায়, জননীর আদরে ও সখার সখ্যের ভিতরে তাহা পাইয়াছ কি? পাও নাই, পাওয়া যায় না;—তাই বলিতেছি যে, সে আনন্দ, সে আগ্রহ, যে আবেগ, সে আকুলতা, সে বিশ্ববিস্মারক সুখ, এক বনিতাপ্রীতির মধ্যেই নিহিত,—আদিরসের মধ্যেই দেদীপ্যমান। রসের মধ্যে এই রসই সকলের আদি, সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া ইহার নাম আদিরস। মধুর ইহার আর-একটি নাম,—মধুর হইতেও ইহা মধুর। আবার উজ্জ্বলও ইহাকে বলিয়া থাকে;—আর-সকল রস ইহার নিকট হীনপ্রভ। এইজন্যই কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—

"তটস্থ হৈয়া হৃদে বিচার যদি করি।
সর্ব্বরস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥"—

তুমি নাসিকাকুঞ্চন করিলে কি হইবে?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ছায়ার ভিতর দিয়াও কায়ার পরিচয় পাওয়া যায়। কেন না, ছায়াকে ছাড়িয়া কায়া থাকিতে পারে, কিন্তু কায়াকে ছাড়িয়া ত ছায়া থাকিতে পারে না। ছায়া কায়া না হইলে, কায়ার মত বটে ত। আবার ছায়া দেখিলে কায়া যে নিকটে আছে, তাহা বুঝিতে পারি। জগতের সামগ্রীকে দূরে রাখিতে বলিয়াছি সত্য, কিন্তু একেবারেই দূরে রাখিবার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা সফল হইবে না। প্রথমে ছায়ার ভিতর দিয়াই কায়ার পরিচয় লইতে হইবে।

"রসো বৈ সঃ"

সে রস যে কি, এমন সামর্থ্য আমাদের নাই যে, তাহা বুঝিয়া উঠি। সুতরাং তাহাকে বুঝিতে হইলে জগতের স্নেহ, প্রীতি, দয়া, বাৎসল্য প্রভৃতির ভিতর দিয়াই বুঝিতে হইবে;—ছায়ার ভিতর দিয়াই কায়ার পরিচয় লইতে হইবে। ছায়াকে ছাড়িব বলিলেই ত ছাড়া যায় না;—জড়চৈতন্যের গ্রন্থি ত সহজে টুটে না। কাজেই প্রথমে ছায়াকে আশ্রয় করিয়া, তার পর সেই ছায়া ছাড়িয়া কায়ায় পৌছিতে হইবে। কায়া নিত্য, ছায়া অনিত্য; এইজন্য দুঃসাধ্য হইলেও চরমে ছায়াকে ছাড়িতেই হইবে।

এমন একটি স্থান আছে—সে স্থান কেমন আমরা জানি না, কিন্তু শুনিতে পাই—এমন একটি স্থান আছে, যেথান হইতে সেবা, সখ্য, আদর, প্রীতি প্রভৃতি রসের ধারা নিত্য উৎসারিত হইতেছে। সে নিত্য রসধারার প্রতিকৃতি জগতেও প্রতিফলিত। এ রসধারার রসময় যিনি, তাঁহার পরিচয় দিই, সে শক্তি আমাদের নাই; কিন্তু ঐ প্রতিকৃতি তাঁহার কৃপার পরিচয় প্রদান করিতেছে। কেন না, এ প্রতিকৃতি যদি না থাকিত, তবে সংসারে যে মরুভূমির বাতাস বহিত, তাহা মনে হইলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। এ রসধারায় অনন্ত বৈচিত্র্য, সে বৈচিত্র্যে সুখও অনন্ত; কিন্তু আদিরসের বৈচিত্র্যে যে সুখ, তেমনটি বুঝি আর নাই। প্রকৃত রসজ্ঞ তাই আদিরসের নিন্দা সহিতে পারেন না। আদিরস অপবিত্র নহে, দুঃসঙ্গদূষিত তোমার চিত্তই অপবিত্র। অশুচি শুচিকে ভোগ করিতে দেয় না,—কামের মধ্যে আদিরসের ভোগ অসম্ভব। কাম অশুচি, আদিরস শুচি—

"শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ।"

ভক্তের ক্রন্দন।

লেখক—রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত।

(গান)

সুরটমল্লার—একতালা।

পতিতপাবন, পতিতে তরাও।
প'ড়েছি অকূলে, কূলে লও তুলে,
হে কৃষ্ণ কাণ্ডারী, কৃপা-চক্ষে চাও॥
রামকৃষ্ণ-রূপে তুমি কল্পতরু, সর্ব্বত্যাগী শিব ওহে জগদ্‌গুরু,
মা-নামে কাঁদিলে, কি খেলা খেলিলে,
কি ভাব সাধিলে, মোরে বোলে দাও॥
কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত এ সংসার,
ধর্ম্মে ধর্ম্মে দ্বেষ, কি মোহ বিকার,
সে ঘোর কাটালে, অমৃত বিলালে,
শক্তি সঞ্চারিলে, শক্তি কি শিখাও॥
ভক্তিহীন আমি ওহে ভগবান্,
কিসে ভক্তি পাব, না জানি সন্ধান,
প্রাণে পাই ব্যথা, দোহাই দেবতা,
ভক্তি দিয়ে তব শ্রীমূর্ত্তি দেখাও॥

—:•:—

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতোক্ত।

সাধারণ উপদেশ।

আদি-লীলা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সঙ্কলিত।

১৩। উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বরমহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়ে ত উপমা॥ ঐ। ৬ পৃঃ

১৪। অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্—তিন তাঁর রূপ॥ ঐ। ৭ পৃঃ

১৫। অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ সর্ব্ব-অবতংশ॥ ঐ

১৬। শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ॥ ঐ

১৭। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
আর্য্য-বিজ্ঞ-বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥ ঐ

১৮। যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ং ভগবান্' শব্দের তাহাতেই সত্তা॥ ঐ

১৯। দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহাঁ করিয়ে গণন॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।ঐ

২০। কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়—কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥ ঐ

২১। কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয়, তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥ ঐ। ৮পৃষ্ঠা

২২। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
'পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ',—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ঐ

২৩। অবতারীর দেহে সব-অবতারের স্থিতি।
কেহো কোনমত কহে, যেমন যার মতি॥ ঐ

২৪। চৈতন্যগোসাঞির এই তত্ত্বনিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ঐ

২৫। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি,—চারিযুগ জানি।
সেই চারি যুগে 'দিব্য 'এক যুগ' মানি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস-ভিতর॥ ৩ পং। ৯পৃঃ

২৬। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার,—চারি রস।
চারি ভাবের ভক্ত যত, কৃষ্ণ তার বশ॥ ঐ

২৭। কলিকালে যুগধর্ম্ম—নামের প্রচার।
তাথ লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥ঐ

২৮। দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাথে।
চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥
'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম॥ ঐ। ১০পৃঃ

২৯। ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম—ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার 'কল্ম' নাম—সেই মহাতম॥ ঐ
ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগে ধর্ম্ম—নামসঙ্কীর্ত্তন সার॥ ঐ

৩০। অদ্বৈত নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে 'উপাঙ্গ'॥ ঐ। ১১ পৃঃ

৩১। নিত্যানন্দগোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত আচার্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥ ঐ

৩২। সঙ্কীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে—সে-ই ধন্য॥
সেই ত সুমেধা,—আর কু-বুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥
কোটি অশ্বমেধ এক-কৃষ্ণনাম-সম।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম॥ ঐ

৩৩। ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্যকৃষ্ণ-অবতারে প্রকট প্রমাণ॥
প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥ ঐ

৩৪। আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥
অসুর-স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজনস্থানে॥ ঐ

৩৫। নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর। ঐ

৩৬। কৃষ্ণকে তুলসী-জল দেয় যেই জন ॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন—।
'জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন ॥'
তবে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন। ঐ। ১২ পৃঃ
৩৭। চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু ॥ ঐ
৩৮। ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার। ঐ
৩৯। অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥ ঐ
৪০। পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥ ৪পৃঃ। ঐ
৪১। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর যে শৃঙ্গার।
চারি ভাবের চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার ॥
নিজ-নিজ ভাব সভে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণসুখ-আস্বাদনে ॥
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সবরস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥ ১০ পৃঃ

চিন্তা।

লেখক, শ্রীফকির চন্দ্র বসু।

চিন্তা! অনেক কষ্টে-অনেক সাধনার পর তোমায় পাইয়াছি। তুমি আমার কষ্টের জিনিষ—সাধনার ধন। তুমি দেবী, নিশ্চয়ই তুমি দেবী। তাই কি নও? যদি দেবী না হও তবে তুমি কি? যদি তুমি দেবী না হও অন্ততঃ দেবী-সহচরী বটে। নিশ্চয়ই তোমার জন্ম এ মর্ত্ত্য জড়জগতে নয়। তোমার জন্ম দেবভূমিতে সে ভূমি আলোক সামান্য, আলোকস্পৃষ্ট ও অতি অদ্ভুত। যাই হও তুমি, দেবীই হও বা তৎসহচরীই হও, আমার নিকট তুমি দেবী। তোমার লীলা কি অদ্ভুত। তোমার কোন কার্য্যটী অদ্ভুত নয় তাই আমি বুঝিতে পারি না। তোমার কেহ ইয়ত্তা করিতে পারে না, তোমার জন্মভূমি দেবভূমি; তোমার কর্ম্মভূমি দেবভূমি। তুমি নিজে নিরাকার; তোমার কর্ম্মভূমিও নিরাকার। তুমি নিজে অনন্ত—

তোমার ক্রীড়া ক্ষেত্রও অনন্ত ও নিরাকার। নিরাকারের অবস্থান কি অদ্ভুত! আবার নিরাকারে নিরাকারে সাকারের উৎপত্তি; সে আরও অলৌকিক—আরও অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। তোমার এই অনির্ব্বচনীয় মহিমা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে যখন তোমাতে ডুবিয়া যাই, তখন তোমাকে দেবী না বলিয়া থাকিতে পারি কৈ? প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় কৈ? তাই তো বলি-চিন্তে তুমি দেবী। দেবি! আমি অধম বলিয়াই তোমাকে চিনিতে পারি নাই। আমার বুদ্ধি শক্তির প্রাচুর্য্যহীনতা বশতঃ তোমার অনন্ত মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই নাই।

চিন্তা! দেবি! তুমি আমার আরাধ্যা। আরাধ্যে! ত্যজিও না; অধম বলিয়া ত্যাগ করিও না। তোমার জীবন্তস্পর্শে মানুষ জীবন্ত হয়। তোমার অভাবে মানুষ মৃত। তুমি পবিত্রাতৃ—উদ্ধারকর্ত্রী। যতদিন মানুষ তোমায় না পায় ততদিন তাহাতে মনুষত্ব থাকে না। তুমিই মানুষের মনুষ্যত্ব; তুমিই মানব সমাজের বিশেষত্ব। তোমার অভাবে মানুষ মনুষ্যত্ব হীন—বিশেষত্ব হীন। তাই বলি তুমি দেবী। তাই প্রার্থনা করি দেবি! তুমি ছাড়িও না। তুমি যখন ছাড়িবে তখনই আমি জীবন হীন—শক্তিহীন—মৃত হইব। তোমার জীবন্ত ভাবেই তো আমি সজীব। এই সজীবতা হারাইয়া—এই মনুষ্যত্ব হারাইয়া—এই নির্জীব প্রাণটাকে লইয়া কি করিব? কোথায় যাইব? যেখানেই যাই না তোমাকে না পাইলে আমার কি হইবে? আমার জীবনের মূল্য কোথায়? তুমিই তো পথ প্রদর্শক—তুমিই তো নেতা; তুমিই মূল্যবান; তোমার অভাবে সব-মূল্যহীন; তোমার অভাবে শক্তি, শক্তিহীন; তোমার অভাবে স্রষ্টাও শক্তি হীন। তোমার বিহনে সকলই নিষ্প্রভ, নিরানন্দ বিষদৃশ। তোমার ভাবেই জগত ভাবময়। সুতরাং চিন্তে! তুমি দেবী—তুমি আরাধ্যা তুমি আমার হৃদয়ের বাঞ্ছিত বস্তু—আমার সাধনের ধন। তাই তোমার চরণ প্রান্তে পড়িয়া প্রার্থনা করি, তাই সকাতরে বলি দেবি! ছাড়িও না।

তুমি যখন মনুষ্যের হৃদয়কে সিংহাসন রূপে গ্রহণ করিয়া তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার কর, তখন তো মানুষ তোমার ক্রীড়া পুত্তলিকা, মানুষের সমস্ত ক্ষমতাই তোমার করতলগত। তুমি তখন মুহূর্ত্তে সেই নরকের কীটকে সপ্ত স্বর্গের উন্নতির পথ প্রদর্শন করাও; আবার স্বর্গস্থিত দেবতার নয়নপথে তুমি ভীষণ নরকের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি প্রতি ফলিত করিয়া বিভীষিকা প্রদর্শন করাও। মুহূর্ত্তের মধ্যে কত সাধু পুরুষকে বিভীষিকাময়ী পাপের পথে পরিভ্রমণ করাও। আবার কতশত ঘোর পাপীকে অসাধুকে এমন এক রাজ্যের ছায়া প্রদান কর যে, হয় তো

সেই ছায়া মাত্র অবলম্বন করিয়া তাহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ার স্বর্গীয় দেবভাবে পূর্ণ হইয়া সেও সাধারণের আদর্শ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিতে থাকে। ধন্য তোমার লীলা! তোমাকে লীলাময়ী বলিব না তো বলিব কাহাকে? তোমার কি স্বর্গীয় প্রভাব! তুমি কত শত রত্নাকরের উদ্ধার কর্ত্রী। আবার সেই তুমিই যজাতির ন্যায় উচ্চবংশীয় রাজামহারাজাগণের মধ্যে কি এক তড়িৎবেগ সঞ্চালিত কর, কি এক অদ্ভুত চিন্তাস্রোত ছুটাইয়া দাও যে, তাহার সেই স্রোতে পড়িয়া পরিণামে প্রকৃতি স্রোতে ভাসিয়া যায়। দেবি! একি রহস্য? ইহার কিছুই যে বুঝিতে পারি না! এ প্রহেলিকার মধ্যে যে কি গূঢ় রহস্য লুকায়িত করিয়া রাখিয়াছ কিছুই জানিতে পারি না। রঙ্গালয়ে যবনিকার অন্তরাল-স্থিতা পবিত্র স্বভাব নারীবেশে সুসজ্জিতা, কুৎসিত স্বভাবা, নর্ত্তকীগণের ন্যায় তোমার এ বেশ কেন?

তোমাকে যে দেবি বলিলাম, তোমাকে যে এত উচ্চস্থান ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু তোমার মধ্যে কেন এত নীচতা? তোমার মধ্যে উচ্চতম কার্য্যাবলীও যে প্রকার দেখিতে পাইলাম, আবার তেমনই নীচতর অতীব ঘৃণিত জঘণ্য কার্য্যকলাপও দেখিতে পাই, ইহার কারণ কি? তবে কি তোমাকে দেবী বলা ভুল হইয়াছে? তবে কি পিশাচের লীলাক্ষেত্র তোমার লীলাক্ষেত্র? তবে কি নৃশংস ঘৃণিত ব্যবহারেও তুমি? এই গুলাতে যে তোমাকে দেবত্ব হইতে অনেক দূরে নিক্ষেপ করিতে চায়। ইহার কারণ কি? চিন্তা! তোমারই সাহার্য্যে তোমার নিকট বসিয়া এই সকল বিষয় মীমাংসা করিব। তোমাকে আমি এখনও দেবী বলিতেছি এবং আশা করি তুমি আমার হৃদয়ের ঈশ্বরী হইয়া যেন চিরকাল আমার হৃদয়ে বিরাজমান থাক।

আচ্ছা! এই যে লোক সকল যাহারা প্রবৃত্তি স্রোতে ভাসিয়া যায়, তাহারা কি প্রকৃতই চিন্তাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করে, দেবী তাহাদিগকে পদপ্রান্তে স্থান না দিয়া প্রবৃত্তির প্রবল স্রোতে চিরতরে ভাসাইয়া দেন? তাতো নয়। প্রবৃত্তি স্রোতে যাহারা ভাসিয়া যায়, তাহারা কি চিন্তাকে তাহাদের জীবনের—নিজ নিজ হৃদয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবী তাহাদের একান্ত আরাধ্য বলিয়া ক্ষণেকের তরে ভাবিয়াছে? তাহার প্রাণটাকে চিন্তার পথে কি ছাড়িয়া দিয়াছে না নিশ্চয়ই তাহারা তাহা করে নাই। করে বলিয়াই তাহার এই প্রতিফল। তাহারা তো চিন্তাকে নিজ নিজ পথ প্রদর্শক করেই না, দেবী বলিয়া স্বীকার করেই না—দেবী বলিয়া চিন্তা চরণে আত্মসমর্পণ করেই না—এতদ্ভিন্ন বরং তাহা। চিন্তাকে নিজ

নিজ অধীন করিয়া আত্মসেবায় নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পায়। তাহাদের ইচ্ছা নয় যে চিন্তাকে স্বাধীনতা দেয়। তাহাদের ইচ্ছা যে, তাহারা তাহাদের ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়; তাহারা ইন্দ্রিয় সেবায় রত থাকে আর চিন্তা সেই ইন্দ্রিয়-গণকে স্বকীয় বৃত্তির অধীন হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাদের এই অপরিণাম-দর্শিতার ফল স্বরূপ স্বকীয় শারীরিক বৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া যাওয়াই বিধান। যাহারা দেবীসেবায় নিজ শরীর ও প্রাণকে উৎসর্গ না করিয়া সামান্য পার্থিব ভোগ সুখে আত্মসমর্পণ করে, তাহাদের পরিণাম এই প্রকার হওয়ায়ই যুক্তিযুক্ত এবং প্রার্থনীয়। তাহারা যদি জগতের লোককে শিক্ষা প্রদান না করিবে তো কাহারা করিবে? ইহাতে চিন্তার হীনতা কিছুই প্রকাশ পায় না বরং চিন্তা মাহাত্ম্যই প্রকাশ পায়। যদি দেবী বলিতে হয়, এই প্রকার অদ্ভুত ক্ষমতা বিশিষ্টাকে না বলিয়া কাহাকে বলিব? যে হৃদয়ে নির্ভর শীলতা নাই, সেখানে চিন্তা নাই। যিনি চিন্তাকে তাঁহার সম্পূর্ণ হৃদয় খানি ছাড়িয়া দিতে কাতর, সে হৃদয়ে চিন্তার আবির্ভাব পূর্ণ মাত্রায় হয় না। এবং যদিও আবির্ভাবোন্মুখ হয়, সে কেবল ততটুকু সময়ের জন্য যতটুকু সময়ের জন্য হৃদয় খানি একবার পূর্ণ মাত্রায় ছাড়িয়া দেওয়া যায়।

এই ভাব নিজ জীবনে অনেকবার অনুভূত হইয়াছে। অনেক সময় যখন দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহের কোন প্রকোষ্ঠ মধ্যে চিন্তাদেবীর আরাধনায় উপবিষ্ট হই, হয় তো দেবী আমার হৃদয় সিংহাসনে আসীন হইয়াছেন; কোন গুরুতর বিষয় মীমাংসার জন্য অনুরোধ করিতেছি, এবং তিনি বিষয়টি গ্রহণ করিতেছেন; এমন সময় প্রকোষ্ঠের দ্বারদ্বয় হঠাৎ উন্মুক্ত হইয়া গেল। যেমনই দ্বারোন্মুক্ত হওন অমনি দেবীর আসন ত্যাগ—অমনি গাত্রোত্থান—অমনি অন্তর্দ্ধান। আর তিনি আমাতে নাই এবং আমিও তাঁহার চরণতল হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছি। তখন বাহ্যজগতে আমি ভ্রমণ করিতেছি। তখন জড়জগতে আমি বিচরণ করিতেছি। সুতরাং তাঁহার দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত হইলাম। তাঁহার স্থান কি বাহ্যজগতে? তাঁহার স্থান কি এই জড়জগতে? তাঁহার নিকট জড় বলিয়া কি কিছু আছে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহার জগৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে আপনাকে এই জড়জগতের সহিত সম্পর্কচ্যুত করিতে হইবে; মন জগতে যাইতে হইবে। সে জগত নিরাকার। সেখানে এই সাকার 'আমি' যাইতে পারে না। সেখানে এই সাকার আমার মধ্যে যে নিরাকার 'আমি' আছে, তাহাকে যাইতে হইবে। সেই নিরাকার মন-জগতে নিরাকার

আমাকে অবস্থান করিয়া তাহার জন্য উপাসনা করিতে হইবে। অমনি দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, দেবী হৃদয় অধিকার করিয়াছেন; যতক্ষণ এই প্রকার ভাবে থাকা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মুহুর্ত্তে লোক-লোকান্তর পর্য্যন্ত গমন করিতে পারা যায়। অন্য সঙ্গী কেহই থাকে না, কেবল দেবীই পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গে থাকেন। যতক্ষণ মন-জগতে থাকি ততক্ষণ এই ভাব। এই ভাব অবলম্বন করিয়া অনেক বিষয় দেবীর নিকট হইতে অবগত হইতে পারা যায়। কত নৈতিক জীবনের বীজ, কত উচ্চ জীবনের আদর্শ, কত সুমিষ্ট ভাবের বীজ তিনি হৃদয়ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেন। সেই বীজ গুলি যত্নের সহিত রক্ষা করিতে পারিলে কালে ফলপ্রদ হয়। নবজীবন গঠিত হয়। কিন্তু যতক্ষণ মনজগতে অবস্থান ততক্ষণ এই ভাব বেশ পরিস্ফুট, যখনই প্রত্যাবর্ত্তন তখনই সেই সকল ভাবের অভাব। কোথাই বা দেবী—কোথাই বা চিন্তা—আর আমিই বা কোথা? সেই ঘর, সেই আমি বসিয়াছি, সেই গৃহদ্বার উন্মুক্ত সেই রাস্তায় কোলাহল সেই সূর্য্য প্রখর কিরণজাল বর্ষণ করিতেছেন। আর সেই যে কত সমাজচিত্র, সেই যে কত সৌন্দর্য্য চিত্র, দেশ দেশান্তরের লোক লোকান্তরের চিত্র, কত প্রেমের চিত্র সে সব কোথা? সে সব আর কিছুই নাই। আছে মাত্র ছায়া; সেই ছায়াই কার্য্যকরী।

এস ছায়া এস তুমি রাখিব যতনে,
বসিয়া চরণতলে পূজিব চরণে—
ছায়া দেখে চলে যাব,
ছায়া দেখে পড়ে রব,
ছাড়িব না ছাড়িব না কভু তোমাধনে॥

সে কি ছায়া! সে ত ছায়া নয়! সে যে আলোক,সে যে অন্ধকারেও দেখা যায়। ছায়া যে আঁধারে মিশায়ে যায়, কিন্তু এতো তাহা নয়। যেমন আলোকের প্রতিবিম্বে ছায়া নাই, অন্ধকার নাই, সেইপ্রকার চিন্তা রক্ষিত যে ছায়া, তাহাতে অন্ধকার নাই; সে ছায়া আঁধারের পথপ্রদর্শক। ধন্যদেবী ধন্য সেই, পায় তব ছায়া যেই। সেই ধন্য সেই ধন্য যে তোমারছায়া অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে।

যেমন মরুভূমিতে বীজ অঙ্কুরিত হয় না সেইপ্রকার যে হৃদয় চিন্তাকর্ষিত নহে—চিন্তার পবিত্র বারিতে যে হৃদয় অভিষিক্ত নহে, সে হৃদয় হইতে কোন সুফলই আশা করা যায় না। সে হৃদয় মরুসম উসর—সে হৃদয়ের বীজোৎপাদিকা শক্তি থাকে না। সে হৃদয় জড় হৃদয়। যে সমাজ হৃদয়ে চিন্তা নাই, সে সমাজ নিদ্রিত—সে সমাজ চেতনহীন—শক্তিহীন—প্রাণহীন—বিশেষত্ব হীন; সে সমাজ যে

ধীরে ধীরে কালের গতির সহিত সাধারণের অলক্ষে পাপপূর্ণ স্রোতস্বতীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে—অলক্ষিত ভাবে যে সমাজ মধ্যে পাপরাশি প্রবেশ করিতেছে, এবং কালে যে পাপরাশির মধ্যে পতিত হইয়া অবনতির গভীর গর্ত্তে চিরতরে নিমর্জ্জিত হইবে তাহা কেহ ভাবে নাই। যেন ঘুমঘোরে অচেতন, তাহা ভাবিবার ক্ষমতা নাই বা অবসর নাই। মস্তকের পার্শ্বে কাল প্রতীক্ষা করিতেছে, মুহুর্ত্ত মধ্যেই কেশাকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে যেন দেখিতে পাইতেছে না, সকলই যেন মৃত ভাব।

আবার যেদিন দেখিবে সেই সমাজ মধ্যে নূতন স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; চিন্তার প্রবল স্রোত সমাজ হৃদয়কে দ্বিধা করিয়া ছুটিয়াছে—হৃদয়ে হৃদয়ে তাহার ঘাত প্রতিঘাত হইতেছে—প্রাণে প্রাণে তাহা বেশ অনুভুত হইতেছে, তখন বুঝিবে সেই সমাজের দিন ফিরিয়াছে—তাহাদের সৌভাগ্যের পূর্ব্বগগণের তিমির-রাশি কাটিতেছে; অচিরে বাল সৌর-কর-রাশি প্রতিবিম্বিত হইয়া সকল দুঃখের অবসান করিবে।

যে জাতির মধ্যে এই চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত না হয়, যে জাতি চিন্তাদেবীর অমৃতবৎ প্রসাদ বারি পানে বঞ্চিত সে জাতিও পতিত পতনোন্মুখ বা পতিত। আবার যে দিন জাতীয় হৃদয় চিন্তার সুশানিত হলদ্বারকর্ষিত হইবে সেই দিন সেই জাতির নানা বিষয়ে উন্নতি হইবে। আবার তাহারা উত্থিত হইবে আবার কালে তাহার জাতীয় অভাব সকল পুরণ করিতে সমর্থ—হইবে।

পাঠক! এস একবার প্রাচীন ঋষি মহাত্মাগণের আশ্রমে গমন করি। ঐ দেখ কেমন বদরিকাশ্রমে লম্বমান জটা শ্মশ্রুধারী ব্যাসদেব ধ্যানস্তিমিত নেত্রে কাহার আরাধনায় নিযুক্ত। কি প্রশান্ততা! কিবা ধীরতা! কি সহিষ্ণুতা কি প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা! তাহার প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাতেই ঐ সকল গুণাবলীর সামঞ্জসী-ভুত ভাব তাঁহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। প্রশান্ত, গভীর এবং সহিষ্ণু ভাবে তিনি চিন্তা করিতে পারিতেন, বলিয়াই যখন সমাজের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল, যখন নিম্নশ্রেণীর লোকের দুর্দ্দশার ছায়া তাঁহার হৃদয়ে পতিত হইল, তখন সামাজিক বিষয় তাঁহার চিন্তার একটী গুরুতর বিষয় রূপে গৃহিত হইল। এবং বর্ত্তমান ও অতীতের চিত্র তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ প্রতিফলিত হওয়ায় ভবিষ্যতের গাঢ় তিমিরাবৃত দৃশ্য বহু দর্শিতা ও দূর দর্শিতা প্রভাবে এবং চিন্তাযোগে তাঁহার অন্তর মধ্যে উদিত হইল; দয়ার করুণ রসে তাঁহার হৃদয় ক্ষেত্র প্লাবিত হইল;

আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। তিনি সুগভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, এবং অবশেষে এই প্রগাঢ় চিন্তার ফল স্বরূপ সমাজের উদ্ধারার্থ এবং সমাজের মধ্যে বৈদিক ধর্ম্মোপদেশ প্রদানার্থ এই সমূহ মহাভারত গ্রন্থ উদ্ভূত হইল। যদি তিনি চিন্তাশীল না হইতেন, যদি তদানীন্তন সামাজিক অবস্থাকে তাঁহার বিচার বিষয় রূপে গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে কখনই এই দুর্লভ গ্রন্থ প্রচারিত হইত না; এবং প্রচারিত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয় মনকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিত না। আজ যে শূদ্রগণ জ্ঞানলাভ করিয়াছে, আজ যে তাঁহার বৈদিক কালের কঠোর নিয়মের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, আজ যে তাঁহাদের হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক প্রতিভাত হইয়াছে, ইহার মূলে সেই মহাযোগী ব্যাসদেবের চিন্তাশীলতা।

পাঠক! আর দেখিবে কি? তবে এস এখন বহু প্রাচীন ছাড়িয়া কিছু অল্প দিনের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখি। এস একবার ঐ প্রেমিক সন্ন্যাসীর নিকট গমন করি। ঐ যে সংকীর্ত্তনোন্মত্ত, নামে মাতোয়ারা, জ্ঞানহারা, মহাপুরুষ উনি কে? ঐ যে শত শত নরনারীকে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পবৎ জড়ভাবাপন্ন করিয়া রাখিয়াছেন উনি কে? যাঁহাকে যিনি একবার দেখিতেছেন—যিনি একবার মাত্র মুখের কথা শুনিতেছেন; তিনি যেন সর্ব্বস্ব ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন—উনি কে? ঐ মহাপুরুষ আমাদের পূজনীয় আধুনিক আর্য্য-জাতির গৌরব আদর্শ প্রেমিক সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব। আজ আমারা একবার ঐ নবীন সন্ন্যাসীর বিষয় কিছু আলোচনা করি। এই নবীন বয়সে স্নেহময়ী মাতার দৃঢ় বন্ধন কাটিয়া, প্রেমময়ীযুবতী ভার্য্যার পবিত্র প্রেমের বন্ধন তুচ্ছজ্ঞানে উন্মোচন করিয়া বিষয় ভোগ সুখেচ্ছাকে চির-তরে জলাঞ্জলি দিয়া আজ কৌপিনঅজিন দণ্ড, কমণ্ডলু মাত্র অবলম্বন করিয়া পথে পথে হরিনামে উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণকরিতেছেন কেন? কেন আজ ইহাঁর মধ্যে এই পরিবর্ত্তন আসিল? এ কথার উত্তরে আমি নিরহঙ্কারে বলিতে পারি একমাত্র চিন্তাশীলতাই ইহার কারণ।

যখন তৎকালীন সমাজের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল, তিনি দেখিলেন যে, শূদ্র ও পতিত নরনারীগণ ব্রাহ্মণগণকর্তৃক অতীব হেয় জ্ঞানে উপেক্ষিত হইতেছে, তাহাদের ধর্ম্মাচরণের স্থান নাই। তাহাদের উচ্চজ্ঞানে অধিকার নাই, তাহাদের আত্মার উন্নতির কোন প্রকৃষ্ট উপায় নাই। এই সকল দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি প্রগাঢ় চিন্তার সহিত সামাজিক বিষয় সকল পর্য্যালোচনা

করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিজ স্বার্থ পরস্বার্থে বলি দিয়া তাঁহার জীবন ব্রতের উদ্যাপন কামনায় বদ্ধ পরিকর হইলেন। তাই তিনি নিকৃষ্ট জাতিগণকে সৌভ্রাতৃ সূত্রে আবদ্ধ করিলেন; তাই তিনি তাঁহার হৃদয়স্থিত সুগভীর ধর্ম্মভাব লইয়া প্রচারার্থ পথে পথে বেড়াইতে লাগিলেন; তাই তিনি হিংসা দ্বেষাদি শূন্য হৃদয়ে জাতিভেদ নির্ব্বিশেষে তাঁহার হৃদয়স্থিত প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব নরনারী হৃদয়ে অনুপ্রবেশিত করাইতে লাগিলেন। আহা! কি মধুময় ভাব! যেমন স্পর্শমনি স্পর্শে সামান্য উপলখণ্ডও সুবর্ণ খণ্ডে পরিণত হয়, সেই প্রকার যাহার হৃদয় (এমন কি জগাই, মাধাই, এর ন্যায় কত শত মহা পাপীর হৃদয়) স্পর্শ করিতে লাগিলেন, তাহারই মধ্যে এক অপূর্ব্ব মধুময় ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। যাহারা ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক হেয়জ্ঞানে পরিত্যক্ত হইতেছিলেন, আজ তাহারই ধর্ম্ম নেতার স্থান গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম লীলা! ধর্ম্ম ক্ষমতা!

আর বেশী বলিব না। এই যে দুইটী দৃষ্টান্ত প্রকটিত হইল, এই দুইটী দৃষ্টান্ত চিন্তা ও কর্ম্মের সামঞ্জস্যীভূত অগ্রসরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। একদিকে চিন্তা আর একদিকে কর্ম্ম। চিন্তা নিজ শক্তি বলে কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দেশ করিতেছে, আর অমনি জীবন কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরায়ণতার সহিত সেই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ব্রতরূপে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত। যেমনই চিন্তা বলিল, ঐ সম্মুখে তোমার কার্য্যক্ষেত্র, অমনি শরীরস্থ রক্তকণিকা যেন নাচিয়া উঠিল, অমনি প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যেন সতেজ ভাব ধারণ করিল, অমনি অগ্রসর হইল। কেমন চমৎকার শৃঙ্খলা! যেই চিন্তা সেই কাজ। আলস্য নাই ঔদাস্য নাই। এই ভাবই জীবনে চাই, নতুবা কেবল চিন্তায় কি হইবে? শতবর্ষ ধরিয়া যদি চিন্তা করি, আর চিন্তা নির্দ্দেশিত পথে গমন না করি, কণ্টক দেখিয়া পদ্ম তুলিতে যদি বিমুখ হই, তাহা হইলে জীবনের উন্নতি হইবে না, সংস্কার হইবে না। ব্যক্তিগত, সমাজগত অথবা জাতিগত উন্নতি করিতে হইলে চিন্তা ও কর্ম্মের সামঞ্জস্যীভূত অগ্রসরতা চাই।

এক্ষণে উপসংহার স্থলে ইহাই বক্তব্য যে ব্যক্তি গত, সমাজ গত, বা জাতিগত কোনও না কোনও উন্নতি সাধন করিতে হইলে অগ্রে চিন্তাদেবীর আরাধনা প্রয়োজন। চিন্তা যে বীজ মানব হৃদয়ে রোপণ করিবে, কর্ম্মরূপ জল সিঞ্চন দ্বারা তাহাই প্রস্ফুটিত হইবে এবং পরিণামে সুফল প্রদান করিবে। সুতরাং চিন্তাই মূল তাই বলি চিন্তাশক্তি দেবশক্তি।

প্রেম ও প্রকৃতি।

সমালোচনা।

লেখক—শ্রীরমেশ চন্দ্র রায়, এল, এম, এস,

প্রেম ও প্রকৃতি।—শ্রীনগেন্দ্র নাথ সোম প্রণীত। সন ১৩১৫ সাল, মূল্য বার আনা। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। দশ খানি সুদৃশ্য হাফ-টোন চিত্র সম্বলিত।

খৃঃ ১৮৯৭ সালে পালামৌ-প্রবাস কালীন সুখে কালক্ষেপের উদ্দেশ্যে, গ্রন্থকার এই কাব্যখানির অবতারণা করেন; পরে, নানা কার্য্যবশতঃ প্রায় একাদশ বৎসর এই কাব্যখানি অসম্পূর্ণ (মাত্র ৩।৪ সর্গ) অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এক্ষণে গ্রন্থকার ইহাকে সমাপ্ত করিয়া জনসাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন।

কাব্য খানিতে বর্ণনীয় বিষয়—প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোহারিত্ব ও প্রেমের মহিমা ও ব্যাপকতা। এই কারণেই কাব্য খানির "প্রেম ও প্রকৃতি" নাম করণ করা হইয়াছে। নামকরণ সার্থক বটে। প্রত্যেক কাব্যেই নায়ক ও নায়িকা থাকেন, ইহাতেও তাহাই আছেন; তবে নায়ক ও নায়িকা উভয়েই অজ্ঞাত নামা, অজ্ঞাত কুলশীল—শ্রীমতী হিম্যান্স কৃত Common lot নামক কবিতার নায়কের ন্যায় রূপ-রস-গন্ধহীন কিন্তু অশেষ গুণের আঁধার স্বরূপ। কাব্যখানির উদ্দেশ্য সংসার তাপক্লিষ্ট জীবের মনে শান্তি দান করা; আমরা আশা করি, গ্রন্থকারের আশা সফল হইবে, পাঠক অশান্ত মনে শান্তিলাভ করিবেন।

কাব্যের গল্পাংশটুকু এইঃ—নায়ক (পুরুষ) কোনও অনির্দ্দিষ্ট কারণে, "ত্রিযামা যামিনী" শেষে, পূত ত্রিবেণী তীরে উপনীত হইয়া, কখনো দুঃখে, কখনো নিরাশয়, জন্মভূমির নিকট হইতে বিদায় ভিক্ষা করিতেছেন—তীর্থ পর্য্যাটনে, মনের শান্তি লাভার্থ বহির্গমন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ এক সন্ন্যাসী "প্রেম গান গাহিতে গাহিতে তথায় উপনীত হয়েন। তিনি নায়ককে "বিশ্ব-প্রেমের" দুই একটি আভাষ দিয়া অন্তর্হিত হয়েন। ক্রমে তীর্থ পর্য্যাটনের পথে ঘুরিতে ঘুরিতে, সন্ধ্যার সময়ে নায়ক হরিদ্বারে উপস্থিত হন। সেই স্থানে, তাঁহার ন্যায় গৃহত্যাগিনী, তীর্থ ভ্রমণরতা, নায়িকার সহিত প্রথমে সাক্ষাৎকারলাভ হয়; নায়িকা নায়কের সহিত ভ্রাতৃ সম্বন্ধ সংস্থাপনান্তর তাঁহাকে পরামর্শ দেন— "ইহাতে (তীর্থ পর্য্যটনে) নাহিক সুখ, চল পান্থ গৃহমুখ;" এই বলিয়া নায়ক ও নায়িকার ছাড়া ছাড়ি হয়। তথা হইতে নায়ক হিমাচল প্রদেশে ভ্রমণে রত

হয়েন। হিমাচলে চতুর্দ্দিকে ভগবানের বিভূতি ও প্রেমের অপূর্ব্ব বিকাশ দর্শন করিয়া, নায়ক, মনুষ্য প্রেমের হিমাচল, প্রেমের তীর্থভূমি, আগ্রায় উপনীত হয়েন। তথা হইতে তীর্থের পথে পর্য্যটন করিতে করিতে কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণে উপনীত হন; সেখানেও নায়ক একটী সাধুর দর্শন লাভ করেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করেন—

"দেখ তীর্থ আছে যত, চাঞ্চল্যে সকলি হত,
সকলি বৃথা যে চিত্ত হইলে চঞ্চল;
চিত্তস্থির যদি হয়, গৃহ বন কিছু নয়,
আঁধারে, আলোকে জ্যোতিঃ সম সমুজ্জ্বল॥

কাশীধাম হইতে ক্রমান্বয়ে, নায়ক পুরুষোত্তম, মালাবার, কুমারিকা-অন্তরীপ পরিভ্রমণ করেন। এবং শেষোক্ত স্থানে সেই নায়িকা ভগ্নীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎকার লাভ হয়, এবং উভয়েই গৃহ প্রত্যাগমনে কৃতসংকল্প হইয়া তথা হইতে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন—এবং অবশেষে—"Home—and—rest!"

এই খণ্ড কাব্যের গল্পাংশটুকু অতীব সামান্য এবং তাহাতে পারিপাট্যের কোনও চেষ্টা নাই; পারিপাট্য দূরে থাকুক, স্থানে স্থানে গল্পাংশটুকুকে অসঙ্গত বলিয়াও বলা যাইতে পারে। এত নিরাভরণা বলিয়া গল্পটুকু এত মনোহর— কবির কল্পনায় এত প্রসার বিস্তৃত।

বিজ্ঞানের সহিত কবির সাক্ষাৎ কোনও সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক, কাব্যের সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ বড় দৃঢ়। কবিতার প্রতিস্তরে মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ চিত্রিত হইয়াছে, তাহার আভাষ দিতে আমরা প্রয়াস পাইব। এবং প্রকৃতির হেলা-ফেলা সৌন্দর্য্যের মধ্যে কি মনোরম বৈজ্ঞানিক সূত্র-গ্রথিত মাধুরী আছে, তাহাও কিঞ্চিৎ বুঝাইবার প্রয়াস পাইব। কিন্তু কোন্ কার্য্য কারণ সূত্রে নায়কের সহিত মাত্র দুইবারই সাধু সাক্ষাৎকার লাভ হইল এবং মাত্র দুইবারই নায়িকার সহিত মিলন হইল, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু না জানিলেও এই অজ্ঞানতা-রহস্য টুকু বড়ই মধুর বোধ হইল, এই পারিপাট্য হীন সামান্য সরল গল্পটুকু বড়ই হৃদয়গ্রাহী বোধ হইল। কবির অট্টালিকা যতই বায়ুমূলক ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইবে, কবির ততই ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে যাইবার সুযোগ হইবে। কাব্য পাঠ করিতে বসিয়া পাঠক কবে নবেল পাঠের রসাস্বাদ করিতে চাহেন? কাব্য পাঠ করিয়া যে পাঠক কবিকে বুঝিতে চেষ্টা না করেন, তাঁহার কাব্যপাঠের বৃথা চেষ্টা—তিনি আকাশ মার্গে উড্ডীয়মান কিন্তু শ্মশানক্ষেত্রে শবস্তূপের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপকারী গৃধ্র বিশেষ।

এই খণ্ড কাব্যখানি আজ একটি কারণে আমাদের বড় মিষ্ট লাগিয়াছে। সে কারণটী এই, কাব্যখানি আমাদের নিখুঁত "স্বদেশী" জিনিষ ইহাতে বিদেশীর কোনও নাম গন্ধ নাই। ইহা উচ্ছৃঙ্খল ছন্দে রচিত নহে, ইহা আমাদের চির প্রিয় এবং নিতান্ত পরিচিত চির-বাঙ্গালী-ধরণের দীর্ঘ ত্রিপদীছন্দে রচিত। ইহাতে অনর্থক অনুপ্রাসের ঘটা নাই, ইহাতে সুশ্রাব্য অনুপ্রাসের অভাবও নাই। এই জন্যই বলিতেছিলাম যে, এই খণ্ড কাব্যখানি বাঙ্গালা ভাষার অনেক উচ্ছৃঙ্খল লেখকের উচ্ছৃঙ্খল ছন্দে রচিত নহে বলিয়াই আমাদের নিখুঁত স্বদেশী জিনিষ এবং প্রিয়। সুধু ছন্দেই ইহার স্বদেশী ভাবের আরম্ভ ও শেষ হয় নাই; বাঙ্গালী প্রেমিক, বাঙ্গালী ধর্ম্মগত প্রাণ, বাঙ্গালী গৃহস্থালী-প্রিয়, বাঙ্গালী তীর্থ লিপ্সা বড়ই প্রিয়, বাঙ্গালীর সতীর পতি দেবতা, বাঙ্গালী প্রেমিক; এই কথা গুলি লইয়াই পুস্তক রচিত—এই কথাগুলি দণ্ডে দণ্ডে, ছত্রে ছত্রে পরিলক্ষিত হইবে—এমন কি লেখক বঙ্গের শারদীয় চন্দ্রমার উল্লেখ করিয়া স্বদেশকে গৌরবান্বিত করিতে ছাড়েন নাই। এই খণ্ডকাব্য খানি বহুদিন পরে একখানি প্রকৃত স্বদেশী কাব্য শিক্ষাসমাজে উপনীত করিয়াছে—এই জন্যই ইহার লেখক আমাদের ধন্যবাদার্হ। ইহাতে বিজাতীয় ভাব নাই, বিদেশীয় গ্রন্থের গন্ধ নাই, কোটেশন ও ফুটনোটের নাম নাই!

প্রকৃতিকে চিত্রিত করিয়া গ্রন্থকার অনেকগুলি ছবি দেখাইয়াছেন—কিন্তু তন্মধ্যে প্রনগ্ন মূর্ত্তিতেই প্রকৃতি অপূর্ব্ব সুন্দরী; তিনি কখনো তরঙ্গায়িত বেণী কাননশোভিনী; কখনো পীন পয়োধরা ধরিত্রী। যে প্রকৃতি "আনমনে"—

"কাননে চৈত্রের রাস,　　কুসুমে বিলায় বাস,
করিয়া বিমুগ্ধ লুব্ধ পরাণ আতুর!"

সেই প্রকৃতিই হিমালয় প্রদেশে কি ভাবে থাকেন, শুনুন:—

হে প্রকৃতি! মায়াবিনী!　　সৌন্দর্য্যের নির্ঝরিণী!
কোথা সে বালিকা-হাস করুণ-অধরে!
জ্যোৎস্না-আকুলিত নিশি,　　সৌরভে পূর্ণিত দিশি,
কাননে কুসুম খেলা—তারকা অম্বরে!
কিম্বা সে বসন্তকালে,　　সন্ধ্যার জলদজালে,
অপূর্ব্ব বিমান-শোভা দিনান্ত কিরণে,
বিপুল পুলকভরা,　　মোহমাখা বসুন্ধরা,

গম্ভীর—গম্ভীর সব! কোথা পিকভৃঙ্গরব!
তটিনীর কুলুকুলু সুমৃদুল তান!
বসন্ত প্রমোদ বন, সে যৌবন নিকেতন!
নয়নে দামিনী-দ্যুতি কণ্ঠে প্রেম-গান!
সকলি ডুবেছে হায়, কণামাত্র নাহি তায়,
শিহরে সৌন্দর্য্য কিরে এ বিজন স্থলে!
সেই পত্র পুষ্পমেলা, জীবনের ছেলেখেলা,
একি দৃশ্য অভিনব গাম্ভীর্য্যের বলে!
পড়ে ধারা পরমাদে, গর্জ্জি শত বজ্রনাদে,
প্রবাহিয়ে স্ফটিকের তরঙ্গিত ধার;
নগ্ন দীর্ঘ তরুদল, অঙ্গে হিম ঝলমল,
শিয়র পরশে নভো-নীলিমার দ্বার!"

বন ভূমিতে প্রকৃতির বালিকালীলা; হিমাচলে প্রকৃতির প্রৌঢ় লীলা; মধ্যে তরঙ্গ ভঙ্গে প্রকৃতির যৌবনের উদ্দামলীলা; সে কিরূপ মনোহর, কিরূপ উন্মাদক একবার শ্রবণ করুনঃ—

"হে আদি সৃষ্টির রূপ, কি মহান্ অপরূপ,
এ মহা-তীর্থের পাশে বারিধি তোমার!
বিস্ময়ে চৌদিকে চাই, আদি নাই, অন্ত নাই,
কোথা এ ব্যাপ্তির শেষ তব পারাবার!
ভ্রুভঙ্গে ভ্রুকুটী-ভরে, হেলায় ইঙ্গিত ক'রে,
জাগাও কি অধীরতা প্রকৃতি-জীবনে;
হৃদয়ে কি অভিলাষ, পূরাইতে কোন্ আশ,
এ ভীম তাণ্ডব তব শয়নে স্বপনে!
আছাড়ি গরজে কূলে, উর্ম্মিমালা ফুলে ফুলে,
ছুটে আসে লক্ষ ফণী ফণা বিস্তারিয়া?
কি ভাষণ! কি কল্লোল! কি উন্মত্ত উতরোল!
প্রলয়-বিষাণ বাজে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া!

* * * * *

তোমার চোখের পরে,　　সুরবৃন্দ সুধা হরে,
　উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, পারিজাত ফুল;
বিষ্ণু লন বিষ্ণুপ্রিয়া,　　বিষদিগ্ধ দৈত্যাহিয়া,
　হরভাগ্যে হলাহল,—এ কেমন ভুল !!!
হৃদয় করিয়া খালি,　　সবি পরে দিলে ডালি,
　শূন্য—শূন্য—শূন্যময়, অন্তর-আগার;
তাই কি বিরাম-হারা,　　দুরন্ত উন্মাদ পারা,
　সে দিন হইতে তুমি মহাপারাবার?
তোমার তরল বুকে,　　ও সৌম্য উদার মুখে,
　ছিল কোন্ ভালবাসা প্রেমের লহরী!
কোন্ স্নেহ কোন্ প্রীতি,　　জীবনের কোন্ গীতি,
　ফুটাইয়া ছিলে প্রাণে দিবা বিভাবরী!

*　　*　　*　　*

এ পৃথী তোমার কোলে,　　যেন ক্ষুদ্র শিশু দোলে,
　জননীর স্নেহ-অঙ্কে সুষমা ছটায়;
কি বিশাল আবরণে,　　আবরিয়া সযতনে,
　দিতেছ করুণা ঢালি' প্রেম মমতায়!

*　　*　　*　　*　　*

যায় দিবা, নিশা আসে,　　রবি চন্দ্র, তারা হাসে,
　তুমি শুদ্ধ সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি বিমোহন;
পূর্ণিমা তোমার শিরে,　　রচে কি মাধুরী ধীরে,
　ভাসে কি আনন্দে বুকে তরুণ তপন!
ল'য়ে ষড় ঋতুদলে,　　কর ক্রীড়া কুতূহলে,
　কালে কালে কি মধুর চিত্র সুশোভন;
শীতের নিস্তব্ধ বেলা,　　বরষা-হিল্লোল খেলা,
　দুরন্ত নিদাঘে ঘোর তরঙ্গ-গর্জ্জন!
আসে অমাতিথি যবে,　　বিস্ময়ে নিরখে সবে,
　কি স্বচ্ছনীলিমাময় মুরতি তোমার;
কি আবেগে আলোড়ন,　　কি ভীষণ গরজন,
　প্রলয়ে উথলে যেন মহা-হাহাকার!

বসি তীরে আনমনে, গত স্মৃতি-স্বপ্ন সনে,
আলসে বহিয়া যায় দিবস ধূসর!
অনন্ত তরঙ্গ-ধার, বিশ্ব করে তোলপাড়,
সংগ্রামে উন্মত্ত কেন লক্ষ মহীধর!
অধীর তড়িত-বেগে, সহসা উঠেছে জেগে,
নবীন উদ্যমে যেন ঘুমভরা বুক!
বসন্ত সমীর স্পর্শে, জীবন্ত স্মৃতির হর্ষে,
এ কোন উল্লাসভরা উন্মাদের সুখ!

*　　*　　*　　*　　*

নীলনভে নীলকান্তি, নীলে নীল নীলভ্রান্তি,
আকাশপাতাল নীল একত্রে বিলীন;
উত্তাল তরঙ্গধার, যেন নীলাম্বের হার,
নয়নে নীলাম্বুময় সৃষ্টি সীমাহীন!" ইত্যাদি।

এইরূপে, প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী, প্রকৃতির প্রত্যেক হাসি, প্রকৃতির প্রত্যেক ভ্রূকুটি লেখক সুন্দর তুলিকায় নিখুঁত রূপে তুলিয়াছেন। এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তুলিকায় ফুটাইতে ফুটাইতে কবি বলিতেছেন—

"শোভনা প্রকৃতি যথা, প্রেমের বিকাশ তথা,
প্রণয়ের চিত্র চির-সৌন্দর্য্য জড়িত!
বিশ্বসৌন্দর্য্যের সার, প্রকৃতির প্রেমাগার,
এমন সুখদ-কুঞ্জ কোথায় রচিত?"

এইরূপে, কবি প্রকৃতি রাজ্য হইতে ক্রমে প্রেমের রাজ্যে পাঠক মহাশয়কে লইয়া আসিলেন। এই প্রেমের মূলমন্ত্র—

"এক মহীরুহে রতা, দেখিবে সহস্র লতা,
জড়প্রেমে বিশ্বপ্রেম অপূর্ব্ব-প্রকাশ!"

কিন্তু, "হায় সে দুর্ল্লভ প্রেম, শত কষ্টিকষা হেম,
এই স্বার্থপর ভূমে কোথা আত্মদান?
প্রেমের পসরা কিনি, ধরা করে বিকি-কিনী,
তুলাদণ্ডে করি তার ওজন সমান!"

লেখক কিরূপ প্রেমের আদর্শ পাঠক মহাশয় সমক্ষে ধরিতে চান তাহা তিনিই বলিয়া দিয়াছেন,—

"পদ্মরাগ মরকত, জ্যোতির্ম্ময় মণি যত,
আলিঙ্গি' মৃত্তিকা-বুক প্রণয়ে বিধুর!
আঁধারে আলোক যথা, বিচিত্র মিলন তথা,
সে প্রেম-প্রসার কেবা বুঝে কত দূর?"

এক্ষণে দেখা যাউক, গ্রন্থকার কি কৌশলে এই প্রেমের বিকাশ দেখাইয়াছেন। এই প্রেম কাম-লালসা পূতি-গন্ধহীন।

ঘোর তমসী-রজনীতে, তদপেক্ষা মসীমগ্ন হৃদয় লইয়া, কখনো সন্দেহের দোলায় দোলাইত হইয়া কখনো ঘৃণায় নিজেকে ধিক্কৃত করিয়া প্রাণী (নায়ক) যখন কাঁদিতেছে—

"মরি কি আশার শেষ জীবনের অবশেষ?
আমি ভবে পথহারা আশ্রয়-বিহীন!
গড়ায় নয়নজল, গলিত মরম তল,
বিষাদে ব্যথিত হিয়া বদন মলিন,"

তখন নৈরাশ্য তাহার হৃদয়কে আশ্রয় করিল, তাই তখন সে শাস্ত্র প্রভৃতির প্রতি সন্দিহান; ক্রমে নৈরাশ্য হইতে জীবনের মমতার হ্রাস হইতে লাগিল, 'আত্ম'-বলির সূত্রপাত হইল—অজ্ঞাতসারে "অহং" দূরে যাইতে লাগিল—হৃদয় প্রেম-প্রণব দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইল। কবিও কৌশলে মানসিক তমসা-বিনাশের সহিত প্রভাতের অবতারণা করিয়া বলিলেন, ভক্তের ভগবান্ ভক্তকে পথ দেখাইবার জন্য সাধুর সাক্ষাৎকার লাভ করাইলেন; ত্র্যহস্পর্শফলে, (সৌন্দর্যের অনুভব, সৌন্দর্য্যের ভোগ, সৌন্দর্য্যে প্রীতি, সৌন্দর্য্যে বিলাস) ক্রমে প্রকৃতি প্রেমের অঙ্কুর দেখা দিল, সংসার তাপক্লিষ্ট বিরাগী মানব তাই তখন বলিল,—

"হে সুধারূপিণি ঊর্ম্মি, কি সান্ত্বনা মোহময়ী
ও মুখে জড়ায়ে আছে সতত তোমার!"

গ্রন্থে ভূমিকালিখিত ব্যবস্থার সার্থকতা হইল।

যে প্রেম পূতসলিলা ত্রিবেণীতীরে অঙ্কুরিত হইল, সেই প্রেম যোগীন্দ্রবাঞ্ছিত হিমাচলের ক্রোড়ে দেবী রমণীর নিস্কলঙ্ক ভক্তি বিজড়িত প্রেম, মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে অনুকূল পবন লাভ করিল। নায়িকা ভগ্নী রমণীর সর্ব্ব মন্ত্রের সার পতিগুণগান করিয়া আপনাকে ধন্য করিলেন, আমরাও পাঠ করিয়া ধন্য হইলাম। নায়ক কণ্টকিতগাত্রে গদ-গদ-স্বরে বলিলেন,—

"দেখি যে প্রেমেতে ভরা তোমারি এ বসুন্ধরা,
বাসযোগ্য গৃহ তব প্রেম মহিমায় !
অপূর্ব্ব তোমার শিক্ষা পূর্ণহৃদে উচ্চ দীক্ষা
নারীর মহত্ত্ব চিরবিখ্যাত ধরায় !

বীজ অঙ্কুরিত জাহ্নবীতীরে ; অনুকূল পবন হিমাচলবক্ষে, হরিদ্বারে ; সাধুর সুহৃদসংসনায় তাহার উৎপত্তি ; অজ্ঞাতসারে প্রকৃতি (নায়িকা) পুরুষের (নায়কের) মিলন ; এমন মণিকাঞ্চনযোগে যে প্রেমের অতীব সুখকর ফল হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি ? এখন বৃক্ষ দেখিলে নায়ক বলেন,—

"এক মহিরুহে রতা দেখিবে সহস্র লতা
জড়প্রেমে বিশ্বপ্রেম অপূর্ব্ব প্রকাশ।"

এখন ধরা গর্ভস্থ রত্নরাজী চক্ষে না দেখিলেও নায়ক বলেন,—

"পদ্মরাগ মরকত জ্যোতির্ম্ময় মণি যত
আলিঙ্গি মৃত্তিকাবুক প্রণয়ে বিধুর !"

এখন আর কষ্ট করিয়া প্রেমের মন্ত্র সাধিতে হয় না ; এখন ক্রমে দৃষ্টির বিস্তার হইতে আরম্ভ করিয়াছে ; ক্রমে মনের উদারতা উপজিতে আরম্ভ করিতেছে ; এখন তাবৎ মানবই নিতান্ত আত্মীয়, প্রথমে আত্মদান, তৎপরে নরপ্রেম এবং তাহা হইতে প্রকৃতপ্রেম। তাই আজ আগ্রার তাজমহল নায়কের চক্ষে এক বিরাট প্রেমিকের প্রেম আরাধনার মূর্ত্তি ধারণ করিল,

"চির আকাঙ্ক্ষার লাগি, থাকি চির-স্বপ্নে জাগি,
সতত মানসে হেরে ধ্যানে সে মুরতি ;
উল্লাসে বিভোর প্রাণ, উন্মীলিয়া হৃ-নয়ান
উদার হৃদয় করে অনন্ত আরতি।
করাল সমাধিবুকে, নিষ্ঠুর মৃত্যুর মুখে,
স্মৃতিহীন চিহ্নহীন স্তব্ধ শূন্যতায় ;
কে জাগে অলক্ষে থাকি, কার সে সতৃষ্ণ আঁখি
হইয়ে পলক-হারা মুখ পানে চায়।
প্রেমের সাধনা বলে এ বিশ্বে সকলি ফলে
প্রেমের শকতি হের ঐশ্বর্য্য মহান্ !
কি স্মৃতি রেখেছ তুলে যমুনার উপকূলে,
এ মর্ত্ত্যে অমরাবতী প্রত্যক্ষ প্রমাণ !

* * * *

সে ধ্যানে, সে ধারণে, বিশুদ্ধ হৃদয় বনে,
ফুটে উঠে পারিজাত ত্রিদিবের ফুল!
ধরার মৃত্তিকা'পরে, সৌন্দর্য্য সৃজন করে
সে প্রেমসাধনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অতুল।

নায়ক তখন প্রাণহীন শীতল মর্ম্মর স্ফটিকে তপ্ত প্রেমশোণিত বহিতে দেখিলেন, প্রেম উদ্বেলিত হৃদয়ের মন্দ-মন্দ হৃৎকম্প তাঁহার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল,—

প্রতি হর্ম্ম্যে স্বর্গছবি, বিচিত্রভাস্কর-কবি
অঙ্কিত করিল কোন্ তুলিকা ধরিয়া;
কি স্বপ্ন মাদরময়, শোভার তুফান বয়,
দিব্যালোকে মূর্ত্তিমতী সজীব হইয়া।

যে ব্যক্তি একদিন,—

"হৃৎপিণ্ড উপাড়িয়ে তাই সব বিসর্জ্জিয়ে
গৃহ ছাড়ি ভিক্ষু হ'য়ে আসিয়াছি চ'লে!"

এই কাতরোক্তি করিয়াছিল, সেই ব্যক্তিই আজ প্রকৃতি-প্রেম হইতে বিশ্বপ্রেমে মজিয়া বারম্বার বলিতেছে,—

"দেখাও প্রেমের ছবি, হে বিশ্বের মহাকবি
অমোঘ সাধন ফলে প্রেমের ঈশ্বর!
যে প্রেমের কণিকা পেয়ে রশ্মির রেখাটি ছেয়ে
এ মর্ত্তভূমি তব এতই সুন্দর!"

* * * *

"সকলি ডুবায়ে দিব, ও আদর্শ বক্ষে নিব,
হৃদয়ে অঙ্কিত করি আলেখ্য মহান্;
প্রেমের ভিখারী আমি, প্রেম-রাজ্যে তুমি স্বামী
ও প্রেম-সাগরে ডুবি লভিব নির্ব্বাণ।"

বাস্তবিকই—

"চিত্ত যদি স্থির হয়, গৃহ বন কিছু নয়,
আঁধারে আলোকে জ্যোতিঃ সম সমুজ্জ্বল।"

* * * *

"চিত্ত শুধু ত্যাগ চায়, আর কিছু নাহি তার,
এ ত্যাগে সুগম পথ প্রেমনিকেতন।"

এইখানেই প্রেম বিকাশের চরম ; পরে ভক্তির অবতারণা। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—কবি কি ইচ্ছা করিয়া, তাঁহার কাব্যের উদ্দেশ্য সাধনার প্রথমে হরিদ্বার হিমাচল করিয়া শেষে কাশী, পুরী মালাবার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলেন, অথবা কি ভূগোল মতে ঐ সকল স্থানের অবতারণা করিয়াছেন? ইহার উত্তর অবশ্য কবি দিবেন। তবে আমার মতে এরূপ করাই সমীচান হইয়াছে। যখন কোন ব্যক্তি সর্ব্ব-প্রথমে নিজের সত্বার অনুভব করে, যখন প্রথম প্রথম সংসার তাহাকে দংশন করিতে থাকে, তাহার তখন কি মনের ভাব হয়? প্রথমে দুঃখ পরে নৈরাশ্য, তৎপরে 'মরিয়া' এই ভাব যথাক্রমে আসে ; তখন মানব ব্যতীত সবলকেই ভাল লাগে, তখন গৃহে মন লাগে না ; এই সময় মন একটী মৃত্তিকা তালের ন্যায়—তখন তাহাকে যে ভাবে ইচ্ছা গঠিত করা যায়। এমন সময়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারী ; সৌন্দর্য্যের উপাসনা হইতে ক্রমে প্রকৃতি প্রেম, এবং তৎপরে বিশ্বপ্রেম। একবার মন বিশ্বপ্রেমে ভিজিলে তখন আর তাহাতে সংসারের দাগ বেশী পড়ে না, তখন সহজেই ভগবৎ-প্রেম অঙ্কুরিত হইতে পারে। তখন গীতার শিক্ষা ধারণা করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন সংসারে থাকিয়া বিশ্বেশ্বরের ধ্যান করিয়া সংসার করিবার ক্ষমতা আইসে—তখন চিত্ত সংযত। এইজন্যই এই গ্রন্থে ক্রমান্বয়ে ঐ ভাবে মনোবিকাশের ক্রমোন্নতি দেখাইয়া এখন কবি আমাদের কিঞ্চিৎ ভক্তি-যোগের আভাষ দিতে চাহেন—এবং অবশেষে বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব বিরাম মন্দিরের কীর্ত্তি গাহিতে চাহেন।

আমরা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কাব্যখানির বিশ্লেষণ করিলাম। এক্ষণে কাব্য-মধ্যে অন্যান্য উক্তিযোগ্য কোন্ কোন্ বিষয় আছে, সংক্ষেপে তাহাদের উল্লেখ করিব।

পুস্তকের ৬৩ পৃষ্ঠায় হিন্দুকবি কাশীধামের কি শান্তিময় পুণ্যের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা সকলেরই বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করা উচিত। ৯১পৃষ্ঠায় সৌন্দর্য্যের ধ্যানটী অতীব মনোরম, এবং ১৬পৃষ্ঠায় বর্ণিত স্বামীমাহাত্ম্য অতীব উচ্চ অঙ্গের হইয়াছে।

ভাষাগত কিছু কিছু সামান্য ত্রুটী আছে, ও ৬৫ পৃষ্ঠায় অনর্থক ধর্ম্মদ্বেষ [illegible] হইয়াছে, এই সকলগুলি পরিহার করিলে, পুস্তকখানি অতীব হৃদয়গ্রাহী হয়। আমরা লেখকের দীর্ঘায়ু কামনা করি, এবং আশাকরি ঐরূপ অপরাপর

প্রকৃতি ও প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে বাঙ্গালীর চির-আদরের বিরাম-মন্দিরের মাহাত্ম্য উল্লেখ করিয়া এই দীর্ঘ সমালোচনার উপসংহার করিব:—

"এ কি জুড়াবার স্থল,　　তুষার হিমানীজল,
শ্রান্তির সুখদ-শয্যা নিশীথ-শয়নে ;
এ কি জীবনের গেহ,　　পুরিত বিমল স্নেহ,
সমীর দুলায় পাখা মধুর বিজনে !

এই সেই নদীকূল,　　কনক চম্পক ফুল,
মদির সৌরভে চির বসন্ত বিকাশে ;
এই সে প্রাচীন বট,　　ভগ্ন জরাজীর্ণ মঠ,
বকুল-সেফালী-কুঞ্জে ঝরিছে বাতাসে।

সারা জীবনের স্মৃতি,　　মধুর প্রণয় গীতি,
বিজড়িত জন্মান্তের অমৃত বল্লরী ;
জরাজন্ম মৃত্যুহরা,　　সুন্দরে সুন্দরীতরা,
যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি ছায়ারূপ ধরি।

ভ্রমিলাম বহুদেশ,　　স্বর্গ-চিত্র অবশেষ,
হে শ্যামা-প্রকৃতি তব মুখ কি শোভার ;
তোমার কোমল বুক,　　ধরে কি সান্ত্বনা সুখ,
এ-প্রাণ-বিরামভূমি কোথা আছে আর !

বেরি-বেরি।

তৃতীয় প্রস্তাব।

লেখক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ রায় সেনগুপ্ত।

ইতিপূর্ব্বে বেরি-বেরি যে শোথ রোগই তাহার যথেষ্ট প্রমাণাদি দেখাইয়াছি। এবং একই সময়ে বিভিন্ন প্রকৃতির বহু লোকের কেন এ রোগ হইতেছে তাহারও কারণাদি দেখাইয়াছি। তৎসত্ত্বেও বেরি-বেরি শোথজাতীয় হইলেও এলোপাথ ডাক্তার ইহাকে একটা সম্পূর্ণ নূতন রোগ বলিতে ছাড়িতেছেন না। আমার সহিত

অনেকগুলি প্রাচীন এবং নবীন ডাক্তারের এ সম্বন্ধে তর্ক ও যুক্তি-প্রদর্শন চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, বেরি-বেরিতে যদিও ওডিমা (শোথ) হয় বটে, তথাপি সেটা একটা উপদ্রব মাত্র; বেরি-বেরিতে নূতন নূতন কত রকমের লক্ষণ ও উপদ্রব হইতেছে, কেবল শোথ-রোগে সে সকল পাওয়া যায় না। ইত্যাদি—তদুত্তর এই যে, এতদিন যাবৎ আমরা যে শোথ রোগের (Dropsy) চিকিৎসা করিয়া আসিয়াছি, পূর্ব্বাপর ডাক্তার কবিরাজেরা যে সকল শোথ রোগী দেখিয়াছেন, তাহার প্রায় সমস্তই, যকৃতেরদোষ. হৃদ্রোগ বস্তি-দোষ অথবা রক্তহীনতা জন্য পুরাতন রোগগ্রস্থ রোগীদিগের শোথ। এখন বেরি-বেরিতে (Epidemic dropsy) তদতিরিক্ত আরও অনেক উপসর্গ বর্ত্তমান হইতেছে বলিয়াই কি এ শোথকে একটা নূতন ব্যাধি বলিব? ডাক্তারী-বিজ্ঞান তুলনায় আয়ুর্ব্বেদীয় বিজ্ঞানাপেক্ষা অনেক নব্য। ডাক্তারী বিজ্ঞানে বেরি-বেরির লক্ষণ নাই বলিয়া, যখন আয়ুর্ব্বেদে সেই সকলের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন ইহাকে নূতন রোগ কি করিয়া বলি? ডাক্তারেরা ইহাকে যে রোগই বলুন, আমরা কিন্তু শোথই বলিব। ডাক্তার মহাশয়েরা (তাহাদের মতে) একটা করিয়া নূতন উপদ্রব পাইতেছেন, আর বলিতেছেন, ইহা বেরি-বেরি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি নিদান হইতে মাত্র সাধারণ লক্ষণগুলির উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে এলোপাথগণের এবং সাধারণের অবগতির জন্য শোথের যাবতীয় লক্ষণ এবং মারক উপসর্গাদির লক্ষণ সংহিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

তত্র বাতশ্বয়থুররুণ রুক্ষো বা বৃদ্ধ্যনবস্থিত তোদাদয়শ্চাত্রবেদনা বিশেষঃ। সুশ্রুতঃ

"বাতাচ্ছোফশ্চলোরুক্ষঃ খররোমারুণাসিতঃ।
সংকোচ স্পন্দহর্ষার্ত্তি তোদভেদ প্রসুপ্তিবান্॥
ক্ষিপ্রোত্থানশমঃ শীঘ্র মুন্নমেৎ পীড়িতস্তনুঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণমর্দ্দনৈঃ শাম্যোরত্রোদরো দিবা মহান্॥
ত্বক্‌চ সর্ষপ লিপ্তেব তস্মিন শিচিমিচিয়তে॥" বাগভটঃ

বাতিক শোথের স্থান কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণ, কোমলস্পর্শ, রহিয়া রহিয়া কমে বাড়ে এবং তোদান্বিত (সূচি বেধনবৎ যন্ত্রণাদি) হইয়া থাকে। ইহা সচল, রুক্ষ খরস্পর্শ, রোমাঞ্চযুক্ত অরুণবর্ণ, কখন উহাতে ঝি ঝি ধরামত কখন সূচিবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়, এবং ঐ স্থানের স্পর্শজ্ঞান কমিয়া যায়। ইহা অতি শীঘ্র শীঘ্র উৎপন্ন ও বিস্তৃত হয়। অল্প চেষ্টাতেই উপশম প্রাপ্ত হয়; স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ তৈলাদি মর্দ্দন ও তাপ দিলে কমিয়া যায়; ইহা দিবসে বৃদ্ধি পায় ও রাত্রে কমে, শরীরের (শোথ স্থানের) ত্বক চকচকে হয় এবং ঐ স্থান সড়্‌সড়্ করে।

পিত্তশ্বয়থুঃ পীতোরক্তো বা শীঘ্রানুসার্য্যোষ-চোষাদয়শ্চাত্র বস্তা বিশেষঃ। সুশ্রুতঃ

পীত রক্তাসিতভাসঃ পিত্তাৎ.........

সতৃড় দাহ জ্বর স্বেদদবক্লেদ মদভ্রমঃ।

শীতাভিলাষী বিড়্ভেদী গন্ধী স্পর্শাসহামৃদুঃ॥" বাগ্‌ভটঃ

পৈত্তিক শোথে শোথস্থান পীত বা রক্তবর্ণ হইয়া উঠে এবং শীঘ্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে ঐ স্থান সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে। এবং চোষণবৎ বেদনা অনুভূত হয়। রোগী তৃষ্ণা দাহ জ্বর ঘর্ম্ম ক্লেদ মত্তা ও ভ্রমযুক্ত হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদা শীতল দ্রব্যের অভিলাষী হয়; শোথ স্থান দুর্গন্ধি ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত স্পর্শদাহ হয় এবং রোগীর উদরাময় হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মাশ্বয়থুঃ পাণ্ডু শুক্লো বা স্নিগ্ধ কঠিনঃ শীতোমন্দানুসারাঃ কণ্ড্বাদয়শ্চাত্র বেদনা বিশেষঃ। সুশ্রুতঃ।

কণ্ডুমান্ পাণ্ডুরোমত্ব কঠিনঃ শীতলোগুরুঃ।

স্নিগ্ধঃ শ্লক্ষ্ণস্থিরঃ স্থানো নিদ্রাচ্ছর্দ্দ্যগ্নি স্বাদকৃৎ।

আক্রান্তো নোন্নমেৎ কৃচ্ছ্রা সমজন্যা নিশাবলঃ।

... ... স্পর্শোষ্ণ কাঙ্ক্ষীচ কফাৎ॥ বাগ্‌ভটঃ

শ্লৈষ্মিক শোথস্থান পাণ্ডু বা শ্বেতবর্ণ শীতলস্পর্শ কঠিন হইয়া অতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় রোগীর প্রায় শীত করে। চুলকনা প্রভৃতি গাত্রে নির্গত হইয়া থাকে; শোথ স্থান চুলকায় কুট কুট করে; শোথ স্থান ঈষৎ উন্নত, কঠিন, স্নিগ্ধ স্পর্শে স্থির এবং ভারী হয়। নিদ্রা বমি ও অগ্নিমান্দ্য ইহার আনুসাঙ্গিক উপদ্রব। এই শোথ রাত্রে বৃদ্ধি পায়; রোগী উষ্ণস্পর্শ দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা করে।

বিষ নিমিত্তস্তগরোপ যোগাৎ দুষ্ট তোয় সেবনাদিনা সতু মৃদুঃ ক্ষিপ্রোত্থানো হ্বলীচলো বা দাহ পাক প্রায়শ্চভবতি। সুশ্রুতঃ।

বিষজশ্চ ... ...শীঘ্রদাহ রুজাকরঃ। বাগ্‌ভটঃ

বিষ নিমিত্ত শোথে (যাহা গরযোগে দুষ্ট তৈলাদি পান হেতু উৎপন্ন হইয়া থাকে) শোথ স্থল মৃদু হয়, ঈষৎ ফুলিয়া উঠে, অথচ শোথ শীঘ্র বলবান হয় না, ইহা ক্রমশঃ দেহে সঞ্চারিত হয়; প্রায়ই এ শোথে জ্বালা হয় এবং শোথ স্থানের পাক হয়।

অভিঘাতেন··· ...শ্চাদ্বি সর্পবান্।

ভূশোষ্মা লোহিতাভাসঃ প্রায়শঃ পিত্ত লক্ষণঃ॥ বাগ্‌ভটঃ

অভিঘাতজ শোথে বিসর্পরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং শোথস্থান ঘোর রক্তবর্ণ উষ্ণ এবং পিত্ত শোথের লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

এখন বেশ ধীরভাবে ও সমবিহিতচিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখুন যে অধুনাতন বেরি-বেরিতে ইহার অধিক আরও অন্য অন্য লক্ষণ কি কিছু দেখা যাইতেছে? বেরি-বেরিতে সদাই অজীর্ণ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে; বস্তুতঃ অজীর্ণ না হইলেও শোথরোগ হওয়া সম্ভব নহে, ইহাও বৈদ্যক শাস্ত্রে উক্ত আছে, কাজেই ইহাও একটা নূতন কথা নহে। যথাঃ—

অজীর্ণিনা বা, গ্রাম্যধর্ম্ম সেবনাৎ, বিরুদ্ধাহার সেবন াৎ......শ্বয়থু মাপাদয়ন্ত্যাখিলে শরীরে। সুশ্রুতঃ

নানারূপ বিরুদ্ধাহার বশতঃ অজীর্ণরোগের সমস্ত শরীরে শোথ উৎপন্ন হয়, ঐরূপ অজীর্ণের উপর অধিক রত্যাসক্ত লোকেরও শোথ হইয়া থাকে।

বেরি-বেরিতে অতিসার হাঁপানি, দৌর্ব্বল্য পিপাসা প্রভৃতি কতকগুলি দুষ্টলক্ষণ বা উপদ্রব হয় দেখিয়াই ডাক্তারেরা ইহাকে একটা পৃথকরোগ অথবা নূতন উপদ্রব বিশিষ্ট এপিডেমিক ড্রপসি বলেন, কিন্তু এসকল উপদ্রবও নূতন নহে, তাহা কি কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন। দেখুন শোথের অরিষ্ট অর্থাৎ প্রাণনাশক লক্ষণের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদে ইহাদেরও উল্লেখ হইয়াছে; সংহিতাকারগণ স্পষ্টাক্ষরে ঐ সকল উপদ্রবের কথা লিখিয়া গিয়াছেন;—

শ্বাস. পিপাসা দৌর্ব্বল্যং জ্বরচ্ছর্দ্দি রয়োচকঃ।
হিক্কাতিসার কাসশ্চ শূলং সজ্কেপয়ন্তি হি॥" সুশ্রুতঃ

শ্বাস, (High Respiration) পিপাসা, দৌর্ব্বল্যজ্বর, বমি, অরুচি, হিক্কা, অতিসার এবং কাশ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগীকে নাশ করে। এখন মিলাইয়া দেখুন যে বেরি-বেরিতে ইহা অপেক্ষা আর কি নূতন কিছু আছে? বেরি-বেরিতে এখন যাহা কিছু উপদ্রব বা লক্ষণ দেখা দিয়াছে এবং রোগের প্রাবল্য সহকারে ভবিষ্যতে আরও যাহা কিছু হওয়া সম্ভব তৎসমস্তই আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ শোথরোগের মধ্যে বহুকালপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া তাহাদের গভীর গবেষণার জলন্ত প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। অতএব বেরি-বেরি যে একটা নূতন রোগ নহে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দর্শিত হইল। *

---

* লক্ষণ বুঝা গেল, প্রতিকারের উপায় কি? আমরা অনুরোধ করি, কবিরাজ মহাশয় উপযুক্ত মুষ্টিযোগ চিকিৎসা ও পথ্যাপথ্যের বিষয় একটু পরিস্কার করিয়া লিখিয়া সাধারণকে উপকৃত করিবেন। সম্পাদক।

জয়কৃষ্ণ দাস।

লেখক—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে বাঙ্গালা সাহিত্যে বহুল বৈষ্ণব-কবির পরিচয় পাওয়া যায়। ন্যূনাধিক শতবর্ষকাল যেন একটানা রহিয়াছিল—বৈষ্ণব কবি ও বৈষ্ণবকাব্য গণিয়া সংখ্যা করা যায় না, অনেকের নাম আছে, অনেকের নাম কালের স্রোতে ডুবিয়া গিয়াছে। যে গুলি থাকিবার মত সে গুলি আছে, যে গুলি না থাকিবার সে গুলি নাই। বৈষ্ণবসাহিত্য বাঙ্গালাভাষায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে—শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এদেশের তদানীন্তন বিদ্বজ্জন সমাজে সংস্কৃতভাষার সমাদর বেশী ছিল। যাহা কিছু জানিবার শুনিবার বুঝিবার তাহাই সংস্কৃত-ভাষায় লিপিবদ্ধ হইত—তৎকালীন শিক্ষিতেরা বাঙ্গালা ভাষার, বড় আদর করিতেন না। এমন কি, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত কথোপকথনে সাধ্যপক্ষে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতেন, গ্রাম্য শব্দ উচ্চারণে রসনাকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের অনাদরে বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃত জনের কণ্ঠে অবস্থিতি করিত—শাস্ত্রীয় কথার আলোচনা তাহাদের শোভা পাইত না। তাহাতে শিক্ষিতগণেরই অধিকার ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব যখন তাহার ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজন হইল। দেশের মধ্যে তখন কত লোক সংস্কৃত বুঝিতেন যে, সংস্কৃত ভাষায় সে সকল কথা লিপিবদ্ধ হইলে, সম্যক তাহা আয়ত্ত করিতে পারিবে। সুতরাং সংস্কৃত তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনোপযোগিনী হইল না, ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলে যে ভাষা সর্ব্বদা ব্যবহার করে তাঁহাকে তাঁহারই আশ্রয় লইতে হইল, অধিকাংশ গ্রন্থই প্রাকৃত-জনের ভাষায় রচনা করিতে হইল, তাঁহার পার্ষদগণ সকলেই তাহা অবলম্বন করিলেন। যে ভাষা লোক শিক্ষার উপযোগিনী তাহারই আশ্রয় লইতে হইল, নূতন ধর্ম্মে নূতন নূতন গ্রন্থ প্রণীত হইতে লাগিল, প্রার্থনা, ভজন, স্তব স্তোত্র যাহা কিছু সাধারণ লোককে শিখাইবার প্রয়োজন হইল, তাহাই বাঙ্গালা ভাষায় রাশি রাশি বৈষ্ণবগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া গেল—বাঙ্গালা ভাষার বিলক্ষণ পুষ্টি জন্মিল। উহার শ্রী-ছাঁদ ফুটিয়া উঠিল ক্রমশঃ বহুবিধ অলঙ্কারে অঙ্গশোভা বৃদ্ধি পাইল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের শক্তি বিষয়ক কাব্যও এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। সময়ের প্রয়োজন মত সুকবিরও আবির্ভাব হইতে লাগিল, এতদিন তাহারা যেন লোকান্তর অপেক্ষা

আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই তাহার অনুবর্ত্তিতা অবলম্বন করিলেন। বৈষ্ণব কবিগণের কবিতা বড়ই মধুর। যারপরনাই চিত্তোন্মাদিনী, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতের কবিপ্রসিদ্ধির অনুবর্ত্তিতা হেতু আপনাদের৹ কাব্যকে একঘেয়ে করিয়া তুলিয়াছেন। মানময়ী রাধিকা মানভরে সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরাগ প্রকাশার্থ—"কাল বসন পরিব না, কাল কোকিল দেখিব না, নীল আকাশে চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইব, কাল তমাল গাছে চন্দন লেপিব ;" ইত্যাদি একই ভাবের কথা কহিয়াছেন দেখিতে পাই। নিরপেক্ষ পাঠকের পক্ষে ইহা প্রীতিকর হইতে পারে না। একজন কবির মানভঞ্জন পড়িয়া অন্যের মানভঞ্জনে নূতন কিছু খুজিয়া মিলে না। কিন্তু আমাদের প্রবন্ধোক্ত বৈষ্ণব কবি সে দোষে ততটা দূষিত নহেন। তাঁহার কবিতায় অনেক নূতনভাব, নূতন অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। পদসমুদ্র পদকল্প লতিকা, পদ কল্পতরু প্রভৃতি মহাজনী পদের যে সকল সংগ্রহ গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে জয়কৃষ্ণ দাসের পদাবলীর সংখ্যা বড়ই কম। আমরা বহু যত্নে তাঁহার "রসকল্পলতা" নামক একখানি কাব্য পাইয়াছি, তিয়াশিটী পদ আছে। সকল পদই যে নূতন রসে নূতন ভাবে ভরা আমরা এমন কথা বলিতে পারি না।

নিম্নোক্ত শ্লোকে কবি গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন ;—

কাননে কালিয়া জলদ কাঁতি,
অবল চপলা চমকে ভাতি,
ইন্দ্রক ধনুকিয়ে ময়ুর কি চান্দ ;
হৃদয়ে বিজয়ন্তী মালেরে।
মুকুতা দাম হীরক সুপাঁতি,
মুরলী নাজন কতেক ভাতি,
ময়ুর নটক পেখল সারি।
দাহুরী কিঙ্কিনী জালরে।
শারদ চন্দ্রমা বিপিনে সাজে,
বরিষে অমিয়া মধুর বোল,
নয়ন চাহনি ভোররে।
দুর্দ্দৈবপবন উদয় ভেল।
চাতক পিয়াসে মরিয়া গেল,

সখীর মাঝে সভুত বাই ;
পড়িলা ললিতা কেরে রে।
দারুণ বিরহ পরম ভেল,
মরমে মরমে পশিয়া গেল,
বিরলে বসিতে ভাবনা-সিন্ধু,
হায় রসিক চান্দরে।
সে দিঠি রঙ্গিম ভঙ্গিম ঠাম,
দশন সুচারু কুন্দ দাম,
মধুর মাধুরী সুচারু গন্ধ,
জয়কৃষ্ণ মন বান্ধহি রে॥

শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বালকগণের সহিত গোষ্ঠে গমন করিতেছিলেন, শ্রীরাধিকা তাঁহাকে পথিমধ্যে দর্শন করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হয়েন। এতদ্দ্বারা কবি দ্বিতীয় শ্লোকে উভয়ের পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

বনে গেলা বিনোদিয়া কানু,
কিবা সে বিনোদ চুড়া,
বরিহা পরাণ উড়ে।
অধরে মধুর বাজে বেণু।
বেড়িয়া রাখালগণে,
ধেনু লঞা গেল বনে,
বনচর বড় ভাগ্যবানে,
করে হরি দরশন,
আনন্দিত তনু মন,
ভ্রমর কোকিল করে গানে।
যমুনার তীরে তীরে,
কলুষিত তরু বরে,
ফুলে ফুলে বিকশিত ভেল।
অনেক তপের ফলে,
হরিপদ সেবা মিলে,
অবহেলে পদরজ পাল্য। *

ধন্য সুখময় ধাম,
বৃন্দাবন যার নাম,
ধন্য ধন্য স্থাবর জঙ্গম,

* পাল্য—পাইল।

সখীগণ সঙ্গে করি,
গান করে সে মাধুরী,
গলাগলি দারুণ রোদন,
আপন দুর্দ্দৈব দিন,
বিধি কৈলা ভাগ্যহীন,
গেগ্যা বনে দেখিতে না পাই।
জয়কৃষ্ণ দাস ভণে,
হেরিয়া রাধার পানে,
চিন্তা কেন তোমার কানাত্রি॥

শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে রাধিকা কৃতকৃতার্থ—সাধারণ নায়িকার ন্যায় ব্যাকুলতা নহে, ভগবদ্ভক্তিতে বিভোর হইয়া তাঁহার কৃপাকাঙ্ক্ষিনী। উপরি উক্ত শ্লোকে কবি স্পষ্টতঃ তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

রাধিকা প্রেমার্থিনী—সুতরাং পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন জন্য বিহ্বলা, কাজেই সুস্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহার দর্শন-সুখলাভলালসায় জল আনিবার ব্যপদেশে কলসী কক্ষে তিনি কালিন্দীকূলে উপস্থিত হইলেন। সেখানে পরস্পর সাক্ষাৎকারে উভয়ের পরম পরিতোষ লাভ হইল বটে, কিন্তু ক্ষণেকের অদর্শনে শ্রীরাধা অধীরা হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি অট্টালিকাশিরে আরোহন করিয়া গোপ-বালকগণে-পরিবেষ্টিতা শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমন করিতে দেখিলেন বটে, কিন্তু নয়নের অন্তরালমাত্র পূর্ব্ববৎ অধীরা। রজনীযোগে তিনি উৎক ণ্ঠিতা—তাহা হইবারই কথা—ভগবৎ-প্রেমে যাঁহার মন একবার মজে তাঁহার আর পার্থিব বিষয় বৈভবে আসক্তি থাকে না। কেহ কেহ উন্মাদের ন্যায় তাঁহাতেই আবিষ্ট হইয়া অনন্যকর্ম্ম হইয়া উঠেন। কানাইয়ালালকে না দেখিয়া শ্রীরাধিকা উন্মাদিনী তাঁহার অশান্তিময়—সংসারের কোন. কাজে তিনি মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না চঞ্চলতা মনের একটী প্রধান ধর্ম্ম শ্রীরাধার মন স্বধর্ম্ম প্রযুক্ত বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত বলিয়া তিনি বংশীকে নিম্নোক্ত প্রকারে তিরস্কার করিতে লাগিলেন ;—

সখী—জাতি কুল শীলে ভরম ভাঙ্গিয়া দিলে
হেনই ডাকাতিয়া বাঁশী।
বাঁশ ঝাড়ে তার জন্ম, ছিদ্রজালে পরিপূর্ণ,
কৃষ্ণাধরে খায় সুধারাশি॥
— সেই অহঙ্কার ধরে, মোর নাম গান করে,
বাউলী করিলা গুরুমাঝে।

কি করিতে কি না করি, ধৈরয ধরিতে নারি,
দূর কৈল যত লোক লাজে ॥
ঘুচায় নীবিবন্ধ, কৈতুকী বিষম কন্ধ,
কত রঙ্গ প্রকাশিয়ে সেই।
প্রবেশ করিল কাণে, তাপিত হইল প্রাণে,
পরিহাসে মন হরি লেই ॥
যখন রন্ধনে থাকি, বাজে রাধা নাম ডাকি,
বিপরীত রন্ধনেতে করে।
জয়কৃষ্ণদাস ভণে, হেরিয়া রাধার পানে,
কৃষ্ণদূতী বুঝহ অন্তরে ॥ ১০

একান্ত কৃষ্ণানুরাগী শ্রীরাধিকা গুরুজনলজ্জা ভয়েই যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীকে ভৎসনা করিয়াছিলেন, তদন্যথায় বংশীর অপর কোন দোষ ছিল না। বংশীধ্বনি শ্রুতিমধুর হইলেও লোকলজ্জাভয়ে তাহা রাধিকার গঞ্জনীয়।

ক্রমে আর তাঁহার সংসার ভাল লাগিল না, বৈরাগ্য জন্মিল সে সংসারে থাকিয়া অহর্নিশ কৃষ্ণধ্যান, কৃষ্ণজ্ঞান সার করিতে পারিল না, তাঁহার সংসারের প্রয়োজনীয়তা বোধ লুপ্ত হইল, শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাহার গুরুজন গঞ্জনায় ভয় রহিল না। তিনি স্থির করিলেন,—

পূরবী।

কানুক কলঙ্ক ভূষণ পরিয়া
যোগিনী হইয়া যাব।
জাতি শীল কুলে তিলাঞ্জলি দিয়া
নবরূপ ধিয়াইব ॥
এ ঘর করণ, কিসের কারণ,
সকলই মিছাই বন্ধ।
শয়নে স্বপনে কিবা জাগরণে,
পরমে গোকুল চন্দ্র।
ভাবিতে ভাবিতে আন নাহি চিতে,
সদাই গুমরি মরি।
এবে যৌবন গেল অকারণ,
কি করিতে কি না করি।

অন্নজল আর সবে ভেল দূর,
ঔষধ শ্রমান মোর।
জলদ লোচন রাতুল চরণ
জয়কৃষ্ণ দাস ঝোরে॥ ১১

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার আসক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বিরহাগ্নি তার বনে জ্বলিয়া উঠিল, অতঃপর তিনি অভিসারিকা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা হইবার জন্য যাত্রা করিলেন, অনুরাগিনী শ্রীরাধিকার মনোভাব বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণও নিশ্চিন্ত নহেন, শ্রীরাধিকাকে দর্শন দিবার জন্য তিনিও অগ্রগামী। পথিমধ্যে উভয়ের শুভ সাক্ষাৎকার রাধিকা অনেক কষ্টভোগ করিয়াছেন, দুশ্চিন্তার তাড়নায় অনেকবার উৎপীড়িত হইয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার মিলে নাই, সেই দুঃখ হইল—অভিমান আসিল—তিনি বিমুখী হইলেন, ফিরিয়া গৃহগমন করিলেন, ইহাতে রাধাপ্রেমপ্রয়াসী শ্যাম কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। তাহার পর শ্রীকুঞ্জে তাঁহাদের উভয়ের শুভসম্মিলন হইল। প্রণয়ীযুগল উভয়েই পরিতৃপ্ত লাভ করিলেন।

বৃন্দাবনবাসিনী গোপিনী মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণানুরাগিনী—সকলেরই কৃষ্ণপ্রেম উদ্বেলিত, সকলেই যে তাঁহার সমান অনুগ্রহলাভে কৃতার্থ হইতে পারিয়াছিলেন, এমন নহে, রাধিকা ও চন্দ্রাবলীই সমধিক সৌভাগ্যভাগিনী ছিলেন, নিশাশেষে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জেতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, শ্রীরাধিকা তাঁহার মিলনাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া আপন বাসগৃহ সুসজ্জিত করিয়া সমস্ত নিশা উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত করেন, সে কথা অপ্রকাশ রহিল না, ক্রমে শ্রীরাধিকার কর্ণগোচর হইল, শুকমুখে এই সংবাদ তাঁহার মনকে চঞ্চল করিল, তিনি মানিনী হইয়া বসিলেন ;—

দুর্জ্জয় মানিনী রাধা,
শ্যামা সখীক দূরহি তেজল,
উপজল দারুণ বাধা।
ভ্রমরক নাদ নাদ পিককুল
শ্রুতিপথে পরশ নপূর।
স্তনযুগ ঘন চন্দনে লেপই,
লোচন কালর দূর॥
চারু চিবুক'পর মৃগমদ তেজল,
তেজল নীলিমা হাস।

অম্বরে জলধর তাহা নাহি লেখই
লুটাঞ্চলে বদন বিকাশ॥
তমাল তরুবরে চুণ লেপায়ল,
ক্রোধহি পরিপূর অঙ্গ।
শ্যামরু দূতী প্রতি ভয় ভীত অন্তরে,
বচন না করু ভঙ্গ।
দুতেহি দূত চলু মিলনি শ্যামরু,
দারুণ দারুণ মান।
জয়কৃষ্ণ দাস বোল সুমধুর,
আলেসি ধারহ কান॥ ২৬

সাতটী পদে বা কবিতায় শ্রীরাধার দূতী তাঁহাকে মান পরিহার জন্য বুঝাইল, শ্রীরাধার দারুণ মান কিছুতেই ভাঙ্গিল না;—দুইটী কবিতা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম;—

রাগ দেশা।

শুনহ সুন্দরী রাধা,
গোকুল চাঁদহি মোহে পাঠায়ল,
তেজহি মানকি রাধা॥
সে বর নাগর গুণের সাগর,
জগজন প্রাণহি প্রাণ।
সোমুখ মাধুরী বচন চাতুরী,
রূপ ভরি গুনীগণ গান॥
পশু পাখী নর মানি দরশনে,
মৃতবৎ অঙ্কুর হোয়।
আপনক ভাগী, মানহি সুন্দরী,
প্রসন্ন নাগর তোয়॥
তোহারি নাম গুণ সদত রট ত হি,
তুহু তাহে পরম সোহাগী।
মানহি তেজল, দুতি পর বোধয়ে,
জয়কৃষ্ণ দাস অনুরাগী॥ ২৭

রাগ কামোদ।

দূতী বলে শুন রাধে, নিবেদি তব পদে,
তোমার অপেক্ষা ধরি কান।

তরুতলে করি বাস, রাধা রাধা ভাষ,
চর চর অরুণ নয়ান ॥
পুলক কদম্ব অঙ্গ, ক্ষণে ধরে কত রঙ্গ,
দশদিক করয়ে নিহার।
ক্ষণেক রোদন করে, ক্ষণে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
মুরছি পড়য়ে বার বার ॥
বাউলীর প্রায় হৈয়া, ইতি উতি যায় ধেয়া,
ক্ষণে স্থিরে আত্ম নিন্দা করে।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ কায়, রজকী বহিয়া যায়,
মিলাইয়া দেহ দুতী মোরে ॥
এ সব প্রলাপ করে তুমি মান কর দুরে,
অতি ঝাট করহ পয়ান।
শুনিয়া এ সব কথা, চলিলা রাধিকা তথা,
জয়কৃষ্ণ দাস রসগান ॥ ৩০

দূতী এত যত্ন করিল, এত বুঝাইল, কিছুতেই শ্রীরাধার মন ফিরিল না—এই মানের অবস্থাতেই দারুণ বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল, এই বিচ্ছেদ বহুদিন ব্যাপী—মথুরা হইতে অক্রূর বৃন্দাবনে আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মধুপুর যাত্রা করিলেন। একথা বৃন্দাবনের সর্ব্বত্রই সকলেই শুনিল। শ্রীরাধার মান দূরে গেল, ব্যথিতহৃদয়ে ব্যাকুলপ্রাণে তিনি বলিতে লাগিলেন ;—

কাঁহা তুমি যায়বে, তুহে নব নাগর,
বিরহ আনন্দে মোরে ভারি।
তোমারি বদন চাঁদ দরশন হু যব,
তব হাম মরণ বিচারি ॥
রহ রহ মন্দির মাঝে।
রসময় ময়ের প্রেম সুধাকর,
কোরে বল্লভ ব্রজমাঝ ॥
অরুনহি লোচন, করুন চাহনি,
লোরহি কত শত ধার।
বোলত গদ গদ, মধুরিম সুন্দরী,
তো বিনু কো আশু আর ॥
বিরহিনী শ্বসিত শ্বসিত ঘন ঘন,
সম্মিত অধরহি নাঞি।
কম্পহি কম্পিত পুলক মুকুলিত,
জয়কৃষ্ণ দাস মুরছাই ॥ ৩৫

বৃন্দাবনের গোপাঙ্গনাগণ কেহই সুস্থির নহে, সকলেই আকুল মনে, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল—মথুরা যাত্রা কালে শ্রীরাধিকা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের রথচক্র ধরিলেন, অক্রুর স্বয়ং রথচালনা করিতেছিলেন—সে বাধা মানিলেন না, মথুরাভিমুখে রথ চালাইয়া দিলেন—গোপিনীগণ ধুলায় লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন—হাহাকার শব্দে বৃন্দাবন পরিপূর্ণ হইল, বৃন্দাবনবাসী নরনারী, পশুপক্ষী অন্যান্য জীবজন্তু যেন সকলেই বিপন্ন—বনে পশু চরে না, গাছে পাখী গায় না, ভ্রমর গুঞ্জরে না, মধুপ মধুপান করে না—কীট পতঙ্গাদি জীবজন্তু সকলেই বিষম শোকাচ্ছন্ন। এইখানেই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার সমাপন। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ আর ব্রজভূমে প্রত্যাগমন করেন নাই।

দৈব-নিগ্রহ।

দৈবনিগ্রহে গত কয়েক বৎসরাবধি পুনঃ পুনঃ পারিবারিক দুর্ঘটনায় মর্ম্মাহত হইয়া আমরা দিন দিন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। যিনি সংসারের সার যাঁহা হইতে জগৎ দর্শন, সেই পরমারাধ্যা জননী আমাদিগকে সংসার ঘূর্ণনে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন!—মাতৃবিয়োগ,—মাতৃবিয়োগ যে কি অসহ্য শোক স্বজ্ঞানে যাঁহারা মাতৃহারা তাঁহারাই তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন। সেই ভীষণ বজ্রপাতের পর উপর্য্যুপরি দুইটী শিশু-সন্তান বিয়োগ; সেই সকল দুর্জ্জয় শোকের লাঘব হইতে না হইতে সম্প্রতি আবার এক নিদারুণ শোক-শেল আমাদের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে। সংসারে আমাদের একটী মাত্র স্নেহময়ী সহোদরা ভগ্নী ছিলেন, একটী পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি এই মায়াধাম পরিত্যাগ করেন, তাঁহার সেই পুত্রটী আমাদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া ইতিপূর্ব্বেই পরলোকে গমন করিয়াছেন, তাহার সেই ভগ্নীটি স্মরণের আশারূপিণী হইয়া জীবিতা ছিলেন, বিগত ৪ঠা অগ্রহায়ণ শনিবার রাত্রি ৪টা ১০ মিনিট সময় আমাদের সেই স্নেহময়ী ভাগিনেয়টী অকালে অতি অল্প বয়সে ইহজন্মের মত নয়ন মুদ্রিত করিয়াছে, সেটী আমাদের বড় আদরের ধন ছিল, সুশীলা, প্রিয়ম্বদা, সৌভাগ্যশালিনী, মধুরভাষিণী, বিদ্যাবতী, ততগুলি সদগুণে সেই আদরিণী কন্যাটী বিভূষিতা ছিলেন, সেই কারণেই তাহার প্রতি আমাদের অধিক আদর। অকস্মাৎ

সেই আদরিণী কন্যাকে হারাইয়া আমরা আত্মহারা হইয়াছি; তদবধি সংসারের কোন কার্য্যে আমরা মনোনিবেষ করিতে পারি নাই; দুঃসহ শোকাভিভূত হইয়া সমস্ত বিষয়কার্য্য বন্ধ রাখিয়াছিলাম, সেই কারণে বর্ত্তমান অগ্রহায়ণ মাসের জন্মভূমি প্রকাশ হইতে অসঙ্গত বিলম্ব হইল। মাসের প্রথম দিবসে জন্মভূমি প্রকাশিত হয়, এবারে প্রকাশ হইতে মাসটি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। যাঁহারা সহানুভূতির সম্মান জানেন, আশা করি, তাঁহারা সদয় হইয়া আমাদের এই অলঙ্ঘনীয় ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন। সংসারের শোক, দুঃখ, মোহ, সমস্তই সেই অনন্ত ইচ্ছাময় জগৎপিতার ইচ্ছাধীন, মানুষের নেত্রজল কেবল দুর্ব্বল-হৃদয়ের ক্ষীণতার নিদর্শন মাত্র। কতদিনে যে এই অসাময়িক বিভীষিকা হইতে আমরা নিস্কৃতি লাভ করিব, মঙ্গলময় জগদীশ্বরই তাহা জানেন, তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা পাষাণে বুক বাঁধিলাম। তাঁহার অদৃশ্য শ্রীচরণে প্রণিপাত করিয়া পুনরায় আমরা এই শঙ্কাকুল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম।

সমালোচনা।

সংক্ষিপ্ত গার্হস্থ্য চিকিৎসা বা আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ সংগ্রহ।

সুশিক্ষিত সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন বিদ্যানিধি কবিভূষণ এম, এ, এল, এম, এস, এই পুস্তকের সংগ্রাহক ও প্রকাশক। এই পুস্তকের মূল্য আট আনা মাত্র। ভারতের পূর্ব্ব প্রচলিত মুষ্টিযোগের নাম ও ব্যবহার ক্রমশঃ বিলুপ্ত হওয়াতে দেশবাসীগণের বিশেষ গৃহস্থ লোকদিগের রোগের সুচিকিৎসার একটী প্রশস্ত উপায় বিনষ্ট হইয়াছে। ডাক্তার মহাশয়েরা বোতল বোতল ঔষধ ব্যবহার করাইয়া যে সকল রোগের শীঘ্র উপশম করিতে বিফল মনোরথ হন, হয়ত সামান্ত সামান্ত মুষ্টিযোগে অল্পদিনের মধ্যে সে সকল রোগ নিঃশ্বাসে আরাম হয়। কবিরাজ কবিভূষণ মহাশয় ডাক্তারী কবিরাজী সম্মত এই সকল মুষ্টিযোগের ব্যবহার জাগাইবার মানসে এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহার সাহায্যে গৃহস্থ লোকেরা গৃহে বসিয়া যৎসামান্ত ব্যয়ে কিংবা বিনা ব্যয়ে অনেকানেক রোগের সুচিকিৎসা করিতে পারিবেন। এ পুস্তকের দ্বারা সাধারণ লোকের বিশেষ উপকার হইবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া তাহা আমরা পূর্ণ সাহসে বলিতে পারি, আশা করি, গণনাথ বাবুর এই ক্ষুদ্র পুস্তক এ দেশের গৃহস্থ সংসারে বিশেষরূপ আদৃত হইবে, আদরের সঙ্গে উপকার লাভ হইবে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৭শ বর্ষ। | ১৩১৬ সাল, পৌষ | ৯ম সংখ্যা

সঙ্গিনী।

শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার ঠাকুর এম, এ।

আজি কত কাল অতীত হইল নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছ কিন্তু দেহটা কি এত বড় যাহার জন্য আমরা এত পাগল হই; কই জীবন্ত লোকের শুধু দেহটাকে কি আমরা এতই চাই; একবার ভাল করিয়া বুঝা যাক্ না কেন; দেহে লালিত্য আছে, চক্ষে জ্যোতিঃ আছে মুখের Expression বা হাবভাব আছে কিন্তু সে গুলি আসে কোথা হইতে? ভাবের লহরীলীলা দেহে খেলে বলিয়াই

দেহের লালিত্য, চক্ষের জ্যোতি, মুখের হাব ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; এই ভাবই মূলাধার এখন দেখা যাউক ইহারও পিছনে আরও কিছু মূল সত্য আছে কি না; ভাবের পিছনে মন, সহজেই অনুমান করা যায়—আগে মনন তবে ভাবনা, তারপর কার্য্য, এই মন শুধু একলা থাকে না, ইহারও পিছনে দেখিতে গেলে আত্মায় আসিয়া পড়ি; এই আত্মাই পরাবলম্বন; দেহ নাই বটে; আত্মা যাইবে কোথা? পৃথিবী তোমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না; ব্যোমযান যেরূপ বন্ধন রজ্জু সকল ছিঁড়িয়া আপনার উন্নমনশীল গ্যাসের জোরে সব ছাড়িয়া Ethereal space এ পরিভ্রমণ করে তুমিও কি তাহাই করিলে? যাইবে যাইবে সুর ধরিতে বটে, কিন্তু যাইবার ইচ্ছা কি এত প্রবল হইয়াছিল; মনের দৃঢ়তার অটুট খুব কম লোক দেখিতে পাওয়া যায়, সেই মনের দৃঢ়তা তোমার প্রকৃষ্টরূপে ছিল; পঞ্চভূত তোমার মনোময়, ভাবময়, আত্মময় সত্তাটীকে টানিয়া রাখিতে পারিল না; ভাবের প্রাধান্যে বেলুনের ন্যায় দ্রুতগতিতে পলাইলে—উর্দ্ধে, উর্দ্ধে, উর্দ্ধে যাইতে থাকিলে পড়িয়া রহিলাম কেবল আমরা—জয় ভাবের জয় মনের জয়, আত্মার জয়।

মানুষের মৃত্যু কাহাকে বলে, দেহটা পড়িয়া থাকার নাম মৃত্যু—কিন্তু দেহটা কি কিছু যাহার জন্য দেহাত্মবিচ্ছেদটাকে মৃত্যু বলিতে হইবে? কখনই নহে; প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এ জীবনে কি মিটে—যতই পাই ততই চাই এই যদি মানব জীবনের প্রধান লক্ষণ তবে সব পাইবার পূর্ব্বে দেহটা খসিয়া যাইলে কাঁদি কেন? মৃত্যু বলি কেন? বরাবর চাহিলে পাই, চাহিবার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি হইলে মৃত্যু বল আর যাহা বলিতে চাও বলিও তৎপূর্ব্বে মৃত্যু বলিতে পাবে না, কিন্তু লোক বুঝে কৈ, প্রাণ তাহা মানিতে চাহে না—এক দিন পুরুরবাঃ প্রেয়সীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া উন্মাদী হইয়া বলিয়াছিলেন;—

ইয়ং মনোমে প্রসভঃ শরীরাৎ।
পিতুঃ পদং মধ্যম মুৎপতন্তী।
সুরাঙ্গনা কর্ষতি খণ্ডিতাগ্রাৎ
সূত্রং মৃণালাদিব রাজহংসী॥

সরোবরের ভিতর হইতে মৃণালদণ্ড বিদীর্ণ করিয়া যেরূপ রাজহংসী মৃণালসূত্র মুখে করিয়া উড়িয়া যায়, সেই রূপই কি তুমি আমার মন-সূত্রটাকে মুখে করিয়া লইয়া পলাইয়াছ। মন সদাই যেন কি একটা কিছুর পশ্চাতে ঘুরিতে থাকে;

বিষয় কোলাহল খুব আছে বটে কিন্তু তাহার ভিতর যেন একটা Vacancy শূন্যতা দেখা যায়—শূন্যে, শূন্যে, মহাশূন্যে মন ঘুরিতে থাকে, কিন্তু আবার সংস্কারবশে ভগ্নপক্ষতি হইয়া নিম্নে ফেরে। একি রকম অবস্থা; আত্মার দেশ নাই, কাল নাই পাত্র নাই, সর্ব্বত্র বিচরণ করিবার ক্ষমতা আছে; দেহটা আমাদিগের Clog আমাদিগকে টানিয়া রাখে; এখন তোমার আর শোক নাই, তাপ নাই, দুঃখ নাই, সর্ব্বত্র বিচরণশীলতা হইয়াছে, রেলের অপেক্ষা পর্দ্দার অপেক্ষা কিছুই নাই। এখন তোমার 'বৃন্দাবনধাম নাহি হেরিলাম' এই কাতরোক্তি আর নাই তুমি স্বেচ্ছা বিহারিণী সর্ব্বদেশব্যাপিণীরূপে সর্ব্বস্থানে বিরাজ করিতেছ; বুঝি বা ক্ষুদ্রদেহে আবদ্ধ থাকিয়া পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়া আত্মার বিচরণশীলতা লোপ পায়; স্বপ্নরাজ্যে আত্মার অবিহত গতি সকলেরই অনুভব করি কিন্তু এখন জাগ্রৎ স্বপ্নে দেখিতেছি যে এই বনভূমি তোমাময়; নির্ঝরিণী পথের ধারে কতই দেখিলাম— দুগ্ধের ন্যায় ফেণরাশি উদ্গীরণ করিতেছে। কুলু কুলুরবে শ্রবণ, মন সুখিত করিতেছে—একি তোমার মধুরালাপ, একি তোমার সুবিমল হাসি; আত্মার ক্ষমতা বোধ হয় এরূপ আছে যে সমস্ত বিসর্জ্জনবস্তুতে আপনাকে অনুপ্রবিষ্ট করাইতে পারে, তাহা না হইলে নির্ঝরিণীর মধুরতা কোথা হইতে আসিল; বনভূমির মধ্যে এ সুবিমল হাসি কাহার; দেহ বহন করিয়া আমি ঘুরিতেছি, তুমি অশরীরিণী তোমার আনন্দ কতই তাহা কিরূপে অনুভব করিব, তুমি হাসিতে থাক, আমি দেখিতে থাকি ও ভাবের বিদ্যুল্লীলার ভিতর দিয়া তোমার সঙ্গের সঙ্গী হই—অথবা তাহাতে আমার ক্ষমতা কই; এত কি করিয়াছি—কি তপস্যা অর্জ্জন করিয়াছি, কি বর লাভ করিয়াছি, যাহাতে এখন তোমার সাথের সাথী হইতে পারি—আমি পারি না ও পারিব না বলিয়া বোধ হয়, কবে যে পারিব কখনও যে পারিব তাহার রাস্তা বহুদূর—ভাবিবার আবশ্যক নাই, তুমি সঙ্গিনীরূপে ঘুরিতেছ ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।—এই বনভূমি কেলুবৃক্ষে পরিপূর্ণ; অত্যুন্নত বৃক্ষরাজি শ্রান্ত মানবের ন্যায় ভুজ বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে—গাছে ছোট ছোট পাতা, তুমি বড় কষ্ট পাইয়াছিলে মরলোকে তোমার দেহ নানাকারণে ভাজা ভাজা হইয়াছিল তাই বুঝি আমাকে চারিদিক হইতে আরামসূচক অবস্থা দেখাইবার জন্য এই পার্ব্বত্যকেলু বৃক্ষরূপে অবস্থান করিতেছে। তোমার শান্তি দেখিয়া আমার সুখ; যে শান্তি শত চেষ্টায় মরলোকে পাও নাই যে শান্তির ব্যাঘাত অনেক সময়ে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতে বহুবার সংঘটন করিয়াছি সে

শান্তিলাভের প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়া আমার হৃদয় আপ্যায়িত করিলে—থাক তোমার যথায় অভিরুচি—কেলুবৃক্ষেতেই বা থাক, নির্ঝরিণীতেই বা থাক, তোমার সুখাবস্থান হইলে আমার তৃপ্তি, কে বলে বৃক্ষে জীবন নাই, জলে জীবন নাই? ভগবান মনু বলিয়াছেন "অন্তঃ সজ্ঞাঃ ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতা"—ইহারা সকলেই অন্তর্নিগূঢ়চেতন, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি চেতনে চেতন সংযোগ চেতনের সহিত অপর এক চেতনের মিলন চিরকাল প্রসিদ্ধ; তুমি ভগবৎ কোপানল দগ্ধ বা কামদেবের ন্যায় অশরীরী হইয়াছ কিন্তু যেরূপ পুরাণে আছে যে হইলেও আসামস্থ কামরূপ প্রদেশে মূর্ত্তিমান হইয়া নিসর্গশোভার মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তুমিও কি সেইরূপ এই রমণীয় পার্ব্বত্যপ্রদেশে হিন-রাশির ভিতরে সুখে বিচরণ করিতেছ; গিরিশৃঙ্গে এ কি অপরূপ শব্দ শুনিলাম—একি তোমার অট্টাট্টহাস—আনন্দলাভ করিতে পাও নাই, আনন্দসন্দোহে ভাসিতেছ কি? ভাস আনন্দে, ভাসাও জগৎকে আনন্দে, কিন্তু তোমার আনন্দে আমার আনন্দ পূর্ব্বে হইত বটে, কিন্তু কৈ এখন সেরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি কৈ? এখন তোমার আনন্দে আমার সেরূপ আনন্দের উৎস ছুটে কৈ? এখন তাহা রতিবিলাপে কবিকথিত;—

উপচারপদং ন চেদিদং
ত্বমন রবে কথমক্ষতা রতিঃ॥

এই বাক্যের ন্যায় হইয়া আসিতেছে, Add that in tae place notked with astisin. ইহার কারণ কি? কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি—তুমি সঙ্গিনীরূপে সহচরীরূপে ছায়ার ন্যায় "ছায়েবানু গতাতস্য নিত্যং স্ত্রীসহচরিণী"রূপে আমার সঙ্গের সঙ্গিনী হইতে পারিতেছ, আমি তাহা পারিতেছি কৈ? সেইজন্য তোমার আনন্দ সন্দোহে আমার নিরানন্দতার কাল মেঘ দেখা দিতেছে, বিদ্যুল্লতাস্ফুরণের ভিতর ঘন গর্জ্জিতের ঘোরারাব শ্রুত হইতেছে, অন্ধকার পথে কাল সর্পের গর্জ্জন শ্রুত হইতেছে, কিন্তু, যাউক সে সব কথা—এখন বল কিসের লাগিয়া, আমারে এখানে আনিলে—দেহত সব জায়গায় থাকে, বা না থাকিতেও পারে; এ ঘোর নির্জ্জনতা, একাকী ভ্রমণলিপ্সাকে আমার হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিল—ভাল তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক—রম্যভূমির মধ্যদিয়া যাইতেছি বটে—মনের ভাব কেহ জানে না—তুমি একাই জানিতেছ, তোমার নিরতিশয় আনন্দ বটে, কিন্তু একবার একবার আমার দিকে চাহিও, নিতান্ত স্বার্থপর হইও না, তুমি মরজগতে সেরূপ ছিলে না, অমরজগতে তোমার সম্বন্ধে তাহা সম্ভবে না জানিও।

অহৃতস্তু বিলোভনান্তরৈ

মর্ম্ম সর্ব্বে বিষয়াস্তদাশ্রয়াঃ॥

আমার কাছে আর কোন প্রলোভন রোচে না, আমার যাহা কিছু তাহা তোমার সহিত বিজড়িত।

ভাবের রাজ্যের এম্‌নি মধুরিমা যে তাহার কাছে কোথায় দেহের কথা লাগে এই ভাবরাজ্যের ভাবসাগরের লহরীলীলায় কত কত মহাপুরুষ হাবুডুবু খাইয়াছেন। সর্ব্ববাদিসম্মতে নারায়ণের অংশভূত মহমনাঃ শ্রীরাম পত্নীর বিলাপাশঙ্কা করিয়া বনে বনে ফিরিতে ফিরিতে লতাবধুকে সীতা ভ্রমে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া "সৌমিত্রিনা সাশ্রমহং নিষিদ্ধি" এই কথা বলিয়াছেন, যাহা Demi God এ পারিয়াছে ক্ষুদ্র মানুষ আমরা তাহা করিলে দোষ কি? অতএব আইস মন, দেখা যাউক, এই সকল প্রোত্তুঙ্গ হইবে প্রোত্তুঙ্গতর শিখরনিচয়ে সেই ভাবময় অশরীরিণীকে দেখিতে পাই কি না পাই; যে দিন "যদ্ধি হৃদয়ং মম তদ্ধি হৃদয়ং তব" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছি ও শ্রুতিগোচর হইয়াছে সেই দিন সেইক্ষণ হইতেইত দৈহিক সম্বন্ধের অবসান; তবে কেন দেহ আছে বা দেহ নাই এই ভাবাভাবের দারুণ কশাঘাতে মানুষ আমরা মরি। মন বুঝে না, এই মনই বলিতেছে যদি ভাবময়রূপে হৃদয়ে তাহাকে দেখিতে পাই, তবে সেই ভাবময়রূপ কেন সর্ব্বত্র খুজিব না? যখন সুখিত ছিলাম, যখন ভাবময়ীকে শুধু কেবল ভাবরাজ্যে দেখিয়া তৃপ্ত হইতাম না, যখন নশ্বর জগতের নশ্বর আবরণে সেই পিঞ্জরে পোষা পাখীটাকে দেখিয়া তৃপ্ত হইতাম, তখন মধুর জীবনের বসন্তকালে পুরুরবার বিরহোন্মাদ পাঠ করিয়া মনে দুঃখও হইত ও কতকটা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইত; কিন্তু আজ এখনত তাহা বোধ হইতেছে না—এখন পুরুরবার সেই প্রশ্ন পর্ব্বমালার প্রতি সম্ভাষণ quite natural যথার্থই স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে; সেই মনোহর কবিকপোল নিঃসৃত বাণী;—

সর্ব্বক্ষিতিভৃতাং নাথ দৃষ্টা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।

বামারণ্যে বনান্তেহস্মিন্ ময়া বিরহিতা ত্বয়া॥

স্বতই আমার মুখে উচ্চারিত হইয়া গেল, গিরি, নদী, বন, উপবন প্রতিধ্বনিচ্ছলে উত্তর দিল, না না, আমরা তোমার অবিদ্যমানা রমণীকে দেখি নাই; তাহারা দেখিতে পাইবে কেন? যাহার দেখিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার জন্য তাহার রূপ তাহার জন্য তাহার ঘুরাফিরা সকলের জন্য নহে; সন্তান সন্ততি স্নেহের সামগ্রী

বটে—কিন্তু জগদীশ্বরের এম্‌নি নিয়ম যে তাহারা শীঘ্রই পিতৃ মাতৃ চিন্তার উৎকণ্ঠা ত্যাগ করে; কিন্তু সঙ্গিনীর অভাব সঙ্গী বই আর কে বুঝিবে বা সঙ্গীর অভাব সঙ্গিণী বৈ আর কে বুঝিবে? মহামনা অজরাজা এক দিন সমদুঃখ-প্রপীড়িত হইয়া বলিয়াছিলেন ;——

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণা বিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিং নমে হৃতং ॥"

মৃত্যু হরন করিয়াছে বটে কিন্তু যমরাজ জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ, যে যমরাজ নচিকতাকে জ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন, যে যমরাজকে লৌকিক কথায় ধর্ম্মরাজ বলে, তাঁহার অন্যায়াচরণ সম্ভবে না ; সুকোমল হৃদয়া পুষ্পধন্বার অঙ্কশায়িনী রতি একদিন এইরূপভাবে বিভোর হইয়া বলিয়াছিলেন ;

"শশিনং পুনরতিশর্ব্বরী
দয়িতা দ্বন্দ্বচরং পতত্রিনং।
ইতিতৌ বিরহান্তর ক্ষমৌ
কথমত্যন্তগতা নমাং দহেঃ ॥

কিন্তু উত্তর এই, যে চিরদুঃখ কাহারও ভাগ্যে থাকিবার নহে ; একদিন তাহার অবসান হইবে ; এই ঘটনার ঘটয়িতা যমরাজের রাজাকে দেখিতে পাইলে যমযন্ত্রণা আর থাকে না ; তুমি সেই পরমপদলাভের জন্য এ জগতে কতই চেষ্টা যত্ন পাঠাভ্যাস করিলে, অন্তিমে স্থিরবিশ্বাসে বিশ্বাসিনী হইয়া আপনার প্রাণ তাহার পাদপদ্মে উপহার দিয়া কৃতকৃতার্থ হইলে ধন্য তোমার স্থিরবিশ্বাস নারী হইয়া মহীয়সী কীর্ত্তি যাহা গোপনে আমাদিগকে দেখাইলে তাহা আমাদের অবশিষ্ট জীবনের উপজীব্য রহিল, কিন্তু তুমি যেমন সেই মোদ-নীয়কে লাভ করিয়া পরমামোদ পাইলে, আমাদের অবশিষ্ট জীবন যেন তাঁহাকে উপলব্ধ করিয়া চলিতে পারি। "স মোদতে মোদনীয়ং হিলব্ধা।" এই আমার আকাঙ্ক্ষা এই গতি এই মুক্তি।

শিমলা শৈল।
৬ই আশ্বিন, ১৩১৬ সাল।

বন্দনা।

লেখক—রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত।

(গান)

ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজ-মধ্যমান।

কে তুমি মা করুণারূপিণি !
কাঙ্গালে করিলে কৃপা, শুনায়ে আশার বাণী ॥
বড় দুখী বোলে কিমা, সন্তানে করিলে ক্ষমা,
শত অপরাধে তারে, দিলে মা ঐ পা দু'খানি ॥
এত দয়া, এত ক্ষমা, চোখে জল আসে যে মা,
স্মরিয়ে শ্রীমূর্ত্তি শ্যামা, রামকৃষ্ণ বলি আমি ॥
খুলে দাও এই আঁখি, তোমাতে মা তাঁরে দেখি,
অথবা তুমিই সেই মা, গুরুরূপা হে জননি ! ॥

বেরি-বেরি

চতুর্থ প্রবন্ধ—প্রতিকার।

লেখক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ রায় সেনগুপ্ত।

যদি লক্ষণই বুঝা গিয়া থাকে তবে রোগ প্রতিকারের জন্য চিন্তা কেন ? আয়ুতত্ত্বের অগাধ জলধি মন্থন করিয়া আর্য্য মহর্ষিগণ যে অমৃত-কলস পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, একটু বিবেচনা করিয়া, একটু মাথা ঘামাইয়া, তাহা হইতে দুই এক বিন্দু প্রয়োগ করিলে ফল নিশ্চিত। তবে যখন এ ব্যাধিটি সংক্রামকভাবে এ দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে তখন এ শোথরোগকে হেয় জ্ঞান করিলে চলিবে না, উপেক্ষা করিলে চলিবে না, তুড়ি দিয়া উড়াইব বলিলে চলিবে না। দেশ কাল পাত্রসংযোগ বিরুদ্ধ আহারাদির মণি-কাঞ্চন যোগ না হইলে কোন ব্যাধিই সংক্রামকভাবে দেশে বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে না। বেরি-বেরি বা অধুনাতন শোথ যখন বহুব্যক্তির ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকিতেও একই সময়ে উৎপন্ন হইতেছে, তখন বিশেষ ধীরতাসহকারে রোগীর ব্যক্তিগত পার্থক্য বিবেচনা করিয়া এবং

রোগের লক্ষণাদির বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা না করিলে আশু ফললাভের আশা অতি কম। রোগ এক কারণে উদ্ভূত হইলেও ব্যক্তিগত ধাত্বাদির ব্যতিক্রমে বিভিন্ন উপায়ে রোগের প্রতিকার করিতে হয়। বাতের ব্যাথায় তাপ দিলে উপশম হয় বলিয়া, সকল স্থানে একরূপ তাপে উপকার দর্শে না; কোথাও বা রুক্ষস্বেদ কোথাও তৈল মর্দ্দন ও তাপ, কোথাও বা গরম জলের তাপে (Fomentation,) যন্ত্রণার শান্তি হয়। শোথ-রোগেও (বেরি-বেরিতেও) তদ্রূপ এক রকম প্রক্রিয়া দ্বারা বা এক ঔষধে সর্ব্বত্র শান্তিলাভের উপায় নাই, কাজেই পাঁচটি মুষ্টিযোগের উল্লেখ করিলেই ইহার প্রতিকারের উপায় বলা হয় না। বিষয় গুরুতর, মাদৃশ ক্ষুদ্র চিকিৎসকের দ্বারা যে ইহার ঠিক ব্যবস্থা পাইবেন তাহার সম্পূর্ণ আশা রাখিবেন না; তবে মহামহোপাধ্যায় আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ যে পথ অনুসরণে নানা তথ্যের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, যদি আমার দ্বারা সেই অভ্রান্ত ঔষধের বিস্তারকল্পে কিছুমাত্র আনুকুল্য এবং জনসাধারণের সামান্যমাত্র উপকার সাধিত হয়, তবে নিজকে ধন্য মনে করিব।

আর একটি কথা, বৈদ্য-চিকিৎসকগণের বংশ-ভেদে গুরু-ভেদে চিকিৎসা-পদ্ধতির কিছু কিছু পার্থক্য বঙ্গদেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তজ্জন্য হয়ত আমার লিখিত মুষ্টিযোগ ও পাচনাদি অপরাপর কবিরাজগণের মধ্যে কাহারও অনুমোদিত, কাহারও বা অনভিপ্রেত হইতে পারে; এইরূপ নানা কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া ঔষধবিষয়ে লিখিতে বিরত থাকিব মনে করিয়া ছিলাম। শাস্ত্রকারগণের প্রমাণ দিয়া বেরি-বেরির যে শোথত্ব স্থাপন করা গিয়াছে তাহার উপর তর্ক চলে না, কারণ প্রমাণগুলি আমার কথা নহে উহা পরমপূজ্য অভ্রান্ত ঋষি ও আচার্য্যবাক্য; কিন্তু ঔষধ নির্ব্বাচন ও প্রয়োগ প্রত্যেক চিকিৎসকের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে, যিনি যেটী ভাল বুঝেন বা যাহাতে ফল পাইয়াছেন সেই ঔষধই ভুয়শঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অত্র প্রবন্ধে লিখিত ঔষধগুলি আমার নিজ ইচ্ছানুরূপ নির্ব্বাচিত ও পরীক্ষিত; কোন কোনটী বা যোগ, এই কারণেই প্রথমে লিখিতে অগ্রসর হই নাই, কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া লিখিতে বসিলাম, ইহাতে তাঁহার ও পাঠকবর্গের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে কি না জানি না।

উপরেই বলিয়াছি পৃথক পৃথক লক্ষণভেদে এক রোগেই নানা ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া পড়ে। অধুনাতন শোথ বা বেরি-বেরিতে

যে যে পাচন মুষ্টিযোগ প্রলেপাদি দ্বারা সাধারণতঃ সকল ক্ষেত্রেই অল্প বিস্তর উপকার পাইয়াছি এবং বহুবার প্রয়োগ করিয়াছি তাহাই এস্থলে লিখিলাম।

১। আঁটী বাদ হরীতকী, কাঁচাহরিদ্রা, বামুনহাটির মূল, গাঁটবাদ গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, দেবদারু এবং শুঁঠ প্রত্যেক ওজন ৵০ দুই আনা (২৪ গ্রেণ) অর্দ্ধসের জল দিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে সিদ্ধ করিয়া ৵০অর্দ্ধপোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এক ছটাক মাত্রায় দিনে দুই বার খাওয়াইলে, হাত, পা, মুখ, উদর প্রভৃতি স্থানের শোথ অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ৫।৭ দিনেই উপকার পাইবেন। জ্বর, কাসি, অগ্নিমান্দ্য সংযুক্ত শোথেও উত্তম ফল পাওয়া যায়। *

২। পুনর্নবা, নিমছাল, পল্‌তা, শুঁঠ, কটকী, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, এবং আঁটী বাদ হরীতকী প্রত্যেক ওজন ৵০ দুই আনা। পূর্ব্বোক্ত মত কাথ করিয়া পূর্ব্ববৎ সেবন করাইলে শোথের সকল অবস্থাতেই উপকার পাওয়া যায়। এইটি চক্রদত্তের একটি উৎকৃষ্ট যোগ। পাতলা দাস্ত থাকিলে কট্‌কী বাদ দিয়া অন্যান্য মসলার কাথ করিয়া লইবেন।

৩। শুঁঠ চূর্ণ ।০ চারি আনা অন্ততঃ ৪।৫ বৎসরের পুরাতন ইক্ষুগুড় ॥০ অর্দ্ধভরি প্রত্যূষে শূন্য উদরে ১০।১২ দিন খাইলে সকল প্রকার শোথে উপকার দর্শে; পাতলা দাস্ত থাকিলে খাওয়া নিষিদ্ধ।

৪। শোথরোগে অধিকমাত্রায় দুগ্ধপান বিধেয় নহে, তথাপি দুগ্ধ ⁄।০ একপোয়া শ্বেতপুনর্নবা দেবদারু (বণিক দ্রব্য বিশেষ, চলিত দেবদারু নহে) ও শুঁঠ প্রত্যেক ॥৵০ আনা জল ॥০ অর্দ্ধসের, একত্রে জ্বাল দিয়া দুগ্ধ অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ৵০ পোয়া মাত্রায় দিনে ২বার সেবন করাইলে শোথের বিশেষ উপশম হয়।

৫। পুরাতন ইক্ষুগুড় ॥০ শুঁঠচূর্ণ ৵০ পিপুল চূর্ণ ৵০ তিল ।০ আনা একত্রে বাটিয়া দুইটি বড়ি করিয়া প্রাতে একটি বৈকালে একটি উষ্ণজল বা দুগ্ধ সহ

* পাচন বা কাথ করিতে হইলে এই মাত্রায় জল দিয়া কাথ করিতে হয়। সেবনের পূর্ণমাত্রা ⁄০ ছটাক। ৭ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ ছটাক এবং ৭ বৎসরের নিম্ন বয়সে এক কাচ্চা করিয়া বা তাহারও কম। কাথ্য মসলার মাত্রা কমাইলে বা কমজল দিয়া সিদ্ধ করিলে ভাল ফল হয় না, অতএব অল্প বয়স্কের জন্য প্রস্তুত হইলেও পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত করিয়া অল্প মাত্রায় কাথজল পান করাইতে হয়।

খাওয়াইলে অর্শ যুক্ত শোথে ২।৩ দিনে উপকার পাওয়া যায়।

৬। পুনর্নবা শাক, কচিমুলো, মানকচু ব্যঞ্জন রাধিয়া শোথ রোগীকে নিত্য খাওয়াইলে ফুলা কমিয়া যায়।

৭। কৈলা বাছুরের চোনা ২ তোলা আন্দাজ, শুঁঠ চূর্ণ, পিপুল চূর্ণ ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেক ৶০ আনা একত্রে মিশ্রিত করিয়া শূন্য উদরে ৭ দিন খাইলে বদ্ধকোষ্ঠ প্লীহা ও যকৃত যুক্ত শোথে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অধিক পাতলা দাস্ত হইতে থাকিলে এ ঔষধ বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

৮। বিল্বপত্রের রস এক কাঁচ্চা, শুঁঠচূর্ণ, পিপুলচূর্ণ, ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেক অর্দ্ধ-আনা (৬গ্রেণ) প্রাতে ও সন্ধ্যায় খাওয়াইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ৩।৪ দিনেই ফুলো কম পড়ে।

৯। ঈষৎ উষ্ণ চোনা দিয়া ফুলো স্থান দিনে ২।৪ বার ধৌত করিলে ক্রমশঃ শোথ কমিতে থাকে এবং শোথ স্থানের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আইসে।

১০। যে সকল শোথে বেদনা যন্ত্রণা থাকে, তাহাতে কচিমূলো-শুকনো, পুনর্নবা শাক, রাস্না, দেবদারু (বণিক কাষ্ঠ বিশেষ) এবং শুঁঠ সমভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে শুখাইলে ৩।৪ দিনে বেদনা আরোগ্য হয়।

১১। শ্লেষ্মাজন্য শোথে জয়ন্তীপাতা গরম চাটুর উপর ছড়াইয়া ছড়াইয়া উপর্য্যুপরি দিতে থাকিলে উহা পরপর সংযুক্ত হইয়া একখানি রুটীর মত হইবে; ঐ রুটী সহ্যমত উষ্ণ উষ্ণ, ফুলোস্থানে (বিশেষতঃ হাত পায়ের ফুলোয়) জড়াইয়া সমস্ত রাত্রি তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে ২।১ দিনেই ফুলো কমিয়া যায়।

১২। কোনকোন সংবাদ পত্রে বেরি-বেরিতে প্রলেপ জন্য মাকাল ফলের উপকারিতার কথা দেখিয়া কয়েকটী রোগীকে উহা বাটীয়া প্রলেপ দিতে দিয়াছিলাম কিন্তু এক অরুণ বা রক্ত বর্ণ শোথে ত্বকের স্বাভাবিকবর্ণ সম্পাদন ভিন্ন বিশেষ উপকার পাই নাই; বরং অনেক স্থলে রাখালশশার মূল বাটিয়া প্রলেপ দেওয়ায় ফুলা কমান সম্বন্ধে আশাতীত ফল পাইয়াছি।

১৩। শোথরোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে প্রথম প্রথম মাঝে মাঝে মৃদু বিরেচন (সোদালের আটা Sascara sagradae Indica চারি আনা হইতে ছয় আনা ওজনে অথবা পরিষ্কৃত এরণ্ড তৈল Refined Castor oil এক কাঁচ্চা হইতে অর্দ্ধছটাক পর্য্যন্ত, উষ্ণজল বা দুগ্ধ সহ প্রয়োগ) দ্বারা মল পরিষ্কার করাইবেন; উদরাময় থাকিলে প্রথমতঃ তাহারই প্রতিকার করিবেন।—মুতা, যমানি (জোয়ান)

বিটলবণ, ও মৌরী সমভাগে লইয়া জলে বাটিয়া কুলের আঁটির মত বড়ি করিয়া নিত্য দুই বেলায় দুইটি, অথবা বেলশুঁঠ চূর্ণ, শিমুল আটাচূর্ণ, আমের কেশীচূর্ণ এবং ধাই ফুলের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত ৵০ আনা মাত্রায়, ঠাণ্ডা জল সহ দিনে ২।৩ বার খাওয়াইলে ঐরূপ উদরাময়যুক্ত শোথের উপকার দর্শে। কোষ্ঠশুদ্ধি অথবা উদরাময়াদির দমন করিয়া লইয়া পরে শোথের ঔষধ দিলে বেরি-বেরিতে স্থায়ী ফল পাওয়া যায়।

১৪। হাঁপানি ও কাশি বেরি-বেরির অন্যতম উপদ্রব, উহাদের শান্তি জন্য পিপুল চূর্ণ /০ এক আনা, একটা বহেড়া বীজের শাঁস, ময়ূর পুচ্ছ ভস্ম এক রতি এবং কুলের আঁটির শাঁস একটা একত্রে মাড়িয়া মধু সহ পাতলা অবলেহ করিয়া মধ্যে মধ্যে চাটাইলে এ দুই উপদ্রবের শান্তি হইবে।

১৫। টোপ টোপ প্রস্রাব বা প্রস্রাবের ধার আটকাইয়া বা রক্তবর্ণ অল্প মাত্রায় প্রস্রাব হইলে পাকা দেশী কুমড়ার জল এক কাঁচ্চা এবং কলমে সোরা ৫রতি Nitrate of Potas 10 grains দিনে আবশ্যকমত এক বা দুইবার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

১৬। প্রথমতঃ অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য না হইলে প্রায়ই শোথরোগ হয় না ; ইহা নিবারণের জন্য ঘৃতে ভাজা হিং ১রতি (২গ্রেণ) সৈন্ধব লবণ ৩ রতি, জীরাচূর্ণ ৬ রতি, আহারান্তে ঠাণ্ডা জল সহ সেবনে শীঘ্র অগ্নি দীপ্ত হইয়া রোগের উপশম হয় ; ক্ষুধা ও বল বৃদ্ধি হইলে অনেক সময়ে শোথ আপনা হইতেই কমিয়া যায়।

১৭। যে শোথ রোগীর মধ্যে মধ্যে দমকা ভেদ বা নিত্যই পাতলা দাস্ত হয়, তাহা-দিগকে ইন্দ্রযব, মুতা, ধাই ফুল, বেল শুঁঠ ,বালা প্রত্যেক ।৵০ আনা ওজনে /॥০ আধ সের জলে পূর্ব্বলিখিত মত ক্বাথ করিয়া খাওয়াইলে ঐরূপ উপদ্রবের অচিরাৎ শান্তি হয়।

১৮। বক্ষস্থলে (হৃদয়ে) যন্ত্রণা, ঘাত প্রতিঘাত, ধড় ফড়াদি ও অব্যক্ত যাতনাও অনেক বেরি-বেরিতে উপস্থিত হইয়া থাকে ; তন্নিবারণ জন্য—বড় এলাচের গুঁড়া ৩রতি, মৃগনাভি (কস্তুরী) অর্দ্ধ রতি এবং কর্পূর ১ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ২টী পুরিয়া করিয়া জল সহ বা মধুসহ ৪ ঘণ্টা অন্তর ২বার খাওয়াইলে সত্বর ঐ সকল উপদ্রবের শান্তি হয় ; এক পুরিয়া খাইয়াই উপকার হইলে দ্বিতীয় বার দিবার আবশ্যক নাই।

এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদোক্ত বহুশঃ দৃষ্টফল অনেকানেক মুখ্য রস ও ধাতুঘটিত

ঔষধও আমাদিগকে সর্ব্বদা প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু সে সকল ঔষধ চিকিৎসক ভিন্ন সাধারণের প্রস্তুত-করণ সাধ্য নহে বলিয়া সে সকলের উল্লেখ করিলাম না; তবে বলাধান বাতশ্লেষ্মার নানা উপদ্রব শান্তি জন্য সর্ব্বজন বিদিত মকরধ্বজ যে একটি অমোঘ ঔষধ, তাহা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

সাধারণতঃ বেরি-বেরিতে যতগুলি উপদ্রব উপস্থিত হয় সেই সকল উপদ্রব শান্তির এবং প্রধানতঃ শোথ আরোগ্যের জন্যই উপরোক্ত মুষ্টিযোগ ও পাচনাদি ব্যবস্থা দিলাম। কঠিন রোগ শান্তি কল্পে অনেক অনুমান যুক্তি ও বিজ্ঞতার আবশ্যক, সাধারণকে ইহা অপেক্ষা, আরও কতকগুলি বিধি ব্যবস্থা দিতে গেলে উপকার অপেক্ষা গোলযোগের সম্ভাবনা। যদি এই ঔষধগুলি যথা-লক্ষণ যথাকালে প্রযুক্ত হয় উপকারলাভ নিশ্চিত।

এখন শোথ রোগের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। সংযোগ-বিরুদ্ধ আহারাদির কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে; এখন সাধারণ পথ্যাদির কথা বলিতেছি।

সকল প্রকার অম্ল বিশেষতঃ দধি শোথ রোগে অপথ্য কিন্তু দুঃখের বিষয় এলোপাথ ডাক্তারগণের হাত হইতে ফেরৎ যতগুলি রোগীরই চিকিৎসা করিয়াছি, সকলেরই মুখে শুনিয়াছি, ডাক্তারবাবুরা তাহাদিগকে দধি ও ঘোল প্রচুর মাত্রায় খাওয়াইয়াছেন। এ থিওরি এলোপাথগণ কোথা হইতে পাইয়াছেন বলিতে পারি না। অবশ্য দধিতে ক্রিমি (Germ) নষ্ট করে বটে কিন্তু তাহা বলিয়া শৈত্যগুণসম্পন্ন দধি রক্তহীনতার উপর (রক্তহীনতা ব্যতিরেকে শোথ হয় না) নিতান্ত অপকারি। যদি ইহা দ্বারা উপকারের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকিত (দধি ও ঘোলত আমাদের দেশেরই জিনিষ), তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদ-কারগণ শোথরোগের নিসিদ্ধ আহারের মধ্যে দধিকে ফেলিতেন না। নিত্য নিত্য দধি বা ঘোল খাইলে জ্বর ও শ্লেষ্মা বৃদ্ধিরই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অনেক স্থলে ঘটিতেছেও তাই। যাহা হউক যাঁহারা কবিরাজী মতে চলিতে চাহেন, তাঁহারা দধি ও ঘোল বর্জ্জন করিবেন। ঘোল খাইতে থাকিলে বেরি-বেরি রোগগ্রস্থ রোগীকে অনেক দিন ঘোল খাইয়া বেড়াইতে হইবে। যদি অজীর্ণ জন্যই ঘোলের ব্যবস্থা চলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ঘৃতে ভাজা হিং প্রভৃতির চূর্ণ এবং অন্যান্য অনেক আগ্নেয় ঔষধ, দধি ঘোলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিলেই অগ্নি-দীপ্তি ও রুচি হইতে পারে, অথচ এ পক্ষে শ্লেষ্মাবৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে না। লবণও

অধিক মাত্রায় এ রোগ হইলে সেবন করিতে নাই। যত কম লবণ খাইলে চলে, অত্যল্প মাত্রায় সেইমত সৈন্ধব লবণ খাইবেন, লবণে রক্ত তরল করিয়া শোথের বৃদ্ধি করে। খাঁটি তৈল না পাইলে ইহার ব্যবহার উঠাইয়া দেওয়াই রোগীর উচিত। খাঁটি তৈল অল্পমাত্রায় চলিতে পারে—মনে রাখা উচিত যে ঘৃত, তৈল, চর্ব্বি, দুগ্ধ প্রভৃতি স্নেহ পদার্থও শোথের অনুকুল নহে; তবে হিং চিত্রকাদি আগ্নেয় ঔষধের সহিত ঘৃত, এবং শুঁঠ বা পিপুল দিয়া সিদ্ধ করা দুগ্ধ সহ্যমত চলিতে পারে।—ব্যাধির তরুণ অবস্থাতেই এই সকল স্নেহ-পদার্থের বহুল ব্যবহার নিষিদ্ধ কিন্তু রোগ পুরাতন হইয়া আসিলে এবং রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ঘৃত দুগ্ধাদি নিষিদ্ধ নহে। গুড় এবং চিনিও অধিকমাত্রায় না খাইয়া স্বল্পমাত্রায় ব্যবহার করা উচিত। সহজ-পাচ্য আহার্য্যমাত্রেই পথ্যরূপে চলিতে পারে।

আটার রুটী বা সুজী সিদ্ধ রুটী পথ্য দিয়া অনেক রোগী সম্বন্ধে শীঘ্র ফল পাইয়াছি। যাঁহাদের অপাক অজীর্ণ ও অম্ল আছে, তাঁহাদের পক্ষে যবের আটার রুটীই প্রশস্ত। জ্বর না থাকিলে এবং রোগীর শরীর অত্যন্ত রুক্ষ হইলে এক বেলা অন্ন এবং অপর বেলা সহ্যমত রুটী, বার্লী (যবমণ্ড), সাগু বা খই দুগ্ধ। অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্যাপেক্ষা মিছরির গুঁড়াই (লাল মিছরী) ব্যবহার্য্য। ভাজা পোড়া শাকদাঁটা, লঙ্কার ঝাল একেবারেই ত্যজ্য। উদরাময় থাকিলে যবের মণ্ড (বার্লী) বা পানফলের পাল সিদ্ধ করিয়া সেই মণ্ড সেব্য। রাত্রিজাগরণ, দিবা-নিদ্রা, ধাতুক্ষয় ও মদ্যপান এরোগে একান্ত নিষিদ্ধ।

যে সকল শোথরোগীর ঔষধাদি ব্যবহারেও নিয়মিত কোষ্ঠশুদ্ধি হয় না, অথবা শক্ত গুট্‌লে মল কেচিৎ কথন অনিয়মিতভাবে নিঃসৃত হয়, তাহাদিগকে মানকচু চূর্ণ ১তোলা হইতে ২তোলা, আতপ চাউলের গুঁড়া ২তোলা হইতে ৪তোলা, খাঁটি গাভী দুগ্ধ ./।০ একপোয়া হইতে ./॥০ আধ সের পাকার্থ জল ./১সের হইতে ./২ সের পর্য্যন্ত একত্রে সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধ মাত্র অবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেই পায়স বা মণ্ড রুচি অনুয়ায়ী মিছরির গুঁড়া মিলাইয়া খাওয়াইলে নিয়মিত কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া শোথ কমিয়া যায়। ইহা বদ্ধকোষ্ঠ শোথরোগীর একাধারে পথ্য এবং ঔষধ।

নবীন চন্দ্র সেনের কবিতা এবং বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রভাব।*

লেখক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র সিংহ।

ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা অবগত হই যে সকল দেশে এমন এক যুগ উপস্থিত হয়, যখন কতিপয় মনীষি তাহার সাহিত্যগগনে সমুদিত হইয়া দীনা মাতৃভাষাকে নানা ফুল ভরত্নে অলঙ্কৃত করেন। এই যুগ ইংরেজীভাষায় augustan age নামে অভিহিত। সম্রাজ্ঞী anne'র রাজত্বকালে ইংলণ্ডে সেই যুগ উপস্থিত হইয়াছিল, যখন Pope, addison; arbuthnut প্রভৃতি মনীষিগণের প্রতিভা প্রভায় তাহার সাহিত্যাকাশ সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশে সে যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাকেও আমরা angustan age নামে অভিহিত করিতে পারি। ১৮৫৪ খৃঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় "সীতার বনবাস" প্রচারে এই যুগ আরম্ভ হইয়াছিল এবং ১৮৯৪খৃঃ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম-চন্দ্রের মৃত্যুতে এই যুগ শেষ হয়। উদার, সুপবিত্র চিন্তা এই যুগের একটি প্রধান লক্ষণ। কি সাহিত্য, কি সমাজ, কি রাজনীতি—সকল বিষয়েই এই পবিত্র চিন্তা বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার, মধুসূদন ও বঙ্কিম, হেম ও নবীন, দীনবন্ধু ও রমেশচন্দ্র—ইহারা সকলেই এই যুগের শীর্ষ অভিনেতা। এই সকল মনীষিগণের চিন্তা কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নয়, উহা আকাশতুল্য অসীম ও সমুদ্রতুল্য গভীর। কবিবর নবীনচন্দ্রের কাব্যে এই উদার ও সুপবিত্র চিন্তা প্রতিছত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে।

কাব্য সাহিত্যের উৎকর্ষ অবশ্য এই যুগের কোন অভিনব পদার্থ নয়। ইহার পূর্ব্বে বঙ্গের আদি কবি জয়দেব তাঁহার 'গীতগোবিন্দে' ছন্দের মোহিনীশক্তির পরিচয় দিয়াছেন; বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের 'পদাবলী' ভক্তির অনন্ত উৎস সৃজন করিয়াছেন; কীর্ত্তিবাস ও কাশীরাম—বাল্মীকি ও বেদব্যাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' রচনা করিয়াছেন। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র 'ফুল্লরা' ও 'মালিনী' চরিত্রে আপনাদের সৃষ্টিচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। তবে প্রাচীন বঙ্গকাব্যসাহিত্য অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ, একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। ইহাতে বীররসের একান্ত অভাব ও আদিরস প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান; ইহাতে চিন্তার গভীরতা থাকিলেও তাহার প্রসার নাই—যেন সকল সময়েই এক সঙ্কীর্ণ পথে আবদ্ধ। বর্ত্তমান যুগে বঙ্গকাব্যসাহিত্যে আদি ও করুণরসের সহিত বীররসের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইয়াছে এবং সঙ্কীর্ণতার পরিবর্ত্তে ঔদার্য্যই বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে।

---

* "চৈতন্য লাইব্রেরি'র বার্ষিক অধিবেশনে 'শ্রীনাথ পদক' প্রাপ্ত রচনা।"

নবীনচন্দ্রের জীবনী।

(জন্ম—১২৫৩ সাল ; মৃত্যু—১৩১৫)

চট্টগ্রামের অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে ১২৫৩ সালের মাঘ মাসে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। আট বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের আর একজন প্রতিভাশালী কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি 'ভারতসঙ্গীত' ও 'বৃত্রসংহার' প্রণেতা মহাকবি হেমচন্দ্র এই দুই মহাকবির মিলিত যশোরাশির প্রভায় বঙ্গগগন উদ্ভাসিত হইয়াছিল। নবীনচন্দ্র জাতিতে বৈদ্য। তাঁহার পিতার নাম ৺ গোপী মোহন রায়। গোপীমোহন বাবু চট্টগ্রাম আদলতের সেরিস্তাদার ছিলেন। তিনি অতুল বৈভবের উত্তরাধিকারী হইয়া এবং নিজে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়াও স্বীয় বদান্যতার আতিশয্যে মৃত্যুকালে আপন পরিবারবর্গের কোন সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। নবীনচন্দ্রের জন্মগ্রহণের পর তৃতীয় দিবসে নয়াপাড়াগ্রামে এক মহা অগ্নিকাণ্ড হয়; ফলে গ্রামটী প্রায় ভস্মীভূত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের পর গ্রামটী নবীনভাব ধারণ করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার রসিকা গুরুপত্নী তাঁহার নাম 'নবীনচন্দ্র' রাখিয়াছিলেন। শৈশবে নবীনচন্দ্র দুষ্টামীর জন্য বিখ্যাত ছিলেন, এইজন্য চট্টগ্রাম স্কুলে অধ্যয়ন কালে তিনি wicked the great (অর্থাৎ দুষ্টের শিরোমণি) ইত্যাখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুষ্টামিতে উত্যক্ত হইয়া চট্টগ্রাম স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন যে গোপীমোহন বাবু অনেক তপস্যা করিয়া এমন পুত্ররত্নলাভ করিয়াছেন। নবীন বাবু তাঁহার পিতার না হউন, তিনি জননী বঙ্গভূমির যে বহুতপস্যার ফল, একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, চট্টগ্রাম স্কুলে বিদ্যাভ্যাসকালে নবীনচন্দ্র কবিতা লিখিতে বড় ভালবাসিতেন; এবং তাঁহার কবিতা দেবীর প্রতি আন্তরিক অনুরাগ উক্ত বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের যত্নে উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি চট্টগ্রাম স্কুল হইতে ১৮৬৩ খৃঃ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তাহার পর ১৮৬৫ খৃঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ, এ ও ১৮৬৭ খৃঃ জেনারেল এসেম্ব্লিজ কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তাঁহার ছাত্রজীবনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার রায়। চন্দ্রকুমার বাবুর পরামর্শ না লইয়া নবীনচন্দ্র কোন কার্য্যই করিতেন না। তিনি

'আমার জীবনে' লিখিয়াছিলেন, যে তাঁহার জীবনে যাহা কিছু ভাল তাহা বহুল পরিমাণে চন্দ্রকুমার বাবুর রচনা। এফ্, এ, পরীক্ষার একমাস পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হয়। এই 'অদ্ভুত বিবাহ ব্যাপার' কিরূপে সংঘটিত হইয়াছিল, নবীনচন্দ্র তাঁহার আত্মজীবনীতে তাহার বিস্তৃতবিবরণ দিয়াছেন। বি, এ, পরীক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বে পিতৃবিয়োগ ঘটে। অর্থের অনটনে প্রপীড়িত হইয়া নবীনচন্দ্র সেই বিপন্নের বন্ধু, আর্ত্তের সহায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হয়েন। যে মহাপুরুষের দয়ারসাগরের বারিসিঞ্চনে একদিন বঙ্গের অদ্বিতীয় কবি মধুস্থদন সমূহবিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, নবীনচন্দ্র তাঁহার স্নেহ ও করুণা হইতে বঞ্চিত হ'ন নাই। প্রেসিডেন্সি কলেজে পঠদ্দশা কালে কবিবর 'বিধবাকামিনী' রচনা করেন; এবং ইহার কিছুদিন পরে 'পিতৃহীন যুবা' রচিত হয়। এই দুইটী কবিতা এইসময়ে 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি স্থযোগ্য সমালোচকগণ এই দুইটী কবিতার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। 'পিতৃহীন যুবকের' প্রথমবার অষ্টশ্লোক মাত্র প্রকাশিত হয়। এরূপ কবিতা খণ্ড খণ্ড করিয়া সংবাদ পত্রে প্রকাশ করা অপেক্ষা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে ভাল হয়—কৃষ্ণকমল বাবু গ্রন্থকারের কতিপয় বন্ধুর নিকট এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। তাহাতেই 'অবকাশরঞ্জিনী' অঙ্কুরিত হয়। ১৮৬৮খৃঃ প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নবীনচন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হ'ন। তিনি বহু মহকুমায় বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া তিনি যে যে মহকুমায় অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানেই জনসাধারণের বিশেষ প্রীতি ও প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার উন্নত ও স্বাধীন চরিত্র হেতুক রাজপদ তাঁহার পক্ষে কুসুম শয্যা হয় নাই। ১৯০৫ খৃঃ রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শেষ জীবন তাঁহার চট্টগ্রামস্থিত 'লক্ষ্মীভিলা' কুটীরে অতিবাহিত করেন। তাঁহার শেষজীবনের ফল দুইখানি পুস্তক—অমৃতাভ (শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের লীলা) ও আমার জীবন (গ্রন্থকারের আত্মজীবনী—পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত) 'আমার জীবনের মাত্র দুইখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে; অবশিষ্ট তিনখণ্ড ও অমৃতাভ এখন যন্ত্রস্থ। ১৩১৫ সালের মাঘমাসে নবীনচন্দ্র পত্নী 'লক্ষ্মীদেবী'ও একমাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার নশ্বর জড়দেহ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইল বটে, কিন্তু তিনি আজ কি এক অমর, দিব্য জ্যোতির্ম্ময় দেহে বঙ্গবাসীর হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিরাজ করিতেছেন।

নবীনচন্দ্রের কাব্যাবলী।

অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়া নবীনচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে আপনার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তন্মধ্যে—

(১) অবকাশরঞ্জিনী।

'অবকাশরঞ্জিনী'ই তাঁহার প্রথম মানস প্রসূত রত্ন। 'অবকাশরঞ্জিনী'—কতকগুলি গীতিকবিতার সমষ্টি। ১২৭৮ সালে এই কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিম বাবু এই পুস্তকখানির বিস্তৃত সমালোচনা করেন এবং ইহাকে বঙ্গভাষায় একখানি অতি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য বলেন! গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যম বলিয়া এই কাব্যে অনেকগুলি দোষ আছে। ইহাতে সৃষ্টিবৈচিত্র্য, ঘটনাবৈচিত্র্য কিম্বা কোন রসের উৎকৃষ্ট অবতারণা লক্ষিত হয় না। অবকাশরঞ্জিনীর অধিকাংশ কবিতা ন্যূনাধিক দীর্ঘতা দোষে দুষ্ট। 'অবকাশরঞ্জিনীর' প্রথম কবিতা 'পিতৃহীন যুবক' ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সকল দোষ সত্ত্বেও 'পিতৃহীনযুবক' বঙ্গভাষায় একটী অতি অপূর্ব্ব কবিতা। এক হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীত' ভিন্ন বঙ্গভাষায় ইহার তুলনা নাই বলিলেও হয়। 'অবকাশরঞ্জিনীর' ভাষা সর্ব্বত্রই মধুর, পরিস্ফুট ও সরল কবি যখন যে ভাব পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহার অমৃতক্ষরণী লেখনীর গুণে সেই ভাবই অতি সুন্দর স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের সমালোচনায় বঙ্কিমবাবু নবীন বাবুকে বর্ণনায় গীতিতে সুসিদ্ধ বলিয়াছিলেন। এই উভয় গুণই অবকাশরঞ্জিনী কাব্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। আমার বোধ হয়, ছন্দলালিত্যে ও বহু উপমালঙ্কৃতা ওজস্বিনী ভাষার বর্ণনায় কোন বাঙ্গালী কবি নবীনচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'পিতৃহীন যুবক' হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

যামিনীর সুমধুর নূপুর-নিক্কন্
ঝিল্লিরবে ভাসিতেছে দিগ্ দিগন্তর ;
পাখার প্রহার শব্দ করে না কখন
ভগ্ন-নিদ্র পক্ষিগণ বৃক্ষের উপর।
কল কলরবে গঙ্গা সাগর সদন
যাইতেছে, অন্ধকারে ঢাকিয়া বদন।"

(২)

তরণী যাইতেছিল সাহসপবনে
বিস্তারি ধবল পাখা গগনমণ্ডলে ;
আশারূপ দীপাবলী উজলি সঘনে
দুর্গম, দুর্গমপথ ; না জানি কি ছলে
দরিদ্রতা তুলি শির মৈনাকের প্রায়
ডুবাইতে চাহে তরী কি করি উপায় ?

আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয় উক্তিমাত্র বিশিষ্ট অব্যক্তব্য কথাকে বঙ্কিম বাবু গীত কাব্যের আত্মা বলিয়াছেন। ইহাতেও নবীনচন্দ্র সামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন নাই। মানবহৃদয়ের সূক্ষ্ম ভাবগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি কিরূপ সুললিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, অবকাশ-রঞ্জিনীর যে কোন কবিতা পড়িলেই জানিতে পারা যায়। বিশেষ না বাছিয়া আমরা "পতিপ্রেমে দুখিনী কামিনী" হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

"প্রাণনাথ! অশ্রুবারি পড়ি ধরাতলে
শোভিছে শিশির-সম দুর্ব্বার আগায়।
আর কত বিন্দু নাহি পড়িতে ধরায়,
কোথায় উড়িয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের বলে
যাইতেছে নাহি জানি; হেন মনে লয়
পতির উদ্দেশ্যে তারা করিছে গমন।
নিরেট পাষাণময় যাহার হৃদয়
নয়নের জলে সে কি দ্রবিবে কখন।"

"কেমনে হৃদয়নাথ! জীবন জীবন,
ভুলিয়া রয়েছ এই দুঃখিনী তোমার;
কেড়ে নিয়ে অবলার পরিণয় হার,
কেমনে বিস্মৃতি-জলে দিলে বিসর্জ্জন?
কেমনে কাটিয়া দৃঢ় উদ্বাহ বন্ধন
শুকাইলে দুঃখিনীর সুখপ্রবাহিণী?
কেমনে ভুলিলে তব বিগত জীবন
বিগত প্রমোদ ক্রীড়া প্রণয়-কাহিনী?"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সুললিত পদবিন্যাসে ও ছন্দোনৈপুণ্যে নবীনচন্দ্র অতুলনীয়। শুধু ছন্দঃমাধুর্য্যে 'অবকাশ-রঞ্জিনীর কতক অংশ কিরূপ মনোরম হইয়াছে দেখুন।—

(১)

"সখিরে!
পরম আদরে অন্তরে আমার
রোপিনু প্রণয়-লতা,
বিষময় ফল ফলিল এখন
বাসনা হইল বৃথা।
জুড়াতে জীবন শীতল ছায়ায়
বসিনু মনের সুখে,
কে জানিত হায়! কোটর হইতে
ভুজঙ্গ দংশিবে বুকে।"

(২)

"সখিরে!
বিচ্ছেদ যাবার নয়, বিচ্ছেদ ত যায় না।
প্রেমসহ এই পোড়া বিচ্ছেদ লুকায় না।
জীয়ন্তে তনা ছাড়িবে প্রাণান্তেও সঙ্গে যাবে,
বিচ্ছেদ যাবার নয় বিচ্ছেদ ত যায় না।
প্রাণসখি! বিচ্ছেদ লুকায় না।"

নবীনচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই বিদ্রুপ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। সেইজন্য কোন এক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে কোন এক প্রসিদ্ধ পুস্তকের সমালোচনা পড়িয়া

তিনি 'এবার" এই কবিতাটী লিখিয়াছিলেন। আবার কাশীনরেশকে লক্ষ্য করিয়া তিনি "বুড়ামঙ্গল" রচনা করেন। শেষোক্ত কবিতার সম্বন্ধে হাস্যাবতার অমৃতবাবু লিখিয়াছেন—

"নন্দনে রচিলে বসি মকর কেতন
হ'ত কি না হ'ত কাব্য তোমার মতন।"

অবকাশ-রঞ্জিনীতে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা আছে। তন্মধ্যে 'পিতৃহীন-যুবক' ও 'সায়ং-চিন্তা' এই দুইটী কবিতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

(২) পলাশীর যুদ্ধ।

১২৮২ সালে এই উৎকৃষ্ট অপূর্ব্ব কাব্যখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। এই কাব্য লিখিয়া নবীনচন্দ্র 'বঙ্গের বায়রণ' বলিয়া অভিহিত হয়েন। তিনিও বায়রণের ন্যায় বলিতে পারেন, "আমি নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিলাম যে আমি একজন বিখ্যাত হইয়াছি।' বায়রণ Childe Harold লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, নবীনচন্দ্র ও 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখিয়া কাব্যজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ২২বৎসর বয়সে নবীন বাবু "পলাশীর যুদ্ধ" আরম্ভ করেন এবং ২৮ বৎসর বয়সে এই কাব্য শেষ হয় সুতরাং এই কাব্য নবীনচন্দ্রের পূর্ণযৌবনের রচনা। যৌবন সমাগমে মানবদেহ যেমন মাংসপেশীর পরিপুষ্টির দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের এক অবিনশ্বর অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য সৃজন করিয়াছে। কবির হৃদয়ে যেন চিরবসন্ত বিরাজমান। ভাষা সর্ব্বত্র সতেজ ও সুন্দর। ভাষার উপর নবীনচন্দ্রের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।

'পলাশীর যুদ্ধ' ঐতিহাসিক কাব্য। ঐতিহাসিক কাব্য বলিতে কেহ যেন না বুঝেন যে পলাশীর যুদ্ধে কোন স্থানে ইতিহাসের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কেন না কাব্য যে ইতিহাস নহে এ কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। ভব-ভূতির ন্যায় মহাকবিও রামসীতার চরিত্রাঙ্কনে সর্ব্বত্র বাল্মীকির অনুগামী হন নাই। কবি ইতিহাসকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপর কাব্যমন্দির প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেন। ইতিহাস সময়ে সময়ে কাব্যের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে বটে, কিন্তু ইতিহাস কখনও কাব্যের প্রাণ হইতে পারে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে 'পলাশীর যুদ্ধ' ঐতিহাসিক কাব্য। বিষয়—সিরাজদ্দৌলার বৃত্তান্ত ও বঙ্গে ইংরাজশ্রীবৃদ্ধির প্রথম অভ্যুদয়। এই পলাশীপ্রাঙ্গনে বঙ্গে মোগলের রাজ্যাভিনয়ের শেষ অঙ্ক অভিনীত হয়; এই পলাশীপ্রাঙ্গনেই বঙ্গগগনে ইংরাজের বিজয় পতাকা প্রথম সগৌরবে উড্ডীন হয়; এই পলাশী-

প্রাঙ্গনেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রথম মিলন হয়; এই স্থানেই দুই ভিন্নজাতীয় সভ্যতা পরস্পরকে আঘাত করিয়া বর্ত্তমান ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি করে। সুতরাং কবির পক্ষে ইহার অপেক্ষা উচ্চ ও গৌরবজনক বিষয় নির্ব্বাচন সম্ভব নহে।

পলাশীর যুদ্ধ অনতি বৃহৎ পাঁচ সর্গে বিভক্ত। প্রথম সর্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নবাব বিদ্রোহীগণের কুমন্ত্রণা, দ্বিতীয় সর্গে ব্রিটিশ সৈন্যের শিবির সন্নিবেশ, তৃতীয় সর্গে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলার মানসিক অবস্থা, চতুর্থ সর্গে যুদ্ধ ও পঞ্চমসর্গে নবাবের অন্তিমঅবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

১২৮৭ সালে রঙ্গমতী কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়। মহাকাব্যের ন্যায় ইহাতে নায়ক ও নায়িকা সন্নিবিষ্ট থাকিলেও রঙ্গমতী বহুলপরিমাণে বর্ণনা কাব্য। বঙ্গদেশ প্রকৃতির লীলাভূমি; এবং নবীনচন্দ্র যে ভাবে বঙ্গের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অতি মনোরম হইয়াছে। এই কাব্য আদ্যন্ত গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ, ইহার ভাব গম্ভীর, কথা গম্ভীর, রচনা গম্ভীর। কাব্যখানি পড়িবার সময় মন প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয় সাত্ত্বিকভাবে পরিপূর্ণ হয়। নবীনবাবু এই কাব্য দুইটী আদর্শ চরিত্রপুষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন; তাঁহার বীরেন্দ্র আদর্শ মহাপুরুষ, শঙ্কর আদর্শ ভৃত্য। যে যে গুণ থাকিলে মানুষ পৃথিবীর আদর্শ স্থানীয় হইতে পারে, বীরেন্দ্রে সেই সমস্ত গুণ বিদ্যমান ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি—

বিদ্বান আদর্শ তুমি; বীর অলঙ্কার; সঙ্গীতসুধার সিন্ধু; শিল্পের সোহাগ;
দয়ার দক্ষিণ হস্ত, দেশ অনুরাগ ছিল প্রজ্জ্বলিত তব হৃদয়ে অপার।
যশের আকর তুমি; গাম্ভীর্য্যে জলধি; পরদুঃখে মন তব আর্দ্র নিরন্তর;
স্নেহজলে নেত্রদ্বয় সিক্ত নিরবধি; গৌরব ব্যঞ্জক তব ললাট সুন্দর।

জননী ও জন্মভূমির প্রতি তাঁহার অপরিসীম ভক্তি ছিল। তিনি যখন শঙ্করের মুখে শুনিলেন যে তাঁহার স্নেহময়ী মাতা মণিকর্ণিকার ঘাটে দেহত্যাগ করিয়াছেন, সেই সময় হইতেই জননীর অন্তিমস্থান দেখিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইল। যৌবনে বারানসী তীর্থে যাইয়া তিনি মণিকর্ণিকার 'ভীষণ অনির্ব্বাণ শ্মশানে" অশ্রুবিগলিত নেত্রে জননীর উদ্দেশ্যে তর্পণ করিলেন। কবিবরের সুলোচনার ন্যায় শঙ্কর কখন

"হাসে নাই নিজ সুখে, কাঁদে নাই নিজ দুঃখে,
চির প্রেমময়ী সলিলের মত
আপন তরল প্রাণ পরে করিয়াছে দান"

এই কাব্য কুসুমিকার সমাবেশ—'বিরাট-দৃশ্য-বিশাল আম্র-স্তর-প্রবিষ্ট স্বুবর্ণ শিরা সদৃশ'। সরলহৃদয়া, প্রেমময়ী কুসুমিকা শেক্সপীয়রের জুলীয়েটের ন্যায় অকালে কালের ক্রোড়ে শয়ন করিলেন।

——————'হায় এক বৃন্তে
ফুটেছিল দুটী ফুল সংসার-কাননে
এক সঙ্গে দুটী ফুল পড়িল খসিয়া।"

(৪-৬) রৈবতক—কুরুক্ষেত্র—প্রভাস।

"পলাশীর যুদ্ধ" রচনা করিবার পর নবীনচন্দ্র একবার ভারতের সমগ্র ইতিহাস খুঁজিয়া দেখিলেন—কিন্তু সর্ব্বত্র সেই মিরজাফর, সেই ভবানন্দ, সেই জয়চাঁদ ইহার পৃষ্ঠায় বিরাজ করিতেছে। এইজন্য তিনি ইতিহাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া আদর্শচরিত্রাঙ্কনে যত্নবান হইলেন। সেই চেষ্টার ফল রঙ্গমতী কাব্য। রঙ্গমতী কাব্যে বীরেন্দ্রে তিনি সেই আদর্শ চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও কবির মন তৃপ্ত হইল না। তিনি আর একবার ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও এই আদর্শ চরিত্র পাওয়া যায় কি না; দেখিলেন যে কেবল একজন অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ স্বীয় অদ্ভুত প্রতিভাবলে এই পরস্পর বিবাদকারী খণ্ড ভারতে শান্তিময় মহাভারত স্থাপনে সমর্থ হইয়া ছিলেন। ইনিই বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহার প্রতিভালোকে পতিত নরনারীগণ অধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতমশেখরে আরোহণ করিয়াছিল।

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যময় জীবনের ইতিহাস। ১২৯৩সালে রৈবতককাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র প্রভাসের শেষ সর্গে লিখিয়াছেন—

'চতুর্দ্দশ বর্ষ ব্যাপে। এরূপে বসিয়া ধ্যানে
গাইয়াছি কৃষ্ণনাম এরূপে বিমুগ্ধ প্রাণে।"

এই তিন খানি কাব্য প্রণয়ণে নবীনচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র প্রভাসের পর বঙ্গসাহিত্যে নবীনচন্দ্রের স্থান সম্বন্ধে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। হীরেন্দ্রবাবু প্রমুখ সমালোচকগণের মতে—অবশ্য এইমত তাঁহারা ইঙ্গিতে প্রকাশ করেন—নবীনচন্দ্র বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। মধুসূদন ও হেমচন্দ্র তাঁহার সমকক্ষ নহেন। নব্যভারত প্রমুখ সমালোচকগণের

মতে মধু, হেম, নবীন তিনজনেই বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি—'একে তিন, তিনে এক'—সুতরাং তুলনা অপ্রার্থনীয়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ সমালোচকগণের মতে নবীনচন্দ্র কোন উচ্চশ্রেণীর গায়ক নহেন। এমন কি শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় রৈবতক প্রভৃতি কাব্যত্রয়ে মন খুলিয়া প্রশংসা করিতে পারা যায়, এমন গুণ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও পান নাই (উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারতে উপসংহার ভাগ)। এক্ষণে রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস এই তিনটি কাব্য আমাদের সমালোচনার বিষয়; বঙ্গসাহিত্যে নবীনচন্দ্রের স্থান সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি উপায়ে খণ্ডভারতে মহাভারত সংস্থাপন করিয়াছিলেন'—ইহাই রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে এই কাব্যত্রয় বিরচিত; রৈবতক তাঁহার আদ্যলীলা; কুরুক্ষেত্রে মধ্যলীলা ও প্রভাসে অন্তিমলীলা বর্ণিত হইয়াছে। খণ্ডভারতে মহাভারত স্থাপনের জন্য প্রথমতঃ বহুবল প্রয়োজন। বাসুদেব জানিতেন যে অর্জ্জুনের তুল্য পরাক্রমশালী বীর সেই সময়ে আর কেহই ছিলেন না। এইজন্য তিনি অর্জ্জুন ও তাঁহার ভগ্নী সুভদ্রার পরিণয় কৌশলে সম্পাদন করিয়া পাণ্ডব ও যাদব শক্তি সম্মিলিত করেন। কুরুক্ষেত্র কাব্যের প্রধান ব্যাপার—অভিমন্যু বধ। অভিমন্যুর মৃত্যুর পর শোকোন্মত্ত অর্জ্জুন ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। ফলে চারিদিনে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হইল; এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমগ্র ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইলেন। বাহুবলে ভারতখণ্ডে মহাভারত স্থাপিত হইল বটে; কিন্তু তাহার ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়দিগকে এক জাতিত্বে পরিণত করিতে হইবে। তাহাদিগকে একধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি যাগ-যজ্ঞাদি প্রসিদ্ধ বৈদিক ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে এ নিষ্কাম, সনাতন ব্রহ্মধর্ম্মের ঘোষণা করিলেন। এই ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনই শ্রীকৃষ্ণের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য;—

"এক ধর্ম্ম, এক জাতি,
এক রাজ্য, এক নীতি,
সকলের এক ভিত্তি, সমভূত হিত;
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম,
লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম,

"'একমেবাদ্বিতীয়"—করিব নিশ্চিত
ওই ধর্ম্মরাজ্য মহাভারত স্থাপিত।"

'প্রভাস" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তিমলীলা। এই কাব্যে যদুবংশ ধ্বংস ও অনার্যগণ কর্ত্তৃক যাদবরমণী লুণ্ঠন বর্ণিত হইয়াছে এইরূপে আর্য্য ও অনার্য্য জাতির সম্মিলন হয়। শ্রীকৃষ্ণ অনার্য্য জরৎকারুর শরে দেহত্যাগ করেন এবং যাদবের পুণ্যভাগ নবধর্ম্ম প্রচারার্থে পশ্চিমাভিমুখে মহাপ্রস্থান করিলেন।

কুরুক্ষেত্র কাব্য সমালোচনায় নব্যভারত সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনার জন্য নবীনবাবু বঙ্কিমবাবুর নিকট সম্পূর্ণরূপে ঋণী। কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনায় যে নবীনবাবুর নিজস্ব, ইহার জন্য তিনি কাহারও নিকট আদৌ ঋণী নহেন; বরং নবীনবাবুর কল্পনা স্থানে স্থানে বঙ্কিমবাবুর অগ্রবর্ত্তী, একথা হীরেন্দ্রবাবু নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত করিয়াছেন [সাহিত্য ১৩০০ সাল]। আর যদিই বা কল্পিত বিষয় নবীনচন্দ্রের নিজস্ব না হয়, তাহাতেই কি তাঁহার কবিপ্রতিভা ও যশঃ নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে; শেক্ষপীয়র, মিলটন কালিদাস ভবভূতি, মধুসূদন ও ভারজিল প্রভৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণ তাঁহাদের কাব্যের আখ্যানবস্তু অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। যে বিদ্যাসুন্দর লিখিয়া ভারতচন্দ্রের নাম এক সময়ে বঙ্গের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইয়াছিল, সেই বিদ্যাসুন্দরের আখ্যানবস্তু কি ভারতচন্দ্রের নিজস্ব? তিনি কি ইহার জন্য রামপ্রসাদের নিকট সম্পূর্ণ রূপে ঋণী নহেন? কল্পিত বিষয়ের যথোচিত চিত্রাঙ্কনেই কবিপ্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কল্পনার নূতনত্বে নহে।

ঔপন্যাসিক ও নাটককারেরা সমাজের যথোচিত চিত্র অঙ্কিত করুন,—কবি-প্রতিভার জন্য আরও উচ্চতর বিষয় আছে। কবি সৌন্দর্য্য বা আদর্শচরিত্র সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে ক্ষণকালের জন্য এই ঝঞ্ঝাপূর্ণ সংসার হইতে তাঁহার কল্পনার ত্রিদিবে লইয়া যান। নবীনচন্দ্র রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, ও প্রভাস এই তিনটী কাব্যে অনেকগুলি আদর্শচরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মানব। সুভদ্রা নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি, অর্জ্জুন আদর্শ বীর, ও রুক্মিণী আদর্শ হিন্দুপত্নী। আবার অভিমন্যু ও উত্তরাচরিত্রে তিনি সরল প্রেমিক প্রেমিকার কি অপূর্ব্ব চিত্র দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণ ও সুভদ্রার চরিত্রাঙ্কনই নবীনচন্দ্রের কাব্যজীবনের অক্ষয়কীর্ত্তি। এই দুইটী চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তিনি কাব্যজগতে চিরযশস্বী হইয়াছেন। শুধু বঙ্গভাষায় কেন, পৃথিবীর কোন

ভাষায় এমন মহান্ ও উদার, প্রেমময় নিখুঁৎ চরিত্র কখনও অঙ্কিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আমারা এই দুইটী চরিত্রের নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ।—বাহুবল, জ্ঞানবল ও ধর্ম্মবল এই তিন শক্তির সম্মিলনে, অপূর্ব্ব কৃষ্ণচরিত্র গঠিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বাহুবলে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি দ্বন্দ-যুদ্ধে কংস ও শিশুপালকে নিধন করিয়াছিলেন। তিনি অদ্বিতীয় রণপণ্ডিত ও রাজনৈতিক ছিলেন। তিনি মগধ রাজ্যের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইতে ব্রজপুরী রক্ষা করেন

ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যেই তাঁহার অনুচর ছিল। তাহারই তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রাজনৈতিক অবস্থা জ্ঞাপন করিত। তিনি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন। বাসুদেবও সময়ে সময়ে তাঁহার নিকটে মস্তক অবনত হইতেন। তিনি জ্ঞাননেত্রে দেখিয়াছিলেন যে ধর্ম্মস্থাপনের জন্য মহাভারত স্থাপিত না হইলে শান্তি স্থাপিত হইবে না। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ভদ্রার্জ্জুনের বিবাহ দ্বারা পাণ্ডব ও যাদবশক্তি মিলিত করেন, এবং এই মিলিত শক্তি দ্বারা তিনি ভারতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, ব্যাসদেব তাহাই সঙ্কলন করিয়া গীতা নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি যখন দেখিলেন যে অর্জ্জুন অনিচ্ছায় শ্লথকরে বিবাদ করিতেছে, তাহাতে এই বিবাদ অচিরে নির্ব্বাপিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তিনি ভাবিলেন—

"যদি কোন ঘটনার ভীষণ আঘাত,
নাহি করে এ হৃদয় কুলিশ কঠিন
এইরূপে দ্রোণাচার্য্য মৃত্যু অভিনয়
বিভীষণ করিবেক আরো কতদিন।"

তাঁহারই কৌশলে একদিন অভিমন্যু ও অর্জ্জুনকে বিভিন্নস্থানে যুদ্ধ করিতে হয়; এবং সপ্তরথী বেষ্টিত হইয়া অভিমন্যু যুদ্ধে নিহত হন। তিনি নিজে অদ্বিতীয় বীর হইয়াও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে স্বয়ং নির্লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার হৃদয় কারুণ্যের আধার ছিল। তাঁহার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত বাসুকিকে তিনিই বলদেবের রোষানল হইতে রক্ষা করেন। অভিমন্যুর শ্মশানে উত্তরা ও অর্জ্জুনের শোকছবি এবং সুভদ্রার উদাসীন ভাব নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"মানবের উষ্ণরক্ত বিনা মানবের পাপ,
মানবের শোক বিনা মানবের পরিতাপ,

না হয় মোচন যদি ; মানবের মুক্তিপথ
রক্তসিন্ধুগর্ভে, যদি শ্মশানে দাবাগ্নিবৎ
একই নির্ঘাতে নাথ! একই নির্ঘোষে হায়!
কৃষ্ণের শোণিতে কেন ভাসালেনা এধরায়।"

তিনি বেদপীড়িত ও পৌত্তলিকা প্লাবিত দেশে সরল, উদার, নিষ্কাম, পবিত্র পরমব্রহ্মার উপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার মতে—

মানুষ চিরবিকাশশীল ও অনন্ত উন্নতিশীল, এবং স্বয়ং নারায়ণ সেই উন্নতির পূর্ণ আদর্শ। এই জন্যই তিনি আর্য্য ও অনার্য্য জাতিগত ভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না ও ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই।

এই সকল কারণে দুর্ব্বাসাপ্রমুখ বিপ্রগণ তাঁহাকে তাহাদিগের শত্রুর মধ্যে গণনা করিতেন।

সুভদ্রা।—শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী ও শারণের সহোদরা। শৈশব হইতেই তাঁহার হৃদয় কারুণ্যের আধার ছিল। শৈশব হইতেই যেইখানে রোগী, শোকী ভদ্রা সেইখানে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা—সকলেই তাঁহার কৃপার পাত্র। তিনি প্রকৃতির উপাসিকা ছিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব প্রকৃতির উপাসনা দেখিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও মুগ্ধ হইতেন। একদিন—

'যখন বহিছে ঝটিকা ঘোর রৈবতক শিরে'
'আচ্ছন্ন গগন নব বরিষার মেঘে'

বাসুদেব দেখিলেন, 'শেখর সীমায়
সায়াহ্ন গগনতলে, ঘোর ঝটিকায়
দশম বর্ষীয়া ভদ্রা বসি একাকিনী
একটি উপল খণ্ডে স্থির দুনয়ন
সমেঘ পশ্চিমাকাশে রহেছে চাহিয়া।'

তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রে ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি রথে মূর্চ্ছিত ও অগণ্য যাদববীরের শরজালে বেষ্টিত অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়া অদ্ভুত সারথ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। রৈবতকে অর্জ্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের অতিথি ছিলেন, সেই সুভদ্রা অর্জ্জুনের বীরত্বে ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার

হৃদয়ে অর্জ্জুনের প্রতি ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত হয়। সেই ভালবাসা—সেই প্রেম ক্রমশঃ গভীর, গভীরতর হইয়া তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়াছিল, কিন্তু কখনও উদ্বেলিত উদ্ভাসিত করে নাই। তিনি জানিতেন—

"হৃদয়েতে যবে করেছি স্থাপন
বাকি আছে কিবা বিবাহ আর।"

দুর্য্যোধনের সহিত বিবাহ স্থিরীকৃত হইলে তিনি আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য সর্ব্বদা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, কিন্তু কখনও গুরুজনের কথায় প্রতিবাদ করেন নাই। অর্জ্জুন যখন তাঁহার নিকট সুভদ্রা হরণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন, তাহাতে কত শত যাদববীর প্রাণত্যাগ করিবে ইহা ভাবিয়া তাঁহার কোমল হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় তিনি আর্ত্ত ও আহতের সেবায় তাঁহার পবিত্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সম্রাট ও ভিক্ষুক, সৎ অসৎ, শত্রু ও মিত্র, আর্য্য ও অনার্য্য জ্ঞানী ও মূর্খ—সকলেই তাঁহার সমান কৃপার পাত্র ছিল। বরং যে অসৎ যে পাপী, যে দরিদ্র তিনি তাহাকেই সমধিক ভালবাসিতেন; কারণ—

"যেই জন পুণ্যবান কে না তারে বাসে ভাল
তাহাতে মহত্ত্ব কিবা আর?
পাপীকে যে ভালবাসে আমি ভালবাসি তারে
সেই জন প্রেম অবতার।"

তিনি তেজস্বিনী ক্ষত্রিয় রমণী ছিলেন। তিনি কর্ণ-দুর্ব্বাসার মন্ত্রণা অবগত হইয়াও তাঁহার প্রিয়পুত্র অভিমন্যুকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিলেন না; সেই প্রশান্ত হৃদয় কেবলমাত্র একবার বিচলিত হইয়াছিল—সেই শান্ত স্থির দুনয়নে একবার মাত্র শোকাশ্রু দেখাদিয়াছিল, সে কেবল তাঁহার প্রিয়পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুতে, সেই ষোড়শবর্ষীয় বালকের শ্মশানে। কিন্তু সমুদ্রে জল বুদ্বুদ্ কতক্ষণ স্থায়ী হয়? তিনি পরমুহূর্ত্তেই দেখিলেন—

"সমগ্র মানবজাতি আজি অভিমন্যু সম
আজি অভিমন্যু মম বিশ্ব চরাচর।"

ধরাতলে কৃষ্ণপ্রেম প্রচারেই তাহার শেষজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহারই পবিত্রমুখে পুণ্যময় কৃষ্ণনাম শুনিতে শুনিতে কৃষ্ণদ্বেষী দুর্ব্বাসা স্বর্গধামে গমন করিল।

রৈবতক প্রভৃতি কাব্যত্রয়ের ভাষা মধুর, পরিস্ফুট ও প্রাঞ্জল ; বর্ণনা সংক্ষিপ্ত ও মনোহর। অধিকাংশ স্থলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ; ইহা মেঘনাদের ছন্দঃ অপেক্ষা প্রাঞ্জল ও বৃত্রসংহারের অমিত্রাক্ষর অপেক্ষা সরস। কাব্য গুলি চিত্তাকর্ষক করিবার নিমিত্ত নবীনবাবু মধ্যে মধ্যে মিত্রাক্ষর ছন্দও ব্যবহার করিয়াছেন।

অধুনাতন এ বিড়ম্বিত বঙ্গে জাতীয় বাঙ্গালা কাব্য বিরল। কুরুক্ষেত্র বাঙ্গালা জাতীয় কাব্য। কৃষ্ণপ্রেম প্রায় কুরুক্ষেত্রের চরম উদ্দেশ্য। ভগদ্বাণী গীতার সুধাময় মর্ম্মসূত্র সঞ্চার করা কুরুক্ষেত্রের ঐকান্তিক লক্ষ্য। যদি ভাষা লীলা দেখিতে চাও, কুরুক্ষেত্র পড়। যদি ভাব প্রবাহে ডুবিতে চাও, কুরুক্ষেত্র পড়। যদি চরিত্রসৃষ্টির সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতে চাও কুরুক্ষেত্র পড়।

৭। অমিতাভ কাব্য।

অমিতাভ নবীনচন্দ্রের শেষ প্রকাশিত মৌলিক কাব্য। ভগবান বুদ্ধদেবের পুণ্যময় জীবন চরিত অবলম্বনে এই কাব্য বিরচিত হইয়াছে। এই পুস্তকের কতক অংশ ইংরাজকবি Edwin Arudo এর Light of Asia হইতে গৃহীত। এই কাব্য দোষ গুণের বিশেষ বাহুল্য নাই। নবীন বাবু ইহাতে চরিত্র সৃষ্টির কোন প্রয়াস পান নাই ; বুদ্ধদেবের পবিত্র জীবনের কতিপয় ঘটনা গীত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। অমিতাভের ভাষা সর্ব্বত্রই মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী ; এবং বর্ণনাগুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী।

৮। অনুবাদ কাব্য।

নবীনচন্দ্র গীতা, চণ্ডী ও ম্যাথু রচিত বাইবেলের পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ শক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি গ্রন্থের ভাব ও অর্থ বিকৃত না করিয়া সরল ও সুন্দর ভাষায় অবিকল অনুবাদ করিতে পারিতেন। তাঁহার অনুবাদ পড়িলে মৌলিক গ্রন্থ বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

ক্রমশঃ

একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।

লেখক—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী ।

গভীর জীমূতমন্দ্র গর্জ্জিছে ভীষণ—
দলে দলে দ্বন্দযুদ্ধে মহা ঝনৎকার !
তীব্রাদপি তীব্রবেগে কুলিশ পতন—
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া শুনি শব্দ হাহাকার !
ভয়ে লুক্কায়িত রবি তারা সুধাকর ;
গ্রাসিয়ে ব্রহ্মাণ্ড সূচীভেদ্য অন্ধকার,
দেখাইছে প্রহেলিকা ঝঞ্ঝাবৃষ্টিধার—
বিজলী রাক্ষসী সহ—একি ভয়ঙ্কর !
সে মহাপুরুষ কেবা কে জান বলনা,
অপূর্ব্ব-সঙ্গীত এই রচনা যাঁহার ।
জানি যদি করি আমি তাঁর উপাসনা—
আমিত্বে অঞ্জলি দিই চরণে তাঁহার !
মনে হয় এ সঙ্গীতে যেথা আছে সম্
সেথা ধ্যানমগ্ন একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।

বিস্ময়কর মিলন ।

লেখক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, বি, এল ।

স্বরগের দেবী তুমি, হে ধীরা ললনে !
মানবীতে হেন ভাব, অসম্ভব আশা ।
নারীর আলোকময় দেহ আবরণে,
ঢাকিয়া রেখেছে নিত্য প্রেম ভালবাসা ।

চিররোগ গ্রস্তে তুমি ঋষি আশীর্ব্বাদ,
আঁধার ব্রহ্মাণ্ডে ঢাকা আলোক গৌরব ।
গরল রাশির মাঝে অমৃতের স্বাদ,
শবরাশি মাঝে এক জীব অবয়ব ॥

মেঘের উপরে তুমি, শশীর উদয়,
ঝঞ্ঝাবাত মাঝে তুমি, স্থির৷ ধ্রুবতারা।
অদ্ভুত প্রকৃতি তুমি, অতীব বিস্ময়,
তুমি মাধুর্য্যের সার, তুমি ব্রহ্মাকারা॥

দুই অঙ্গ শিব শিবা এক হয়েছিল,
দুই অঙ্গ হরি-হর একত্রে মিলন।
দ্বিত্ব প্রেমে, প্রিয়তমে বিঘ্ন উপজিল।
এসো মিলি এক দেহ করি হে ধারণ॥

এক আশা, এক ইচ্ছা, দোঁহে এক মন,
স্বরগ নরক এক, এক আত্মা প্রাণ।
একই জীবন, আর একই মরণ;
এক মুক্তি, এক ধ্বংশ, একই নির্ব্বাণ॥

বাক্যেতে এ প্রেম কভু ব্যক্ত নাহি হয়,
বাক্যরথে প্রেম-রাজ্যে কে পারে যাইতে?
হের প্রেম প্রিয়ে, আমি চিরি এ হৃদয়,
মরি তব কোলে, মুখ দেখিতে দেখিতে॥

প্রেমাবেশে প্রেয়সীরে এত কথা বলি,
প্রেমিক নাগরবর বাহু পসারিয়া,
ধরিয়া কামিণীকণ্ঠ হয়ে কুতূহলী,
বসিলা কমল দলে, একাঙ্গ হইয়া॥

শোভিল যুগল রূপে, রম্য উপবন,
শোভে যথা হরগৌরী, কৈলাশ অচলে।
প্রেমে প্রেমে দেখাইলা অপূর্ব্ব মিলন,
শোভিল কমল-মাল্য উভয়ের গলে॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতোক্ত।

সাধারণ উপদেশ।

আদি-লীলা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সঙ্কলিত।

৪২। সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ—যারে জ্ঞান করি মানি॥ ঐ ১৪

৪৩। সন্ধিনীর সার অংশ—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার। ঐ

৪৪। কৃষ্ণের ভগবত্তা-জ্ঞান—সংবিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥ ঐ

৪৫। হ্লাদিনীর সার—'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব"।
ভাবের পরমকাষ্ঠা—নাম মহাভাব॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥ ঐ

৪৬। রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥ ঐ ১৫পৃঃ

৪৭। কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন॥

এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেই করে।
তৃষ্ণা-শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি ভাল, না জানে সৃজন॥
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমিষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি॥ ১৭পৃঃ
৪৮। কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে, সেই ভাগ্যবান্॥ ঐ

সমালোচনা।

সংক্ষিপ্ত শিশু ও বাল চিকিৎসা।—

শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর এল, আর, সি, পি, প্রণীত, মূল্য আড়াই টাকা। শৈশবে ও বাল্যাবস্থায় সচরাচর যে সকল পীড়া জন্মে, তাহার চিকিৎসা সাধারণ চিকিৎসা প্রণালীর অনুগত হয় না; ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন প্রকার চিকিৎসা প্রয়োজন। আমবাত, প্রদাহ, রসতড়কা, যকৃৎ, ইচ্ছাবসন্ত, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধ, কোষ্ঠ কাঠিণ্য জ্বর এবং ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি অনেক রোগ শিশুদেহ আশ্রয় করে, শৈশবরোগের ন্যায় বাল্যাবস্থাতেও অনেকপ্রকার রোগ হয়, সে সকল রোগ নির্ণয় করিয়া বিধিমত চিকিৎসা করা বহু বিবেচনা সাপেক্ষ; কারণ—শিশুগণ কথা কহিয়া রোগ যন্ত্রণা ব্যক্ত করিতে পারে না; কতক অনুমানে ও কতক কতক লক্ষণ দর্শনে নির্ণয় করিয়া লইতে হয়, বলিতে গেলে শিশু চিকিৎসা ও পশু চিকিৎসা প্রায় সমান, সকল চিকিৎসকের দ্বারা ঠিক ঠিক রোগ নির্ণয় হয় না, বলিয়া শৈশবে মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। শিশুগণের চিকিৎসায় চিকিৎসকগণকে বিশেষ সতর্ক হইতে হয়। সুবিচক্ষণ ডাক্তার আর, জি, কর প্রস্তাবিত পুস্তকে সংক্ষেপে শিশুগণের ও বালকগণের চিকিৎসা প্রকরণ ও পথ্যাদির নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উদাহরণ ও বিশেষ চিকিৎসার ফল এই পুস্তকে লিখিত আছে, এইরূপ একখানি পুস্তকের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল, ডাক্তার আর, জি, কর সেই আবশ্যকতা অনুভব করিয়া এই পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত হইলেও চিকিৎসক মহাশয়েরা ইহার দ্বারায় বিস্তর উপকার লাভ করিবেন,

গৃহস্থ পরিবারেও এই পুস্তকের উপযোগিতা অনুভূত হইবে। ডাক্তার আর, জি, কর শিশুরোগ ও বালরোগ শান্তির উপায় নিরূপণ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন, সাধারণ্যে ইহার আদর হইলে সুবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত আর জি, কর মহাশয় এতৎ দেশের জনকজননীর আশীর্ব্বাদ লাভকরিবেন সন্দেহ নাই।

আর্য্যজ্বর-চিকিৎসা।—কবিরাজ স্বর্গীয় ধনঞ্জয় নন্দী প্রণীত, তদীয় পুত্র শ্রীফণীন্দ্রনাথ নন্দী দ্বারা পাইক পাড়া হইতে প্রকাশিত, জন্মভূমি প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য একটাকা।

কবিরাজ মহাশয় এই পুস্তকে বিশেষ গুণপনার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কি কারণে জ্বরের উৎপত্তি, জ্বর কত প্রকার, কোন কোন জ্বরের কি প্রকার লক্ষণ, কোন্ কোন্ জ্বরে কি প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা, কি প্রকার ঔষধ ও কি প্রকার পাচন এবং উপসর্গ নিবারণের জন্য কি প্রকার মুষ্টিযোগ এবং উপসর্গ নিবারণার্থ কি প্রকার মুষ্টিযোগের প্রয়োগবিধি, এই পুস্তকে বিশদরূপে তাহা লিখিত হইয়াছে। এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক মতে জ্বর চিকিৎসার অনেকগুলি পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, কবিরাজী মতে জ্বরচিকিৎসার এক খানিও পুস্তক বঙ্গভাষায় ছিল না। সুপণ্ডিত নন্দী মহাশয় সেই অভাবের পুরণ করিয়াছেন। কেবল জ্বর চিকিৎসার প্রণালীই যে এতৎ পুস্তকের নির্ঘণ্ট, তাহ' নহে, ঋষিবাক্যের সহিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণের মতের তুলনা করিয়া নন্দীমহাশয় অতি পরিস্ফুটরূপে তাহার ফলাফল ও ব্যাখ্যা বুঝাইয়া-দিয়াছেন, ইংরাজি চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল, জ্বরচিকিৎসা ডাক্তার মহাশয়গণের প্রণীত ও সঙ্কলিত পুস্তকগুলি যে তিনি মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা করিয়াছিলেন, এই পুস্তক পাঠে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদ্যকশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি এবং ইংরাজীশাস্ত্রের অনুশীলন এই উভয়ের সামঞ্জস্যবিধান থাকাতে পুস্তকখানি বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। আমাদের কবিরাজ মহাশয়েরা অনাদর না করিয়া এখানি অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে ইহার গুণাগুণ বুঝিতে পারিবেন, বৈদ্যকমতে জ্বরের চিকিৎসা করিতে যাঁহারা অনুরাগী এই পুস্তকের সাহায্যে তৎবিষয় তাঁহারা অনেক উপকার পাইবেন, সাহস করিয়া এ কথা বলা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে যাহাতে জ্বর চিকিৎসক বৈদ্যের সংখ্যাধিক্য হয়, নন্দী মহাশয় সেইরূপ আশা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পুস্তকের গুণ বিচার করিয়াছেন আমরাও আশা করিতেছি, তাঁহার আশা পুর্ণ হইবে



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৭শ বর্ষ। ১৩১৬ সাল, মাঘ। ১০ম সংখ্যা।

চিরযৌবন।

লেখক—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম, এ,

যৌবন, কি মানব, কি পশু পক্ষী, কি কীট পতঙ্গ, কি প্রকৃতির অন্যান্য পদার্থসমূহ সকলের সম্বন্ধেই অতি মনোহর কাল সন্দেহ নাই। এই যৌবন কালের দৃশ্য হৃদয়ানন্দকারী, আশার সুখস্বপ্ন; কি মানব, কি অপরাপর জীব সকলকেই এই সময়ে অনুপ্রাণিত করে ও দেহ মনকে পুষ্ট করিয়া নয়নানন্দকর শোভায় শোভিত করে; প্রেমিক কবি মুর গাহিয়াছেন;—

"Light winged hopes, that come when bid,
And rainbow joys, that end in weeping,
And passions among pure thought hid,
Like serpents under flow rets sleeping."

এই সময় আনন্দের রামধনুরাগ দৃষ্টিকে পরিতৃপ্ত করিতে থাকে, আশার মোহন মূর্ত্তি সদাই সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান থাকে; এবং প্রবৃত্তিনিচয় পরিপুষ্ট হইয়া নিবৃত্তিচিন্তার মধ্যে সর্পরূপে বর্ত্তমান থাকে; এই কাল যেমন মনোহর তেমনি ভীষণ; এই কালকে ভীষণ করিয়া তোলা বা মনোহারিত্বে বজায় রাখা জীবের করায়ত্ত, কিন্তু এম্‌নি মোহ এই কালে এক এক সময়ে জীবকে আচ্ছন্ন করে যে, সে আর ইহাকে মনোহারিত্বে বজায় রাখিতে পারে না।

ধন্য সেই মানব, যে এই কালকে মনোহারিত্বে বজায় রাখিয়া, আজীবন ইহার উপাসনা করিতে পারে। পৃথিবী নিত্য নিত্য নবযৌবন সাজে সজ্জিত হইতেছে। আজ যে উষা উদয় হইল, কাল আবার সেই উষার সঞ্চার হইবে; ইহা অবশ্যম্ভাবী; উষার নবীনালোক, কি সুখী, কি দুঃখী সকলের প্রাণেই কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুখ আনিয়া দেয়; কি রোগী, কি সুস্থকায় ব্যক্তি সকলেই এই সময়ে পরমানন্দ ভোগ করেন; দিবসের এই নবযৌবন সমাগম কি আনন্দপ্রদ, যিনি উষার ছবি প্রতিদিন নিজ চক্ষে দেখেন, তিনিই জানিতে পারেন; পরের মুখে কথায় শুনিয়া ইহার আস্বাদ পাওয়া যায় না; এই সময়ে পক্ষীদিগের আনন্দ-কোলাহলে নির্জীব আত্মাও সজীব হইয়া উঠে; সৃষ্টির আদিকাল হইতে এখনও প্রতিদিন সেই একই ভাব, একই দৃশ্য জগৎকে অনুপ্রাণিত করিতেছে; ইহা কি জগতের চিরযৌবনের পরিচারক নহে; জগৎ পুরাতন হইয়াছে বটে কিন্তু সেই পুরাতনত্বের নিদর্শন কোথায়? মানব স্মৃতিতেই জগতের পুরাতনত্ব, জগৎ বৃদ্ধ,-দৃশ্যে নহে, কিন্তু মানুষের মনে—মানবের মনই জগৎকে বৃদ্ধ করিয়া তুলে; বৃদ্ধ করিয়া দেখে; নচেৎ জগৎ পুরাতন নহে; সেই হিমাদ্রি এখনও বর্ত্তমান, সেই চন্দ্রসূর্য্য যাহা সৃষ্টির প্রথমে, জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, আজিও তাহারা অমৃতধার কিরণ বর্ষণে জগৎকে তুষিতেছে, সেই মেঘ, সেই প্রকৃতির হাসিরাশি আজিও দেখিতেছি, তবে জগৎকে বৃদ্ধ বলি কেন? যে আমি শৈশবে ছিলাম, যে আমি কৈশোরকালে কতই খেলাধূলা করিলাম, যে আমি যৌবনে নানা রসরঙ্গে মত্ত হইলাম, সেই আমি এখনও রহিয়াছি, তবু কেন বলি, কেন

ভাবি যে জগৎ আর সেরূপ নহে, সে আর তাহার সেরূপ দেখায় না, সেরূপ আনন্দ সে আর দেয় না? ইহার মূলে কি আছে, এই কুভাব কেন আমাদের হৃদয় অধিকার করিল, তাহা একবার অনুসন্ধান করিতে দোষ কি? যে ভাব পোষণ করিলে আনন্দ পাই, তাহারই পোষণ করা জীবের সহজায়ত্তাধীন, তবে কেন বিষাদের ঘোর কালিমায় মুখমণ্ডল কলুষিত করি, কেন হতাশ হইয়া আক্ষেপ করি!

"যঃ কৌমারহরঃ স এবহিবর
স্তা এব চৈত্রাঃ ক্ষপাঃ।
তে চোন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ
প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ॥"

সেই চৈত্রমাসের বিমল রজনী এখনও বর্ত্তমান, সেই মালতীকুসুম সৌরভ এখনও বহিতেছে, সেই কদম্বসংসর্গস্পর্শী বায়ু এখনও বিচরণ করিতেছে, কিন্তু আমার হৃদয় আর সেই বায়ুর ভিতর দিয়া চলিতে ফিরিতে পারিতেছে না, সেই বায়ুর সুখস্পর্শ আর অনুভব হইতেছে না; দোষ কাহার, বায়ুর, না আমাদের? এখন আমাদের "মালাপি জ্বালায়তে' মালাতে জ্বালা বোধ হইতেছে; দোষ ত মালার নহে, পূর্ব্বে যে মালা ছিল এখনও সেই মালা বর্ত্তমান, আমাদের স্পর্শ-বোধঘ্রাণশক্তি সদাই বর্ত্তমান, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় অনুভূতি কোথায়? কাল ফুরাইয়া গিয়াছে, এই ভাবনায় আমাদের আর সেরূপ অনুভূতি হয় না; সেই কাল, যে কাল হারাইয়াছি, তাহার জন্য চিন্তা বিষাদের স্রোত এত অধিক, যে বর্ত্তমান কাল মধুর হইতেও মধুরতম হইলে তাহার মধুরিমা এখন আর আমা-দিগের হৃদয়ে পশে না? এ বিষম ব্যাধি, সান্নিপাতিক বিকার,—ইহার চিকিৎসা কে করিবে? চিকিৎসক পাওয়া সুকঠিন। চিকিৎসক না পাইয়া বিফল ব্যবস্থা করিয়া জগতের কবিগণ তাঁহাদের নিজস্ব ধন কবি প্রতিভা বলে যৌবনের নিত্যত্বের কল্পনা করিয়া সুখী ও জগতকে সুখীকরিতে চেষ্টা করিয়াছেন, হাবভাবময়ী কালীদাসের লেখনীপ্রসূত বক্ষমান্ পংক্তি পাঠ করিলে কাহার না মনে আনন্দ হয়? অলকার বর্ণনা কাব্যজগতে এক অভিনব বস্তু—

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপাঃ নিত্যপুষ্পাঃ।
হংসশ্রেণীরচিতরসনাঃ নিত্যপদ্মাঃ নলিন্যঃ॥
কেকোৎকণ্ঠাঃ ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ।
বিত্তেশানাং নচখলুবয়ো যৌবনাদন্যদস্তি॥

কিন্তু, সেই অলকা কোথায়,—অলকা নিত্য নবরূপে আমাদের সম্মুখে উদয় হইতেছে বটে, কিন্তু আমরা দেখিতেছি না, অলকা শুধু কবির কল্পনায় বিরাজিত নহে ; ইহা সত্য, অটুট সত্য, কিন্তু হায় মোহের আবরণে আমরা অলকার অলকা তিলকা দেখিতেছিনা, যে মোহনছবি কবি স্বীয় প্রতিভাবলে আঁকিয়াছেন, তাহাই নানারূপে নানাচ্ছন্দে নানাকালে, নানাদেশে আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতেছে, কিন্তু অন্ধের পক্ষে আলোক যেরূপ, বধিরের পক্ষে বীণার ঝঙ্কার যেরূপ আমাদের পক্ষে তাহা তদ্রূপ ; কুসুমে কীট ধরিয়াছে নহিলে কুসুম আর সুবাস ছাড়েনা কেন ? বিষয় কীটে আমরা দষ্ট হইয়া জর্জ্জরীভূত, তাই বিশ্বের মোহন ছবি দেখিতে পাই না। আমরা খোলস লইয়াই ব্যস্ত, ভিতরের শাঁস দেখি না, তাই সেই নিত্য নব, সত্য সুন্দর জগতে প্রতিভাও দেখিয়া আত্মাকে তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তাহার নিত্য নবীনতা অনুভব করি না। আমরা এটা ওটা সেটা চাহি কিন্তু যাঁহাকে চাহিলে সকল প্রকার চাওয়ার ফল পাওয়া যায় তাঁহার দিকে চাই কই ? যখন শরীরে ক্ষুধার উদ্রেক হয় তখন কি আমাদের নবযৌবনের ভাব হৃদয়ে স্বতই আসিয়া পড়ে না। এই ক্ষুদ্রব্যাপারের প্রতি যিনি একবার স্থিরদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন, যে সেই পরমাত্মার ইচ্ছা এই যে আমাদের ennui দারুণ বিষাদ হৃদয়ে না পশে, জরাগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষুধায় যেমন মোহন ভাব, সবলেরও সেইরূপ—তবে জরা ও যৌবনে পার্থক্য কই ? সত্য বটে, উভয় অবস্থায় শরীরের ক্ষমতার তারতম্য ঘটে, কিন্তু অনুভূতি ত সমানই থাকে—সেই প্রাতঃ সূর্য্য জরাগ্রস্তের কক্ষে যেরূপ আনন্দ বিতরণ করে সেই বালখিল্যী ঋষিগণ যাঁহারা, সূর্য্যদেবেরস্তবে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাকে জগতে অবতারণা করান তাঁহারা বৃদ্ধের চক্ষের সমক্ষেও বর্ত্তমান। সবল যুবকেরও হৃদয়ে বর্ত্তমান। নানাজাতি বিহঙ্গমগণ সৃষ্টির আদিকাল হইতে অদ্যাপি গান করিতেছে ও করিবে, তবে মানবের হৃদয় কেন বিষাদে ডুবিয়া যায়--যৌবন গিয়াছে, কাল হারাইয়াছি, ইত্যাদি ভাবিয়া এই মোহন বিশ্বসংগীতে যোগদান করেনা কেন ? শুনা যায় যযাতি রাজা আপন পুত্রকে নিজ দেহের জরাসংক্রমণ করাইয়া দিয়া দীর্ঘকাল নবযৌবন ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে যে জরাকে ভয় করিয়া এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সেই জরাই আসিয়া উপস্থিত। দেহের অপটুতাকে মনের বলের দ্বারা অতিক্রম করিতে পারিলে জরার প্রসব আর কোথায় ? এই আত্মা পরমাত্ম ধর্ম্মী—"নিত্য সর্ব্বগতঃ স্থানুরচলো পুরাতনঃ" আমি নিত্য, আমি সর্ব্বজীবান্তরস্থ, আমি তাঁহাতে ও তিনি আমাতে

এই ভাবে বিভোর থাকিলে চিরযৌবন আমাদের করতলন্যস্ত আমলকবৎ সুখ লভ্য; যদি আমরা চাতকী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকি হাহা করিয়া বিষয়ের পিছনে না দৌড়াদৌড়ি করি তবে আর দুঃখ কোথায়?

"আশ্রিত্য চাতকীং বৃত্তিং দেহ পাতাবধিদ্বিজ।
স্বয়রস্তার্থ ভাবনয়া স্থেয়নিত্যেব মামতিঃ॥
সরঃসমুদ্রনদ্যাদীন্ বিহায়চতকোথা।
তৃষিতোম্রিয়তে বাপি যাচতে নপয়োধরং॥
এবমেব প্রযত্নেন সাধনানি পরিত্যজন।
স্বেষ্টদেবে সদামেঘৌ গতিরন্তে ভবেদিতি॥

সকলপ্রকার সাধন ত্যাগ করিয়া চাতক যেরূপ স্থির লক্ষ্যে সরোবর, সমুদ্র, নদ্যাদির জল ত্যাগ করিয়া কাঙ্ক্ষিত জলের জন্য প্রাণ পাত করে আমাদেরও সেইরূপ করিতে হইবে; তবে জীবনে মিষ্টতা, সরলতা নবীনতা প্রতিনিয়তই অনুভূত হইবে, নচেৎ নহে; সেই পরমাত্মা যখন মুনিজনমানসহংসরূপী হইয়া আমাদের হৃদয়-সরোবরে বিরাজিত থাকিবেন, যখন সখার ন্যায় নিত্যসহায় হইয়া সঙ্গে অহরহঃ বাস করিবেন, তখন জরা, বার্দ্ধক্য, শোক দুঃখ কিছুই থাকিবে না। তিনি নিত্য নবীন চিরসুন্দর, তাই বৈষ্ণব কবির চক্ষে শ্রীকৃষ্ণ চিরযৌবনশালী তাঁহার প্রেমিক প্রেমিকাগণও চিরযৌবনশালী ও কুন্তীর ন্যায় চিরযৌবনশালিনী। বিশ্ব যখন নিত্য নবযৌবনে আবির্ভূত হইয়া আমাদের হৃদয় মনকে উন্মাদিত করিতেছে, তখন বিশ্বস্রষ্টাকে চিরযৌবনে যৌবান্বিত দেখিবনা কেন? আত্মাকেই বা বৃদ্ধ মনে করিয়া ভয়ে, নিরাশায় আকুল হইব কেন? বিশ্বের নিয়ম এই, যে এখানে পুরাতন স্থান পায় না, এই দেহ জীর্ণ হইবে, বটে, বৃদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু আত্মাকে বৃদ্ধত্বের ঘনান্ধকারে অভিভূত করিবেন। জ্ঞানে বৃদ্ধ হইবে, অনুরাগে বৃদ্ধানুরাগী হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া নিরাশায় ডুবিবে না; আত্মাকে সতেজ রাখিতে হইবে,—অনন্তকাল ইহার স্থিতি বৃদ্ধত্বের ছায়াও ইহাতে স্পর্শে না।

কেবল বিশ্বের সেবা করিলে, বৃদ্ধত্বের ভাব আপনি আসিয়া পড়ে, কিন্তু বিশ্বপতিকে বিশ্বরাজ্যে সমাসীন দেখিয়া হৃদয় মন্দিরে তাঁহার করুণ নয়নপাত অহরহঃ দেখিলে বৃদ্ধত্ব কোথায় তলাইয়া যায়। বিশ্বময় চিরযৌবন দর্শন করিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্থিরবর্ত্ম অনুসরণ করি-

অধ্বাতে আমরা অচিরকালে উপনীত হইতে পারিব। লৌহবর্ত্মের উপর বাষ্পীয় শকট যখন চলে তখন সেই বর্ত্মের উপর অন্তরায় আসিয়া পড়িলে শকটের গতি ক্ষণকালের জন্য রোধ হয় বটে—সে সময় অপর শকটচারীরা মনে করিতে পারেন, যে আমাদের এ অন্তরায় অভিভূত করিতে পারিবে না—আমরা অন্তরায়কে ছাড়াইয়া অপর বর্ত্ম অবলম্বন করিয়া শীঘ্র গন্তব্যস্থানে পঁহুছিব, কিন্তু লৌহবর্ত্মের এক্ষণিক অন্তরায় অন্তর্হিত হইলে আর রক্ষা নাই, তখন বাষ্পীয় শকট ক্ষনিক বাধার নিমিত্ত কিছুমাত্র দুঃখভোগ করে না, অপর শকটচারীদিগকে দূরে ফেলিয়া গন্তব্যস্থানে, অগ্রেই পঁহুছে। সেই লৌহময়বর্ত্ম সেই শানিত ক্ষুরধারের বর্ত্ম অবলম্বন করিলে জীবনে নবীনতার অনুভব হইবে, জীবন মধুময় হইবে, বৃদ্ধত্বের ছায়াও পঁহুছিবে না।

তিন পণ্ডিতের বিদেশ যাত্রা।

নবদ্বীপ কাঁচাগোলেবন্ধ জন।
ন্যায়চুঞ্চু বৈদ্যরত্ন স্মৃতি-পঞ্চানন॥
অনেক তর্কের পর করিলেন স্থির।
বিদেশ ভ্রমণে এবার হইব বাহির॥
মহোৎসাহে তিনে মিলি যাত্রার কারণ।
পঞ্জিকা খুলিয়া করে দিন নির্ব্বাচন॥
তর্করত্ন কহে শুন স্মৃতিপঞ্চানন।
সোমবারে করিলাম দিন নিরূপণ॥
চন্দ্র তারা শুদ্ধ আর ত্রি-অমৃত যোগ।
করিতে হবে না পথে কোন কষ্টভোগ॥
স্মৃতি-পঞ্চানন কহে দেও পঞ্জিখান।
দেখিব বারেক আমি মম গ্রহস্থান॥
নস্য টেনে পঞ্চানন পঞ্জিকা খুলিল।
চোক টেনে দূর হ'তে দেখিতে লাগিল॥

'তক্ক অত্ত দাঁ' রেগে কহে পঞ্চানন।
নস্যের গুণেতে রুদ্ধ নাসিকা পবন॥
উড়ানী লইয়া করে নাসিকা ঝাড়িল।
উড়ানীতে নিষ্ঠীবন শোভিতে লাগিল॥
স্মৃতি পঞ্চানন কহে 'কি দেখিলা দিন্।
যাতচন্দ্র বৌরপক্ষ মম রাশি মীন্॥
মূর্খ তুমি কার্য্যকালে সুধু জ্ঞান তর্ক।
কাজিকায় সিদ্ধ কড় খুড়াইয়া আর্ক॥
স্মৃতি জ্যোতিষেতে অই ফাঁকি নাহি চলে।
ধর্ম্মকর্ম্ম নষ্ট হয় ফাঁকির জঞ্জালে।
ক্রোধে তর্করত্ন জ্বলে ছিল কিছু দূরে।
হামা দিয়া কাছে আসে উড়ানী গেল উড়ে॥
উড়ানী গেল উড়ে আর কাঁছা গেল খুলে।
মস্তকের আর্ককলা ঘন ঘন দোলে।
বাজিল তুমুল তর্ক কেহ নহে ঊন।
বিবাদ বিচার তর্কে উভয়ে নিপুণ॥
ঘন ঘন নস্য টানে ঘন নাক ঝাড়ে।
কখন বসনে মোছে কখন শরীরে॥
টানিতে টানিতে বাস দোহার গেল খুলে।
উলঙ্গের প্রায় তবু তর্ক নাহি ভুলে॥
মুখামুখি সাঙ্গ করে হাতাহাতি প্রায়।
আসি বৈদ্যরত্ন মাঝে বিবাদ থামায়॥
আসল ভুলিয়া তোমরা করিছ কলহ।
কেমনে হইবে কাজ তাহাই বুঝহ॥
নানামুনির নানামত শাস্ত্রের বচন।
তাই মনে করে ধর আমার বচন॥
প্রাচীন মতেতে শুদ্ধ দিন নাহি মিলে।
কার্য্য সিদ্ধি (তবে) দৃক্ সিদ্ধ মতেতে চলিলে॥
তর্করত্ন যাত্রা করুন প্রাচীনের মতে।
নব্যমতে যাত্রা করি তোমাতে আমাতে॥

নব্য আর প্রাচীনেতে বিপরীত ভাব।
পাইতে যাত্রার দিন না হবে অভাব॥
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জী দেখিয়া তখন।
দিন স্থির করিলেন স্মৃতি পঞ্চানন॥
সোমবার প্রাতঃকালে শ্রীদুর্গা স্মরিয়া।
যাত্রা করে তিনজন গণেশে চিন্তিয়া॥
চলিতে চলিতে তারা বহুদূর গেল।
মধ্যাহ্ন কালেতে এক বাজার মিলিল॥
বাজারে পৌঁছিয়া তারা ঘরভাড়া নিল।
আহারের কি ব্যবস্থা চিন্তিতে লাগিল॥
তর্করত্ন কহে ভায়া তর্কে কাজ নাই।
দই ছাতু গুড়ে এস এ বেলা কাটাই॥
পঞ্চানন কহে তাহে নাহিক আপত্তি।
বৈদ্য বলে এত বেলায় বাড়িয়াছে পিত্তি॥
শাস্ত্রেতে "বাতকৃৎ শক্তু" বৃদ্ধি হবে বায়ু।
দধিতে করিবে কফ ক্ষীণ হবে আয়ু॥
বায়ু পিত্ত কফে হবে ত্রিদোষ উদ্গম।
বিদেশ বিপাকে এসে ঘটাবে মরণ॥
ফলারেবিখ্যাত তোমরা পেটুকব্রাহ্মণ।
কুঁড়ের সর্দ্দার তাহে বিচিত্র মিলন॥
উঠ উঠ ঝট্ করে' করে এস স্নান।
আমিও বাজার করে আসি ততক্ষণ।
বৈদ্যরত্ন বৈদ্যশাস্ত্রে অতীব নিপুণ।
বিশেষতঃ কণ্ঠগত তার দ্রব্যগুণ॥
যত যত দ্রব্য তিনি দেখেন বাজারে।
সকলই সদোষ তার হইল বিচারে॥
খুঁজিতে খুঁজিতে এক দেখিল কুষ্মাণ্ড।
সুপক্ক সিকেতে ঝোলা যেন অশ্ব অণ্ড॥
'অমৃতং পক্ক কুষ্মাণ্ডং' অর্থাৎ কিনিলেন বৈদ্য।
পাকা একটী সাচী কুমড়া সম্পূর্ণ অখাদ্য।

অবশেষে কিনিলেন তণ্ডুল লবণ।
মসলাও কিছু কিছু অন্য আয়োজন ॥
পথ হতে গুটিকত নিম্বপত্র লয়ে।
আসিলেন বৈদ্যরত্ন হরষিত হয়ে ॥
স্নান করে আসি কহে ব্রাহ্মণ দু-জন।
বৈদ্যরত্ন কি করিলা পাক আয়োজন ॥
অদূরে কুষ্মাণ্ড দেখি স্মৃতিপঞ্চানন।
কহিলেন বৈদ্যরত্নে করিয়া গর্জ্জন ॥
বৈদ্যরত্ন তুমি বট, ব্যাকুব পঞ্চানন।
প্রতিপদে কুষ্মাণ্ডের নিষিদ্ধ ভোজন ॥
বাজারে কি অন্য দ্রব্য কিছু না পাইলে।
অখাদ্য পুরণো এটা কিনিয়া আনিলে ॥
বৈদ্যরত্ন বলে দাদা কি করিব আর।
ভাল দ্রব্য না পাইনু করিয়া বিচার ॥
লাউ দেখিলাম তাহে কফ বৃদ্ধি করে।
বার্ত্তাকুতে পিত্ত বৃদ্ধি শাস্ত্রের বিচারে ॥
নির্দোষ কেবল এই কুষ্মাণ্ড পুরাণ।
শাস্ত্র অনুসারে ইহা অমৃত সমান ॥
স্মৃতি পঞ্চানন তুমি স্মৃতি ভাল জান।
তিথির বিচারে তুমি বটহ প্রমাণ ॥
কাজ কি কলহে দাদা তর্করত্ন বলে।
অতীত প্রহর ত্রয় ক্ষিদেয় পেট জ্বলে ॥
তর্করত্ন চলিলেন পাক আয়োজনে।
জলপাত্র লয়ে বৈদ্য চলিল পিছনে ॥
হইল রসুই শেষ নিমঝোল ভাত।
শ্রীবিষ্ণু স্মরিয়া তিনে ভাতে দিলেন হাত ॥
শরীর যদি সুস্থ থাকে যদি খেতে চাও ভাল।
খাবার কালে বৈদ্য ডেকে ঘটাইওনা জঞ্জাল ॥

স্বাস্থ্য

লেখক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ রায় সেনগুপ্ত।

স্বাস্থ্যই দেহীমাত্রেরই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। স্বাস্থ্য না থাকিলে কাজকর্ম্ম সাহস উদ্যম কিছুই থাকে না। স্বাস্থ্যের অভাবে মানব পশুরও অধম হইয়া পড়ে। সাংসারিক কাজ বল, ঈশ্বর আরাধনা বল, এমন কি প্রিয়তম জীবন পর্য্যন্ত সে স্বাস্থ্যের উপরেই নির্ভর করিতেছে, সে স্বাস্থ্য কি এবং তাহা রক্ষারই বা উপায় কি? প্রকৃত স্বাস্থ্য কাহাকে বলে?—স্থূলকায়া, উজ্জ্বল বর্ণ বা প্রভূত বল থাকিলেই তাহাকে সুস্থ বা স্বাস্থ্যবান বলা যাইতে পারে না—তবে প্রকৃত স্বাস্থ্য কি? সেই প্রকৃত স্বাস্থ্যের রক্ষণ বা বিকৃত স্বাস্থ্যের ক্ষপন বা বৃংহন কি উপায়ে সাধিত হইতে পারে তদালোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

"সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতু মলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে॥"

যখন শরীরে বায়ু পিত্ত কফ দোষত্রয় সমভাবে কার্য্য করে, যখন জঠরাগ্নির সমতা থাকে, ধাতু ও মল সমক্রিয় এবং দেহ, আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন সদাই প্রফুল্ল থাকে, তখনই প্রকৃত স্বাস্থ্য।

এখন ইন্দ্রিয়াদি কতকগুলি বিষয় সুবোধগম্য হইলেও দোষত্রয় ধাতু ও মলের বিষয় সাধারণের সহজবোধগম্য নহে, তজ্জন্য ঐ গুলির কি কি ক্রিয়া আমাদের দেহে অহরহ সাধিত হইতেছে তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

'দোষধাতু মলমূলংহি শরীরং।'

বায়ু পিত্ত ও কফরূপী দোষ ত্রয়, রস, রক্তাদি ধাতু এবং পুরীষাদি মলই দেহ রক্ষার মূল কারণ।

এখন ঐ সকলের কার্য্য অনুধাবন করা যাউক।

বায়ুর কার্য্য ;—দেহস্থ বায়ু পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া—ব্যান, উদান, প্রাণ সমান ও অপান নামে আখ্যাত হইয়া পাঁচটী পৃথক পৃথক কার্য্য করিতেছে। ১। প্রস্পন্দন অর্থাৎ শরীরের চালনা ব্যান বায়ুর কার্য্য। ২। উদ্বহন অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থের ধারণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারিতা উদান বায়ুর দ্বারা সাধিত হয়। ৩। পূরণ অর্থাৎ শরীরের পুষ্ট্যর্থে আহারাদি গ্রহণ প্রাণবায়ুর কার্য্য ৪। বিবেক অর্থাৎ রসমূত্র পুরীষাদির পৃথকরণ, সমান বায়ুর দ্বারা সম্পন্ন হয় ৫। এবং ধারণ অর্থাৎ বেগকালে শুক্র মূত্র পুরীষাদির ত্যাগ [illegible] ঐ সকলের ধারণ অপান বায়ুর কার্য্য। পঞ্চবায়ুর এই

পক্ষ প্রধান কার্য্য; তদতিরিক্ত শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্যও ব্যান বায়ুর দ্বারা; দোষ, ধাতু মলাদির কার্য্যকারিতা উদান বায়ু দ্বারা; ভুক্ত আহার্য্য হইতে উৎপন্ন রস রক্তাদির স্ব স্ব স্থানে প্রেরণও প্রাণবায়ু দ্বারা এবং সর্ব্বশরীরের ধারণও অপান বায়ুর দ্বারা সাধিত হইতেছে। অপিচ উৎসাহ, উচ্ছাস ধ্যান, ধারণা, মনন প্রভৃতি, বায়ুর কার্য্য। বায়ু পৃথক পৃথক স্থানভেদে পৃথক পৃথক উপরোক্ত কার্য্য সমাধা করিলেও ঐ সমস্তই এক মূল বায়ুর কার্য্য।

পিত্তের কার্য্য;—ঐরূপ রাগ, পক্তি, ওজমেধা, তেজ এবং উষ্মা এই পাঁচটী কার্য্য রঞ্জক, পাচক, আলোচক, সাধক ও ভ্রাজক সংজ্ঞক পৃথক পৃথক পঞ্চ পিত্ত দ্বারা সাধিত হইতেছে। ১। পিত্তের যে অংশ দ্বারা ভুক্ত বস্তুর পরিপাক কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহাই পাচক পিত্ত বা অগ্নি; ২। পিত্তের যে অংশ দ্বারা পরিপাকান্তে রস (হরিদ্রা ও রক্ত বর্ণে) রঞ্জিত হয় তাহাকেই রঞ্জক পিত্ত; ৩। পিত্তের যে অংশ দ্বারা শুক্রের উৎপত্তি এবং দৃষ্টিশক্তির বিকাশ তাহাকেই আলোচক পিত্ত বা আলোচকাগ্নি; ৪। পিত্তের যে অংশ ওজের উৎপাদক ও মেধাকৃৎ তাহাকেই সাধকপিত্ত বা সাধকাগ্নি এবং ৫। যে অংশ দ্বারা সর্ব্বদেহের উষ্মার উৎপত্তি তাহাকে ভ্রাজক পিত্ত কহে। পাচক পিত্ত পক্বাশয়ে, রঞ্জক পিত্ত যকৃৎ ও প্লীহা যন্ত্রে, সাধক পিত্ত হৃদয়ে, আলোচক পিত্ত চক্ষে এবং ভ্রাজক পিত্ত ত্বকে অবস্থিতি করিয়া থাকে।

কফের কার্য্য;—ঐরূপ কফ সন্ধিস্থল, কণ্ঠ, মস্তক, বক্ষ এবং আমাশয় এই পঞ্চস্থান আশ্রয় করিয়া অবলম্বক, তর্পক, বোধক, ক্লেদক এবং শ্লেষক নামে আখ্যাত হইয়া দেহ রক্ষার্থে পঞ্চবিভিন্ন কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। ঐ সকল পৃথক পৃথক স্থানগত কফ (শ্লেষ্মা) হস্তপদাদির সন্ধিস্থলের বন্ধন শরীরের স্নিগ্ধতা ব্রণাদির রোপন, শরীরের পুষ্টাধান; ত্বক ও সন্ধির দৃঢ়ীকরণ; বল বৃদ্ধি ও তৃপ্তি উৎপাদন করিয়া থাকে. ১। আমাশয়স্থ শ্লেষ্মা নিজ শক্তিপ্রভাবে শরীরের অন্যান্য শ্লেষ্মাস্থানের জল সরবরাহ করিয়া থাকে, তজ্জন্য উহাকে শ্লেষক কহা যায়। ২। বক্ষস্থলস্থিত শ্লেষ্মা ত্রিকস্থানাদির সন্ধারণ এবং অন্নরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া হৃদয়ের কার্য্যসম্পাদন করে তজ্জন্য উহাকে ক্লেদক কহা যায়; ৩। জিহ্বামূল ও কণ্ঠস্থ শ্লেষ্মা জিহ্বেন্দ্রিয়ের সম্যক রসগ্রহণে ও জ্ঞানে সক্ষম করিয়া থাকে, তজ্জন্য উহাকে বোধক কহা যায়। ৪। শিরঃস্থ শ্লেষ্মা স্নেহসন্তর্পন করিয়া ইন্দ্রিয়াদির (চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকাদির কার্য্যকরণে) সহায়তা করে তজ্জন্য

উহাকে তর্পক কহা যায়; এবং ৫। সন্ধিস্থ শ্লেষ্মা সন্ধিস্থানের বন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করে, তজ্জন্য উহাকে অবলম্বক কহা যায়।

এক্ষণে রস রক্ত, মাংস মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতুর কার্যকারিতা দেখাইতেছি। রস কি?—রসনাগ্রাহ্য ষড়বিধ রস এবং শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, পিচ্ছিল, মৃদু তীক্ষ্ণ ভেদে বিভিন্ন গুণসম্পন্ন ভক্ষ্য ভোজ্য, লেহ্য পেয় বস্তু ভক্ষণের পর ঐ সকল সম্যক পরিপাক পাইয়া মলাদি হইতে পৃথক হইয়া যে সার অংশটুকু উৎপন্ন হয় তাহাই রস; এই রসের দ্বারা প্রীণন অর্থাৎ সর্ব্বশরীরের তুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে; ২। রক্ত—উক্ত রস যখন যকৃত ও প্লীহা যন্ত্রে পরিশুদ্ধ হইয়া অরুণ বর্ণ ধারণ করে তখনই তাহাকে রক্ত বলা যায়; রক্ত দ্বারা শরীরের পোষণ জীবনধারণ এবং জনন কার্য্য সাধিত হয়; ৩। রক্ত হইতেই মাংসের উৎপত্তি; মাংস অস্থির উপর আচ্ছাদন করিয়া উহাকে রক্ষা করে এবং শরীরের পুষ্টি সাধন করে। ৪। মাংস হইতে মেদের উৎপত্তি মেদ দ্বারা শরীরের স্নিগ্ধতা সম্পাদিত হয়; ৫। মেদ হইতে অস্থি জন্মে; অস্থি মজ্জাকে রক্ষা করে, শরীরকে দৃঢ় করে এবং শরীরধারণে সহায়তা করে, বিনা অস্থিতে কেবল মাংসপিণ্ড শরীরের দ্বারা কোন কার্য্য সম্ভবে না; ৬। অস্থি হইতে মজ্জার জন্ম—মজ্জার দ্বারা অস্থির পূরণ (নলীর মধ্যেই মজ্জার স্থান), শুক্রের পুষ্টি ও শরীরে বলাধান হইয়া থাকে; এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি; শুক্রদ্বারা সন্তান উৎপাদন, শরীরের ধৈর্য্যতা, কান্তি, প্রীতি, বল ও হর্ষ। এইরূপে রস হইতে শুক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ থাকায় তদুৎপন্ন (রক্তোৎপন্ন) দুগ্ধকেও জীবন (শিশুর প্রাণধারণের উপায়) বলা যায়।

এক্ষণে মলের কথা বলিতেছি। মল শব্দে পুরীষ মূত্র ঘর্ম্ম ক্লেদ এই সকলকে বুঝায়। এই সকলের দ্বারাও শরীর ধারণ কার্য্যের কুশলতা হইয়া থাকে। পীড়িত ব্যক্তির সকল ধাতুর ক্ষয় হইলেও যদি বিড়ভেদ অতিরিক্ত মূত্র ও স্বেদাদি নিঃসরণ না হয়, তাহাহইলে পীড়িতের বল রক্ষা হয়। ঐ সকলের অতি নির্গমনে মানব বিকল হইয়া পড়ে, এমন কি মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়া থাকে।

স্বাস্থ্য অবিকৃত রাখিতে হইলে এবং নির্ব্যাধি-শরীর ধারণ করিতে হইলে ঐ সকল ধাতুদোষ, ও মল যাহাতে সুচারুরূপে কার্য্য করে এবং অব্যাপন্ন প্রাকৃতিক অবস্থায় থাকে সে বিষয়ে সততঃ যত্নপরায়ণ হওয়া মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

বাহিরে অগ্নি, জল- বায়ু দ্বারা যেমন বাষ্প প্রস্তুত হইয়া কলে নানাকার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে ; অথবা যেমন সূর্য্যের উত্তাপে চন্দ্রের স্নিগ্ধতা গুণে এবং মরুৎ সাহায্যে অহরহ শোধন বর্ষণ ও পালন কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তদ্রূপ দেহ মধ্যে অগ্নি বা সূর্য্যরূপী পিত্ত, সোম বা জলরূপী শ্লেষ্ম, এবং বায়ু দ্বারা দেহের পালন কার্য্য সাধিত হইতেছে। অগ্নি হইতে বাষ্পের উৎপত্তি হইলেও সেই অগ্নির তেজে যেমন (Boiler) বয়লার ক্রমশঃ জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দেহ মধ্যেও পিত্তরূপী অগ্নি সততঃ সমস্ত দেহকে জীর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু বায়ুর সাহায্যে আহার্য্য উদরস্থ হওয়ায় কফজ (জলীয় রস ও স্নেহ পদার্থের) রস, রক্ত, মজ্জা মাংস শুক্রাদির সততঃ উৎপত্তি হওয়ায়, জীব বহুদিন পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক তাড়না সহ্য করিয়া জীবিত থাকিতে সক্ষম হয়।

যেমন সময়ে সময়ে অধিক পরিমাণে তৈল (পলিতায় মুখ দিয়া টগ্ টগ্ করিয়া উত্তপ্ত তৈল পড়িতে পড়িতে) পাইলে, সময়ে সময়ে একেবারে তৈল নিঃশেষ হইয়া গেল, কখন কখন বা তৈল পলিতা ঠিক থাকিলেও প্রবল বাতাসে দীপনির্ব্বাণ হইয়া যায়, তদ্রূপ দেহে প্রবল শ্লেষ্মাধিক্যে পিত্তাধিক্যে বা বাতাধিক্যে প্রাণ-প্রদীপ নির্ব্বানপ্রাপ্ত হয় ; সেইজন্য যাহাতে উক্ত দোষ ত্রয় (বায়ু, পিত্ত ও কফ) সর্ব্বদা সমান অবস্থায় থাকে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্ত্তব্য উহাদের হ্রাস বৃদ্ধিতেই ব্যাধির বিকাশ।

এক্ষণে এই বাতাদি দোষ ত্রয় এবং রক্তাদি ধাতুক্ষয়ে কি কি লক্ষণ হয় এবং তাহাদের বৃংহণের (পূরণের) উপায় কি তাহাই দেখাইব ;—

বাতক্ষয়ে ;—(শরীরে প্রাকৃতিক বায়ুর হ্রাস হইলে) মানব অলস অল্পভাষী অপ্রফুল্ল হয়। উহার পূরণার্থে শীতল অথচ রুক্ষ দ্রব্য (স্নান পান ও ভোজনাদি) সেবন করিবে।

পিত্তক্ষয়ে ;—গাত্রের উষ্ণতার হ্রাস, অগ্নির (পরিপাচন শক্তির) হ্রাস বা বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে ; শরীর জ্যোতিহীন হইয়া পড়ে। কটু অথচ উষ্ণ লবণাদি সেবনে পিত্ত বর্দ্ধিত হয়।

কফক্ষয়ে ;—গাত্রের রুক্ষতা (বলুথসে খড়ি উঠা, অন্তর্দাহ, আমাশয় শ্লেষ্মস্থল, কণ্ঠ ও মস্তিষ্কের শূন্যতা, সন্ধিস্থলের শিথিলতা, তৃষ্ণা, অনিদ্রা ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য হইয়া থাকে ; শীতল অথচ স্নিগ্ধ দুগ্ধাদি সেবনে কফ বর্দ্ধিত হয়।

রসক্ষয়ে—হৃৎপীড়া, কম্প, আমাশয়ের শূন্যতা এবং মনের ঔদাস্য ও তৃষ্ণার উৎপত্তি। রক্তক্ষয়ে—চর্ম্মের রুক্ষতা, শিরাসকলের শিথিলতা হইয়া থাকে এবং রোগী অম্লরসদ্রব্য ও শীতল পেয় (সরবৎ, বরফজল প্রভৃতি) দ্রব্যের প্রার্থনা করে। মাংসক্ষয়ে—মনুষ্যের কটী, গ্রোথ, গণ্ড, উরু, বক্ষ, পিণ্ডিকা (পায়ের ডিম) উদর, গ্রীবা প্রভৃতি শুষ্ক হইয়া যায়, প্লীহা বর্দ্ধিত হয়, সন্ধিস্থল শুষ্ক (ঢিলে পড়া) হইয়া যায় এবং মেদ বর্দ্ধক মাংস ভোজনে আকাঙ্ক্ষা হয়। অস্থিক্ষয়ে—অস্থিতোদ [হাড়ের কামড়ানি কন্‌কনানি] হয়, দন্ত ও নখ ভাঙ্গিয়া যায়। মজ্জাক্ষয়ে—শুক্রের অল্পতা, গাঁটে গাঁটে [অস্থি সন্ধিস্থলের] কামড়ানি অস্থির ভিতর যন্ত্রণা হয়, অস্থি সকল যেন অসার ও শূন্য [হাল্কা ও অন্তঃসার শূন্য ফাঁপা] বোধ হয়। শুক্রক্ষয়ে—মেঢ্র অণ্ডে [কোষে] বেদনা, মলক্ষয়—তন্মধ্যে—পুরীষক্ষয়ে হৃদয় ও পাঁজরে বেদনা [শূলবৎ] সশব্দে বায়ুর ঊর্দ্ধ গমন এবং উদরে বায়ু সঞ্চারণ হইয়া থাকে। মূত্রক্ষয়ে—অল্পমূত্রতা, মূত্রকৃচ্ছ্র বস্তির [মূত্রাশয়ে] জ্বালা যন্ত্রণা অনুভূত হয়। স্বেদক্ষয়ে রোমকূপের স্তব্ধতা, ত্বকশোষ, স্পর্শবৈগুণ্য এবং ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায় [ঘর্ম্মের অপ্রবৃত্তি]। আর্ত্তবক্ষয়ে যথোচিতকালে [মাসান্তে] অল্পমাত্র ঋতুরক্তের নিঃসরণ এবং বস্তিদেশে বেদনা। স্তন্যক্ষয়ে—স্তনদ্বয়ের ম্লানতা [চুপসাইয়া যাওয়া] স্তনদুগ্ধের সম্পূর্ণ অপ্রবৃত্তি বা অল্প প্রবৃত্তি।

যখন যে ধাতুর ক্ষয় হয়, সেই দ্রব্যের উপাদানের অভাব বশতঃ যে সকল দ্রব্যে ঐ সকল ধাতু বর্দ্ধিত হয়, সেই সকল দ্রব্য ভোজন পান বা লেপনে রোগীর স্বভাবতঃই ইচ্ছা হইয়া থাকে। তখন সেই সেই দ্রব্য অল্প অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলে উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই। রস হইতে মূত্র পর্য্যন্ত কয়েকটি ধাতু ও মলক্ষয়ে যে সকল দ্রব্য অভ্যঙ্গ ও পান ভোজনে সেই সেই ধাতু বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয় তাহাই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। স্বেদক্ষয়ে—(ঘর্ম্মবন্ধথাকিলে) তৈলাদিমর্দ্দন অভ্যঙ্গ এবং স্বেদ (উষ্ণতাপ fomentation) করা কর্ত্তব্য। আর্ত্তব ক্ষয়ে সংশোধক ও অগ্নিবর্দ্ধক দ্রব্য ব্যবহারে উপকার দর্শে। স্তন্যক্ষয়ে লাউ মাসকলাই প্রভৃতি স্তন্যবর্দ্ধক মদ্যাদি ব্যবহার করা উচিত। গর্ভক্ষয়ে—গর্ভ (শুক্র হইতে থাকিলে) অষ্টমাস গর্ভকাল হইলে ক্ষীর বস্তি ও মেধ্যাশুভক্ষণ করা বিধেয়।

[illegible]

উপরে বাতাদি দোষ মল ও রসাদি ধাতুর হ্রাস হইলে যে যে অস্বাস্থ্যের লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহার উল্লেখ এবং তাহাদিগের বৃদ্ধির উপায় কথিত হইল; এস্থলে ঐ সকল বর্দ্ধিত হইলে কি কি লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং তৎ-তৎ প্রশমনের উপায় কি তাহাই বলিতেছি। এস্থলে বলিয়া রাখি যে পিত্তের ক্ষয় হইলে শ্লেষ্মার বৃদ্ধি এবং শ্লেষ্মার ক্ষয় হইলেই পিত্তের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি একযোগে পিত্ত ও শ্লেষ্মার ক্ষয় হয়, তাহাহইলে বায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রসাদি ধাতুর বিশেষতঃ শুক্রের ক্ষয়েও বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

বায়ুবৃদ্ধি হইলে —শরীর ক্রমে কৃশ হইয়া পড়ে, গা কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া যায়, ভাল নিদ্রা হয় না, মানব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কঠিন মল নিঃসৃত হয়, উষ্ণ দ্রব্যে অভিলাস জন্মে, মধ্যে মধ্যে গাত্রের স্থানে স্থানে স্পন্দন হয়, বাক্যের স্বরকর্কশ হইয়া পড়ে।

পিত্ত বৃদ্ধি হইলে গাত্রচর্ম্ম পীত আভাবিশিষ্ট হইয়া পড়ে, সর্ব্বশরীরে উত্তাপ সময়ে সময়ে মূর্চ্ছা বলহানি, ইন্দ্রিগণের অশক্তি উপস্থিত হয়; মলমূত্র ও চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ হইয়া থাকে, সর্ব্বদাই শীতল দ্রব্যে অভিলাস জন্মে।

শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে—গাত্র শীতলস্পর্শ, পাণ্ডুবর্ণ ও রক্তহীন হয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভারী, শরীর উদ্যমহীন ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, সদাই তন্দ্রা নিদ্রা বা আলস্য আইসে; শরীরের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ

নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা এবং বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রভাব।

লেখক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র সিংহ।

নবীনচন্দ্রের কবিত্বশক্তি।

নবীনচন্দ্রের কাব্যাবলীর আমরা পৃথক ভাবে আলোচনা করিলাম। দেখিলাম—যে সকল গুণ থাকিলে কবিগণ যশস্বী হইতে পারেন, নবীনচন্দ্রের তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। ভাষা, রস ও চরিত্রসৃষ্টি—এই তিনের উৎকর্ষেই কবিতার মনোহারিত্ব। নবীনচন্দ্রের কাব্যে এই তিনটি গুণ কি পরিমাণ বিদ্যমান, আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

ঘটনাবৈচিত্র্যের সহিত ভাষার বৈচিত্র্যসাধন করা কবির একটি প্রধান গুণ মধুসূদনের এই গুণ যে পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, তাহা সচরাচর দেখা যায় না। মেঘনাদ-বধ ও ব্রজাঙ্গনার ভাষায় কি প্রভেদ? মেঘনাদের ভাষা অভ্রভেদী হিমাদ্রি-সম্ভূত ভীষণ জলপ্রতাপের ন্যায়, ব্রজাঙ্গনার ভাষা সন্তাপহারিণী, কুলু কুলু নিনাদিনী নির্ঝরিণীর সঙ্গীতের মত। এই ভাব ও ভাষার অপূর্ব্ব সম্মিলন নবীন-চন্দ্রের কাব্যের অধিকাংশস্থলেই দেখা যায়। রঙ্গমতী কাব্যের কুমীয়া রমণীর বিষাদ গীতটি শ্রবণ করুন।—

"ভুলিলে কেমনে?
এত আশা, ভালবাসা, ভুলিলে কেমনে?
এই কালীন্দির তীরে,
এই কালীন্দির নীরে,
এই তরুতলে, এই নিবিড় কাননে
বসি এই শিলাতলে
এই নির্ঝরিণী কূলে
বলেছিলে কত কথা, ভুলিলে কেমনে?"

কি মধুর! কি মর্ম্মস্পর্শী! জানিনা বিরহিণী নাইটিঙ্গেলের গীত ইহার মত সকরুণ ও উচ্ছ্বাসময়ী কি না?

যে ভাষার ধ্বনিমাত্রেই বর্ণিত বিষয়ের মর্ম্ম আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, তাহাই কবির শ্রেষ্ঠ ভাষা। ইংরাজ কবিদিগের মধ্যে গ্রে ও টেনিসন্ তাঁহাদের কাব্য মধ্যে এই 'ধ্বন্যাত্মক ভাষা' বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথম কবির বিখ্যাত Elegy ও দ্বিতীয় কবির Passing of Arthur ইহার প্রকৃত উদাহরণ। দুই চারিটী দৃষ্টান্তেই এই বিষয়টী প্রতীয়মান হইবে।

(1)

I heard the water lapping on the cag
And long ripple washing in the reeds.

(2)

Now pursuing, now retreating
Now in circling troops they meets.

(3)

Slow melting strains their queen s approach declare.

নবীনচন্দ্র অনেকস্থলে ধ্বন্যাত্মক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন ; এবং ইহাতে তিনি কম দক্ষতার পরিচয় দেন নাই।

নবীনচন্দ্রের ভাষা প্রাঞ্জল অথচ মধুর ; দুরূহ কিম্বা শ্রুতিকটু শব্দ তিনি কদাচ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি কুরুক্ষেত্র কাব্যে মহাভারত ও ভাগবতের দার্শনিকতা যেরূপ বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

সংক্ষিপ্ততা (condeusation) ভাষার আর একটি মহৎ গুণ। দুই চারিটী কথায় একটি সুন্দর ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা পৃথিবীর অতি অল্প কবিরই দেখা যায়।

কাব্যের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার উপমা। উপমা সৌষ্টব না থাকিলে কাব্য নীরস ও দরিদ্র হইয়া পড়ে। এই উপমা সৌষ্টবেই কালিদাস ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি, কালিদাসের উপমাগুলি বড় স্বাভাবিক—মিলটনের ন্যায় কল্পিত নহে। কালিদাসের উপমায় আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, উপমেয় আর উপমানদ্বয় মধ্যে সাদৃশ এক বিষয়ে নহে—অনেক বিষয়ে লক্ষিত হয়। নবীনচন্দ্রের উপমা গুলি এত স্বাভাবিক ও সুন্দর যে, এ বিষয়ে আমরা কালিদাসের নীচেই তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি।

অর্জ্জুন দুর হইতে স্থিরনেত্রে সুভদ্রার অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিতেছেন :—

আকাশের অন্তরালে রয়েছে ত্রিদিব,
তথাপি সে স্বর্গশোভা নিরখি যেমন ;
কেশরাশি অন্তরালে রহিয়াছি পড়ি,
যেই স্বর্গ দীনভাবে, নয়ন আমার
তাহার অতুল শোভা ভাসিছে তেমন ;
পবিত্রতা শীতলতা করি বরিষণ।
পল্লব আঁধারে খণ্ড জ্যোৎস্নার মত
অলক আঁধারে ঐ অতুল আনন
রয়েছে অসাবধানে কি শোভা বিকাশি,
নিদ্রার আঁধারে যেন স্বপনের হাসি ;
অতীতের সুখ স্মৃতি ভবিষ্যৎ আশা ;
নিরাশায় অন্ধকারে যেন ভালবাসা।"

কবি প্রভাস-সিন্ধুর সন্ধ্যাকালীন বেলাভূমির বর্ণনা করিতেছেন—

"সভস্ম গৈরিকাবৃতা শোভিতেছে বেলাভূমি
ধূসর-বসনা, শান্তিময়ী, উদাসিন
সাষ্টাঙ্গে প্রণতা—যেন মহা নির্ব্বাণের গীত
শুনিতেছে সিন্ধুকণ্ঠে যোগচ্ছা যোগিনী।"

নবীনচন্দ্রের অনুপ্রাসচ্ছটা সময়ে সময়ে বিস্ময়কর। 'বাণী-বীণা-বিনিন্দিত,' 'বিলাস বিলোল', 'বিরাজিত বঙ্গের বিচিত্র সভায়', 'নবাব নয়নে নিত্য' প্রভৃতি সুন্দর অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত তাঁহার কাব্যে বিরল নহে।

নবীনবাবুর বর্ণনাশক্তির পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি; তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল সংক্ষিপ্ত, ওজস্বিনী ও বহু উপমালঙ্কৃতা, ছন্দঃ লাবণ্যময়ী; দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও গভীর; সেইজন্য তাঁহার বর্ণনাগুলি সর্ব্বত্রই মধুর ও হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে। অল্প কথায় একটি সুন্দর আলেখ্য আমাদের চক্ষের সম্মুখে আনয়ন করিতে তিনি যেমন দক্ষ, বঙ্গের আর কোন কবি সেইরূপ নহেন। এই জন্যই বঙ্কিম বাবু তাঁহাকে বর্ণনায় মন্ত্রসিদ্ধ বলিয়াছেন।

কবিত্বের প্রথম পরীক্ষা—কবির ভাষায়। আমাদিগের বিবেচনায় নবীনচন্দ্র এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তাঁহার ভাষা সরল অথচ সরস, ওজস্বিনী অথচ লাবণ্যময়ী সংক্ষিপ্ত অথচ নানাঅলংকার সুশোভিত। তাঁহার তীব্র তেজস্বিনী ভাষা যেমন মোহনলালের বীরদর্পে নারী-সুকুমার বঙ্গবাসীর হৃদয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সঞ্চার করিয়াছে, আবার সেই ভাষা সকরুন ও উচ্ছলিত হইয়া জুমীয়া রমণীর বিষাদ সঙ্গীতে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত করিয়াছে। যে ভাষা অভিমন্যু ও উত্তরার কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থল বর্ণনার আনন্দে পারাবারের ন্যায় উচ্ছসিত হইয়াছিল, তাহাই আবার পতিহীনা, অনাথিনী উত্তরার শোকে নির্ঝরিণীর ন্যায় শত ধারে উথলিয়া উঠিয়াছে। নবীনচন্দ্রের এই বৈচিত্র্যময়ী ভাষার তুলনা বঙ্গ-সাহিত্যে কেবল মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেই পাওয়া যায়।

২। রস।

কবিত্বের দ্বিতীয় পরীক্ষা—রসের অবতারণায়। মনুষ্য হৃদয়ে যে সকল স্বাভাবিক ভাব আছে, সেই গুলির যথোচিত উদ্রেক করা সামান্য কবিত্বের পরিচায়ক নহে। নবীনচন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন রসপ্রধান অনেকগুলি কাব্য ও মহাকাব্য

করুণ ও আদিরসের; রঙ্গমতীতে বীর, করুণ ও বাৎসল্য রসের এবং প্রভাস ও অমিতাভে প্রধানতঃ শান্তরসের অবতারণা করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র কাব্যে সকল রসের উৎকৃষ্ট অবতারণা আছে, সেইজন্যই 'কুরুক্ষেত্র' এত মধুর ও চিত্তাকর্ষক।

আদি বা প্রেমরস।

আদিরসের অবতারণায় নবীনচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। 'কেন দেখিলাম' এই কবিতার সমালোচনায় বঙ্গের কার্লাইল, মনস্বী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় বলিয়াছিলেন—এরূপ কবিতা এমন ওজস্বিনী ভাষায় বঙ্গের অন্য কোন কবি রচনা করিতে পারেন কি না, আমি জানি না। বস্তুতঃ আদিরসাশ্রিত কবিতায় নবীনচন্দ্র, জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণেরও সমকক্ষ। নবীনচন্দ্র প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির অনেকগুলি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্র কাব্যে দ্বিতীয় সর্গে কবি অভিমন্যু ও উত্তরার কথোপকথনে বালক বালিকার প্রেম অতি সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন;—যাহাতে সদা হাস্য, সদা মান, সদা বিবাদ, যাহা সদা ক্রীড়াশীল ও কৌতুকময়ী; যাহাতে—

"ইচ্ছা হয় রাখি তারে নয়নে নয়নে।
মিশাইয়া প্রাণে প্রাণে জীবনে জীবনে॥"

'বীরেন্দ্র ও কুমারিকায়' নবীনচন্দ্র যুবক যুবতীর প্রেম অঙ্কিত করিয়াছেন। এই প্রেম—

"অতৃপ্ত সৌরভ রাগে
অতৃপ্ত বাসনা জাগে
তথাপি কোমল ঘ্রাণ ঝড়বেগে ঝড়েরে।"

সুভদ্রার প্রেম শান্ত, স্থির উদার,;—যাহা সাগর তুল্য গভীর, আকাশের মত স্বচ্ছ, হিমাদ্রির মত মহান; যে প্রেমে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ, তাহাতে চঞ্চলতা নাই, উদ্বেগতা নাই—সে যেন—

'নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।"

যে প্রেমের উচ্ছাসে মনুষ্য সংসারের অন্যান্য কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয় না, যে প্রেম-সাগরে ডুবিয়া মানুষ কখনও বলে না।—

'আমি তোমার বঁধু, তুমি আমার বঁধু, এই শুধু নিয়ে থাকি,
বিশ্ব হ'তে সব লুপ্ত হয়ে যাক্, আর যা রহিল বাকি।'

জরৎকারুর প্রেম কুলপ্লাবিনী পদ্মার ভীষণ প্রবাহের ন্যায়—যাহাতে মানুষ

হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে পারে না, কেবল আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর উদ্দেশ্যে ছুটিয়া বেড়ায়।

শৈলজার প্রেমে কামনার ছায়া না থাকিলেও নৈরাশ্যব্যঞ্জক উন্মাদতা আছে, শৈলজা অর্জ্জুনকে বলিতেছে—

"তুমি পিতা, তুমি ভ্রাতা তুমি প্রাণেশ্বর,
তুমি শৈলজার এক অনন্ত ঈশ্বর।"

বীর ও রৌদ্র রস।

নবীনচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধে ও রঙ্গমতী কাব্যে বীর রসের যেরূপ উৎকৃষ্ট অবতারণা করিয়াছেন, পরবর্ত্তী কাব্যগুলিতে সেরূপ করেন নাই। পলাশীর যুদ্ধে মোহনলালের সেই ভৈরব গর্জ্জন ও জগৎশেঠের তপ্তলোষ্ট্রসম আগ্নেয় গিরির ভীষণ উদ্গীরণ প্রত্যেক বঙ্গবাসীই কণ্ঠস্থ করিয়াছেন।

করুণ রস।

বাঙ্গালীর হৃদয় স্বভাবতঃ করুণ ও কোমল। সে যেদিকে তাহার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, দেখিতে পায় কেবল ফলপুষ্পসুশোভিত বৃক্ষলতা কিম্বা দিগন্তব্যাপী হরিৎক্ষেত্র। যেখানে কঠিন প্রস্তরের চিহ্নমাত্রও নাই, যেখানে ধরণী পর্য্যন্ত কোমল; যাহার হৃদয়ে কুলুকুলু নিনাদিনী ভাগীরথী সকরুণ গীত গাহিতে গাহিতে অনন্তকাল হইতে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে; যেখানে গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য নাই, শীতের আতিশয্য নাই; সেই ষড়ঋতুর লীলাভূমি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় কোমল ও করুণরসে পূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। যে সংস্কৃত ভাষা কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রথমশ্রেণীর কবিগণের রচনাতেও দুরূহ ও সময়ে সময়ে কর্কশ বলিয়া প্রতীতি জন্মে (কথাটা কিঞ্চিৎ কর্কশ হইলেও অপ্রিয় সত্য), বঙ্গবাসী কবি জয়দেবের হস্তে সেই ভাষা কুসুমের অপেক্ষা কোমলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র ইহারা সকলেই করুণরসের অবতারনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আধুনিক কবিগণ যেমন বীররসের উৎকৃষ্ট অবতারণা করিয়া বাঙ্গালীর শক্তির সঞ্চার করিয়াছেন, সেইরূপ করুণরসের বর্ণনায় তাঁহারা পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত করিয়াছেন। যে মধুসূদন প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ সর্গে ও নীলধ্বজের প্রতি-জনার উক্তিতে বীররসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তিনিই আবার সীতা ও সরমার কথোপকথনে ও মেঘনাদের চিতায় রাবনের শোকে করুণরসের কি

অপরূপ আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। করুণরসের অবতারণায় নবীনচন্দ্র কোন বাঙ্গালী কবি অপেক্ষা হীন নহেন। তিনি পলাশীর যুদ্ধের দ্বিতীয় সর্গে বীররসের পার্শ্বে করুণরসের অবতারণা করিয়া যেরূপ কবিত্ব দেখাইয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার তুলনা অতি বিরল "ব্রিটিশের রণবাদ্য বাজে ঝম্ ঝম্" শুনিয়া যখন আমাদের হৃদয় নাচিয়া উঠে, ব্রিটিশ পদাতিকের পদ-সঞ্চালন দেখিয়া আমরা যখন প্রতি-মুহূর্ত্তে রণভূমির প্রতীক্ষা করিয়া আছি, ঠিক সেই সময়ে কবি ব্রিটিশসৈনিকের ভাবাক্রান্ত চিত্তের চিন্তার স্রোতে আমাদের নয়ন সমক্ষে আনায়ন করিয়াছেন। এইরূপ পটপরিবর্ত্তনে আমরা মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করি। কুরুক্ষেত্র কাব্যে শেষ তিন সর্গে কবি আমাদিগকে করুণরসের চরমসীমা দেখাইয়াছেন। কবি লিখিয়াছেন—অভিমন্যুর মৃত্যুতে—

'করিবে অনন্তকাল অশ্রু বিসর্জ্জন।'

কবির এই উক্তির সম্পূর্ণ সার্থকতা হইয়াছে। অভিমন্যুর মৃত্যুতে—অর্জ্জুনের শোকে—গোবিন্দের শোকে আমাদের নয়ন অশ্রুজলে ভরিয়া যায়—কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। তবে এমন দুই একজন পাষাণহৃদয় আছেন, যাঁহাদের অভিমন্যু উত্তরার বিদায় দৃশ্যে কিংবা জরৎকারুর হৃদয় বিদারক প্রেমের নৈরাশ্যে মন বিচলিত হয় না; যাঁহাদের অভিমন্যুর চিতায় সুভদ্রার উদাসীন ভাব, উত্তরার শোকছবি ও অর্জ্জুনের উন্মত্ততা দর্শনে নেত্রে একবিন্দু অশ্রু দেখা দেয় না। তাঁহারা বলেন যেখানে মায়ের চক্ষে জল নাই, পাঠকের চক্ষে জল আসিবার সম্ভাবনা সেখানে কোথায়? শোকের চরমসীমায় অশ্রুজলও শুষ্ক হয়, এই সামান্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটুকু তাঁহারা জানেন না। তবে এইরূপ পাঠকের সংখ্যা অল্প, সাগরে বারিবিন্দুবৎ। এই আশায় আমরা কুরুক্ষেত্রের এই অংশ হইতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

অভিমন্যুর শোকে উন্মাদিনী উত্তরা গোবিন্দকে বলিতেছেন—

"দেব! কহ একবার,
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
তাহার পুতুল খেলা নাহি ফুরাইতে নাথ।
ফুরাইল জীবনের খেলা কি তাহার?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
মামা যার নারায়ণ, জনক গাণ্ডীবধন্বা,
জননী সুভদ্রা দেবী, এই দশা তার?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?

'তুমি উত্তরার হাসি কত যে বাসিতে ভাল,
মুছাইলে এইরূপে সে হাসি কি তার ?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?

অভিমন্যুর চিতায় গোবিন্দের সেই উদ্বেলিত হৃদয়ের গভীর উচ্ছাস—

"এই অষ্টাদশ দিন হইয়াছে প্রবাহিত,
যে শোণিত পারাবার, কৃষ্ণের তপ্ত শোণিত—
প্রতিবিন্দু সে সিন্ধুর ; হা নাথ ! প্রতি শ্মশান—
করিয়াছে ভস্ম আজি জীবন্ত কৃষ্ণের প্রাণ।
প্রতি রমণীর কণ্ঠ, অনাথার হাহাকার,
গান্ধারীর শোকচ্ছাস, শোক-ছবি উত্তরার,
অর্জ্জুনের উন্মত্ততা, সে বৈরাগ্য সুভদ্রার,
করিয়াছে কৃষ্ণপ্রাণে শেলাঘাত অনিবার"

হাস্য রস।

সত্যভামা ও সুলোচনার কোন্দলে হাস্যরস বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। তবে কুরুক্ষেত্রকাব্যে 'পুতুল খেলা' স্বর্গে হাস্যরস অতিরিক্ত হওয়ায় কিঞ্চিৎ তিক্ত হইয়াছে।

শান্ত রস।

নবীনচন্দ্র রৈবতক কাব্যে দ্বিতীয় সর্গে প্রীতিপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ ব্যাসাশ্রমের যে সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পড়িলে মন এক পবিত্র সাত্বিক ভাবে পুর্ণ হয়। ফলতঃ যেমন মহর্ষি ব্যাস, যোগ্য তপোবন তাঁহার এই উক্তির সার্থকতা তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এইরূপ উৎকৃষ্ট শান্ত রসের অবতারণা নবীনচন্দ্রের কাব্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ব্যাসাশ্রমের এই অপূর্ব্ব বর্ণনার একিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম—

"পবিত্র আশ্রম ! দেখ পবিত্র শেখর
রৈবতক স্থিরভাবে,
সুনীল আকাশ পটে,
স্থাপিয়া শ্যামল বপুঃ—শান্ত প্রীতিকর—
সমাধিস্থ প্রকৃতির মহা যোগিবর।
বেষ্টিয়া আশ্রমপ্রান্ত অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে

ছুটিয়াছে শৈলশ্রেণী উত্তর দক্ষিণে
নানা অবয়বে। কভু উচ্চ কভু নীচ,
কভু বা তরঙ্গায়িত আকাশের পটে।
কোথাও প্রাচীর মত
দুরারোহ শৈল অঙ্গ,
আবার কোথাও অঙ্গ পড়েছে ঢলিয়া
সমতল শস্যক্ষেত্রে তরঙ্গ খেলিয়া।”

ইচ্ছা হয়, এই ব্যাসাশ্রমের বর্ণনার সমস্তই উদ্ধৃত করি। এমন সুন্দর, মহিমাময় শান্তিময় তপোবনের বর্ণনা বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া বোধ হয়না।

বীভৎস ও ভয়ানক রস।

নবীনচন্দ্র বীভৎস রসের বিশেষ অবতারণা করেন নাই। তবে কুরুক্ষেত্র কাব্যে যুদ্ধ শেষে রণাঙ্গনের তিনি যে ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। সিরাজের স্বপ্নগুলিতেও ভয়ানক রসের অতি সুন্দর উদ্রেক হইয়াছে।

চরিত্রসৃষ্টি।

কবিত্বের চরম পরীক্ষা—সৌন্দর্য্য বা আদর্শ চরিত্র সৃজনে। অতি অল্পসংখ্যক কবিই এই মহাগুণে বিভূষিত। বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার, শেক্ষপীয়র, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রথমশ্রেণীর কবিগণ মাত্র আদর্শ চরিত্রসৃজনে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মিলটন ও মধুসূদন—দুই জনেই ভাষা ছন্দের উপর অপরিসীম দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা মোহিনী সৃষ্টিশক্তির বিশেষ পরিচয় প্রদান করেন নাই। এইজন্য তাঁহারা শক্তিসম্পন্ন কবি হইয়াও প্রথমশ্রেণীর কবিদলভুক্ত হইবার উপযুক্ত নহেন। নবীনচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধ ও অমিতাভে (তাঁহার প্রথম ও শেষ প্রকাশিত কাব্য) চরিত্রসৃষ্টির বিশেষ প্রয়াস পান নাই। তবে রঙ্গমতী, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে তিনি এই দুর্লভ ক্ষমতার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে তাহার তুলনা অতি অল্পই আছে। রঙ্গমতী কাব্যে বীরেন্দ্র একটি আদর্শ চরিত্র। রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রে তিনি কল্পিত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের আদর্শচরিত্রগুলির অতি উজ্জ্বল ও অভিনব চিত্র দেখাইয়াছেন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মবীর, ব্যাসদেব জ্ঞানবীর ও সুভদ্রা নিষ্কাম ধর্ম্মের অবতার। আবার এই মহৎচরিত্র সকল আরও পরিস্ফুট

করিবার জন্য তিনি ইঁহাদের পার্শ্বে দুর্ব্বাসার পাপচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই তিনটি কাব্যে নবীনবাবু আমাদের পূর্ব্বগৌরবের অতি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়া আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। মধুসূদন প্রমীলার ন্যায় বীরাঙ্গনার ও হেমচন্দ্র দধীচির ন্যায় ধর্ম্মবীরের সৃজন করিয়া উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বৃত্রসংহারে বৃত্র ও রুদ্রপীড়, ঐন্দ্রিলা ও ইন্দুবালা প্রভৃতি চরিত্র থাকিতে আমরা দধিচীর নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলাম, তাহার কারণ এই যে আমাদের বিবেচনায় একমাত্র দধীচিই বৃত্রসংহারের আদর্শ চরিত্র এবং তাঁহার আত্মোসর্গ ই উক্তকাব্যের কেন্দ্রস্থল। চরিত্র সৃষ্টির সম্বন্ধে নবীনচন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রধান অনেক গুলির আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সকল গুলিই বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। বীরেন্দ্র, শঙ্কর, কৃষ্ণ, ব্যাস, সুভদ্রা, অর্জ্জুন রুক্মিণী, সত্যভামা, অভিমন্যু, উত্তরা ও শৈলজা সকলেই রক্তমাংসের জীব এবং সকলেই আমাদের আদর্শস্থানীয়। 'চন্দ্রশেখর' "আনন্দমঠ" প্রণেতা বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন কোন বাঙ্গালী কবি এতগুলি উজ্জ্বল আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।

নবীনচন্দ্রের কাব্যে ভাষা, রস ও চরিত্রসৃষ্টির উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম। তাঁহার ভাষা ও বর্ণনা শক্তি সম্বন্ধে কোন দুই মত দৃষ্ট হয় না, প্রতিকূল সমালোচকেরাও বলেন যে নবীনচন্দ্রের ভাষা বহু সম্পদশালী এবং তাঁহার বর্ণনাশক্তি বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়। আমরা দেখিয়াছি, নবীনচন্দ্র সকল রসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণা করিতে সক্ষম। তিনি বীর রসের বর্ণনায় আমাদের মন যেমন উত্তেজিত করিয়াছেন, সেইরূপ করুণরসের বর্ণনায় আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত করিয়াছেন। তবে শান্তরসের অবতারণাতেই নবীনচন্দ্রের বিশেষত্ব। তাঁহার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস পড়িলে মন এক অপূর্ব্ব সাত্বিকরসে অপ্লুত হয়। শেক্ষপীয়রের ম্যাকবেথ একদিন হৃদয়ের গভীর যন্ত্রণায় বলিয়াছিলেন—

Doctor ! cans thou not minister to a mind diseased.

না ; চিকিৎসকেরা মানসিক ব্যাধির প্রতীকার করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। দুঃখে শান্তি ও শোকে সান্ত্বনা দিতে পৃথিবীর প্রথমশ্রেণীর কবিগণই কেবল সমর্থ। এই মানসিক ব্যাধি নিরাকরনী শক্তি (যাহাকে Mathew arnold কাব্যের fealing power বলিয়াছেন) নবীনচন্দ্রের কাব্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। আদর্শ চরিত্র সৃজনেও নবীনচন্দ্র অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি

যেমন মহাভারতের আদর্শ চরিত্র সকলের উজ্জল ও অভিনব চিত্র দেখাইয়াছেন, সেইরূপ অনেকগুলি নূতন চরিত্র সৃষ্টি করিয়া কাব্যজগৎ আলোকিত করিয়াছেন। শৈলজা, সুলোচনা, জরৎকারু, বীরেন্দ্র, শঙ্কর ও কুসুমিকা তাহার প্রমাণ। ছায়া ব্যতিরেকে আলোকের উজ্জলতা যেমন আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না, সেইরূপ পাপের ছায়া ব্যতীত পুণ্যপ্রভা বেশপরিস্ফুট হয় না। এইজন্যই রঙ্গমতীকাব্যে বীরেন্দ্রের পার্শ্বে মর্কট রামের চিত্র ও কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে দুর্ব্বাসার চিত্র। এতাদৃশ বহুগুণ সম্পন্ন শক্তিশালী কবিকে মহাকবি বলিব কি না, এ প্রশ্ন উত্থাপন করাই বৃথা।

নবীনচন্দ্রের কাব্যে জাতীয় ভাব।

নবীনচন্দ্র বাঙ্গালার জাতীয় কবি। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ন্যায় বাঙ্গালার অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কবি নহেন, তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কবি! মানবের সুখ, দুঃখ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁহার কাব্যে যেরূপ সুন্দর প্রতিফলিত হইয়াছে, তাঁহার সমসাময়িক অন্য কোন কবির রচনায় সেরূপ হয় নাই। তিনি যখন প্রথম আবির্ভূত হয়েন, বঙ্গদেশে তখন সকল বিষয়েই এক বিপ্লবের বন্যা উপস্থিত হইয়াছিল। সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের পুরাতন ছাঁটিয়া ফেলিয়া নূতনের দিকে ধাবিত হইতেছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী, ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের পরিবর্ত্তে বঙ্কিমচন্দ্রের সুমধুর উপন্যাস ও দীনবন্ধুর হাস্যরস প্রধান নাটক ও প্রহসন তখন বঙ্গের ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বিধবা বিবাহ' পুস্তক প্রচার করিয়া দেশে এক সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন। কেশব চন্দ্রের 'নব-বিধানের' New dispensation আলোকে শিক্ষিত বঙ্গবাসী পৌত্তলিকতার বিকৃত ভাব দর্শন করিয়া শিহরিয়া উঠিল। সেই সময়ে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসিক অবস্থা নবীনচন্দ্র অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন——

"আশ্রয়পাদপচ্যুত লতার মতন,
প্রত্যেক বাতাস ভরে বিশ্বাস আমার—
কাঁপিতে লাগিল ; জ্ঞান আলোকে তেমন
মিশাইল অন্ধকার পূর্ব্ব সংস্কার।"

ফলতঃ সেই সময় "এই বহে খৃষ্টধর্ম্ম-বিস্তারিয়া কায়,
এই স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্রোত নিরমল ;
অবোধ বাঙ্গালী আহা! কোন দিকে যায় ?"

বঙ্গসাহিত্যে নবীনচন্দ্রের স্থান নির্ণয়।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র-তুলনায় সমালোচনা।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র—তিনজনেই প্রতিভাসম্পন্ন কবি ছিলেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য তাঁহাদিগের নিকট বহু ঋণে আবদ্ধ। তিনজনেই উৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন ;—মধুসূদনের মেঘনাদ বধ, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার ও নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র বঙ্গসাহিত্যের তিনটি বিশাল স্তম্ভ-স্বরূপ তিনজনেই এক এক বিষয়ে আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন ;—বীররসের বর্ণনায় মধুসূদন, উদ্দীপনায় হেমচন্দ্র ও শান্তরসের অবতারণায় নবীনচন্দ্র অতুলনীয়। এইরূপ তিন জন সমপ্রতিভাসম্পন্ন সমসাময়িক মহাকবির তুলনায় সমালোচনা করিয়া সহসা একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া বিশেষ সহজ নহে। তবে এই তিনজন মহাকবির কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয়ে যে সকল ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাই সন্নিবেশিত করিলাম।

এই তিনজন কবির ভাষা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে মধুসূদনের ভাষা গম্ভীর, হেমচন্দ্রের ভাষা সরল ও নবীনচন্দ্রের ভাষা লাবণ্যময়ী। মধুসূদন ও নবীনচন্দ্রের ভাষা বিষয় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারন করিতে পারে। সে ভাষা সমর বর্ণনায় সৈনিকের সহিত তালে তালে নৃত্য করে, আবার বিরহিনীর চিন্তার স্রোতে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। হেমচন্দ্রের ভাষা অনেকটা সংযত ও আবদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। বিষয় ভেদে তাঁহার ভাষায় কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তিনি যে ভাষায় কবিতাবলী ও ছায়াময়ী রচনা করিয়াছেন, বৃত্রসংহারের ভাষা তাহা হইতে বিভিন্ন নহে। তিনি বৃত্রসংহারে বহুছন্দের সমাবেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার ভাষা সর্ব্বত্রই সমান—সে ভাষা সুরাসুরের যুদ্ধ বর্ণনায় দ্রুতগতিময়, শচীর শোকে ভারাক্রান্ত নয় ও দেবসেনাপতির সাহস বাক্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সঞ্চার করে না। তথাপি হেমচন্দ্রের ভাষা সর্ব্বত্রই সরল ও মধুর। নবীনচন্দ্রের ভাষা হেমচন্দ্রের ভাষা অপেক্ষা বৈচিত্র্যময়ী, সংক্ষিপ্ত ও ওজস্বিনী। তাঁহার ভাষায় ওজস্বিতাগুণের জন্য 'পলাশীর যুদ্ধের এত আদর। ছন্দ হিসাবে—বিশেষতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দে মধুসূদনের স্থান হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চে।

হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর অপেক্ষাকৃত সরল ও নবীনচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর প্রাঞ্জল ও মধুর হইলেও মেঘনাদের জলদগম্ভীর ভাব তাঁহাদের ছন্দে প্রকটিত হয় নাই। মিত্রাক্ষর ছন্দে আমরা কাহাকেও উচ্চতর স্থান দিতে সক্ষম নহি।

রসের উৎকৃষ্ট অবতারণায় তিনজনেই বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। বীররসের বর্ণনায় মেঘনাদ বধ অবশ্যই সমশ্রেণীস্থ সকল কাব্যের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। উদ্দীপনায় ও বিরহের সঙ্গীতে হেমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। এইজন্যই তাঁহার ভারতসঙ্গীত ও হতাশের আক্ষেপ আমাদের চিরনূতন বলিয়া বোধ হয়। আদি ও শান্তরসের অবতারণায় নবীনচন্দ্র অদ্বিতীয়। তিনি আদিরসাশ্রিত বর্ণনায় জয়দেব ও বিদ্যাপতির সমকক্ষ; শান্তরসের অবতারণায় কোন বাঙ্গালী কবি তাঁহার সমকক্ষ নহেন। নবীনচন্দ্রের আর একটি বিশেষত্বএই যে তিনি সকল রসেরই উৎকৃষ্ট অবতারণা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কুরুক্ষেত্র কাব্যই তাহার প্রমাণ।

চরিত্র সৃষ্টি সম্বন্ধে নবীনচন্দ্রের স্থান মধুসূদন ও হেমচন্দ্র হইতে অনেক উচ্চে। গদ্যসাহিত্যে যেমন বঙ্কিম বাবু অসংখ্য নরনারী সৃজন করিয়া আমাদিগকে মোহিত করিয়াছেন, কাব্যসাহিত্যে সেইরূপ নবীনচন্দ্র বহু উচ্চ আদর্শ সৃষ্টি করিয়া আপনার অসামান্য সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যিনি প্রমীলার ন্যায় বীরাঙ্গনার কল্পনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার সৃষ্টিশক্তি অবশ্য নিন্দনীয় নহে। কিন্তু মেঘনাদ বধে এরূপ উজ্জ্বল চরিত্র আর একটিও দেখা যায় না। হেমচন্দ্র বৃত্রসংহারে সৃষ্টিশক্তির সামান্য পরিচয় দেন নাই। বৃত্র, রুদ্রপীড়, ইন্দুবালা ও ঐন্দ্রিলার চরিত্র বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। তবে ইহার একটিও আদর্শ চরিত্র নহে। ইন্দুবালা চরিত্রে অনেক গুণ থাকিলেও, ইন্দুবালা বর্ত্তমান বঙ্গরমণীর চিত্র—প্রমীলার ন্যায় আদর্শচরিত্র হইতে বহু নিম্নে। নবীনচন্দ্রের সৃষ্টিশক্তি আরও উচ্চ অঙ্গের। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা কেবল আদর্শ লইয়াই ব্যাপৃত—কৃষ্ণ কর্ম্মবীর ব্যাসদেব জ্ঞানবীর, সুভদ্রা নিষ্কাম ধর্ম্মের আদর্শ, উত্তরা ও কুসুমিকা "মাধুরীর স্বপ্ন" ও জরৎকারু দুরাকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্ত্তি। এই সকল দের চরিত্রের পার্শ্বে তিনি দুর্ব্বাসা ও মর্কট রায়ের ন্যায় কুটচক্রীর সৃষ্টি করিয়াছেন। এই মোহিনী সৃষ্টিশক্তির গুণেই তাঁহার রঙ্গমতী, রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র এত মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতোক্ত

সাধারণ উপদেশ।

আদি-লীলা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সঙ্কলিত।

৪৯। অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল॥ ঐ

৫০। কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজায় লোভ। ঐ

৫১। গোপীগণের প্রেম—'অধিরূঢ় ভাব' নাম।
শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম, কভু নহে কাম॥ ঐ

৫২। কাম-প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য—হয় প্রেম ত প্রবল॥
লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥ ঐ

৫৩। সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশের অবধান।
সেই ত অংশেরে কহি 'অবতার' নাম॥ ৫ পঃ। ২৪ পৃঃ

৫৪। এইমত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়—।
সর্ব্বদা ঈশ্বর তত্ত্ব অচিন্ত্য শক্তি হয়॥ ঐ

৫৫। কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ-আশ্রয়।
সর্ব্ব-অংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয়॥
যেই যেই-রূপে জানে, সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে॥ ৫ পং। ২৫ পৃঃ

৫৬। একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥ ঐ

৫৭। বৃন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়॥ ঐ। ২৭ পৃঃ

৫৮। আচার্য্যগোসাঞি—চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তার প্রভু নিত্যানন্দ॥
প্রভুর উপাঙ্গ—শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
হস্ত-মুখ-নেত্র-অঙ্গ-চক্রাদস্ত্রে সম॥
এইসব লঞা চৈতন্যপ্রভুর বিহার।
এইসব লৈয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার॥ ৬ পং। ২৯ পৃঃ

৫৯। কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু।
কোটীব্রহ্মা সুখ নহে তার একবিন্দু॥ ঐ

৬০। কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব॥ ঐ। ৩০ পৃঃ

মেহরোগ ও তাহার প্রতিকার।

কবিরাজ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধন্বন্তরী।

ইতিপূর্ব্বে কয়েক খানি সাপ্তাহিক পত্রে "মেহ রোগ" সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিলে অনেকে তাহার প্রতিকারের জন্য আমাকে লিখিয়াছিলেন; সেই জন্য নিম্নে ইহার উৎপত্তির কারণ ও তাহার সহজ সহজ মুষ্টিযোগ লিখিত হইল।

১। ইক্ষু, সুরা, ক্ষার, লালা, সান্দ্র, উদক, সিকতা, শনৈ, শুক্র ও শীত এই দশ প্রকার মেহ কফ হইতে উৎপন্ন হয়:— যথা—

ইক্ষু মেহ সুরাক্ষার লালাখ্যা সান্দ্র কোদকঃ।
সিকতাখ্যা শনৈমেহ শুক্র শীত কফোদ্ভবাঃ" ॥

২। মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, নীল, রক্তিকা, কৃষ্ণ ও রৌদ্র এই ছয় প্রকার পিত্ত হইতে উৎপন্ন। যথা—

"মঞ্জিষ্ঠাখ্যা হরিদ্রাখ্যা নীল মেহশ্চ রক্তিকা।
কৃষ্ণমেহ রৌদ্র মেহশ্চ পিত্ত লক্ষবাঃ॥

৩। হস্তি, বসা, মজ্জা, মধু, এই চারি প্রকার মেহ বায়ু কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়। যথা—

"হস্তিমেহ, বসামেহ, মজ্জামেহ মধুপ্রভা।
চতুষ্ক বাতজাঃ মেহ ইতি মেহশ্চ বিংশতিঃ" ॥

এই কুড়ি প্রকার মেহ মানব শরীরে দেখা যায়। তন্মধ্যে বায়ু কর্ত্তৃক যে চারি প্রকার মেহ লিখিত হইল তাহাই কষ্টসাধ্য ও প্রাণান্ত কর।

নিম্নের কয়েকটী কারণে মেহরোগ উৎপন্ন হয় :—

১। স্বপ্নদোষ,
২। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা,
৩। অলসতা,
৪। দধি ও অপরিষ্কার জলপানে,
৫। বিকৃত দুগ্ধ,
৬। কচ্ছপ, হংস, বরাহ, মহিষাদির মাংস,
৭। নূতন চাউলের অন্ন,
৮। মিষ্টান্ন,
৯। দূষিত গণিকা সহবাসে,
১০। অতিরিক্ত ভোজন বা অনাহার,
১১। গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণে

এই সমস্ত কারণে মেহরোগ উৎপন্ন হয়।

প্রথমতঃ মেহরোগ হইবার পূর্ব্বে দন্তের মলিনতা, দেহের চিকণতা, মুখের মিষ্টতা, হস্তপদের দাহ, তৃষ্ণাধিক্য ও মূত্র নালীতে এক প্রকার যন্ত্রণা ও সর্ব্বদা প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা যায়।

পূর্ব্বোক্ত বিংশতি প্রকার মেহ যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাদের লক্ষণ স্বরূপ নিম্নে লিখিত হইল :—

ইক্ষুমেহ এই মেহে প্রস্রাবের আকার ইক্ষু রসের ন্যায় কিঞ্চিৎ ঘোলা এবং মিষ্টাস্বাদ।

সুরামেহ।—সুরার ন্যায় বর্ণ ও আকার উপরে স্বচ্ছ তলদেশে একপ্রকার ঘন পদার্থ জমিয়া থাকে।

ক্ষারমেহঃ— ক্ষার জলের ন্যায়, ইহাতে প্রস্রাব কালে যন্ত্রণা বোধ হয়, এবং এক প্রকার ক্ষার গন্ধ পাওয়া যায়।

লালামেহ—এই মেহে লালার ন্যায় সূত্রবৎ পিচ্ছিল মেহ নির্গত হয়।

সান্দ্রমেহ — এই মেহে অত্যন্ত ঘন এবং পূঁজের ন্যায় দৃষ্ট হয়।

উদক মেহ—এই মেহে প্রস্রাবের বর্ণ স্বাস্থ্য, শীতল, নির্গন্ধ ও নির্ম্মল জলের ন্যায় পরিষ্কার।

সিকতা মেহ—এই মেহ বালির ন্যায় ও অত্যন্ত মলিন।

শনৈমেহ—এই মেহ প্রস্রাবের পূর্ব্বে অল্পে অল্পে বহির্গত হয়।

শুক্রমেহ—এই মেহ শুক্র মিশ্রিত হওয়াতে গাঢ়, শুভ্র, ও শুক্রের ন্যায় প্রস্রাবে দৃষ্ট হয়।

শীতমেহ—এই মেহ অতি শীতল ও সুমিষ্ট।

মঞ্জিষ্ঠা মেহ—এই মেহ ঈষৎ আরক্তিম ও গাঢ়।

হরিদ্রা মেহ—এই মেহে লিঙ্গ নাল মধ্যে এক প্রকার জ্বালা ও যন্ত্রণা দায়ক বেদনা অনুভব হয় এবং হরিদ্রার ন্যায় মেহ ক্ষরণ হইতে থাকে।

নীল মেহ ও কৃষ্ণমেহ এই মেহে নীল ও কৃষ্ণবর্ণ মেহ দৃষ্টিগোচর হয়।

রক্তিকা মেহ—এই মেহ রক্তের ন্যায়,

রৌদ্রমেহ—এই মেহ কষায়, মধুর এবং রুক্ষ।

হস্তিমেহ—এই মেহে মত্ত হস্তির ন্যায় মূত্রের বেগ হয়, এবং বিশেষ ক্লেদযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বসামেহ—এই মেহেতে বসা মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায় ও প্রস্রাবের আধিক্য হয়।

মজ্জামেহ—এই মেহ দ্বারা মজ্জারস আকৃষ্ট হইয়া মজ্জা রসের ন্যায় মেহ নিঃসরণ হইতে থাকে।

মধুমেহ এই মেহে মধুর মত মেহ নির্গত হইতে থাকে।

এই সমস্ত মেহ প্রথমাবস্থায় উত্তম রূপ যত্ন না করিলে শেষে ভীষণ আকার ধারণ করে।

নিম্নে কয়েকটী টোট্‌কা লিখিত হইল

মেহরোগে রুক্ষ ক্রিয়া, ব্যায়াম, নিশি জাগরণ, গাত্র মার্জ্জন প্রভৃতি যে সকল ক্রিয়া দ্বারা শ্লেষ্মা ও পিত্ত নষ্ট হয়, তৎসমুদয় ক্রিয়া মেহরোগে ব্যবস্থা হয়।

ত্রিফলা, লৌহ, শিলাযতু, হরিতকী এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া মধুর সহিত সেবন করিবে।

শতমূলীর রস দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ নষ্ট হয়।

গুলঞ্চের সার মধুর সহিত সেবন করিলে মেহ নষ্টহয়।

সোরা ২ রতি, কাবাব চিনি ৪ রতি, ও মধু একত্রে মিশ্রিত করিয়া এক দিবস জলে ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে, পরদিন প্রাতে এই সকল দ্রব্যকে ছাঁকিয়া জলটুকু সেবন করিলে ৩।৪ দিবসে প্রমেহ রোগ বিনষ্ট হয়।

কর্পূর ৪ রতি, লইয়া একটী কাঁঠালি কলার সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া তাহাতে অর্দ্ধ ছটাক জল মিশাইয়া একখানি পাতলা নেকড়া দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া তাহা সেবন করিবে। এইরূপ ৩ দিন ব্যবহার করিলে মেহরোগ সারিবে।

একটী নেয়াপাতি ডাবের মুখ কিঞ্চিৎ ফাঁক করিয়া তাহাতে ২ রতি প্রমাণ ফট্‌কিরি চূর্ণ দিয়া মুখটী ভাল করিয়া বন্ধ করতঃ পুকুরের পাঁকের মধ্যে ডাবটী পুতিয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতে ঐ ডাবটীর জল পান করিলে মেহ রোগের আশু প্রতিকার হয়।

সমালোচনা।

বনৌষধি দর্পণ, ২য় খণ্ড। শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত সঙ্কলিত। প্রথম খণ্ডের সমালোচনা কালে ইহার বিশেষ উপযোগীতা এবং সঙ্কলন-কর্ত্তার উদ্যম ও হিতৈষিতার সবিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে, বনৌষধি দর্পণ আমাদের চিকিৎসক বর্গের এবং অনুসন্ধান প্রিয় শিক্ষিত সংসারি ব্যক্তি বর্গের বিশেষ উপকারে আসিবে, এতদ্বারা চিকিৎসা সংসারের একটা প্রকৃত অভাব মোচন হইবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; কবিরাজ মহাশয় সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। গ্রন্থ প্রযুক্ত আয়ুর্ব্বেদোক্ত দুরূহ শব্দ গুলির পরিভাষা এই খণ্ডের প্রথমে সংযোজিত হইয়াছে, তাহাও শব্দ সংসারে দর্পণের কাজ করিবে। সর্ব্বসাধারণে এই কবিরাজ মহাশয়কে উৎসাহ দান করিলে আমরা সুখী হইব। এই খণ্ডের মূল্য পাঁচ টাকা। বিডনষ্ট্রীটের ১৪ নং ভবনে পাওয়া যায়।

কবিরাজ চিকিৎসা সোপান। শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিজাভূষণ রায় কবিভূষণ ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি এতৎনগরের খ্যাতনামা সুচিকিৎসক স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্র কবিরাজের পৌত্র, কয়েক বৎসর কাশীধামে শিক্ষা চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, সুচিকিৎসায় ইঁহার প্রতিষ্ঠা আছে। পুস্তকে গুণব্যাখ্যাস্থলে আমরা দেখিলাম, "পল্লীগ্রামের লোকে বিনা খরচায় এবং সহরে অল্প মাত্র খরচে দেশী গাছ-গাছড়া দ্বারা কঠিন কঠিন পীড়া আরোগ্য করিয়া লোকের প্রাণ রক্ষা করিতে এবং যশস্বী হইতে পারিবেন।" পুস্তকের গর্ভেও ঐ সকল বাক্যের সার্থকতার পরিচয় আছে, এই প্রথম ভাগে জ্বরাধিকার আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালায় সামান্য জ্ঞান থাকিলে অতি সহজে ইহার নির্ঘণ্ট বুঝিতে পারা যায়, এই পুস্তক দেখিয়া লোকে চিকিৎসকের বিনা সাহায্যে বহু লোকের চিকিৎসায় কৃত-কার্য্য হইতে পারিবে মূল্য ।০ আনা মাত্র।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৭শ বর্ষ। ১৩১৬ সাল, ফাল্গুন। ১১শ সংখ্যা।

সাধনতত্ত্ব

সমালোচনা।

লেখক,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী।

ধনৈশ্বর্য্যাশী বিষয়ী ব্যক্তি সকল অর্থবলে দাসদাসী নিযুক্ত করিয়া এবং নানাবিধ কৌশল প্রয়োগ করিয়া বাহ্ ইন্দ্রিয় সকলের সর্ব্বপ্রকার জাগতিক বিষয় ভোগে নিরত হইয়া মরীচিকাবৎ প্রকৃত সুখের আশা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, এই প্রকার প্রকৃতিযুক্ত মোহান্ধ ধনশালী বিষয়ীদিগের আরাধ্য দেবতার অর্চ্চনাদিআধ্যাত্মিক কার্য্য সকল ও অর্থভোগী বা বৃত্তিভোগী গুরুপুরোহিত দ্বারা সম্পন্ন করিয়া,

স্বপ্নলব্ধ ধনকামীর ন্যায় তাঁহারা মিথ্যা ফল কামনা করিয়া থাকেন। এই প্রকার অর্থবলে ঋত্বিক সকল নিযুক্ত করিয়া হোম যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম সকলেরও অনুষ্ঠান কলিকালে নিস্ফল করিয়া অর্থব্যয় এবং সময় নষ্ট করিয়া থাকেন; কেন না, তন্ময় হইয়া ভাবিয়া বুঝিলে দেখা যায় যে, শ্রীভগবান্ বিভু অর্থাৎ তিনি স্থান এবং কালে আবদ্ধ নহেন, পরন্তু সর্ব্বব্যাপী; এই অর্থে তাঁহার এক নাম হইয়াছে বিষ্ণু। তিনি "সর্ব্বভূতেষু গূঢ়" অর্থাৎ তিনি সর্ব্বভূতে গূঢ় ভাবে বিরাজিত আছেন। এই অর্থে তাঁহার এক নাম সর্ব্বভূতের "আত্মা" হইয়াছে। শ্রীভগবানের অনন্ত নামের মধ্যে সর্ব্বাকর্ষক এবং সর্ব্বাশ্রয়ের শ্রীকৃষ্ণনাম সর্ব্বপ্রধান। কেন না, এই অনন্ত সৌরজগতের মধ্যে আমাদের আশ্রয় এই পৃথিবী নামক গ্রহের মধ্যে নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, ছোট বড় যে স্থানে যে পদার্থ বিরাজিত আছে, তাহারা সমস্তই পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহাকে আশ্রয় অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া আপন আপন নিয়োজিত কার্য্য করিতেছে। বিজ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করিয়া বুঝিলে দেখা যায় যে, আমাদের আশ্রয় অবলম্বন আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহ; আমাদের একটী সৌর-জগতের বহু সংখ্যক গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে একটী গ্রহ মাত্র। এই প্রকার অনন্ত গ্রহ উপগ্রহ, অনন্ত সৌরজগতের অনন্ত স্থান ব্যাপিয়া অনন্তকাল ধরিয়া, সর্ব্ব-আশ্রয়ে শ্রীভগবান্ কর্তৃক আকর্ষিত হইয়া স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া আপন আপন নিয়োজিত কার্য্য করিতেছে। তাই সর্ব্বাশ্রয় শ্রীভগবানের আর একটী নাম সর্ব্বাককর্ষ বা শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছে। কৃষ, ধাতু হইতে কৃষ্ণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃষ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ। ইহাতে বুঝিতে হইবে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রী-পুরুষ স্থাবর অস্থাবরাদি জাগতিক সর্ব্ব বস্তুকে তাঁহার অভিমুখে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছেন। ইহাতে আরও বুঝিতে হইবে, অনন্ত ঐশ্বর্য্যযুক্ত অনন্ত ভগবান্‌কে আশিলক্ষ আকৃতি প্রকৃতিযুক্ত অসংখ্য জীবের মধ্যে ভাগ্যবান্‌গণ তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যিনি যে, ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া, অন্য কথায় যে ব্যক্তি বা ভক্ত যে ভাবে তাঁহার যে রস আস্বাদন করিয়া তাঁহাকে যত নামে অভিহিত করিয়াছেন, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহার্য্যে যতদূর বুঝা গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়; তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ নামের নামীতে সর্ব্বপ্রকার নামের সর্ব্বপ্রকার নামীর সত্ত্বাপর্য্যবসিত হইতেছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, "গো" এই নাম বলিলে এই নামের নামী, গোত্ব ধর্ম্মযুক্ত কোন জীবের জ্ঞান হয়। প্রস্তর এই নাম বলিলে এই নামের নামী প্রস্তরত্ব ধর্ম্মযুক্ত কোন অস্থাবর বস্তুর জ্ঞান হয়। এই প্রকার

শ্রীকৃষ্ণ এই নাম করিলে, তাঁহার নামী সর্ব্বব্যাপী (বিভু) সর্ব্বভূতের] আত্মা, সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাকর্ষক এক চিন্ময় সত্বার জ্ঞান হয়।

এই বিষয়টী আরও একটুকু বিষদ ভাবে বুঝিতে গেলে এই ভাবে বুঝিতে হয় —য, শ্রীভগবান্ অতি বৃহৎ বস্তু, ক্ষুদ্রজীব তাহাকে সম্যক্ প্রকারে ধারণা করিতে পারে না, তাই যে জীব বা যে যে, উপাসক সম্প্রদায়ের যে যে, ব্যক্তি যে যে, ভাবে তাঁহার সত্বা ধারণা করিয়া যে নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহার অর্থাৎ এই সমস্ত সত্বার সমষ্টি করিলে আমরা যে মহান্ সত্বার উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা সর্ব্ব-আশ্রয়, সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ নামের নামীর সত্বায় পর্য্যবসিত হয়, অর্থাৎ সেই মহান্ সত্বাকে শ্রীকৃষ্ণ নামে অভিহিত করিলে, সর্ব্বসত্বা তাহাতে উপলব্ধি হয়। তাই শাস্ত্রে লিখিত আছেঃ—

"ঈশ্বরঃ পরমংকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণঃ কারণম্॥
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতরী সর্ব্ব কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, ইহা সবার আধার॥
পুরুষ, যোষিত (স্ত্রী) কিংবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥
নানা ভক্তে নানামত রসামৃত হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥

ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ব্যক্তি শ্রীভগবানের যে, রসে আকৃষ্ট হইয়া যে প্রকার "ভাবাবেশে"এই ভগবৎ-রস আস্বাদন করেন, তাহার বিষয়ও তিনি এবং আশ্রয়ও তিনি অর্থাৎ শ্রীভগবান্ই রসস্বরূপ, এবং তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া ভক্তের হৃদয়ে ভাবের স্ফুর্ত্তি হয়, এবং পরমানন্দ লাভ করে; তাই উপনিষদে উল্লেখ আছে,—

"রসোবৈ সঃ।
রসং হ্যেবায়ংলব্ধ্বা নন্দী ভবতি॥"

"সেই পরমাত্মা রস-স্বরূপ তৃপ্তিহেতু। সেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন।" ইহার ভাবার্থ এই যে, মঙ্গলময়ের প্রেমরস লাভ করিয়া জীব পরমানন্দে মগ্ন থাকেন, বাক্য তাঁহাকে আপনা হইতেই রস-স্বরূপ

বলিয়া উঠে। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসং বিশন্তি।"।

আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে, এবং প্রলয়কালে আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে।

এই বিষয়টি আর একটু বিষদ্ ভাবে বুঝিতে গেলে বুঝিতে হয় যে, চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর, তাঁহা হইতে সমস্ত অবতার সকল উৎপন্ন হইয়াছে। আর জগৎ সৃষ্টির যত কারণ আছে, তাহার মৌলিক বা প্রধান কারণই চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আবার অনন্ত অবতারই বল, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই বল, আর অনন্ত বৈকুণ্ঠই বল, সর্ব্ব জগতের আধার এই আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ, এক কথায় সর্ব্ব জগৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে পরিণত হইয়াছে এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; অতএব তিনিই বিষয়, তিনিই সর্ব্বাশ্রয়। এই প্রকার আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ পাপী, তাপী, দরিদ্র, কাঙ্গালদিগকে কুল, মান, শীল, পণ্ডিত, মূর্খ, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকাদি বিচার না করিয়া, আপন স্বাভাবিক সুমধুর মাধুর্য্য ভাবে প্রেমাকর্ষণ করিতেছেন; আমরা ক্ষুদ্র জীব, আমরা আমার পুত্র, আমার পরিবার, আমার স্বামী, আমার বাটী, আমার ধন-ঐশ্বর্য্য; ইত্যাদি বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনকে আবদ্ধ করিয়া আমরা চিরকাল ভগবৎ-বহির্ম্মুখী হইতেছি, তাই শাস্ত্রে লিখিত আছেঃ—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে ডুবায়॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, জীব যখন শ্রীকৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হয়, তখন সুযোগ বুঝিয়া "মায়া" তাহাকে সুখের প্রলোভনে ভুলাইয়া নানাপ্রকার দুঃখভোগ করায় কখনও রাজসিক এবং তামসিক শাস্ত্রের কুহকে ভুলাইয়া যাগ, যোগ্য, হোম, জপ, তপাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইয়া স্বর্গভোগ করায়; আবার কখন বা কামাদি নীচবৃত্তি সকল উত্তেজিত করতঃ নানাপ্রকার অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত করিয়া নরকে ডুবায়।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মের ফল কখন স্থায়ী হয় না। ভোগান্তে তাহা পর্য্যবসিত হয়। কাজেই জীবের কখন চিরকাল স্বর্গে সুখভোগ কিম্বা নরকে

কর্ম্মফল অনুসারে কথন স্বর্গ, কথন নরক পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। তাহার মধ্যে কলিকালে হোম, জপ, তপাদি কোনপ্রকার যজ্ঞ বা বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে পারে না; কেন না, হোমাদি কোন প্রকার ক্ষুদ্র যজ্ঞ করিতে গেলেও চারি প্রকার ঋত্বিকের আবশ্যক, যথা—অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা, ও ব্রহ্মা, এই চারি প্রকারের ঋত্বিকের চারি প্রকার কার্য্য। প্রথম প্রকার ঋত্বিক চারিজন আবশ্যক। ইহাঁরা প্রত্যেকেই যজুর্ব্বেদে ব্যুৎপন্ন এবং যজুর্ব্বেদোক্ত বেদি নির্ম্মাণ কার্য্যে বিশেষজ্ঞ, অর্থাৎ বহুস্থানে বহুবার যজ্ঞ কার্য্য করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এ প্রকার লোক নির্ব্বাচন করিতে হয়।

২। দ্বিতীয়তঃ—৪ জন হোতা, ইহাঁদের ঋগ্বেদে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হওয়া চাহি।

৩। তৃতীয়তঃ—৪ জন উদ্গাতা ইহাদের সামবেদে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হওয়া চাহি। এই ৪ জন বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ হওয়া বিশেষ আবশ্যক; কেন না, উদ্গাতার উদ্‌গানে মন্ত্র সকল মূর্ত্তিমান দেবতা স্বরূপ হইয়া যজমান্‌কে (যিনি কর্ম্ম করেন) কর্ম্মফল প্রদান করিবে।

৪। চতুর্থতঃ—৪ জন ব্রহ্মার আবশ্যক, এই চারিজন ব্রহ্মা সর্ব্ববেদ এবং যজ্ঞে পারদর্শী হওয়া চাহি।

এক্ষণে যাঁহার কিছুমাত্র বিচার শক্তি আছে, তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে, সত্য, ত্রেতা, এবং দ্বাপর যুগে বৈদিক ক্রিয়া যখন নিত্য নৈমিত্তিক ভাবে গৃহী মাত্রেই অনুষ্ঠান করিত, তখনও যদি ১৬ জন বিশেষজ্ঞ আচার্য্য দ্বারা এই প্রকার অতি সাবধানতার সহিত বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত, তখন কলিকালে এ প্রকার বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান কখন সম্ভব নহে। কেন না, বেদ অপৌরুষের অর্থাৎ ভগবান্ বাক্য শ্রীভগবান্ যেকার্য্য যে প্রকার করিতে আদেশ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া কার্য্য করিলে কখন সে কার্য্যের সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাই পরম কারুণিক মহর্ষি জৈমিনি পূর্ব্ব মীমাংসার বিচার করিয়া বিষদ্ ভাবে জগৎকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, দেশাচার কুলাচার প্রভৃতি সংস্কার বশতঃ বা গুরু পুরোহিত অধ্যাপকাদির পরামর্শ অনুসারে বেদ-বিধির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিলে কখনই কার্য্যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে, কলিকালে যখন ঋত্বিকের সম্পূর্ণ অভাব এবং যজ্ঞ কার্য্যের উপাচারও অমিল, তখন গুরু পুরোহিত অধ্যাপকাদির পরামর্শে যিনি যে কোন প্রকার প্রগাঢ় ভক্তিভাবে বৈদিক যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করুন না কেন, তাহা মিথ্যা

সময় নষ্ট, অর্থের অপব্যয় মাত্র। এই প্রকার বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের অনুরূপ তান্ত্রিক ক্রিয়াগুলিও নিষ্ফল বলিয়া বুঝিবে। কলিকালে তাহার অনুষ্ঠানে কোন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেন না, মন্ত্র এবং ঔষধিতে কেহ কখন ভগবান্‌কে বশ করিতে পারে না। এই বিচারে বুঝিতে হইবে যে, বৈদিক এবং তান্ত্রিক কর্ম্ম যখন নিষ্ফল বলিয়া স্থির হইল, তখন তাহার অনুষ্ঠান করিয়া কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখী কোন ব্যক্তি কলিকালে স্বর্গ সুখ ভোগ করিবার অধিকারী হয় না, অথচ অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠানের ফলে তাহাদিগকে নরকের দুঃখ মাত্র ভোগ করিতে হয়। তাই শ্রীভগবান্ কলির জীবের প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহার শেষ আজ্ঞা বলবান; ইহা জগৎকে শিক্ষা দিয়া উপনিষদ্ বা বেদান্ত শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ শ্রীভগবান্ মূল-বেদের ক্রিয়া কাণ্ডের উপদেশ দিয়া পরিশেষে বেদান্ত বা উপনিষদ শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়া ভক্তিরই প্রাধান্য জগৎকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ভগবৎ বিমুখ জীব সকল যখন বেদান্তের সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে অপারক হইলেন; তখন শ্রীভগবান্ কৃপা পরবশ হইয়া দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতারপ্রাপ্ত হইয়া বেদান্তের বিষদ্ ব্যাখ্যা স্বরূপ গীতাশাস্ত্র প্রকাশ করিয়া শেষ আজ্ঞা বলবৎ রাখিয়া অজ্ঞানান্ধ লোকদিগকে ভক্তিমার্গের প্রাধান্য বুঝাইয়া গিয়াছেন, তাই গীতার শেষভাগে ভক্তিবিষয় প্রস্তাব-বর্ণনা করা হইয়াছে, তাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন যে,

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামিমাশুচঃ॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া জগৎকে বুঝাইতেছেন যে, সর্ব্বধর্ম্ম অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মকর্ম্ম বা পাপ পুণ্য অন্য কথায় সর্ব্বপ্রকার বেদবিহিত ধর্ম্মকর্ম্ম এবং বেদ-নিষিদ্ধ সর্ব্ব প্রকার অধর্ম্ম বা পাপকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমার স্মরণাপন্ন হও অর্থাৎ কায়মন, এবং বাক্যে আমাকে আত্ম সমর্পণ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব। ইহার দ্বারা পরম কারুণিক পরমেশ্বর কলিজীবের উপর দয়া প্রকাশ করিয়া, "শেষ আজ্ঞা বলবান্" এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া উপদেশ দিয়াছেন যে, দানধর্ম্ম ব্রতধর্ম্ম, রাস্তা, ঘাট, পুষ্করিণী আদি উৎসর্গ, জলছত্র দেওয়া, পান্থশালা নির্ম্মাণ, গুরু পুরোহিত আদির সেবা করা, তীর্থস্থানে গমন করিয়া পাণ্ডাদিগকে বহু অর্থ প্রদান করা, বৈতরণী

কেহ নিষ্পাপী হইতে পারিবে না। পরন্তু শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন করিতে পারিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া মহাভক্ত রামপ্রসাদ এই গীতটী গাহিয়াছেনঃ—

"কাজ কি আমার কাশী।
(ওরে) কালীপদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি॥
হৃদ্‌কমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি॥
কালীনামে পাপ কোথা, মাথা নাই মাথাব্যথা।
(ওরে) অনল দহন যথা, করে তুলারাশি॥
গয়ায় করে পিণ্ডদান, পিতৃ ঋণে পায় ত্রাণ,
(ওরে) যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে মলেই মুক্তি, এই বটে সে শিবের উক্তি,
(ওরে) সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
(ওরে) চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণা-নিধির বলে,
(ওরে) চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাব্‌লে এলোকেশী॥"

এই প্রকার ভক্ত কুলগুরু শ্রীচৈতন্যদেব সনাতনকে শিক্ষাচ্ছলে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেনঃ—

"কামত্যাগী কৃষ্ণভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥
[বেদ] বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন [হয় না।]
অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত॥
জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা সহ নিয়মাদি * বুলে কৃষ্ণ সঙ্গ॥

* নিয়মাদিঃ — যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম সামাদি যোগের অষ্ট অঙ্গ।

এক্ষণে ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ভগবান্ বিমুখ জীব, সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া চতুর্ব্বিধ মুক্তি বা পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম, বিনাভক্তি অনুশীলন ব্যতীত হয় না। এক্ষণে বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে, মায়ামোহে ভুলিয়া জীব যখন কৃষ্ণবিমুখী হয়, তখন নিজের পুরুষকার দ্বারা কেহ কখন মায়া হইতে মুক্ত হইতে পারে না, তখন এই মায়া হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?

"ভক্তি মুক্তি সিদ্ধকামী যদি হয়।
গাঢ়ভক্তি যোগে তবে কৃষ্ণকে ভজয়॥"

পরম কারুণিক শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বশাস্ত্রের অতি গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া সনাতনকে শিক্ষা দিতেনঃ—

"সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া, তাহারে ছাড়ায়॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, ভক্ত, সাধুসঙ্গ এবং ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যে জীবের কৃষ্ণ-ভক্তি হয়, তাহার মায়া ক্রমশঃ ছাড়িয়া নিস্তার প্রাপ্ত হয়।

একই ভক্তিকে নয়টী অঙ্গে বিভক্ত করিয়া তাহার বিকাশ ত্রাণ কি প্রকার হয়; তাহা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সনাতনকে আর একটু বিষদ্ ভাবে এই প্রকারে বুঝাইয়াছেন যথাঃ—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যের রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই-প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম॥"

ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, যাহারা তান্ত্রিক এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন বা যে সমস্ত গুরু পুরোহিতগণ তাঁহাদের শিষ্য বা যজমানকে এই প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত করান, তাঁহারা ইহকাল এবং পরকাল দুই নষ্ট করিতেছেন। আবার

যে সমস্ত বৈষ্ণব নামধারী ভক্তি শাস্ত্রানভিজ্ঞগণ কুসঙ্গে পতিত হইয়া, স্ত্রীলোক-দিগকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ বা মন্ত্রজপ করিতে করিতে স্বকীয় বা পরকীয় ভাবে তাঁহাদের ধ্যান, ধারণা, দর্শন, স্পর্শন, স্তম্ভন এবং সম্ভোগাদি ক্রিয়ার অনু-ষ্ঠান দ্বারা ভজন সাধন করেন, তাঁহারা বৃন্দাবন, জগন্নাথ, নবদ্বীপ বা গঙ্গাতীর-বাসী হউন না কেন, এই অপরাধে তাঁহাদের কোন ক্রমে নিস্তার নাই। আবার যাঁহারা তন্ত্র এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এই কুকার্য্যে প্রবৃত্ত আছেন, তাঁহারাও ঘোর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সনাতনকে শিক্ষা-চ্ছলে জগৎকে বুঝাইয়াছেন যে,—

"ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে
পুরাণাগমাস্তাং তামেব হি দেবতাং
পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্
বিষ্ণুঃ সমস্তাগমব্যাপারেষু
বিবেচন ব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥"

চরাচর জগতের মোহার্থ অর্থাৎ মায়া বা অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন করিবার জন্য পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্র বিরচিত হইয়াছে। তন্নিরূপিত দেবগণও অর্থাৎ তন্ত্র এবং পুরাণাদি মিথ্যা শাস্ত্রাদি দ্বারা নিরূপিত মিথ্যা দেবদেবীগণও (অজ্ঞান) মানবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছে; কিন্তু নিখিল শাস্ত্র অর্থাৎ সমস্ত বেদ বেদাঙ্গাদি সর্ব্বধর্ম্ম শাস্ত্র বিচার করতঃ মীমাংসা করিলে কেবল মাত্র বিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণই) ভগ-বান্ বলিয়া নিশ্চিত হয়। এই অতি আবশ্যকীয় বিষয় মহাপ্রভু কি প্রকার যুক্তি দ্বারা সনাতনের শিক্ষাচ্ছলে জগৎকে বুঝাইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুনঃ—

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণবেদ পুরাণ॥
শাস্ত্র, গুরু, আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্তির সাধন॥
অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ—শিরোমণি প্রেম মহাধন॥

কৃষ্ণ মাধুর্য্য সেবা প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণ-সেবা করে কৃষ্ণ রস-আস্বাদন॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখদেখি পুছয়ে তাহারে॥
তুমি কেনে এত দুঃখী তোমার আছে পিতৃধন।
তোরে না কহিল অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ।
ঐছে বেদপুরাণ জীবে কৃষ্ণ উপদেশ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে জ্ঞানে ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়॥
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বরুলী উঠিবে ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিবে তাঁহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজাগরে।
ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্ব দিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম জ্ঞানযোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব জগৎকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতেছেন যে, পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম-রূপ মহাধনের অধীশ্বর হইতে চাহ, তবে সর্ব্বশাস্ত্রের যে যে স্থানে যে কোন প্রকার কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, অথবা নিষ্কাম, অষ্টাঙ্গ যোগের বিষয় উল্লেখ আছে, তাহার সমস্তকে যথাক্রমে ভীমরুল, বোল্‌তা, অথবা যক্ষ অথবা কালসর্প মনে করিয়া সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে—

ভক্তি সহকারে শ্রীভগবান্‌কে ভজনা করিলে, ভক্তিতেই তিনি বশ হন অর্থাৎ তাঁহাকে ভক্তিযোগে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভগবৎ-বাক্যের পোষকতায় শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০) দেখা যায়—

"ন সাধয়তি মাং যোগে ন সাখ্যংধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন, উদ্ধব! আমার উর্জ্জিতা শ্রেষ্ঠা, ভক্তি,-প্রেম ভক্তি যেরূপ আমাকে রুদ্ধ করে—বশীভূত করে, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য (আত্মানাত্মবিবেক), ধর্ম্ম (গার্হস্থ ধর্ম্ম), স্বাধ্যায়—বেদপাঠ (ব্রহ্মচারি ধর্ম্ম), তপস্যা (বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম) এবং ত্যাগ (সন্ন্যাস), ইহারা কেহই আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না। ঐ গ্রন্থে—(১১।১৪।২০)

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়সতাম্।
ভক্তিঃপুণাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥"

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, কেবল মাত্র শ্রদ্ধাসমন্বিত ভক্তি দ্বারাই সাধুগণ আমাকে প্রিয় আত্মারূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমার প্রতি নিষ্ঠাভক্তি চণ্ডাল কেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে। যাঁহার কিছুমাত্র বিচারশক্তি আছে, তিনি ইহার দ্বারা বুঝুন যে, কি বৈদিক, কি তান্ত্রিক, কোন প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কখন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হয় না; সুতরাং যাঁহারা তন্ত্র শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ষট্‌চক্র ভেদ, ভূতশুদ্ধি, মারণ, উচাটন, বশীকরণ, এবং নায়িকা সাধন, কালিসাধন, ভৈরবি সাধনাদি যত প্রকার ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে কখন ভগবৎ-প্রেমরূপ মহাধন প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কাজে কাজেই তাঁহারা কখনই ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। ইহার সঙ্গে ভক্তি-বিরোধী তন্ত্র এবং পুরাণের কল্পিত দেবতাগণও কখন ভগবৎ ভক্তের উপাস্য হইতে পারে না। অতএব সৎ-চিৎ এবং আনন্দ চিন্ময় বিগ্রহ স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত দ্বিতীয় উপাস্য আর কেহ নাই।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত।

বঙ্গের আর একটি সমুজ্জ্বলরত্ন করাল কাল সাগরে ডুবিল। রাজধানির

সোমবার রাত্রি দ্বিপ্রহর দ্বিতীয় ঘটিকার সময় ইহ-সংসার হইতে যোগ্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহার বিয়োগে সমস্ত বঙ্গদেশ শোকসাগরে নিমগ্ন ; শীঘ্র আমরা তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না ; শীঘ্র আমরা তৎসদৃশ আর একটি বঙ্গ উজ্জ্বল রত্ন প্রাপ্ত হইব, তেমন আশা অতি বিরল।

১২৫৫ বঙ্গাব্দের ২৮ শে শ্রাবণ (ইং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট তারিখে) বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত রামবাগানের দত্তভবনে জন্মগ্রহণ করেন, বর্ত্তমান ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১৩ই অগ্রহায়ণ তারিখে একষষ্টি বৎসর বয়সে ইহসংসার পরিহার করিলেন। জীবনে তিনি বহুবিধ শুভকরী লীলা খেলা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই ইহ-জন্মভূমিতে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

বাবু রমেশচন্দ্র কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে এল, এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করিয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ৩রা মার্চ্চ তারিখে ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁহার সঙ্গীহন বাবু স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু বিহারী লাল গুপ্ত। তিনজনেই. বন্ধু, তিনজনেরই লক্ষ্য ছিল সিবিল সার্ব্বিশ পরীক্ষা ; তিনজনেই ঈপ্সিত বিষয়ে সফল মনোরথ হইয়াছিলেন। বাবু রমেশচন্দ্রের পিতা ডেপুটি কালেক্টার ছিলেন, ইংলণ্ড হইতে দেশে আসিয়া সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র এক জেলার এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট হন, পর্য্যয়ক্রমে অনেক জেলার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া পরিশেষে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশানর হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ঐ উচ্চ পদ আর কোন বঙ্গ সন্তান প্রাপ্ত হন নাই।

যেখানে যেখানে মাজিষ্ট্রেট রমেশচন্দ্র শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সকল স্থলেই সকল কার্য্যে তাঁহার উচ্চ স্থখ্যাতি প্রচার হইয়াছিল। প্রজালোকের হিত সাধন এবং গবর্ণমেণ্টের প্রীতিবর্দ্ধন, একসঙ্গে এই উভয় সম্মান লাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না সরকারি কার্য্য ভার লইয়া প্রায় কেহই তাহা পারেন নাই, রমেশচন্দ্র পারিয়াছিলেন।

বাবু রমেশচন্দ্র যখন যে দুর্ণনিযুক্ত জেলার ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট হন, তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ভণ্ডলোকেরা প্রায় সর্ব্বদা চুরি ডাকাতি নরনারী হত্যা সতীর সতীত্ব হরণ ইত্যাদি অসৎকার্য্যে রত ছিল, উচিত মত দণ্ডবিধানে ও মিষ্ট মিষ্ট প্রবোধ বচনে বাবু রমেশচন্দ্র সেই সকল জেলায় শান্তিস্থাপন করিয়াছিলেন।

রমেশচন্দ্র উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার হইয়া স্থখ্যাতি ত লইয়াই ছিলেন,

ভঞ্জের রাজার ব্রাহ্মিকা বিবাহে বাধা দিয়া তিনি তথাকার সর্ব্বলোকের প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন।

সর্ব্বপ্রকার রাজকীয় কার্য্যে সুখ্যাতিভাজন হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বাবু রমেশচন্দ্রকে সি, আই, ই, উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

২৬ বৎসর সরকারি কার্য্যে পরিশ্রম করিয়া বাবু রমেশচন্দ্র রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে তিনি বরদার মহারাজের রাজস্ব সচীব হন, তাহার পর ঐ রাজ্যের দেওয়ান মন্ত্রী হইয়াছিলেন, কিন্তু বেশী দিন দেওয়ানী করিতে হইল না, করালকাল তাঁহাকে আহ্বাণ করিল, কার্য্যে যশোভাজন হইয়া অচিরে তিনি পার্থিব লীলা সম্বরণ করিলেন।

কলিকাতার ঠাকুর বংশ এবং রামবাগানের দত্ত বংশ অবিচ্ছেদে সুপণ্ডিত সম্মানে সম্মানিত। দত্ত বংশের একটি কুমারী ইংরাজী ভাষায় সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন; কন্যাটির পারিবারিক নাম হইয়াছিল, পোয়েটেস্ মিস্ তরুদত্ত। আসল নাম ছিল তরুবালা। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ঐ বিখ্যাত পণ্ডিত বংশের রত্ন ছিলেন, সর্ব্বদেশীয় কাব্য সাহিত্যের আলোচনায় তাঁহার যথেষ্ট আমোদ ছিল। ইংরাজীতে সুপণ্ডিত হইলে মাতৃভাষার প্রতি তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন, মাতৃভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, আন্তরিক যত্নে তিনি কয়েকখানি বাঙ্গালা উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কন, জীবন প্রভাত, জীবন সন্ধ্যা, প্রভৃতি। শেষোক্ত দুইখানি পুস্তক সাধুজনের হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছে।

বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের পাণ্ডিত্যের প্রধান নিদর্শন ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় ঋগ্বেদের অনুবাদ; রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ। বেদের অনুবাদটি বেদজ্ঞলোকের আদৃত হইয়াছে কি না, তাহার বিচারক তাঁহারা; আমরা নই। ঐ তিন অনুবাদ ভিন্ন তিনি ইংরাজী ভাষায় আরও অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইকনামিক হিষ্ট্রীঅব ইণ্ডিয়া এবং ইণ্ডিয়ান ফাইনান্স এণ্ড ম্যানুফ্যাক্চার এই তিন খানি পুস্তক উল্লেখ যোগ্য।

বাবু রমেশচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও গুণাবলী স্মরণ করিয়া আমরা নিত্য নিত্য ব্যথিত হইতেছি, তাঁহার একটি স্মরণ চিহ্ন স্থাপন করা আবশ্যক, পাথরের মূর্ত্তির কথা আমরা বলিতেছি না, যে চিহ্ন দর্শনে ও যে চিহ্নের ফলভোগে লোকে সতত তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারে, কৃতীপুরুষের সেইরূপ স্মরণ চিহ্ন বাঞ্ছনীয়। বাবু রমেশচন্দ্রের একটি পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। তিনি পিতৃনামের গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন, এই ভরসায় আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব

২য় প্রস্তাব।

কবিরাজ—শ্রীগিরিজাভূষণ রায় (সেন গুপ্ত)

মলক্ষয়ে—ধারক অথবা মলকারক পথ্যাদি ব্যবহার করিবে।

পূর্ব্বে বাতাদি দোষত্রয় রসাদি ধাতু এবং মলমূত্র স্বেদ ক্লেদের অভাব বা স্রাব হইলে কি কি লক্ষণ হয় এবং তাহার বৃদ্ধিকরিবার উপায় কথিত হইল, এক্ষণে ঐ সকল দোষ ও ধাতুর বৃদ্ধি হইলে কি কি লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং তাহাদের প্রশমনোপায় কহিতেছি।

বায়ু বৃদ্ধি পাইলে শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইয়া পড়ে, গাত্র চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, নিদ্রা হয় না, মানব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কঠিন মল নিঃসৃত হয় উষ্ণদ্রব্যে অভিলাষ হয়, গাত্রচর্ম্মের স্ফুরন অর্থাৎ শরীরের কোন কোন স্থানের স্পন্দন হয় (নাচিতে থাকে) এবং বাক্যের স্বর কর্কশ হইয়া পড়ে।

পিত্ত বর্দ্ধিত হইলে গাত্রচর্ম্ম পীতাভ, সর্ব্বশরীরে উত্তাপ, বলহানি, ইন্দ্রিয় সকলের দৌর্ব্বল্য এবং সময়ে সময়ে মোহ বা মূর্চ্ছা হইয়া থাকে মলমূত্র ও চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায় সর্ব্বদাই শীতল দ্রব্যে অভিলাষ হয়।

শ্লেষ্মা (কফ) বর্দ্ধিত হইলে গাত্র শীতল, ফেকাসে বর্ণ, রক্তহীন এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভারি হয়; শরীর উদ্যম হীন ও শিথিল হইয়া পড়ে; সর্ব্বদাই তন্দ্রা বা নিদ্রা আইসে, সন্ধিস্থল বলহীন ও শিথিল হইয়া পড়ে।

রসের বৃদ্ধি হইলে উৎক্লেদ বা বমনবেগ, মুখ-নাসাদি হইতে জলস্রাব; রক্তবৃদ্ধি হইলে সর্ব্বশরীর রক্তবর্ণ (লাল) হইয়া উঠে, শিরাসকল রক্তপূর্ণ হইয়া সমুন্নত হয়। মাংস বৃদ্ধি হইলে কটি গণ্ড ওষ্ঠ উরু বাহু জংঘা মাংস দ্বারা পুষ্ট ও স্ফীত হয় এবং দেহ ভারি হয়। মেদ বৃদ্ধি হইলে উদর ও পার্শ্ব বৃদ্ধি হয় এবং ব্যাসে পুষ্ট হয় (ভুড়ি হয় এবং ফাড়ে বাড়ে); সর্ব্বশরীর স্নিগ্ধ ও দুর্গন্ধ যুক্ত হইয়া থাকে, শ্বাস ও কাশরোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। অস্থি বৃদ্ধি হইলে অতিরিক্ত অস্থি ও গজদন্তাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে, নখ ও কেশ শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

মজ্জা বৃদ্ধ পাইলে সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ নেত্র ভারি হয়। শুক্রের অতি বৃদ্ধি হইলে অতিরিক্ত শুক্রপাত এবং শুক্রজনিত অশ্মরি [পাথুরি] রোগ হইয়া থাকে।

অধিক মল সঞ্চিত হইলে স্বশব্দে আধ্মান (পেটফাঁপা) এবং কুক্ষিদেশে (কোঁকে) টানিয়া ধরে ও মন্দ মন্দ বেদনা অনুভূত হয়।

মূত্র বৃদ্ধি হইলে মুহু মুহু প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব, বস্তিতে জ্বালা বেদনা ও আধ্মান (ফাঁপ) হয়।

স্বেদ বৃদ্ধি হইলে সর্ব্বদাই অত্যন্ত ঘর্ম্মে গাত্র আদ্র থাকে এবং গাত্রে দুর্গন্ধ ও কণ্ডু (চুলকনা) হইয়া থাকে।

দোষাদি ক্ষয় হইলে যেমন দোষাদির প্রতিকুল (বৃংহন) দ্রব্য দ্বারা তাহাদের বৃদ্ধি করাইতে হয়, তদ্রূপ তাহাদের অতি বৃদ্ধি হইলে তাহাদের অনুকুল অথচ সংশমনক পথ্যাদি দ্বারা তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইবে। যেমন—গুলঞ্চ ও শুঁঠের দ্বারা বায়ুর দমন, মধু ও ত্রিফলাদির দ্বারা পিত্তের দমন এবং গুড় ও আদা দ্বারা কফের দমন হইয়া থাকে।

এক্ষণে কিরূপ আহার বিহারাদি দ্বারা সাধারণতঃ কোন কোন ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে, তাহার বিষয় আলোচনা করা যাক।

সর্ব্বদা শ্লেষ্মাবর্দ্ধক পান ভোজনে অভ্যস্থ, অজীর্ণের উপর ভোজনকারি ব্যায়ামে বিরত, দিবা নিদ্রায় রত ব্যক্তির ভুক্ত অন্নরস তিক্ত রসের পরিবর্ত্তে মধুর রসে পরিবর্ত্তিত হইয়া মেদ বৃদ্ধি করিতে থাকে; ক্রমশঃ ঐ ব্যক্তি অতিস্থূল হইয়া পড়ে; শ্বাস, পিপাসা, ক্ষুধা, স্বপ্ন ঘর্ম্ম গাত্রদৌর্গন্ধ সর্ব্বদাই কণ্ঠে শাঁ শাঁ ও হু হু শব্দ, গাত্রের অবসাদ এই সকল উপদ্রব স্থূল ব্যক্তির উপস্থিত হইয়া থাকে; সকল কার্য্যেই অসমর্থতা এবং (মেদ কর্তৃক স্রোত অর্থাৎ নাড়িকা সকল অবরুদ্ধ থাকায় অন্য ধাতু সকল বর্দ্ধিত হইতে না পারায়) ক্ষীণ প্রাণ হইয়া পড়ে। যখন যে ব্যধি উপস্থিত হয়, তখনই তাহা প্রবল হইয়া উঠে; প্রমেহ পীড়কা-বিদ্রধি (Dia betes carbuncle.) জ্বর ভগন্দর বা বাত রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাহাতে অতিরিক্ত মেদ বৃদ্ধি না হয়, তজ্জন্য মেদোৎপত্তির কারণ গুলিকে সততঃ বর্জ্জন করিবেন, যদি সাবধানে থাকিয়াও মেদগ্রস্থ হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তৎপ্রশমনার্থে শিলাজতু গুগ্‌গুল গোমূত্র হরীতকী বহেড়া আমলা রসাঞ্জন প্রভৃতি ঔষধ রূপে এবং যবমুগ কোঁদো প্রভৃতি মেদঘ্ন ও স্রোত বিশোধনীয় আহার্য্য ব্যবহার করিবেন। অল্প অল্প ব্যায়াম এবং ত্রিফলার (হরীতকী বহেড়া ও আমলা একত্রে) ক্বাথে কিঞ্চিৎ গোমূত্র মধু, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বস্তিশোধন (মুত্রস্থলী পরিষ্কার) দ্বারা

সর্ব্বদা বাতবর্দ্ধক আহারবিহারে অভ্যস্থ অধিক ব্যায়াম পরায়ণ ভয় শোকগ্রস্থ, সর্ব্বদা চিন্তাশীল ব্যক্তির অথবা অধিক রাত্রি জাগরণ করিলে বা পিপাশা ও ক্ষুধার নিরোধ বশতঃ অধিক কষায় রস দ্রব্য পান ভোজনে, অল্পাহারী হইলে, রসধাতু শুস্ক হইয়া শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইয়া পড়ে। ঐ রূপ পীড়িত ব্যক্তি অত্যন্ত কৃশ এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম উষ্ণতা বর্ষা ও ভার সহ্য করিতে অপারগ হইয়া পড়ে; কোন কার্য্যই একাগ্রমনে অধিকক্ষণ করিতে পারে না; ক্রমে শ্বাস কাস ক্ষয় প্লীহা উদরী অগ্নিমান্দ্য গুল্ম বা রক্তপিত্তের মধ্যে একটা না একটা রোগগ্রস্থ হইয়া জীবনত্যাগ করে। দুর্ব্বল ও ক্ষীণপ্রাণ হওয়ায় সকল রোগেই প্রবল বেগে তাড়না করে যাহাতে রসধাতু শুষ্ক হইয়া ঐরূপ অবস্থা না হয় তদ্ধেতু উৎপত্তির কারণ গুলিকে সর্ব্বথা পরিহার করিবে, যদি রস ক্ষয় হেতু কৃশতা ও পূর্ব্বোক্ত উপদ্রবগুলির এক বা বহুলক্ষণের বিকাশ পায়, তাহা হইলে ক্ষীরকাকোলী অশ্বগন্ধা ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে প্রভৃতি মধুর রস বনৌষধি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধ-দধি-ঘৃত-মাংস পরমান্নশালি ও ষষ্টি ধান্যের তণ্ডুল যব-গম-আহার্য্যে রসের পুষ্টিসাধন হইয়া ঐসকল উপদ্রবের শান্তি হয়; দিবা নিদ্রা ব্রহ্মচর্য্য অল্প সহ্যমত ব্যায়াম বল বর্দ্ধক পোষ্টাই দ্রব্য (মংথন্, খেজুর-দ্রাক্ষা-বাদাম প্রভৃতি মেওয়া) ঐস্থলে বিশেষ হিতকর।

যাঁহারা নাতিস্নিগ্ধ নাতিরুক্ষ স্বাস্থ্যে রক্ষার অনুকুল আহারবিহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের শরীরে অন্নরস অবিকৃতভাবে ও অপ্রতিহৃত্যাতিতে কার্য্য করিয়া দোষত্রয় ধাতু ও মলমূত্রাদির কার্য্য সমভাবে সুসম্পন্ন করায় তজ্জন্য ঐরূপ আহার-বিহার-শীল মানবের শরীর নাতিস্থূল নাতিকৃশ (মধ্যমাবয়ব) হইয়া থাকে; তাঁহারা সকল কার্য্যেই সক্ষম ও কষ্টসহিষ্ণু ক্ষুধাতৃষ্ণা শীতল আতপ বর্ষা প্রভৃতি অনায়াসে সহ্য করিতে পারেন এবং তাঁহাদের শরীরে বিশিষ্ট বল থাকে।

এইরূপ বলবান হাড়ে মাসে জড়িত শরীরই প্রশস্ত যাহাতে এই প্রকার শরীর হয় এবং ঐরূপ শরীর চিরদিন বজায় থাকে, সকলেরই সে বিষয়ে লক্ষ্য থাকা একান্ত প্রার্থনীয়।

যদি ও অতিস্থূল বা অতিকৃশ উভয় বিধ দেহই নিকৃষ্ট তথাপি অতিস্থূল অপেক্ষা অতিকৃশ বহু প্রশংসনীয়। বলবান্ মধ্য শরীরই সর্ব্ব—শ্রেষ্ঠ—

মঙ্গল-সঙ্গীত

লেখক,—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী।

জয়-জয় রাজটীকা, জয় রাজ-সিংহাসন।
সেথা সমাসীন আজি বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মণ ॥
কোটি কোটি প্রজা-কণ্ঠে আজি জয়ধ্বনি,
গায় রবি, গায় শশী শাখি-পাখি-সহ বিপুলা অবনী,
অভিনেতা-অভিনেত্রী আমরা তারি প্রতিধ্বনি ;
দেবাশীষ পুষ্পবৃষ্টি হউক শিরসি বরষণ—
ধন্য ধন্য ধন্য সবে, করি দেব-রাজে দরশন—
দয়া-ধর্ম্ম-দান তব বংশের সম্মান,
ফুল্লচিতে লোকহিতে, নাহি তব বংশের সমান—
পাত্র মিত্র সঙ্গে নিয়ে, সদানন্দ সুধা পিয়ে,
দীর্ঘজীবী হয়ে কর প্রজার পালন,
বিভুপদে এ প্রার্থনা হয় যেন পূরণ।

——:০:——

অন্বেষণ।

লেখক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল,

চায়রে নয়ন মোর হেরিতে নয়ন,
যে নয়নে বিভাসিবে প্রেমের চাহনি ;
চায়রে আমার কর করে পরশন,
সেই কর, বহে যাহে প্রেম-তরঙ্গিনী।

চায়রে হৃদয় মোর এ হেন হৃদয়,
যার আলিঙ্গন-সুখে বিরহ পাকরি ;

---

* স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি পঞ্চ শ্রীযুক্ত রাজাধিরাজ বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুরের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে মিনার্ভা থিয়েটার সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গীত হয়।

প্রেম-নীর স্নিগ্ধ ধারে নিরবধি বয়,
সদা ধীরে খেলে যথা প্রেমের লহরী।

মন চায় হেন এক মানস—ললনা,
দিবারাতি যে পুরাবে বাসনা আমার ;
প্রেম-ময়ী, শান্তিদেবী, বিহীনা ছলনা,
বিতরিবে ভালবাসা, জীবনে তাহার।

হায়রে পাগল আমি, প্রেমরসে মাতি,
কল্পনা গঠিত হেন চিত্ত-প্রমোদিনী ;
খুজিলাম ভু-মণ্ডল, করি পাতি প্াতি,
কোন দেশে না মিলিল তেমন মোহিনী।

উঠিলাম নভোদেশে ত্যজি ভয় ডর,
নিরখিনু গ্রহতারা, নিখিল ভুবন ;
ভ্রমিনু ব্রহ্মাণ্ড সপ্ত লোক চরাচর,
হেরিলাম কিমদ্ভুত দেহী জীবগণ।

হেরিনু নাচিছে করি কর ধরাধরি,
মধুর লাবণ্যময়ী স্বরগ অপ্সরী ;
মাতাইয়া সপ্তলোক বীণা করে ধরি,
গাইতেছে ছায়া পথে অগণিত পরী।

হায়রে তথাপি মম না পুরিল আশা,
না পাইনু তারে, প্রাণ যার তরে ধায় ;
কেহ না করিল শান্ত প্রণয় পিপাসা,
পূর্ণ ভালবাসা দিতে কেহ নাহি চায়।

নিরাশ হইয়া স্তবে বিশ্বপতি প্রতি,
কহিনু—"হে প্রেমময় ! করহ রচন ;
এ পাগল তরে এক প্রেমময়ী সতী,
হইবে যে অনুরূপ মনের মতন।

আছে গোলাপের দল, মধু নলিনীর,

উষার সুষমা ধীর বসন্ত সমীর,
কোকিল কূজন, আর ভ্রমর ঝঙ্কার।

কিম্বা নাথ! সরলতা মধুরতা নিয়া,
মিশাইয়া তার সহ বিমল প্রণয়,
সমুদয় লালিত্যের সার গলাইয়া,
রচ ইচ্ছাময় তব যাহে ইচ্ছা হয়।

আমরা উভয়ে নাথ! প্রেমে মাতোয়ার,
সেবিব চরণ তব, অনন্ত সময়;
যত কাল বিশ্ব-চক্র ঘুরিবে তোমার,
যত কাল রবে বিশ্ব তোমাতেই লয়।

মায়া।

লেখক—শ্রীঅমূল্যচরণ দত্ত।

একদা মহর্ষি নারদ ও দেবাদিদেব নারায়ণ দুইজনে সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মর্ত্তলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে দুইজনে নানাপ্রকার কথোপকথনের পর মহর্ষিনারদ নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর আপনি যে আমাকে বলিতেছিলেন যে, এই মর্ত্ত লোকের প্রত্যেক ব্যক্তি-ই এই মায়াজালে আবদ্ধ, এই মায়াজাল হইতে মুক্ত হইতে অতি অল্প সংখ্যক লোকই সক্ষম হয়। এ মায়াজাল অত্যন্ত ভয়ানক। গুটিপোকা যেমন আপনার লাল দ্বারা জাল প্রস্তুত করে এবং পরিশেষে আপনার জালে আপনিই আবদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। মানবেরও অবস্থা ঠিক সেইরূপ। ঠাকুর আমি ত আপনার মায়া কিছুই বুঝি না, তবে সংসারে মায়া জিনিষটা কি একবার তা আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন?" নারায়ণ মনে মনে একটু হাস্য করিলেন ও পরে বলিলেন, "আচ্ছা তোমায় একদিন দেখাব; যখন সময় হইবে, তখন আপনিই বুঝিবে যে মায়া কি? তখন আর আমার কাছে বুঝিতে আসিবে না।" এইপ্রকারে দুইজনে কথোপকথন করিতে করিতে মহর্ষি নারদ সে বিষয় একেবারে ভুলিয়া

একবার দেখাইতে পারিলেই হয় ও মনে মনে উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ংকাল পরে নারদকে বলিলেন, "পথ ভ্রমণে আমার ভয়ানক পিপাসা পাইয়াছে একটু জল আনিয়া দিতে পার, নারদ নারায়ণের নিমিত্ত জল অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সম্মুখে ভীষণ প্রান্তর ভিন্ন কোনও পুষ্করিণী কিম্বা কুপের চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না, এইরূপে আরও কিয়ৎদুর অগ্রসর হইবার পর সম্মুখে একটী সুন্দর সরোবর দেখিতে পাইলেন। সেই সুন্দর সরোবর দেখিয়া নারদের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না, নারদ তাড়াতাড়ি সেই পুষ্করিণী হইতে জল লইবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু জলাশয়ের নিকটবর্ত্তি হইয়া দেখিলেন যে, তিনি পাত্র আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, এতদুর হইতে অঞ্জলী করিয়া জল লইয়া যাওয়াও অসম্ভব মনে করিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানে কোনও জলপাত্রের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় স্বয়ং নারায়ণ একটী পরমাসুন্দরী যুবতী বেশে নারদকে মায়াজালে জড়িত করিবার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া তথায় কলসী কক্ষে উপস্থিত হইলেন। নারদ ভাবিতেছেন যে, সূর্য্যদেব প্রায় অস্তগত এখনও আমি জল লইয়া যাইতে পারিলাম না, না-জানি ঠাকুর কত কি মনে করিতেছেন। এমন সময় দেখিলেন যে, সম্মুখে একটী পরমাসুন্দরী যুবতী কলসী কক্ষে সেই সরোবরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে!

একাকী সেই যুবতীকে কলসী কক্ষে সরোবরাভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া নারদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, মনে করিতেছিলেন, এমন সময় সেই স্ত্রীলোকটী নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "জনশূন্য প্রান্তরে আপনি কিজন্য আসিয়াছেন, নারদ স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। এই প্রান্তরকে যে জনশূন্য বলিতেছ, ইহাতে কি কোন মানবের বাসস্থান নাই, তখন সেই যুবতী উত্তর করিল যে, আমি এই চতুর্দ্দশ বৎসর এই বনে বাস করিতেছি! বাল্যকালে কোনও নিকটস্থ পল্লী হইতে একটী সিংহী আমাকে চুরি করিয়া আনে সেই সিংহীর যত্নে আমি লালিত পালিত হই, সম্প্রতি সেই সিংহীটী মারা গিয়াছে, এখন আমি একাকী। এই চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে আপনিই আমার চক্ষে প্রথম মানুষ, এইরূপে সেই যুবতীর সহিত কথোপকথনে নারদ প্রভু নারায়ণের পিপাসার কথা একেবারেই বিস্মৃত হইলেন। এবং সেই যুবতীর মায়াজালে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে

সেই যুবতী জল কলসী পূর্ণ করিয়া নারদকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিজ আবাস ভূমিতে উপস্থিত হইলেন ও তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই বনমধ্য হইতে ফলমূল আহরণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। এইরূপে কিছু-কাল অতীত হইলে সেই যুবতীর গর্ভে নারদের একটী পুত্র সন্তান জন্মিল। এইরূপে আরও কিছুকাল অতীত হইলে পর একদা নারদ পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ এই বন প্রদেশে বাস করিয়া ও বন ফল ভক্ষণ করিয়া আর থাকিতে পারা যায় না, চল আমরা নগরে গিয়া বাস করি। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা পরদিন প্রাতে নগরাভিমুখে গমনের জন্য সেই বন স্থল হইতে বহির্গত হইলেন, কিয়দ্দূর আসিয়া দেখিলেন যে, সম্মুখে এক দুস্তর সমুদ্র, তাহা না পার হইলে পরপারে যাইবার আর কোনও উপায় নাই। তথন তাঁহারা তিনজনে সেই সমুদ্র তীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন, এমন সময় ভবকর্ণধার নারায়ণ এক কর্ণ-ধারের বেশ ধারণ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। তখন নারদ সেই কর্ণধারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই আমাদের পরপারে লইয়া যাইবে ?" তখন সেই কর্ণধার বলিল, "ভাই আমার তাহাতে কোনও আপত্ত নাই, কিন্তু আমার নৌকাখানি অত্যন্ত ক্ষুদ্র অতএব তোমাদের তিন ব্যক্তিকে একে-বারে পার করিতে পারিব না। হয় তোমরা তিনজনে তিনবারে পার হও, নতুবা প্রথমে তুমি ও তোমার পত্নী পার হউক, পরে তোমার পুত্র পার হইবে। অথবা তুমি ও তোমার পুত্র প্রথমে পার হও, পরে তোমার স্ত্রী পার হইবে, অথবা প্রথমে তোমার পত্নী ও তোমার পুত্র পার হউক, পরে তুমি পার হইবে। এইরূপ বহুক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, নারদের পুত্র ও পত্নী প্রথমে পার হইবে তাহার পর নারদ পার হইবে। নারদের পত্নী ও পুত্র নৌকারোহণ করিলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল, নারদ তীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যখন অর্দ্ধ সমুদ্র পার হইয়াছে, তখন নারায়ণ ঝটিকাউত্থিত করিয়া নৌকা জলমগ্ন করিলেন। নারদ এতক্ষণ তীরে দাঁড়াইয়া অনিমিষ লোচনে দেখিতে ছিলেন, যখন দেখিলেন যে, নৌকা ডুবিল, তখনই তিনি হস্তপদ আছড়িয়া জলে ঝাঁপ দিলেন, ও হা পত্নী ! হা পুত্র ! করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ও সন্তরণ দ্বারা তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল, তিনি সন্তরণ করিতে করিতে অবশেষে হতচৈতন্য হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত পর পারের তটে উপনীত হইলেন, তখন নারায়ণ কর্ণধার বেশ পরিত্যাগ করিয়া [illegible]

লাগিলেন, কিছুকাল শুশ্রূষার পর নারদের চৈতন্য হইল, কিন্তু তখনও তিনি হা পত্নী! হা পুত্র রবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে যখন নারদের সম্পূর্ণ চৈতন্যলাভ হইল, তখন নারায়ণ নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি যে আমার পিপাসার জল আনিতে গিয়াছিলে- তাহার কি হইল, তখন নারদ অপ্রতিভ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন, নারায়ণ পুনরায় কহিলেন, "সে যাহা হউক আমার পিপাসা পায় নাই, আমি ভাণ করিয়া ছিলাম মাত্র, এখন মায়া যে কি জিনিষ তাহা বুঝিয়াছ কি না, আরও বুঝাইতে হইবে। তখন নারদ বলিলেন, না আর মায়া বুঝিয়া কাজ নাই, যথেষ্ট বুঝিয়াছি চলুন এক্ষণে স্বর্গধামে ফিরিয়া যাওয়া যাউক, এই বলিয়া তাঁহারা স্বর্গাভিমুখে গমন করিলেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত

সাধারণ উপদেশ।

আদি-লীলা।

প্রভুপাদ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সঙ্কলিত।

৬১। পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
প্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয়॥ ঐ ৩১ পৃঃ

৬২। এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগত-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর॥
কেহো মানে, কেহো না মানে, সব তাঁর দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই-পাপে নাশ॥ ঐ

৬৩। কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ 'ভক্ত বড়' করি মানে।
তাহাতে বহুত শাস্ত্রবচন প্রমাণে॥ ঐ

৬৪। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
আর যত দেখ সব—তাঁর পরিকর ॥ ৭ পং। ৩২ পৃষ্ঠা
৬৫। এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥
এই তিন তত্ত্ব—সর্ব্বারাধ্য করি মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব—আরাধক জানি ॥
শ্রীবাসাদি যত কোটিকোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধভক্ততত্ত্ব-মধ্যে সভার গণন ॥
গদাধর-আদি—প্রভুর শক্তি-অবতার।
"অন্তরঙ্গ ভক্ত" করি গণন যাহার ॥ ঐ
৬৬। বেদান্ত-পঠন ধ্যান:সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ॥ ঐ । ৩৩ পৃঃ
৬৭। মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা, এই মন্ত্র সার ॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসারমোচন।
কৃষ্ণনাম, হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥
নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥ ঐ। ৩৪ পৃঃ
৬৮। কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে,—তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু ॥ ঐ
৬৯। 'কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। ঐ
৭০। প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ ॥
প্রেমার:স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে—ইতি-উতি ধায় ॥
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদগদ বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥

এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায়॥ ঐ
৭১। নাচো গাও ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তার' সর্ব্বজন॥ ঐ
৭২। কৃষ্ণপ্রেমা সে-ই পায়, যার ভাগ্যোদয়॥ ঐ
৭৩। বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয়, রাখে লুকাইয়া॥
হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথাতথা।
জগাই-মাধাই-পর্য্যন্ত, অন্যের কা কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর—প্রেম-নিগূঢ়-ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে-তারে, না কৈল বিচার॥ ৮ পঃ। ৩৭ পৃঃ
৭৪। অদ্যাপিহ দেখ—চৈতন্যনাম যেই লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রুবিহ্বল সে হয়॥
'নিত্যানন্দ' বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
আউলায় সর্ব্ব অঙ্গ, অশ্রুগঙ্গা বয়॥
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥

চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ-সব- বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥ ঐ
অতএব ভজ লোক চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসারদুঃখ, পাবে প্রেমানন্দ॥ ঐ। ৩৮ পৃঃ

৭৫। ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ তিন স্বরূপে—।
সাক্ষাৎ, আবেশ, আর আবির্ভাব-রূপে॥
সাক্ষাতে সকল ভক্ত দেখে নির্ব্বিশেষ।
নকুলব্রহ্মচারিদেহে প্রভুর আবেশ॥
'প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী' তাঁর আগে নাম ছিল।
'নৃসিংহানন্দ' নাম প্রভু পাছেতে রাখিল॥
তাঁহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব।
অলৌকিক ঐছে প্রভু অনেক স্বভাব॥ ১০ পঃ। ৪২ পৃঃ

৭৬। অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পান দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করেন, লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম॥
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত-স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন-মান॥
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারিদণ্ড নিদ্রা—সেহো নহে কোন দিনে॥
তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার॥ ঐ। ৪৩ পৃঃ

৭৭। পাইয়া মনুষ্যজন্ম, যে না শুনে গৌর-গুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্তপানী,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল॥ ১৪ পঃ। ৫৩পৃঃ

৭৮। মিশ্র কহে—দেব সিদ্ধ মুনি কেনে নয়।
যে সে বড় হউক—মাত্র আমার তনয়॥
পুত্রের লালন-শিক্ষা পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিখাইলে কৈছে জানিবে ধর্ম্মমর্ম্ম ?॥

মিশ্র বোলে—পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম—পুত্রের শিক্ষণ॥ ঐ। ৫৬ পৃঃ

৭৯। পিতৃক্রিয়া বিধিদৃষ্টো ঈশ্বর করিল॥ ১৫ পং। ৫৭ পৃঃ

৮০। দেহসম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রামসম্বন্ধ সাঁচা॥ ১৭পং। ৬৪পৃঃ

——:০:——

ব্রাহ্মণের প্রধান কর্ত্তব্য ত্রিসন্ধ্যা।

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণঃ।

ধর্ম্ম তরুর প্রধান মূল—ব্রাহ্মণ। মনুবলেন—

"ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামভিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥" (১। ৯৯)

অর্থ—পৃথিবীস্থ সকল মানবের ধর্ম্মরূপ ধনের কোষাগার রক্ষার জন্য ঈশ্বরই ব্রাহ্মণরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

অতএব ধর্ম্মের মূল ব্রাহ্মণ, ও ব্রাহ্মণের মূল সন্ধ্যার বিষয় একটু বিশদরূপে পরিস্ফুট করিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রীতির জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমাদির মধ্যে প্রাণী শ্রেষ্ঠ, প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিমান্ শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমানের মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্বান্, বিদ্বানের মধ্যে অনুষ্ঠানজ্ঞ, অনুষ্ঠানজ্ঞের মধ্যে অনুষ্ঠানকারী, অনুষ্ঠানকারীর মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। ইহা মনুরই কথা।

আবার বেদাদি শাস্ত্রে ইহাও আছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং পাদ হইতে শূদ্র জন্মিয়াছে। অথবা ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদের চারিটী ব্রাহ্মণই ব্রহ্মার চারিটী মুখ, ক্ষত্রিয় জাতি ব্রহ্মার বাহু, বৈশ্যজাতি উরু, এবং শূদ্রজাতি ব্রহ্মার পাদ।

উত্তমাঙ্গ মুখ হইতে ব্রাহ্মণের জন্ম, অথবা ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গই ব্রাহ্মণ, তাই ব্রাহ্মণের এত প্রাধান্য।

শরীরের এত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকিতে মুখকে উত্তমাঙ্গ বলে কেন? বিচারে উৎপন্ন হইতেছে যে, জগতে ব্যক্তির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ জ্ঞানের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হইতেই,

ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন প্রচ্ছন্নজ্ঞান তরুগুল্মাদি হইতে স্ফুটজ্ঞান পশুপক্ষী শ্রেষ্ঠ, আবার স্ফুট-সঙ্কীর্ণজ্ঞান পশু পক্ষী হইতে স্ফুট বিস্তৃত জ্ঞান নরশ্রেষ্ঠ, সেই নরেরও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে মস্তকই শ্রেষ্ঠ, কেন না, যেই জ্ঞানের উৎকর্ষে মানবের উৎকর্ষতা, সেই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থানই মস্তক। চক্ষু কর্ণ নাসিকা ও জিহ্বা, একমাত্র মস্তককে আশ্রয় করিয়াই নিজ নিজ বিষয় রূপ রস গন্ধ ও শব্দ যথানিয়মে গ্রহণ করিয়া থাকে। আর ত্বক্ ইন্দ্রিয় সমস্ত দেহ ব্যাপক, সুতরাং মস্তকেও তাহার অভাব নাই, অতএব জ্ঞানার্জ্জক সকল ইন্দ্রিয়ের আকর বিধায়ই মস্তকের নাম "উত্তমাঙ্গ" ঐ উত্তমাঙ্গ হইতে স্বাভাবিক সত্ত্বগুণ প্রাধান্য লইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন, কাযে কাযেই বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্রাহ্মণেরই নিজস্ব, এই জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ ব্রাহ্মণেই প্রায় লক্ষিত হয়, এজন্যই ব্রাহ্মণজাতি শ্রেষ্ঠতায় সকলেরই অগ্রণীয় হইয়াছেন।

আর এক কথা, উপাদান কারণের গুণ কার্য্যে লক্ষিত হয়, ইহা সকলেই জানে, যেমন সূত্র উপাদান কারণ, বস্ত্র তাহার কার্য্য, সে জন্য সূত্র যদি শুভ্র হয়, তবে তন্নির্ম্মিত বস্ত্রও শুভ্র হইবে, সূত্র যদি রক্তবর্ণ হয়, তবে বস্ত্রও রক্ত বর্ণ ই হইবে। সেইরূপ ব্রহ্মার মুখ উপাদান কারণ, ব্রাহ্মণ তাহার কার্য্য, ব্রহ্মার মুখ চতুষ্টয়ের গুণ বাগ্মিতা, ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব প্রভৃতি বেদ উপনিষদ্ আরণ্যক প্রভৃতি শাস্ত্র অনবরত বলিয়াছেন, অর্থাৎ বকাম তাহার প্রধান কার্য্য। ভগবান্ শঙ্কর ত্রিপুরাদি অসুরবর্গকে এবং ভগবান্ বিষ্ণু মধুকৈটভাদি দৈত্যদিগকে বাহু-বলে বিদলিত করিয়াছেন। আর ব্রহ্মা কেবল গলা বাজী করিয়াছেন। দৈত্য মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইলে, ব্রহ্মা ভয়ে জড়সড় একটুকু হাতটা পর্য্যন্ত নাড়িলেন না। অন্ততঃ করস্থিত কমণ্ডলুটার ঘা মারিবারও উদ্যম বা ভয় প্রদর্শন করিলেন না। কেবল বিষ্ণুর ঘুম ভাঙ্গিবার জন্য নিদ্রাদেবীকে লক্ষ্য করিয়া চারিমুখে চেঁচাইতে লাগিলেন। সেই উপাদান কারণ ব্রহ্মার মুখ হইতে জাত ব্রাহ্মণেরা না পাইয়াছে ভুজবীর্য্য, না পাইয়াছে জঙ্ঘা বীর্য্য, কেবল শাস্ত্রাভ্যাস শাস্ত্ররচনা সদুপদেশ নীতি প্রচার, জপ তপস্যাদি সদাচার প্রভৃতির পাঠনা ইত্যাদি মুখের কার্য্য লইয়াই ব্যাস বশিষ্ট ও বাল্মীকাদি ব্রাহ্মণেরা জন্মিয়াছেন।

বাস্তবিকও ব্রাহ্মণের মত মুখের যোর অপর কোনও জাতিতে প্রায়ই তেমন দেখা যায় না, ব্রাহ্মণ যেমন মাথা বকাইতে পারেন, আর কেহ তেমন পারে না, সুতরাং জ্ঞানপ্রধান শাস্ত্র প্রণেতা ব্রাহ্মণই, সেজন্যই ব্রাহ্মণ সমাজে এত প্রধান।

ইহা মিথ্যা নহে, রাম যুধিষ্ঠিরাদি রাজা ছিলেন, স্বর্ণসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া

গুণ্ঠিত, জটামণ্ডিত নক্তক (নেকড়া) পরিহিত বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণকে সমাগত দেখিলে, সত্রাসে সাদরে কনক-মুকুট, কনক-সিংহাসন ছাড়িয়া ঐ ব্রাহ্মণের পায়ে অবলুণ্ঠিত হইয়া কৃতার্থম্মন হইতেন। ঐ ব্রাহ্মণেরা যেই রীতি পদ্ধতিতে রাজ্য শাসনের উপদেশ দিতেন, মস্তক অবনত করিয়া তাহা স্বীকার করিতেন।

ধরিতে গেলে ব্রাহ্মণেরাই রাজারও রাজা ছিলেন, ব্রাহ্মণেরাই সকলের প্রভু ছিলেন, অশন বসন প্রভৃতি সকলই ব্রাহ্মণের স্বাধীন ছিল, পরাধীন নহে।

তাই মনু বলিয়াছেন—

"স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙক্তে স্বংবস্তে স্বংদদাতি চ।
আনৃশংস্যাদ্‌ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ ॥" (১।১০১)

অর্থ—ব্রাহ্মণ নিজের ভোগ্য নিজে ভোগ করে, নিজের বস্ত্র নিজে পরিধান করে, নিজের ধন নিজে দান করে, কেবল ব্রাহ্মণ উদাসীন নিরীহ জাতি বিধায়ই অপরেরা (রাজ্য) ব্রাহ্মণের প্রসাদ স্বরূপ ভোগ করে।

যাহা হউক ব্রাহ্মণের প্রাধান্যের কারণ জ্ঞান এবং চরিত্রের দ্বারা হইয়াছে, ইহাতে কোনও শাস্ত্র বা কোন সমাজেরই মত দ্বৈধ নাই।

মনু বলেন—(১১।২৩৭)

"ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং" ব্রাহ্মণের তপস্যাই জ্ঞান, "বৃত্তেন চ ভবেদ্দ্বিজঃ" চরিত্র দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়, (মহাভারত বন, ২১৬।১৪) অতএব জ্ঞানই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব।

সকল শাস্ত্রের মধ্যে বেদ শ্রেষ্ঠ, বেদের মধ্যে মন্ত্র শ্রেষ্ঠ, মন্ত্র সমূহের মধ্যে সন্ধ্যা শ্রেষ্ঠ, আবার সন্ধ্যার মধ্যেও গায়ত্রী শ্রেষ্ঠ, গায়ত্রী হইতে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

যেই জ্ঞানের উৎকর্ষে ব্রাহ্মণের এত উৎকর্ষতা, সেই জ্ঞানের প্রধান আকরই "সন্ধ্যা" সেজন্যই সন্ধ্যা ব্রাহ্মণের জীবন সর্ব্বস্ব।

"সন্ধ্যা" অর্থ—সম্যক্‌রূপে ধ্যানের বিষয়, একাগ্রতার লক্ষ্য, প্রথমতঃ এই সন্ধ্যা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারই ধ্যানে উপস্থিত হয়, ব্রহ্মাই সন্ধ্যার আবিষ্কর্ত্তা, তাই ব্রহ্মা হইতেই প্রথমে জন্মেন, সন্ধ্যা ব্রহ্মার কন্যা। ব্রহ্মা যতই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিতে লাগিলেন, ততই উত্তরোত্তর অধিকাধিক অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব অর্থ ব্রহ্মার হৃদয়ে আবির্ভূত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার ভিতরে তাদৃশ সুন্দর আশ্চর্য্য অর্থ অনুভব করিয়া ব্রহ্মা যেন আনন্দে উন্মাদ হইলেন, সন্ধ্যার সৌন্দর্য্যে ব্রহ্মা মুগ্ধ হইয়া, ব্রহ্মা এতই সন্ধ্যার প্রতি অনুরক্ত হইলেন যে, যেন মুহূর্ত্তকালও সন্ধ্যা হইতে বিরত

ব্রহ্মা মাতোয়ারা, উন্মাদ, এমন কি নিজের কর্ত্তব্য সৃষ্টিকর্ম্ম ভুলিয়া অহোরাত্র সন্ধ্যার প্রতিই অনুরক্ত, পরে ভগবান্ শঙ্করের উপদেশ ও ভয়ে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এইরূপ সময় বিভাগ করিয়া ব্রহ্মা সন্ধ্যোপাসনায় রত হইলেন।

তদবধি ব্রহ্মা সর্ব্ব বেদের সারভূত সন্ধ্যাকে মনে করিয়া নিজের প্রিয়পুত্র মরীচ্যাদি ঋষিদিগকে সন্ধ্যোপাসনায় দীক্ষিত করিলেন। ঋষিগণও বুঝিলেন, সন্ধ্যাই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব সন্ধ্যাই ব্রাহ্মণের জাতি, সন্ধ্যাই ব্রাহ্মণের জীবন সর্ব্বস্ব, তাই ব্রাহ্মণ, ধন প্রাণ মান সুখ শান্তি এমন কি ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত তৃণ তুল্য মনে করিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন; কিন্তু সন্ধ্যা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এমন কি এক বেলা সন্ধ্যা বাধ হইলে, সেই অপরাধের মোচনার্থ দশবার গায়ত্রী জপরূপ প্রায়শ্চিত্তাত্মক দণ্ড স্বীকার করিতে হয়। ক্রমে ত্রিসন্ধ্যা বাধ করিলে শূদ্রজাতিতে পরিণত হয়। একপক্ষ সন্ধ্যা বাধ করিলে মহাপ্রায়শ্চিত্তার্হ চণ্ডাল জাতিতে পরিণত হয়। (বিষ্ণু পু ৩অ:৮।৩৭—)

এখন দ্রষ্টব্য হইতে পারে যে, সেই সন্ধ্যার এত সৌন্দর্য্যটা কি? বরং অনেকে ভাবিতে বা বলিতে পারে যে—সন্ধ্যার আবার এত সৌন্দর্য্য, এত উৎকৃষ্ট ভাব অথবা মনোহর অর্থ কি আছে? বরং এই মাত্রইত বুঝিতে পারা যায় যে, "মরু-দেশোৎপন্ন জল আমার মঙ্গল করুন, জলপ্লাবিত দেশের জল আমাদের মঙ্গল করুন, আর কূপোদক, সমুদ্রোদক আমাদের মঙ্গল করুন" এই প্রকারইত সন্ধ্যার অর্থ, ইহার আবার এত বাহাদুরী কি? এইরূপ ভাবা ঠিক নহে।

আদি সৃষ্টিতে ব্রহ্মা চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মেরই "বিবর্ত্ত" চৈতন্যাত্মা ব্রহ্মই দৃশ্যমান জগদ্রূপ ধারণ করিয়াছেন, এই ক্ষিতি জলতেজ বায়ু ও আকাশ চৈতন্যাত্মা ব্রহ্মেরই এক একটা অংশ, এই দেব মনুষ্য পশু পক্ষী কৃমি পতঙ্গ, ব্রহ্মেরই এক একটা গুঁড়—সূক্ষ্মতম অংশ, সুতরাং যেই ক্ষিতি তেজ বায়ু ও আকাশকে আমরা জড় পদার্থ দেখিতেছি, প্রকৃত পক্ষে তাহারা জড় নহে, কিন্তু চৈতন্যাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই "আমি" রূপে বিরাজিত, ক্ষিতিতে আমি সদগন্ধ জলের আমি রস, তেজের আমি প্রভা, বায়ুর আমি স্পর্শ, আকাশের আমি শব্দ, সুতরাং সকলেই জীবন্ত, সকলে-রই ভিতরে ভিতরে আমি আত্মা আছি, * ইহাদেরও জীবন, মরণ, রোগ আছে।

* গীতায়ে আছে—"পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ" "রসোঽহ মপ্সু কৌন্তেয়" "প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ" "তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ" "শব্দঃখে" ইত্যাদি।

+ মহাভারতে উক্ত আছে—আদি; ৮৯,১১ শ্লোঃ—

মশক দংশক পক্ষী সরীসৃপ কৃমি মৎস্য প্রস্তর তৃণ কাষ্ঠ প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগের পরে পুনর্ব্বার নিজ নিজ কর্ম্মক্ষম পূর্ব্বদেহ ধারণ করিবে।

পরন্তু তন্মধ্যে যাহারা সমধিক তমোগুণে আক্রান্ত, তাহারা জড়বৎ প্রতীয়মান হইতেছে; আর যাহারা নূন্যাধিক ভাবে সত্ত্ব গুণময়, তাহারা চেতন বা জীবন্ত রূপে প্রতীয়মান হইতেছে. এই মন্ত্র প্রভেদ, অতএব সকলেই চেতন, সকলেই জীবন্ত + আমরা জল আদি পদার্থকে একাগ্রচিত্তে আহ্বান করিলে তাহারা শুনিতে পায়।

এবং ব্রহ্মই নিজ ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে স্থাবর জঙ্গমাদি হইয়াছে "আমি একই বহু হইব" "আমিই প্রজা হইব" এইরূপ ইচ্ছা শক্তির বলে তৎক্ষণাৎ তিনি সেই সেই বিষয় সৃষ্টি করেন, ইহাতে বুঝিতে হইবে যে ইচ্ছা শক্তির এমনই এক অপূর্ব্ব মহিমা আছে যে, যে বিষয়ে ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা করা যায় সেই বিষয় সিদ্ধ হয় বরং ঈশ্বরের মহীয়সী শক্তির বলে মহান পর্ব্বত সমুদ্র ভূলোক গোলক প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে; আর সাধারণ প্রাণীর পরিচ্ছন্ন শক্তির বলে পরিছিন্ন অসন বসন গৃহ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইচ্ছা শক্তি এককালে বিফল হয় না।

এজন্যই ঈশ্বর বাক্য বেদোক্ত মন্ত্রে ইচ্ছারই প্রকারান্তর প্রার্থনা বাক্য নিয়োগ আছে, যথা—"আপঃ পুনন্তু" "শন্নোভবন্তু" "এনঃশুন্ধন্তু" "মা ন ভুবং" "ভুয়াসং" ইত্যাদি প্রার্থনা বাক্যময় মন্ত্র উপপন্ন হয়, অন্যথা উহা উন্মত্ত প্রলপিত তুল্য বা আকাশ কুসুম তুল্য হইতে বাধা হয় না।

এখন বুঝা উচিত, এই পাঞ্চভৌতিকারব্ধ শরীরে মন আদি ইন্দ্রিয়াদির স্বাস্থ্যাদি মঙ্গলার্থ একাগ্রচিত্তে সম্বোধন করিয়া ক্ষিতি জল অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য বায়ু ও আকাশ আদির নিকটে একাগ্রতা সহকারে প্রার্থনা-ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নিশ্চয়ই তাহারা প্রসন্ন হইয়া আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ করেন, কল্যাণ বিধান করেন।

সেজন্য জলকে বলা হয় মরুদেশের জল, কূপোদক, সমুদ্রোদক আমার মঙ্গল করুন, হে জল! তুমি আমাদিগকে তোমার শিবতম রসের ভাজন কর! জল অন্তরে বাহিরে থাকিয়া পৃথিবীকে পূত করুক, সেই পূতা পৃথিবী তদুৎপন্ন পূত ফল শস্যাদিরূপে আমাদের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পুষ্টি সুখ-স্বচ্ছন্দ-বিধান করুক, এই রূপে প্রার্থিত হইয়া পৃথিব্যাদি দেবতারা আমাদের আধিব্যাধি বিনাশ করেন, আয়ুবৃদ্ধি করেন, বুদ্ধি নির্ম্মল করেন।

এইরূপ সন্ধ্যার সকল মন্ত্রেরই অতি সুন্দর অনির্ব্বচনীয় তাৎপর্য্য অর্থ আছে, ইহা ব্রহ্মা প্রথমে আপন চিন্তাশক্তি দ্বারা আবিষ্কার করিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে যে, কেহ নূতন একটা বিষয় আবিষ্কার করিতে পারিলে সে অতুলনীয় আনন্দ অনুভব করে।

সন্ধ্যার এবং ক্ষিত্যাদির ঐ জাতীয় অর্থ এবং চেতনা শক্তির বিষয় আবিষ্কার করা কি সামান্য চিন্তা বা বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

অতএব ব্রাহ্মণের সর্ব্বথাই সন্ধ্যা প্রধান উপাস্য তাহা ব্যতীত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বই থাকে না। তাই মনু বলিয়াছেন "ঋষয়ো দীর্গসন্ধ্যত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুযুঃ"।

অর্থ—ঋষিগণ অতি স্থির শান্ত চিত্তে অতি প্রণিধান করিয়া অধিকক্ষণ ধরিয়া সন্ধ্যা করিতেন, সেজন্যই তাঁহারা এত দীর্ঘজীবি হইয়াছিলেন।

অধিকন্তু সন্ধ্যাঙ্গ প্রাণায়ামের যে কি অপূর্ব্ব স্বাস্থ্য জননী শক্তি তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রকাশ করা অসাধ্য। মন্বাদি সকল শাস্ত্রেই প্রাণায়ামের পাপনাশকতা ও রোগনাশকতা শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে। মানবের খাদ্যাদির সহিত যে সমস্ত দূষিত বিষাক্ত ধূলি-পরমাণু দেহে প্রবেশ করে, নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত ও রোম কূপপথে যে সমস্ত দূষিত অস্বাস্থ্যকর বাষ্প, বায়ু ও পরমাণু শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তাহা একমাত্র প্রাণায়াম দ্বারা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই বাহির করা যায় না, আহার বিহার ও শয়নের বৈষম্য প্রযুক্ত যে সকল রস রক্ত শিরা ও বাত স্থান ভ্রষ্ট হইয়া ব্যাধির কারণ হয়, তাহা একমাত্র প্রাণায়াম দ্বারাই স্বস্থানে স্থাপিত করিয়া স্বাস্থ্য সাধন করিতে পারা যায়।

অতএব ব্রাহ্মণের সর্ব্বতোভাবে যথাকালে যথানিয়মে প্রথমতই সন্ধ্যোপাসনা করা যুক্তি যুক্ত এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বচন স্তূপাকার দর্শন করান যাইতে পারে।

অভিমত

ভারত ভৈষজ্যালয়।—নগরীয় নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটের শাখা কাশীনাথ দত্তের ষ্ট্রীটস্থ ১৬ নং ভবনে "ভারত ভৈষজ্যালয়" নামে একটি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ভৈষজ্য বিদ্যাবিশারদ কবিরাজ শ্রীযুক্ত সাধুচরণ গুপ্ত এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্মত ঔষধাদি প্রস্তুত করিতেছেন, কবিরাজ মহাশয় বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক এই ভৈষজ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, শাস্ত্রমতে ঔষধগুলি যাহাতে অকৃত্রিম হয়, তৎবিষয়ে প্রচুর অর্থব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না, বাস্তবিক ঔষধগুলি অকৃত্রিম হইতেছে, কয়েকটি ঔষধের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি, এই ভৈষজ্যালয়ে "কুসুমিকা" নামে এক প্রকার সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা যেরূপ সৌরভযুক্ত সেইরূপ উপকারী; বাজারে কতকগুলি তৈলে যেমন বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর কুসুমিকা যেরূপ আড়ম্বরের গর্ভবাসিনী নহে, ব্যবহারে আমরা ইহার বিশেষ উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছি, আমাদের কতিপয় বন্ধুও কুসুমিকা ব্যবহার করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, অনেকের মুখেই কুসুমিকার প্রশংসা পরিকীর্ত্তিত হইতেছে, আশাকরি কবিরাজ মহাশয় এই অভিনব ঔষধালয়ের উৎকর্ষ বিধানে আরও অধিক মনোযোগী হইবেন।

সমালোচনা।

প্রেম ও শান্তি।—রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত মূল্য বারো আনা। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

প্রেম ও শান্তি, সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক এই দুইটি ভাবের সামঞ্জস্য রাখিয়া ভক্ত কবি হারাণচন্দ্র উপন্যাসচ্ছলে এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন, প্রথমে দুটি নায়ক নায়িকার প্রসঙ্গ; নায়ক চাহে ভগবান্‌কে—নায়িকা চাহে-তাহাকে পার্থিক প্রেমে আকর্ষণ করিতে, দুইদিকে বিপরীত আকর্ষণ বহু তর্ক বিতর্কের পর নায়ক একবার "দুর হও," বলিয়া নায়িকাকে বর্জ্জন করিয়া যায়; রামাপাগ্‌লার সহিত নায়কের আধ্যাত্মিক ভাবের কথোপকথন, রামাপাগ্‌লার অপর নাম রামব্রহ্ম ঠাকুর। বিদ্যাপতির কয়েকটি পদ আবৃত্তি করিয়া রামব্রহ্ম ঠাকুর সেই বিভ্রান্ত প্রেমিকের চিত্ত বিমুগ্ধ করেন, সংসারে মায়াই বড়, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি তাহাকে মহামায়ার স্মরণ লইতে বলেন, সেই উপদেশে নায়ক মন্মথ ভক্তিমান হইয়া মা! মা! বলিয়া জগদম্বাকে ডাকেন, রামব্রহ্ম ঠাকুর অদৃশ্য হন, তাহার পরেই আবার সেই মোহিনী নায়িকার সাহত মন্মথের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ সে সময়ের ভাব অন্য প্রকার যদিও প্রথমাংশে মেহিনীকে পাপিষ্ঠা কলঙ্কিনী ও পোড়ার মুখী বলিয়া গঞ্জনা দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু পরিচয়ে প্রকাশ মোহিনী একটি বালবিধবা, মৃত পতির মূর্ত্তি দর্শন পিপাসিনী, বাস্তবিক কলঙ্কিনী নহে, অথচ মন্মথের প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল, পাগল রূপি রামব্রহ্ম ঠাকুর শেষকালে তাহাদিগকে পার্থিক ও স্বর্গীয় প্রেমের প্রভেদ বুঝাইয়া সত্যপথে আনয়ন করেন, সাধারণ নায়ক নায়িকার প্রেমের নাম কাম তাহা অতি সঙ্কীর্ণ ভগবৎ প্রেম বিশ্বব্যাপী সেই প্রেমে অবগাহন করিলে শান্তিলাভ হয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের পবিত্র নাম স্মরণে ভক্ত কবি হারাণচন্দ্র শান্তিরও উত্তম উদাহরণ দেখাইয়াছেন, শক্তি মহিমা অক্ষুন্ন রাখিয়া সেই সঙ্গে হরিনামের মাহাত্ম্য সংযোগ করা হইয়াছে, অভেদ ভবেই শান্তি অভেদ ভাবেই প্রেম। অকপটে ভগবানে মতি স্থির রাখিয়া সংসারি মানব সংসার সুখে বিহার করিলেও প্রেম ও শান্তির ছায়ায় দেহ মন শীতল করিতে পারেন, ইহাই প্রতিপন্ন করাই গ্রন্থ কারের উদ্দেশ্য।

গল্পের রচনা কৌশলে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, ভাষা প্রাঞ্জল যেখানে যেখানে কথোপকথনের নাটকের প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, সেই সেই স্থলের ভাষা বিশুদ্ধ প্রকৃতির অনুগত সাধারণের সুখ, পাঠ্য ও সুবোধ্য পাঠকগণ এই প্রেম ও শান্তি পুস্তক পাঠে আধ্যাত্মিক ভাবের অনেক উপদেশ পাইবেন, আমরা ইহা পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। হারাণচন্দ্র এইরূপে ভক্তিমার্গে বিচরণ করিলে সকলের নিকটই যশস্বী হইবেন।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

১৭শ বর্ষ। } ১৩১৬ সাল, চৈত্র। { ১২শ সংখ্যা।

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

কথিত উপদেশামৃত।

ঈশ্বর নিরূপণ। কর্ত্তাব্যতীরেকে কার্য্য হয় না। কর্ত্তাকে দেখিতে না পাইলেও কার্য্য দর্শন করিয়া কর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ঈশ্বরের কার্য্য এই চরাচর বিশ্ব-সংসার; বিশ্বদর্শনে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, বিশ্ব-কর্ত্তা সেই বাক্যমনের অগোচর বিশ্বেশ্বর। যাঁহারা ইহা স্বীকার না করেন, তাঁহারা আস্তিকপদবাচ্য হইতে পারেন না।

তার্কিকেরা তর্ক উপস্থিত করেন, চক্ষে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার অস্তিত্ব কিরূপে স্বীকার করা যায়? জগদীশ্বর আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর, তবে তাঁহার অস্তিত্ব কি প্রকারে প্রমাণযোগ্য হয়? এই দুই প্রশ্নের উত্তর এই যে, নিশাকালে আকাশ-মণ্ডল অসংখ্য নক্ষত্র মালায় বিভূষিত থাকে, দিবাভাগে সেই সকল নক্ষত্র আমাদের নেত্রগোচর হয় না; তবে কি আকাশে নক্ষত্রের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতে হইবে? কখনই না।

দুগ্ধে মাখন আছে, কিরূপে দুগ্ধ হইতে মাখন প্রস্তুত হয়, অজ্ঞান বালকেরা তাহা জানে না। যাঁহারা একান্তমনে ঈশ্বর চিন্তা করেন নাই, ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহারা চিরকালই অজ্ঞান বালক।

সমুদ্র অতুল স্পর্শ; সমুদ্রগর্ভে কি কি পদার্থ আছে, সাধারণ মনুষ্যেরা গৃহে বসিয়া তাহা স্থির করিতে পারে না। তাহারা হয়ত মনে করিতে পারে, জলনিধি কেবল জলেই পরিপূর্ণ; তন্মধ্যে অন্য পদার্থ কিছুই নাই। ভ্রান্তলোকের এইরূপ ধারণাকে কি সমীচীন বলিয়া স্বীকার করা যায়?

পৃথিবী বিশ্বেশ্বরের লীলা-ভূমি। পৃথিবীতেই বিশ্বকর্ত্তার লীলা প্রকাশ। কি কি উপাদানে জীবদেহ গঠিত, প্রত্যেক জীবের উপযোগিতা কি কি, যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর কি কি, ধর্ম্ম, জ্ঞান-সহযোগে অভিনিবেশপূর্ব্বক তাহা আলোচনা করিলে পরাৎপর ঈশ্বরবস্তু উপলব্ধি হইয়া থাকে। *

মনোহর উদ্যান; উদ্যান মধ্যস্থ বৃক্ষারাজী, পুষ্পরাজী, পশুপক্ষী ও সুগঠিত কৃত্রিম পুত্তলিকা ইত্যাদি দর্শন করিয়া দর্শকেরা মোহিত হইয়া থাকে, উদ্যানের অধিপতিকে জানিবার জন্য প্রায় কেহই সমুৎসুক হয় না। সৃষ্টবস্তু দর্শনে মহৎ প্রযুক্ত সৃষ্টিকর্ত্তাকে জানিবার ঔদাস্যও তদ্রূপ।

ঈশ্বরকে মন বুদ্ধির অগোচর বলা হয়, অথচ মন বুদ্ধির সংযোগ ব্যতীত ঈশ্বরকে জানিবার উপায় নাই। মানবের মন দুই প্রকার; বিষাত্মক ও বিষয় বিরহিত। মূলে বিশ্বাস রাখিয়া শাস্ত্র-বাক্য-প্রমাণে বিষয়-বিরহিত মন ঈশ্বর তত্ত্ব অবগত হইতে পারে, বিষয়াত্মক মন সে পথে পৌঁছিতে পারে না।

আপনাকে চিনিতে পারিলেই মানব ঈশ্বর বস্তু চিনিতে পারে। ঈশ্বরের একটি

---

* পরমহংসদেবের সুবিচক্ষণ ভক্ত সিমুলিয়া নিবাসী বাবু রামচন্দ্র দত্ত এই অংশে জড়শাস্ত্র ও চৈতন্য শাস্ত্রের বিচার করিয়া মানবের ঈশ্বর নিরূপণের একটি উত্তম পন্থা দেখাইয়া গিয়াছেন।

আখ্যা পরমাত্মা; পরমাত্মা হইতেই আত্মার উদ্ভব; আধ্যাত্মিকযোগে আত্ম নিরূপণ হইলেই পরমাত্মা নিরূপণ হয়।

ঈশ্বর অনন্ত, তাঁহার শক্তিও অনন্ত। ঐশীশক্তি দ্বারাই এই বিশ্ব-সংসার পরিচালিত হইতেছে। কাননে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সৌরভ বিতরণ করে; পুষ্প নিজে কোথাও যায় না, তাহার সৌরভ-শক্তিই সৌরভ বিতরণের মূল। ঐরূপ সর্ব্ব শক্তিই ব্রহ্ম শক্তি, ব্রহ্ম কেবল উপলক্ষ মাত্র, এই কারণে শাস্ত্র তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় বলে, শক্তিই সর্ব্বাধার। যে শক্তি দ্বারা বিশ্ব-সংসার সৃষ্ট হইয়াছে, সেই শক্তির নাম আদ্যাশক্তি, অর্থান্তরে ভগবতী।

ঈশ্বর সগুণ নির্গুণ ও গুণাতীত। সেইরূপ ঈশ্বর সাকার নিরাকার ও রূপাতীত। প্রমাণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের পাষাণ-বিগ্রহকে সাকার দৃষ্ট হয়, কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণে ভাব ও গুণ মানসপটে উদিত হয়, তখন আর সাকার বোধ থাকে না, অনন্তর কৃষ্ণ যখন চৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়া যাঁন, তখন সাকার নিরাকার উভয় ভাবই অন্তর্হিত হয়। সগুণ নির্গুণ ও গুণাতীত, এই তিনটিরও মীমাংসা ঐরূপ।

মায়া।—যে বস্তু যাহা নহে, তাহা বলিয়া ভ্রম হওয়াই মায়া। ঈশ্বরের একটি মায়াশক্তি আছে, সেই শক্তি চিৎশক্তির অঙ্গরূপিণী, মানব আমি ও আমার এই বোধে অন্ধপ্রায় হইয়া সংসারে বিচরণ করে, অবিদ্যামায়ায় যাহারা আচ্ছন্ন, তাহারা অজ্ঞান-পদবাচ্য, সেই অজ্ঞান বিদূরিত না হইলে মানব কদাচ মায়ামুক্ত হইতে পারে না, বিদ্যাপ্রভাবে মায়া মুক্ত না হইলে আত্মজ্ঞান জন্মে না, সুতরাং আত্মদর্শন হয় না। স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি মায়াও আত্ম দর্শনের প্রতিরোধিকা।

সাধনার স্থান।—সংসারে থাকিয়া যাঁহাদের বৈরাগ্যোদয় হয়, যাঁহারা একাগ্রমনে ঈশ্বর উপাসনায় অভিলাষী হন, লোকালয় পরিত্যাগ করা তাঁহাদের পক্ষে বিধেয়। তাদৃশ্য সাধকের পক্ষে উপদেশ—"ধ্যান কর্ব্বে বনে মনে আর কোণে।" কারণ সংসারের প্রলোভণের আকর্ষণে চিত্তবিচলিত হয়। প্রথমশ্রেণীর সাধকের পক্ষে এই উৎকৃষ্ট বিধি। দ্বিতীয়শ্রেণীর সাধকেরা নির্লিপ্ত-ভাবে সংসারে থাকিয়া সাধন করিতে পারেন। সেখানে এই যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে যে, দুর্গমধ্যে থাকিয়া অল্প মাত্র সৈন্য-সাহায্যে বিচক্ষণ সেনাপতি যেমন বিপক্ষ পক্ষের বহু সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন, নির্লিপ্ত সংসারি-সাধক সংসারে থাকিয়া সেইরূপে সাধন কার্য্যে আনুকূল্য প্রাপ্ত হন।

সন্ন্যাস।—সন্ন্যাস গ্রহণাকাঙ্ক্ষি কোন ব্যক্তি যখন সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতে যায়, সন্ন্যাসী তখন তাহাকে স্ত্রী পুত্রাদি সংসার বন্ধনের কথা জিজ্ঞাসা করেন, উত্তর প্রাপ্ত হইয়া সন্ন্যাসী যখন বুঝিতে পারেন, সে ব্যক্তি সংসারবন্ধনমুক্ত, তখন তিনি তাহাকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া থাকেন।

পিতামাতা ও ধর্ম্মপত্নীর ঋণ পরিশোধের অগ্রে সন্ন্যাস গ্রহণ শাস্ত্র সিদ্ধ হয় না; ঋণপরিশোধের কাল পর্য্যন্ত সাধনাকাঙ্ক্ষি জীবকে সংসারে থাকিতে হয়, সাধনের বস্তু মনমধ্যে বাস করেন।

মনই সকল কার্য্যের কর্ত্তা। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, সৎ-অসৎ সকল কার্য্যের কর্ত্তাই মন, সংসারিক কার্য্যে সংলিপ্ত থাকিয়াও মনে মনে যে, ব্যক্তি অকপটে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে, অবশ্যই তাহার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয়। ভস্ম মাখিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া গৃহত্যাগ করিলেই ঈশ্বরবস্তু লাভ হয় না, মন যাহার অন্যদিকে থাকে, ক্ষণে ক্ষণে যাহার সংসার মনে পড়ে, তাহার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি অসম্ভব। ঈশ্বরনিরত নির্লিপ্ত সংসারি ব্যক্তিই প্রকৃত সাধক।

সাধন প্রণালী।—যাহার যে প্রকার স্বভাব, সেই স্বভাবানুযায়ী ঈশ্বর সাধন করা তাহার কর্ত্তব্য। সাধনের তিন অবস্থা;—প্রথম সাধন-প্রবর্ত্তক, দ্বিতীয় সাধক, তৃতীয় সাধন-সিদ্ধ। বিবেক-বৈরাগ্যের আশ্রয়ে যাঁহারা সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা সাধনপ্রবর্ত্তক; পার্থিব পদার্থ দর্শনে ও সাংসারিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ হতাশ হইয়া, যাঁহারা শান্তিচ্ছায়া অন্বেষণ করেন, তাঁহারা সাধক; তৃতীয়, শান্তিচ্ছায়া প্রাপ্ত হইয়া অর্ণবপোতের দিগ্ নির্ণয় যন্ত্রের শলাকার ন্যায় বশীভূতমনকে যাঁহারা একমাত্র ঈশ্বরের দিকে অটল রাখিতে পারেন, তাঁহারা সাধনসিদ্ধ।

সত্ব-রজ স্তমোগুণের সমষ্টিই জগৎ; জগতের মনুষ্যেরাও অংশানুক্রমে এই তিন গুণে বিজড়িত। যিনি সত্বগুণাবলম্বি, তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য ক্ষমা-পর উপকার, সত্যনিষ্ঠা ও চিত্তসংযম প্রভৃতি নিরন্তর বিদ্যমান থাকে, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তি, সংসারের বাহ্যাড়ম্বরের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ থাকে না। যিনি রজোগুণাবলম্বি, সকাম ভোগবিলাস, দুর্জ্জয় রিপু পরতন্ত্রতা ও সাময়িক ঈশ্বরানুরক্তি তাঁহার ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি তমোগুণাবলম্বি, অহঙ্কারপরায়ণ হইয়া সর্ব্বক্ষণ রিপু চরিতার্থ করা ও আহারাদিতে বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন করা তাহার স্বভাব; কদাচিৎ ঈশ্বরের প্রতি তাহার মন যায়, তাহাও ক্ষণিক মাত্র।

কেহ কেহ ন্যূনাধিক পরিমাণে সত্ব রজঃ উভয় গুণের অধীন, কেহ কেহ রজঃ স্তমঃ উভয় গুণের অধীন, তাহাদের চিত্ত ঈশ্বরের দিকে এক একবার ধাবিত হয়, কিন্তু সে ভাব বহুক্ষণ স্থায়ী হইতে পায় না।

ত্রিগুণের এই যে পার্থক্য, সাধনপথেও তাহা প্রবল। মুক্তিদাতা একজন। যাহারা মুক্তিপথে আদৌ অগ্রসর হইতে পারে না, ঈশ্বরের কৃপা লাভ তাহাদের পক্ষে দুর্ঘট, এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন গুণ ভেদে সাধনার পৃথক্ পৃথক্ পন্থা নিরূপিত হইয়াছে। মনকে বশীভূত করিতে না পারিলে সাধনা বিফল হয়, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।



দোলযাত্রা।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি, বসন্ত সমীরে—
মধুময় কুঞ্জবন মধু বৃন্দাবনে ;
যমুনাসলিলসিক্ত তরুলতারাজী,
দুলিছে পবন ভরে ; তরুশিরে বসি—
গাহিছে বিহগ কুল হিন্দোলসঙ্গীত।
পূর্ব্বদিন চন্দ্রোদয়ে প্রদোষ সময়ে,
মায়াবী কংসের দূত মেঢ়াসুরে বধি,
গোষ্ঠমাঝে শুষ্ক পত্রে হুতাশন জ্বালি,
করিলা চাঁচর খেলা কৃষ্ণ বলরাম ;
তদবধি রহিয়াছে বহ্ন্যুৎসব নাম।
রজনী প্রভাত কালে অষ্টসখী মেলি,
রচিয়া লতার দোলা বাঁধি তরুশাখে,
দোলাইলা রাধাকৃষ্ণে দোল দোল দোল।
ভক্তির প্রবাহ ছুটে সখীদের মুখে,
নাচিয়া নাচিয়া সবে করতালি দিয়া—
গাহিল মধুর স্বরে হোলির সংগীত ;

প্রেমানন্দে হোলিখেলা আবীরে কুম্কুমে—
শ্রীকৃষ্ণের কাল অঙ্গ লাগিল সুন্দর,
শ্রীমতীর স্বর্ণ-অঙ্গে সিন্দুরের ঘটা।
রসিকা সখীরা সবে আবীরের জলে—
পিচকারি ভরাইয়া রসের কৌতুকে—
হাসি হাসি দুই অঙ্গে দিল ছড়াইয়া,
শোভিল যুগল রূপ রসের হিন্দোলে।
কুঞ্জভূমি, তরুলতা, সব লালে লাল!
বনফুল তুলে আনি গোপবালা দল—
প্রদানিল প্রেমানন্দে রাধাকৃষ্ণ পদে।
যুগলের গলদেশে বনফুল মালা;
দুলিলেন রাধাকৃষ্ণ প্রমোদে বিভোর।
তরুলতা, পশুপক্ষী, সকলি দুলিল,
দুলিলা কালিন্দী সতী হিল্লোলে হিল্লোলে।
হোলির উৎসব আজি, প্রেমের পুলকে—
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজে করি প্রণিপাত।
এই পূর্ণিমার নিশি, রাহুগ্রাসে শশী,
জন্মিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ ধামে।
গৌরাঙ্গের প্রেমোৎসবে তীর্থ মায়াপুরে—
মহামেলা অনুষ্ঠান মহা মহোৎসব।
প্রণমামি শ্রীগৌরাঙ্গ! চরণে তোমার,
কৃপাকর কৃপাময়, ভক্তজনগণে;
বাজুক তোমার প্রেমে হরিভক্ত খোল,
হরিবল হরিবোল, বোল হরিবোল!
দোলে দোলে রাধাশ্যাম, দোল দোল দোল—

যমুনাকূলে শ্রীকৃষ্ণ।

কাঁপিছে যমুনাজল সমীর হিল্লোলে ;
তরঙ্গে তরঙ্গে নাচি, বক্ষ উচু করি,
খেলিছে তরঙ্গ মালা পবনের সনে—
প্রেমামোদে ; শোভিতেছে সুনীল আকাশ—
ঊর্দ্ধপথে ; নদী জলে পড়িয়াছে ছায়া—
নীলবর্ণ ; নীলে নীল মিশিতেছে ভাল ;
সেই নীল জল কূলে নীল অবয়বে—
দাঁড়ায়ে আছেন কৃষ্ণ মুরলীবদন,
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠাম, বামে হেলা চূড়া,
পরিধান পীতধড়া, বনমালা গলে।
নীলজল, নীলাকাশ, নীল কৃষ্ণবপু,
আহা ! কি বা সেই ছায়া পড়িয়াছে জলে ;
তিন নীলে সেই শোভা অপূর্ব্ব সুন্দর !
হেনকালে কুঞ্জবনে ডাকিল কোকিল—
ধিক্কারি কবির সুরে, জিজ্ঞাসিল পাখী,
"ওরে নাকি তুমি বল কৃষ্ণচন্দ্র কালো ?"
হাসিয়া প্রকৃতিদেবী করিলা উত্তর,
তাই বটে, জানি আমি কৃষ্ণরূপ কালো ;
কালিন্দীর কালো জলে কালো কৃষ্ণরূপ,
মিলিয়াছে অপরূপ, কালোতে কালোতে !
কালো কৃষ্ণ, কালোরূপা কালিন্দী সুন্দরী,
উভয়ে হতেছে কথা, শুনিছে পবন,
আর কেহ শুনিছে না, বুঝিছে না কেহ,
উভয়েই বুঝিতেছে উভয়ের বাণী।
বাঁশীতে কহেন কথা বাঁশরীবয়ান,
বীচিরবে কথা কন কলিন্দনন্দিনী।
কি যে সে প্রেমের কথা, কে বর্ণিবে তাহা ?
ধীরে ধীরে প্রবাহিছে প্রেমের লহরী,

চুম্বিয়া চুম্বিয়া প্রেমে, সে লহরী লয়ে,
প্রেমানন্দে শূন্যপথে উঠিছে বাতাস ;
হেনকালে দূরকুঞ্জে কে ধরিল স্বর—
"কৃপাকর কৃপাময় কাতর কিঙ্করে !"
চমকি চাহিলা কৃষ্ণ কুঞ্জবন পানে।
কেহ নাই, শূন্যকুঞ্জ, বাতাসের খেলা ;
পঞ্চমে উঠিছে তান, কোকিলের ধ্বনি।
তবে ওকি ? কোথা হতে নর কণ্ঠস্বর !
আকুল করিয়ে প্রাণ, পশিছে শ্রবণে ?
কুঞ্জপানে চেয়ে চেয়ে ফিরাইয়ে মুখ,
এই তর্ক ভাবিছেন নিকুঞ্জ-বিহারী।
সেই রবে শ্রুতি পথে পশিল আবার,
"কৃপাকর কৃপাময় কাতর কিঙ্করে !"
গলিল কৃষ্ণের হিয়া। ভকত-বৎসল—
প্রবাহিছে ভক্তিরস বুঝিলা অন্তরে,
কোন ভক্ত আসিয়াছে নিকুঞ্জ কাননে ?
মনে মনে ভাবিছেন ভাবনা-বারণ,
অকস্মাৎ একমূর্ত্তি দেখা দিল দূরে।
দেখিতে দেখিতে যেন অক্ষি পালটিতে,
সেই মূর্ত্তি নিপতিত শ্রীহরিচরণে ;
গদ্‌গদ্‌ ভাষ মুখে, রসনায় গান—
"কৃপাকর কৃপাময় কাতর কিঙ্করে !"
কোন্ ভক্ত হেন প্রেমে এই গীত গায় ?
কোথা হতে অকস্মাৎ, যমুনা পুলিনে—
লুটায়ে পড়িল আসি কৃষ্ণ পদতলে ?
এই বটে ! সেই ভক্ত, এই সে অক্রূর,
কংস দূত, কৃষ্ণপ্রাণ, কৃষ্ণ পরায়ণ।
অহরহ কৃষ্ণভক্তি হৃদে জাগে যাঁর,
ধন্য সেই এ সংসারে সার্থক জনম

কৃষ্ণ নামামৃত পানে অমর সে সাধু।
আর নয় ;—সুসময় উপস্থিত এবে,
শুনিতে হতেছে সাধ, অবশ্য শুনিব—
ভক্তসনে শ্রীকৃষ্ণের কি কি কথা হয়।
ভাবের ভাবুক যাঁরা, তাঁহাদের মনে,
স্বভাবত এসে থাকে এই আকিঞ্চন।
দেখ রঙ্গ, মৃদুহাসি ত্রিভঙ্গ মুরারি—
করে ধরি তুলিলেন ভকত অক্রূরে।
জোড় করে নতি করি-সুধীর অক্রূর—
নয়নের জলে ভাসি আরম্ভিলা স্তব ;
প্রেমভক্তি বরষিল সেই স্তুতিগীতে।
সান্ত্বনিয়া রাধাকান্ত তুষিয়া ভকতে—
সুধাইলা, তথা আসা কোন্ অভিলাষে ?
যমুনার পানে চাহি প্রসন্ন বদনে—
উত্তরিলা বার্ত্তাবহ সুমতি অক্রূর,
"কলিন্দ নন্দিনী নদী কড় ভাগ্যবতী !
নিত্য হেরে কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণের চরণ—
ধুয়াইয়া দেয় নিত্য আপনার জলে ;
যমুনার মত পুণ্য আমাদের নাই ;
আমরা অভাগা ভবে অতি অভাজন !
কৃষ্ণ হে ! ভাবিয়া দেখ, আজি কতদিন,—
কতদিন ত্যজিয়াছ মথুরা নগরী ;
জননী দেবকী তব, পিতা বসুদেব—
কেঁদে কেঁদে অন্ধ প্রায়, বদ্ধ কারাগারে ;
আমিও কেঁদেছি কত, কি কব কেশব !
যদিও হৃদয়ে জাগে মূরতি তোমার—
প্রতিক্ষণ, তবুকৃষ্ণ, নয়ন যুগল—
সদা অশ্রুপাত করে তব অদর্শনে।

জগতের প্রাণ তুমি, জান নাকি হরি ?
মনে কি পড়ে না তব জনমের কথা ?
বিশ্বপিতা, বিশ্বমাতা, তুমি বাসুদেব,
কৃপা করি বলিয়াছ বসুদেবে পিতা,
কৃপা করি জন্মিয়াছ দেবকী উদরে,
ভুলেছ কি ভবেশ্বর সে সব বারতা ?
নন্দঘোষে পিতা বলি কৃতার্থ করেছ,
মা বলিয়া যশোদারে সেজেছ দুলাল,
(দয়াময় !) গোকুলে তোমার নাম যশোদার ছেলে।
অসীম অপার তব দয়া-পারাবার !
কে তুমি, কোথায় আছ ? গোপিনীরা জানে,—
যশোদার নীলমণি তুমি চিন্তামণি—
যা জানুক গোপিনীরা পুণ্যবতী বটে ;
দুর্লভ কৃষ্ণের প্রেমে বিকায়েছে প্রাণ !
গোকুলের ছেলে খেলা অতি সুমধুর—
কি সুন্দর বাল্যলীলা তব লীলাময় !
শুনিয়া হৃদয়পদ্ম ফুল্লহয়ে উঠে !
ধেনু চরায়েছ হরি, রাখালের বেশে,
চুরি করিয়াছ ননী গোপীদের ঘরে,
শিরে করি বহিয়াছ নন্দের পাদুকা,
বলিহারী বংশীধারি, মহিমা তোমার !
এখনো রাখাল সজ্জা, শিরে পুচ্ছচূড়া,
এইবেশে কতখেলা কর বৃন্দাবনে।
পাঁচনী ছাড়িয়া করে, ধরেছ বাঁশরী,
মাতায়েছ গোপীদের বাঁশরীর গানে,
ধন্য তারা ব্রজাঙ্গনা ; অজ্ঞানে কি জ্ঞানে—
নেহারিছে কৃষ্ণরূপ ! গৃহধর্ম্ম ভুলি !
কভু কদম্বের মূলে বিহার তোমার,
কভু যমুনার কূলে বাঁশরী বাজাও।

ধন্য নদী, ধন্য কুঞ্জ, ধন্য বৃন্দাবন!
সুখ বৃন্দাবনে তুমি সুখে আছ হরি,
আমাদের কথা কিছু নাহি পড়ে মনে!
সুধায়েছ, আসিয়াছি কোন্ অভিলাষে?
তাহারি উত্তর আমি নিবেদি চরণে।
লহ নিমন্ত্রণ কৃষ্ণ! লহ নিমন্ত্রণ,
মমসঙ্গে কংস যজ্ঞে চল মথুরায়।
সমারোহে ধনুযজ্ঞ করিবেন রাজা—
কংস; আমি আনিয়াছি নিমন্ত্রণ পাঁতি।
এই লহ, ব্রজপুরে সবারে দিয়াছি—
ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ; বাকী সুধু তুমি;
এই লহ; চল কৃষ্ণ মধুপুরে চল।
দাদা হলধরে হরি, লহ সঙ্গে করি,
মনোরথ পূরাবারে আনিয়াছি রথ—
পুষ্প ঘেরা, কুঞ্জপথে রাখিয়াছি দূরে,
দুই-ভাই সেই রথে কর আরোহণ,
আশা পুরাইব আমি হইয়া সারথি।
হাসিয়া কহিলা কৃষ্ণ, বুঝিলাম এবে—
যে কারণে সখা, তব হেথা আগমন।
যজ্ঞ করিবেন কংস, তারি নিমন্ত্রণ—
আনিয়াছ ব্রজে তুমি তাঁহারি আদেশে।
যাব আমি মধুপুরে, অবশ্যই যাব।
রাজা তিনি, মাননীয়, তাহাতে মাতুল,
অবশ্য রাখিব আমি রাজ নিমন্ত্রণ;
যাব আমি তব রথে, যাবেন বলাই।
চল সখা নন্দালয়ে, যথা নন্দরাণী—
মা যশোদা, রয়েছেন পথপানে চেয়ে,
স্নেহবতী, ব্যাকুলিনী মম অদর্শনে;
লব আমি তাঁর কাছে মাগিয়া বিদায়,

বুঝাইয়া অনুমতি লইব পিতার,
করে ধরি সঙ্গে লব দাদা বলরামে ;
এই ভিক্ষা তব কাছে, ক্ষণেকের তরে—
বিলম্ব হইবে মম যান আরোহণে,
নিজগুণে সে বিলম্ব ক্ষমিও আমার,
স্নেহে বাঁধা আছি আমি, জান তুমি তাহা।
কহিলা অক্রূর পুনঃ, সম্ভাষি মধুরে,
কেন কৃষ্ণ, বিদায়ের কিবা প্রয়োজন ?
ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ দিয়াছি সবারে,
সকলেই যাইবেন যজ্ঞ নিমন্ত্রণে ;
নন্দঘোষ, ব্রজবাসী, ব্রজ শিশুগণ,
কেহ বাকী থাকিবে না যেতে মথুরায়,
তবে কেন কালক্ষয় বিদায়ের ছলে,
করিতে করহ ইচ্ছা ? কহ ইচ্ছাময় !
একান্তই যাবে যদি, চল যদুপতি,
কে রোধে তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছার বিধাতা !
চাহি যমুনার পানে সজল নয়নে,
চিন্তিলেন ক্ষণকাল চিন্তামণি হরি,
এ মধুর বৃন্দাবনে আসিব না আর,
দাঁড়াব না এইরূপে যমুনার কূলে,
আর আমি ভ্রমিব না নিকুঞ্জ কাননে,
ডাকিব না শ্রীরাধারে বাজায়ে বাঁশরী,
নিকুঞ্জ-বিহার মম আজি ফুরাইল,
নিকুঞ্জ-বিহারী নাম ঘুচিল আমার !
এইসব চিন্তা করি স্মরি পূর্ব্বকথা,
কাতর হইলা কৃষ্ণ। হইলে কি হয় ?
দেখাতে হইবে সব, যেখানে যে লীলা।
যমুনার কাছে আর নিকুঞ্জের কাছে—
[illegible] লইলেন অন্তিম বিদায় ;

মনে মনে বৃন্দাবনে করি সম্ভাষণ,
কহিলেন মায়াময় বৃন্দাবনেশ্বর,—
থাক তুমি বৃন্দাবন! চলিলাম আমি,
রহিব না তোমা ছাড়া, রহিব যদিন—
মরভূমে; বৃন্দাবন ছাড়া আমি নই।
এইরূপে বৃন্দাবনে সম্ভাষি মানসে,
অক্রূরের করে ধরি চলিলেন হরি—
শৈশব লীলার ক্ষেত্রে, যথা নন্দালয়,
মাতা যশোদার কাছে বিদায় লইতে।

——০:※:০——

বন্দনা-গীতি।

ঝিঁঝিঁট—একতালা।

লেখক, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত।

জয় নারায়ণ, রামকৃষ্ণ, নররূপী ভগবান্।
দাঁড়াও স'ম্মুখে, হাসি-হাসি মুখে, চরণামৃত করিহে পান॥
(আহা, চরণামৃত করি হে পান) (তব চরণামৃত করি হে পান)
ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্ব'লে পুড়ে আছি, ছোঁও নাথ মোরে একবার আসি,
ভূতের বেগার খেটে মোরে গেছি, কর হে পুন জীবন দান॥
(আহা, কর হে পুন জীবন দান) (প্রভু কর হে পুন জীবন দান)
সে জীবনে প্রভু তোমারি নাম, গাহি যেন মুখে অবিরাম,
হৃদয় মাঝারে ওহে গুণধাম, জাগায়ে শ্রীমূর্ত্তি করি হে ধ্যান॥
(তব শ্রীমূর্ত্তি জাগায়ে করি হে ধ্যান) (আহা, শ্রীমূর্ত্তি জাগায়ে করি হে ধ্যান)
দক্ষিণে কমলা, বামে বাণী, শিবরূপে তুমি কালী কাত্যায়নী,
তুমি পুরুষ কি নারী, বুঝিতে না পারি, কত ভাবে জীবে করিলে ত্রাণ॥
(আহা, কত ভাবে জীবে করিলে ত্রাণ) (প্রভু কত ভাবে জীবে করিলে ত্রাণ)
মা মা রবে কাঁদিয়ে আকুল, হরি বোলে নৃত্য কর হে অতুল,
অনন্ত সে ভাব, স্বভাবে অভাব, হেরিয়ে বিশ্ব পুলকিত প্রাণ॥
(আহা, হেরিয়ে বিশ্ব পুলকিত প্রাণ) (কিবা, হেরিয়ে বিশ্ব পুলকিত প্রাণ)
ডাকি সবে মিলে এ উৎসব মাঝে, এস দয়াময় অলক্ষিত ভাবে,
কাঙ্গাল-ঠাকুর, কাঙ্গালের পুর, কর হে তীর্থ রাখ হে মান॥
(দেব, কর হে তীর্থ রাখ হে মান)) আহা, কর হে তীর্থ রাখ হে মান)

——:০:——

রাঁচি ভ্রমণ।

লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ জ্যোতিষী।

যাহা বলিবার, তাহা বলিয়াছি, আরও বলি। এখানে লোকজনও যথেষ্ঠ। কাল কাল লোক গোজান যাতয়াত করিতেছ, প্রথমে গিয়া তিন পয়সা দিয়া, গোযানে আরোহন করিলাম তিন মাইল যাইলাম। সকলেরই আত্মীয় বন্ধুগণ ষ্টেসনেই উপস্থিত ছিলেন, আমার সর্ব্বদেশজ্ঞতা থাকায় কাহাকে আসিতে বলি নাই। স্বয়ংই মুটীয়ার সহিত গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিলাম। পথিমধ্যে কমিশনার সাহেবের বাঙ্গালার সম্মুখেই বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। যাইতে যাইতে আরও অনেক কলিকাতার লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

কমিসনারের বাঙ্গালাটী ৫০।৬০ বিঘা জমির উপর। সম্মুখে কতকটা ইটের দেওয়াল, অবশিষ্ট সব মাটির দেওয়াল। সম্মুখে ও পার্শ্বে পাহারা ওয়ালারা বিস্তৃত পথের শান্তি রক্ষা করিতেছে। রাঁচির মত এত বড় প্রসস্ত পরিষ্কার রাস্তা আর বাঙ্গালার কোনও সহরে প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। সে তুলনায় পুরুলিয়ার রাস্তাগুলি সরু ও অপরিস্কৃত। কলিকাতার মত ধুলি ধুসরও নহে। বায়ু নির্ম্মল ও শীতল।

পরাহে প্রাতে উঠিয়া একাই নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। নগরের উত্তর প্রান্তে কমিসনারের বিস্তৃত মাঠের মধ্যেই কাছারি। স্বর্গে পারিজাত পুষ্পের গন্ধে সর্ব্বাঙ্গিক আমোদিত। কমিসনরের কাছারির দক্ষিণে যে রাস্তা আছে তাহাতে বেড়াইলে সে যে কি বস্তু তাহা বুঝা যায়। বহুদুর হইতে ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। রাঁচি রাস্তায় বাহির হইলেই টানিয়া টানিয়া নিশ্বাস লইতে হয়। যেন হাপাইতে হয়, সেখানকার বায়ু অত্যন্ত পাতলা। কমিসনরের কাছারির নিকটেই জজকোর্ট, জেলখানা অপর সর্ব্ববিধ কাছারি। এই অঞ্চলে ম্যাজিষ্ট্রেট নাই, কমিসনরই ম্যাজিষ্ট্রেট। যতদূর আঁখি যায় প্রাণ ভরিয়া ততদূর বেড়াইয়া আসিলাম। কলিকাতার ধুলি ধুমাচ্ছাদিত স্থান ছাড়িয়া রাঁচি ভ্রমণ একরূপ স্বর্গবাস। কলিকাতার অনেকেই এখানে বাঙ্গালা করিয়াছেন, সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম। রাঁচিতে একটি জিনিষ কলিকাতার চক্ষুতে নূতন, সর্ব্ব বাটিতেই এক একটি ঘটীযন্ত্র। পুরুলিয়ানিম্নভূমি হওয়ায় জল বহুল, আর রাঁচি উচ্চস্থান হওয়ায় ইন্দারার অনেক নিচে জল, সেইজন্য পশ্চিম দেশের মত এক বাড়িতেই একটি ঘটীযন্ত্র। একটা বড় তালগাছের ঢেঁকী। ঢেঁকীর যে ধারে পা দেয়, সেইধারে

তার একধারে দড়ি বাঁধা ঐ ধারটা টানিয়া কুয়ার মধ্যে নামাইয়া দিলেই আপনিই জল উঠে। নামাইতেই যাহা কষ্ট জল তুলিতে আর কোনও কষ্ট নাই। এখানে এই ইন্দারার জলেই স্নান হয়। স্থানীয় পুষ্করিণীর জল ভাল নহে এক প্রকার ময়লা পড়ে।

৩য় দিন পথে বাহির হইয়াই বুঝিলাম। আমার সর্ব্ববিধ পীড়া আরোগ্য হইয়াছে, নবীন জীবন লাভ করিয়াছি। বক্ষস্থল যেন স্ফীত হইয়াছে। সে পথের বায়ু আঘ্রাণেই শরীরের শিরায় শিরায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইতেছে। আমার রাঁচি আসার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। সেই পাতলা বায়ু সেবন করিলে কার না শরীর ফুলিয়া উঠে। আমার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুটি স্বর্ণকান্তি রক্তিম হইয়া সেই দেশে বাস করিতেছেন, একটি লোকও সেখানে রোগা দেখিলাম না।

ঐ দিন অপরাহ্নে পুলিশ ট্রেনিংকলেজ দেখিতে গেলাম। তাহা কাছারি হইতে ৩ মাইল দূর কমিসনরের বাটি হইতে সিধা ৩ মাইল পথ, সুপরিস্কৃত অশ্বথ আম্র ছায়াচ্ছাদিত সুপ্রসস্ত রাস্তা আর দুইধারে কেবল বৃহৎ পরিস্কৃত বাংলা শ্রেণী। এক স্থানে হোটেল ও টেনিস খেলিবার সুন্দর মাঠ। এখানে শ্বেতবর্ণ শ্রীমান ও শ্রীমতিরা বন্দুক ক্রীড়া করেন। অনেক সাহেব ও বাইসাইকল এই পথে দেখিলাম। দূর দূরে ঘর বলিয়া সকলের বাইসিকল একখানি ভাঙ্গা মোটর গাড়ি দেখিলাম। এই ৮।১০ বর্ষ মধ্যে বাইসিকলে বাঙ্গালা দেশ ছায়িয়া ফেলিয়াছে। আবার নগরের তুলনায় রাঁচিতে বাইসিকল কিছু বেশী। নগর—যত্ন রোপিত বৃক্ষ পল্লব ইহাই যদি নগরের ব্যুৎপত্তি হয় তবে রাঁচি সে ব্যুৎপত্তি লাভের যোগ্য, ইংরাজ শাসনাধীন বাঙ্গালায় অনেক রাস্তায় এইরূপ বৃক্ষ আছে, রাঁচির সহিত কোন রাস্তার তুলনা হয় না।

কৃষ্ণনগর হইতে রাণাঘাট পর্য্যন্ত ৮ ক্রোশ পথ এইরূপ আম্র বাটিকায় আচ্ছাদিত। একবার বসন্তকালে মধ্যাহ্নে এই স্থিরচ্ছায়ময় ক্রমাকীর্ণ সহকারে সুফল সুরভি পথে গিয়াছিলাম সে এক অপূর্ব্ব ভ্রমণ হইয়াছিল। কিন্তু রাঁচির এই আম্র বাটিকা শরৎকালেও অতি মধুর। পথে কাঁসাই নদী পার হইয়া পুলিশ ট্রেনিংকলেজে যাইতে হয়। এখানে কাঁসাই নদীর উৎপত্তির স্থান, দুই তিন অঙ্গুলি মাত্র জল চলিতেছে। ইন্দারার জল খাইয়া তৃপ্তি হইত না, তৃষ্ণা না থাকিলেও কাঁসাই নদীর সুসার তুষার শীতল সেই জল অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিলাম। দেহ মন প্রাণ শীতল হইল। সে জলের কি আস্বাদন কি বলিব। যে না খাইয়াছে তাহাকে বুঝান

যায় না। একটু ময়লা বলিয়া বাবুলোকে খান না আমার তাহাতে কি আপত্তি। শাস্ত্রে গিরিনদীর জলের অনেক প্রশংসা লিখিত আছে। আর তাহা খাইয়া যখন আত্মা পর্য্যন্ত তৃপ্তি হয় তখন আর আপত্তি কি।

পুলিস ট্রেনীংকলেজ একটা বিরাট ব্যাপার, বাঙ্গালার সমুখে পুলিস শিক্ষা হইতেছে। অনেক ছাত্র এখানে কনেষ্টবল গিরি শিখিতেছে। হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী ঢের দেখিলাম। কোলের ছেলেরা সব পোলা ও গারত খেলিতেছে ও সভ্য হইয়াছে। প্রভুযিশুখৃষ্টের করুনা পাইয়াছে, ধুতি চাদর জুতা জামা পরিয়াছে। বিয়ে এমে পাশ করিয়াছে। ডিপুটি ও মুনসেফ হইয়াছে এক পুরুষেই ২০।২২ বর্ষ মধ্যে এত উন্নত হইয়াছে। এবং যাহারা লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহাদের নাকের ডগাটা একটু একটু উচা হইয়াছে আর তত খাঁদা নাই।

দুইঘণ্টা কলেজে থাকিয়া বাসায় ফিরিলাম। এইখানেই ছোটলাটফ্রেজারেব সবিশেষ অনুগ্রহ। সরকারি সমুদয় কলেজ এখানে উঠিয়া আসিবে। প্রেসিডেন্সী কলেজ উঠিয়া আসিবার কথা হইয়াছিল। টেক্নিক্যাল্ কলেজ হইবে। শিবপুর কলেজ যাইবে। পাগলা গারদ যাইবে আরও কত কি হইবে। গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কৃপা দৃষ্টি।

চতুর্থ দিবসে মধ্যাহ্নে কোলের নাচ দেখিলাম। ইহা এক নূতন ও অদ্ভুত দৃশ্য। স্থানীয় ভাষায় "কোল যাত্রা" বলে। এখানে প্রতিবৎসর শুক্লা কার্ত্তিক ষষ্টীতে এই কোলের নাচ হয়। স্থানীয় অধিবাসী কোলেরা— কৃষ্ণবর্ণ খাঁদা অসভ্য জাতি। তাহারা ঐ তারিখে প্রতি বৎসর "ঘট" পূজা উপলক্ষে সপরিবারে নৃত্য করে। এতৎ উপলক্ষে আট দশ ক্রোশ দূর হইতে কোলগণ সহরে আসে এবং কমিসনরের কাছারির সম্মুখে এবং তাহাদের উপস্থিতেই নৃত্য করে। এবং সাহেবগণ এই নৃত্য বড়ই পচ্ছন্দ করেন।

মধ্যাহ্নে কাছারির দিকে গিয়াই দেখিলাম, বড় বড় "ঝণ্টী"—নিশান উড়িতেছে। কোলগণ দলে দলে সহরে আসিতেছে। মরদা মরদী বালক বালিকা সকলেই নানা বেশে ভূষিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের খুব আনন্দ ও উৎসাহ দেখিলাম। তাহাদের বসন ও ভূষণ সব একাকার।
স্ত্রীগণের পরিধানে লাল ডোরা দেওয়া জোলার সাড়ী। তাহা দ্বারাই উরুদেশ পর্য্যন্ত আবৃত বক্ষস্থল ও কটিদেশ আবদ্ধ। মস্তকের খোঁপাগুলিতে হরিদ্রাবর্ণ পুষ্প। কোল রমণীবৃন্দের খোঁপায় বগের পাখার ঝুটি লালরঙ্গ করা এক হস্ত

বিস্তৃত এই বেশে কুমারীগণ সজ্জিতা চারিজনে বা ছয় জনে পরস্পর বাহুলতায় বেষ্টিত। মুখে কি উৎসাহ ও সরলতা। খোঁপায় সুয়ার গুজির ফুলের ঝুটি কি বাহার! যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী। অথবা বকের পাখার মজ্জিত একহাত দেড় হাত লম্বা ঝুটি, তাহারই বা কি বাহার।

তাহারা তালে তালে পা ফেলিয়া সেই স্থিরচ্ছায় ক্রমাকীর্ণ পন্থায় গান করিতে করিতে আসিতেছে।

কমিশনারের কোটাভিমুখে মার্চ্চ করিয়া যাইতেছে। হাইল্যাণ্ডারদের হাঁটু অবধি যেমন উন্মুক্ত এবং তাহাদের গাউন যেমন দুলিতে থাকে, সাঁওতাল কামিনীদের বসনও তথায় তদ্রূপই দুলিতেছে। পায়ের তালের কি সুশিক্ষিত পটুত্ব। আমি ঐ দিন তাহাদের সহিত সহরের বাহির হইতে সহর মধ্য পর্য্যন্ত প্রায় এক মাইল পথ হাঁটিয়া লক্ষ করিয়া আসিলাম, সেই ঘোড়ে পা ফেলা, এক জনেরও তালভঙ্গ হইল না। এ আজন্ম সিদ্ধ সুশিক্ষিত পটুত্ব বোধ হয় হাইল্যাণ্ডারদের মার্চ্চেও হয় না, মাগীগুলা চাষা, নিজেরা আপন হাতে ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য করে, হাতের কাঁড়া কি! পুরুষগণের এরূপ সুঠাম গঠন নাই। এক এক দলে স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকার প্রায় ২০।৩০।৪০।৫০ এইরূপ সংখ্যক লোক অপরূপ নানাবেশে ভূষিত। প্রৌঢ়াগণ ছেলে বাঁধা যাইতে কাহারও মুখে উৎসাহ ও আনন্দের ক্রটি নাই।

প্রত্যেকেরই মুখে সরলতা। এবং স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কোনও সংকোচের ভাব নাই, অত্যন্ত মিলামিশা। গান গুলি রুদ্ধকণ্ঠ বা চাপাগলায় হইতেছে, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। তবে যাহারা অনেক দিন শুনিতেছেন, তাহারা বুঝিবেন, উহার মধ্যে দুই একটা বাঙ্গালা কথাও আছে। পুরুলিয়ায় অবস্থিতি কালীন সাঁওতালগণ যখন সহরের কার্য্য করিয়া দলে দলে গৃহ ফিরিত, তাহারা যে গান গাইত, তাহা উন্মুক্ত মধুর কণ্ঠে বাঙ্গলা কৃষ্ণসঙ্গীত। কিন্তু রাঁচির গান সাঁওতালী। তবে Harmony বড়ই সুন্দর। কেল্লার ব্যাণ্ডে পিত্তলে বাঁশীর মধ্য হইতে যেরূপ স্বর উঠে এবং সেখানে দাঁড়াইলে যেরূপ একতানের রাগ শুনা যায় ইহাদের নারী কণ্ঠের সংগীতও সেইরূপ।

আমি সেইদিন মধ্যাহ্নে বাসা হইতে বহির্গত হইয়া সুবর্ণ রেখার জলের আশায় উত্তরের মাঠে যাই, কিন্তু সুবর্ণ রেখা বহু দূরবর্ত্তিনী শুনিয়া এক মাইল দূরে

একটি শুষ্ক নদীর উষ্ণ ও কটু জল পান করিয়া সর্ব্বব্যাধি বিমুক্ত হইয়া ঐ কোলের দলের সহিত সহরে ফিরিয়া প্রায় বেলা ৩টার সময় কাছারির মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যাত্রীদের ভীড় দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম যে "কোলযাত্রা" আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে বুঝিয়াছিলাম যে কোন যাত্রা বা গান। পরে বুঝিলাম এদেশে যাত্রা অর্থে নাচ বুঝিতে হইবে।

একটি বড় আম্র বৃক্ষের গায়ে ৪।৫ টি চিত্রবিচিত্র নিশান রক্ষিত হইয়াছে, আর সেই আম্র বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া ৩০।৪০ জন মরদা ও মরদী ঘুরিতেছে। বৃক্ষের নিকটে বালক ও বালিকাগণ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ এবং মাদল একপিঠে ঢাক রক্ষিত আছে। দুইদললোক ঘুরিতেছে। একদলে পুরুষগণ। আর একদলে স্ত্রীগণ। অথবা মিশ্রভাবে একজন পুরুষ একজন স্ত্রী। এই ভাবে দুই দল কখনও বা দুই চারিজন পুরুষও দুই চারিজন স্ত্রী এইরূপে দুই দল লোক পাশা পাশি লম্বমান গোলভাবে সেই বৃক্ষটিকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। এবং গান করিতেছে। সেই দলপতি মরদ "হুরুর্" শব্দ করিতেছে, আর ঐ দুই দলে যুগপৎ তালে তালে পা ফেলিয়া ৫ হইতে ১০ হাত দর্শকদের দিকে পিছাইয়া আসিতেছে। আবার ক্রমশঃ গাছের দিকে ফিরিয়া যাইতেছে ও ঘুরিতেছে।

স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের বাহু পরস্পরের কক্ষে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। সে ব্যূহ ভেদ করে কাহার সাধ্য! পরস্পরের বক্ষ পৃষ্ঠ অবিচ্ছিন্ন। খুব খেলিয়া তালে তালে পা ফেলিয়া যাইতেছে এতগুলি লোকের কাহারও তাল ভাঙ্গিতেছে না। এরূপ ৪০।৫০—১০০।১৫০ যে যেরূপ দল সেই দলে উর্দ্ধ লম্ফন দিতেছে ও পড়িতেছে। কি উৎসাহ ও কি আনন্দ, কি Drill ইহা সভাবত শিক্ষা। মানুষে শিক্ষা দিয়া এইরূপ ভাল শিখান যায় না। এতগুলি স্ত্রীপুরুষে এত ঘেসাঘেসি, কোনও কুভাবের চিহ্ন নাই। কাহার মুখে হাঁসি নাই, কাহারও চক্ষে বিদ্যুদ্দাম স্ফুরন কটাক্ষ নাই। কোনও প্রগল্‌ভ নাই। আছে দৃঢ়তা ধৈর্য্য, উৎসাহ আনন্দ, একাগ্রতা আগ্রহ। সরলতা ও স্বাভাবিকতা। কাহার সাজ বাঁকিতেছে না, সটান সোজা লাফাইতেছে মাত্র।

এই দল সকলের স্ত্রীপুরুষগণ ১৩ হইতে ৪০।৫০ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স্ক। যাহার নাচিতে কষ্টবোধ হইতেছে, সে মধ্যে মধ্যে যাইয়া বিশ্রাম করিতেছে। যে নবাগন্তক বা শ্রমাপনোদিত, সে আবার ঐ বাহুব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কখনও ঐ দ্বিদলের একদল বামাবর্ত্তে ঘুরিতেছে অপর দল দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিতেছে।

৩টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত নাচ হইয়াছিল। বিভিন্ন বিভিন্ন বৃক্ষ, নিশানও স্থান বেষ্টনে বিভিন্ন বিভিন্ন দল নৃত্য গীত করিয়াছিল। প্রথমে একদল দেখিলাম ক্রমশ ৮।১০ বৃত্তে নৃত্যের সমাবেশ দেখিলাম এবং এই ৩।৪ ঘণ্টা এতগুলি বৃত্ত ও দলে অক্লান্ত উৎসাহ আনন্দে নাচিয়াছিল।

প্রথমে যুগপৎ নৃত্যগীত আরম্ভ হইয়াছিল, শেষাংশে পুরুষেরা মাদল ঢাক কাঁধে করিয়া নাচাইতে লাগিল, আর স্ত্রীগণ তালে তালে নাচিতে লাগিল ও গান করিতে লাগিল। কলিকাতার ধাঙ্গড়গণ তাহাদের উৎসবাদিতে ঐরূপ করিয়া থাকে, অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। মাদল যত নিচু করে স্ত্রীগণ তত ঝুঁকিয়া পড়ে, মাদল যত পিছাইয়া যায়, স্ত্রীগণও তত পিছাইয়া যায়, পূর্ব্ববৎ সেইতালে। পুরুষের নাচের মত "হুরুর" শব্দ নাই ও লম্পন নাই। এ নাচও অপূর্ব্ব। ইহা মানুষ ভুলাইয়া পয়সা আদায় করিবার নৃত্য নহে, ইহা জাতীয় উৎসবে নিজের নিজের প্রাণের উল্লাস নৃত্য। ইহা উল্লাস নৃত্য। আমি আমার প্রাণের আনন্দে লাফাইতেছি যাহার ভাল লাগে দেখুক না হয়, চলে যাক্। কাহারও নিগ্রহানুগ্রহের অপেক্ষা নাই। ইহার নাম শিবের তাণ্ডব নৃত্য। অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহার বর্ণনা আছে।

ঐ তারিখে কাছারি বন্দ হয়। একটু ছোট খাট মেলা হয়, দোকান পসারী আসে। ৪।৫ হাজার লোক বোধ হয়, সেই মাঠে জমোয়াত হইয়াছিল। রাঁচি আড়ে দীর্ঘে ২।৪ মাইল হইলেও লোক কম। ১০।৫০ বিঘা জমি লইয়া এক একটা বাঙ্গালা ও বাগান লোকালয়।

আমার বাসার পশ্চিমে ও নিকটে একটি ১০০।১৫০ হাত উচ্চ একটা মাটির ঢিপি আছে। আমি প্রত্যহ তাহার উপর উঠিয়া বায়ুসেবন করিতাম। রেল খুলিয়া বাবু লোকের শুভাগম হওয়ায় ঢিপি কাটিয়া ঘূর্ণমান পথ প্রস্তুত হইতেছে এই বর্ষে অর্দ্ধেক হইয়াছে, আগামী বর্ষে বোধহয় উপর অবধি হইবে। এই ঢিপিটা যদি কলিকাতায় থাকিত, তবে কলিকাতার বাবু লোকেরা এইটাকে সোনা দিয়া মুড়িয়া ফেলিতেন। হায়! সব সুখ এক জায়গায় হয় না। "দার্জ্জিলিংকা হাওয়া পশ্চিমকা পানি ঔর কলকত্তাকে খানা" এই তিনইত আর একত্রে হয় না। ঐ পাহাড়ের শৃঙ্গে বসিয়া রাঁচি সহরটি বড়ই সুন্দর দেখাইত, যেন একখানি দৃশ্যপট Lands cope লম্বা লম্বা দূর প্রসার রাস্তাগুলি গাছের সারিগুলি এবং বাগান ও বাড়িগুলি এবং বকের মত মানুষ গুলি। সে যে কি ছবি, আজিও ভুলিবার নহে।

ঐ পাহাড়ের দক্ষিণেই একটি সাহেব বাগ আছে। তাহার জল অপরিষ্কার ও ময়লা। পুরুলিয়া বাগের সহিত ইহার সৌন্দর্য্যের তুলনাই হয় না, সে কাঁচের মত জল নাই। পুরুলিয়ার বাঁগটি দুই মাইল বেষ্টন হইলে রাঁচির বাঁধটি তিন মাইল হইবে। নানা দেশে নানা সৌন্দর্য্য। পুরুলিয়ার সৌন্দর্য্য রাঁচিতে নাই, এবং রাঁচির সৌন্দর্য্যও পুরুলিয়ায় নাই। পুরুলিয়া বাঁধে চারিটি দ্বীপ আছে। রাঁচি বাঁধে চারিটী দ্বীপ থাকে এবং উত্তরাংশবর্ত্তী এই পাহাড়টির জন্ত আরও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পাইয়াছে। রাঁচির উত্তরে এক মাইল দূরে একটি পাথরের টিবি আছে, আমি তাহার উপরে উঠিলাম। পুরুলিয়ার নিকটে কোনও পাহাড় না থাকায় নগরটি শ্রীবিহীন। পুরুলিয়া স্বজলা সুফলা মায়ার জল শীতল আর রাঁচি নির্জ্জন নির্ম্মল তুষারজ বিহ্বল। ভীষণশীত, কার্ত্তিকেই কলিকাতার পৌষ মাস।

পঞ্চম দিন। অদ্য রবিবার হওয়ায় আমার বন্ধুর অবসর হওয়ায় তিনি আমায় লইয়া টিবিস মন্দির দেখিতে চলিলেন। ষ্টেশনের নিকটে ২০০।২৫০ বর্ষের পুরাতন নিরেট পাথরের গাথা বিষ্ণু মন্দির দেখিলাম। সেখানে নবদ্বীপের ছাত্র এক বৃদ্ধ সাধু অধ্যাপকের দর্শন লাভ করিলাম। তিনি আমার সতীর্থ হওয়ায় যত্ন করিলেন এবং প্রসাদ দিলেন।

পরাহে মধ্যাহ্ণে রাঁচি ত্যাগ করিয়া পুরুলিয়ায় আসিয়াই দেখি, রাণীর জন্ম গ্রহণোৎসবে নগর আলোকিত। রাজপুরুষগণ দ্বারাই নগর আলোকিত হইতেছে রাঁচিতে তাহার কোনও চিহ্ন দেখিলাম না।

এখানে আর দিন কয়েক থাকিয়া রাসপূর্ণিমার দিন সাঁওতাল পরগণার মহেশ পুরে আসিলাম। মহেশ পুর একটি ক্ষুদ্র পল্লী। জল বায়ু সমতল ক্ষেত্রে অতি উত্তম! এখানে ডাক্তারের অন্ন হয় না। রাজ বাড়ির চারিধারে ১০০।১৫০ খানি কুটীর আছে। লোকেরা বেশ নীরোগ দেহে আছে। বাঁশলা নদীর বালুকা বিধৌত জলে পাথর জীর্ণ হয়। এই সময়ে নদীতে একহাত আধ হাত আন্দাজ জল আছে। সাঁওতালগণ নদী মধ্যে বালির বাঁধ দিয়া পূর্ব্বের জল ছেঁচিয়া ফেলিয়া নবোদ্ভূত সুশীতল জল বাটিতে করিয়া তুলিয়া কলসী ভরিয়া লইয়া গেল; আমি সেই জল অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিয়া আত্মা ও দেহ পরিতৃপ্ত করিলাম। সাঁওতাল ও কোলের দেশের এত গ্রাম বেড়াইলাম কি আর লিখিব, সেই জল- সেই স্থল, সেই পাহাড়, সেই উজ্জ্বল সেই মাঠ, সেই বন তাহা ভিন্ন কলিকাতার লোকের কাছে আর কি পরিচয় দিব। মহেশ পুর সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে—

তরুতলং শার্ষপ শাকং
নবৌদলং পিচ্ছিলানি দধীনি।
অল্পব্যয়েন সুন্দর
গ্রাম্যজনো মিষ্ট মন্নাতি॥

নূতন শর্বির্ণার শাক, নূতন ধানের ভাত, ঘোল, দৈ, পাড়াগেয়ে লোক বেশ খায়। শান্ত নিরুপদ্রব স্থানে অনন্ত সুখাকর।

ঐ স্থান হইতে ৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী আজিমগঞ্জে আসিয়া মা পতিত পাবনী ভাগীরথীর জলে আর তৃষ্ণা ভাঙ্গিল না। আর কলিকাতায় ফিরিয়া দুই চারি দিন জল মুখেই করিতে পারি নাই।

শিশুগণের রোগ নিবারণ করিবার উপায়।

অকালে সংসার ত্যাগের পূর্ব্বে ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম, ডি, যে কয়েকটি প্রবন্ধের আদর্শ আমাদের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই একটি।

শিশু তিন প্রকার—দুগ্ধপায়ী, দুগ্ধান্নভোজী, ও অন্নভোজী, দুগ্ধ এবং অন্ন নির্দ্দোষ হইলে শিশু সুস্থ থাকে, এবং দূষিত দুগ্ধ ও অন্ন সেবন করিলে শিশু রোগগ্রস্ত হয়। শিশুর প্রধান আহার মাতৃদুগ্ধ। মাতৃদুগ্ধ সেবনোপযোগী কি না এ বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে সকল গৃহস্থেরই জ্ঞান থাকা উচিত। নারী-দুগ্ধ জলের সহিত মিলিত করিলে যদি সম্পূর্ণ ভাবে মিশ্রিত হয় এবং সেবন করিতে সুস্বাদু ও দুর্গন্ধরহিত বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলে সেই দুগ্ধ বিশুদ্ধ। যে দুগ্ধ জলে, নিক্ষেপ করিলে মিলিত না হইয়া জলের উপরি কিয়ৎ পরিমাণে ভাসমান হয়, সেই দুগ্ধ প্রায়ই কিঞ্চিৎ কষায় রস বিশিষ্ট ফেনাযুক্ত এবং মলমূত্র রোধক। মাতার বাত, হিষ্টিরিয়া, [মূর্চ্ছা] হৃদ্‌রোগ, হাঁপানি প্রভৃতি বায়ুজনিত রোগ থাকিলে দুগ্ধে এই সকল দোষ দেখা যাইতে পারে। মাতৃদুগ্ধ কিয়ৎ পরিমাণে অম্ল কটুরস যুক্ত হইলে তাহা পিত্ত কর্ত্তৃক দূষিত জানিবে। এই দুগ্ধ জলে নিক্ষেপ করিলে কখন কখন ঈষৎ পীতবর্ণ বোধ হয়। জননীর অম্লপিত্ত রোগ, অজীর্ণ রোগ, যকৃতের দোষ, পাণ্ডু, ন্যাবা রোগ থাকিলে দুগ্ধে এই সকল দোষ বর্ত্তমান থাকে। *

* দূষিত গাভীদুগ্ধ বা ছাগীদুগ্ধে এই প্রকার সমস্ত দোষই পরিলক্ষিত হইতে পারে, এই উপায়ে নারীদুগ্ধের ন্যায় গোদুগ্ধ ও ছাগী দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই প্রকার পিত্ত কর্তৃক দূষিত স্তন্যপান করিলে শিশুর শরীরে দাহ উৎপন্ন হয়, এবং পিত্তজনিত অনেক প্রকার রোগ হইতে পারে, মাতার দেহে শ্লেষ্মজনিত পীড়া থাকিলে দুগ্ধ লবণাক্ত পিচ্ছিল হয় এবং জলে নিক্ষেপ করিলে নিমগ্ন হইয়া যায়। এই প্রকার দুগ্ধ পান করিলে শিশুর শ্লেষ্মজনিত পীড়া হওয়া সম্ভব। স্তন দুগ্ধে পূর্ব্বোক্ত দোষ সকল মিশ্রিত ভাবে থাকিলে সে দুগ্ধ বিশেষ অপকারী বুঝিয়া শিশুকে পান করিতে দেওয়া উচিত নহে।

বিশুদ্ধ মাতৃদুগ্ধের লক্ষণঃ—যে দুগ্ধ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, যাহা অবিবর্ণ এবং যাহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুর ন্যায় পরিলক্ষিত না হয়, এইরূপ স্তন দুগ্ধই বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে। মাতা বা ধাত্রী শোকাকুলা, ক্ষুধার্ত্তা, শ্রান্তা, ব্যাধিমতী, অতীব কৃশা, গর্ভিণী, জ্বরগ্রস্তা, অজীর্ণ রোগপীড়িতা অপথ্যসেবিনী হইলে তাহার স্তনপানে শিশুরুগ্ন হইয়া থাকে। আজকাল অনেক গর্ভধারিণী অজীর্ণ রোগে কষ্ট পান, তাঁহাদের বুকজ্বালা অম্লউদ্গার চোঁয়া ঢেঁকুর পেটে বায়ুজনিত কূজনধ্বনি এবং উদরাময় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। যকৃতের দোষ এবং অজীর্ণ রোগ থাকিলে সেই মাতার স্তনদুগ্ধ শিশুর ব্যবহারোপযোগী নহে। মাতৃদুগ্ধ বা উপযুক্ত ধাত্রীর দুগ্ধ না পাইলে শিশুকে ছাগীদুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে, যে ছাগী চরিয়া বেড়াইতে পায়, তাহার ধারোষ্ণদুগ্ধ শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ছাগীকে একস্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার দুগ্ধে অপকার হইবার সম্ভাবনা।

মহারাষ্ট্র দেশে শিশুদিগকে মাতৃদুগ্ধের বা ধাত্রীর দুগ্ধের অভাবে ছাগীর স্তন হইতে দুগ্ধপান করাইতে শিখান হয়। ছাগীর এমন অভ্যাস হইয়া যায় যে, শিশুর পান করিবার সময় হইলে সে আপনি আসিয়া বালকের নিকট উপস্থিত হয়, অনেকেই মাতৃদুগ্ধের অভাবে শিশুকে গর্দ্দভীর দুগ্ধ পান করাইয়া থাকে। কিন্তু এইটী মনে রাখা উচিত যে গর্দ্দভীর দুগ্ধের পোষণ শক্তি নারী দুগ্ধের অপেক্ষা অনেক কম। গর্দ্দভীর দুগ্ধ দ্বিগুণ পরিমিত পান করাইলে তবে কিয়ৎ পরিমাণে মাতৃদুগ্ধের সমান হয়। এইরূপ পরিমাণে গর্দ্দভী দুগ্ধ পান করান অনেক ব্যয়-সাধ্য। গর্দ্দভী দুগ্ধে পোষণ শক্তি কম থাকায় শিশুর স্মৃতি, মেধা ও বুদ্ধি ভালরূপ হয় না। আমি অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে, যৌবনাবস্থাতেও এই সকল মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক কম। প্রাচীন ঋষিরা নীচ জাতির দুগ্ধ পান করান নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাবধি নেপালের মহারাজাধিরাজের

উত্তরাধিকারী ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহাকে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণীর দুগ্ধ পান করান হয়, এই এক দৃষ্টান্তেই পাঠকগণের বুঝা উচিত যে, আমাদের শাস্ত্রকারেরা নীচজাতি জীবের দুগ্ধ পান করান অনুমোদন করেন নাই।

আমাদের এদেশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে গাভী দুগ্ধ পান করান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসবের ৩।৪ দিন পরে মাতার স্তনে দুগ্ধ আইসে। প্রকৃতি মাতৃস্তনে দুগ্ধ আনিতে যেমন বিলম্ব করেন, তেমনই সন্তানেরও সেই ৩।৪ দিন পরিপাক করিবার শক্তি ভাল বিকাশ পায় না। এই ৩।৪ দিন মাতৃদুগ্ধের অভাবে গাভীদুগ্ধ পান করান অনাবশ্যক! এই সময়ে শিশুকে অল্প অল্প মধু পান করাইলে যথেষ্ট হয়।

যদি একান্ত দুগ্ধ পান করাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে মনস্তুষ্টির জন্য অতি অল্পই দুগ্ধ দেওয়াই শ্রেয়ঃ। মহারাষ্ট্র দেশে বালকের দেহ সুস্থ রাখিবার জন্য এরাণ্ড তৈল এবং গোমূত্র আবশ্যক হইলে শিশুকে পান করান হয়। আমাদের বঙ্গদেশে এই প্রথা অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইলে যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা। গো দুগ্ধ মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক গুরুপাক। শিশুকে গাভীদুগ্ধ পান করাইতে হইলে দুগ্ধের সহিত মৌরির জল, বার্লি সিদ্ধজল বা এরারুট সিদ্ধ জল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করাণ উচিত। দুগ্ধ শিশুর উদরে উপস্থিত হইবামাত্র ছানা বাঁধিয়া যায়। মাতৃদুগ্ধের ছানা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়, এবং গো দুগ্ধের ছানা মাতৃ-দুগ্ধের ছানার অপেক্ষা অনেক বড়। বার্লি সিদ্ধ জল বা এরারুট সিদ্ধ জল মিশ্রিত করিলে দুগ্ধে ছানা অত বড় হয় না। ছানা বড় বড় খণ্ডে বিভক্ত হইলে শীঘ্র পরিপাক পায় না, যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইবে, ততই শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হইবে। দুগ্ধ যদি ভালরূপে পরিপাক প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে শিশু দুগ্ধ বমন করিয়া ফেলে। দুগ্ধ পরিপাক না হইলে উদরে অম্লরস উৎপন্ন হয়, এবং গ্যাস জন্মায়; এই অম্ল পদার্থ পকাশয়ে যাইয়া উদরাময় উপস্থিত করে এবং সেই শিশুর মলে অম্ল গন্ধ পাওয়া যায়। এই অম্ল জনিত উদরাময় আরোগ্য করিবার জন্য দুগ্ধের সহিত সামান্য চুণের জল মিশ্রিত করিলে সুফল হইয়া থাকে। গাভী-দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া না দিলে দুগ্ধের সহিত অনেক রোগের বীজ বালকের দেহে প্রবেশ করিতে পারে। আমাদের দেশে এইজন্য জাল দেওয়া দুগ্ধ পান করাণ প্রথা প্রচলিত আছে। গোয়ালারা যেখান সেখান হইতে দুগ্ধে খারাপ জল মিশ্রিত করে; এইরূপ জল মিশ্রিত দুগ্ধ নানা রোগের আকর। সকল গৃহস্থেরই এই বিপদের কথা মনে রাখা দরকার যে, সর্ব্বভুক্ বহ্নির সংস্পর্শে দুগ্ধ শোধন করিয়া দেওয়া উচিত, পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ করিয়া দুগ্ধ ও মাংসাদি সুসিদ্ধ না করিয়া

সেবন করা আমাদের পক্ষে অহিতকর। শিশুর দুগ্ধ বমন তাহার অজীর্ণ রোগের প্রধান লক্ষণ। উদরাময়, মলে অম্ল গন্ধ, মলের সহিত ছানার অংশ থাকা শিশুর অজীর্ণ রোগের দ্বিতীয় লক্ষণ। যাঁহারা এই সময়ে সাবধান হইয়া বালকের অজীর্ণের কারণ নিরূপণ করিয়া প্রতিকার করেন, তাঁহাদেরই শিশু শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে, এই অজীর্ণ রোগগ্রস্ত শিশুকে ক্রন্দন নিবারণ করিবার জন্য মুহু র্মুহুঃ দুগ্ধ পান করাণ নানা বিপদজনক, রোগের কারণ হইয়া থাকে। পরিপাক না হইলে উদরে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ জন্মায়, এই পদার্থ যকৃতে যাইলে ভীষণ যকৃৎ রোগ উৎপন্ন হয়।

যে সকল শিশু দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারিতেছ না, তাহাদের কিছুদিনের জন্য কাল্পনিক উপায়ে দুগ্ধ পরিপাক করাইয়া সেবন করাণ উচিত। এই প্রক্রিয়াকে ইংরাজিতে "পেপ্টনাইজ" করা কহে। আজকাল বাজারে অনেক প্রকার শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়, এইরূপ শিশুদের খাদ্য বিক্রয় হইতেছে। আবশ্যক হইলে অল্প দিনের জন্য এই শিশু খাদ্যের মধ্যে কোন একটী খাদ্য ব্যবহার করান যাইতে পারে। বারমাস এই প্রকার খাদ্য খাওয়াইলে শিশুর পরিপাক শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। অনেকে না জানিয়া শিশুকে জমাট দুগ্ধ (Condensed milk) সাধারণ দুগ্ধের পরিবর্ত্তে সেবনকরান, এইরূপ জমাট দুগ্ধ সেবন করিলে শিশু দেখিতে মোটা হয় বটে, কিন্তু তাহার দেহ অন্তঃসার শূন্য হয়। জননীর ধারোষ্ণ দুগ্ধ বালকের পক্ষে অমৃত স্বরূপ। ইহাতে শিশুর দেহের পোষণোপযোগী সমস্ত পদার্থই আছে। শিশুকে দুগ্ধপান করাইলে গর্ভধারিণীর স্ত্রীরোগ সংক্রান্তরোগ প্রায়ই হয় না। স্তনে দুধ আসিলে শিশুকে ২ ঘণ্টা অন্তর স্তনপান করান উচিত। একটু সবলে দুগ্ধ টানিতে শিখিলে দিবাভাগে ২॥ ঘণ্টা অন্তর ও রাত্রিতে একবার দুগ্ধ পান করাইলে যথেষ্ট হয়। ক্রমশঃ স্তনপান করাইবার সময়ের ব্যবধান বাড়ান উচিত। শিশু স্তনের সমস্ত দুগ্ধ পান করিতে না পারিলে স্তন হইতে বাকি দুগ্ধ বাহির করিয়া ফেলা উচিত ; নতুবা ঠুনকা প্রভৃতি রোগ জন্মাইতে পারে। শিশু ৭।৮ মাসের হইলে তিন ঘণ্টা অন্তর পান করাইলে যথেষ্ট হয়। সায়ংকালে একটু দুগ্ধ পান করাইলে আর রাত্রিতে শিশুকে জাগাইয়া দুগ্ধ পান করান উচিত নহে। যে সকল গর্ভধারিণী বালককে অধিক পরিমাণে খাওয়াইয়া হৃষ্ট-পুষ্ট করিতে চাহেন, তাহাদের সন্তান প্রায়ই কৃশ হইয়া থাকে, এবং অকালে যকৃৎ রোগগ্রস্ত হইয়া নষ্ট হয়।

দন্ত উঠিতে আরম্ভ হইলেই ভাতের মাড়ি ও কাঁচা মুগের ডালের যুষ সেবন করাইতে শিখান উচিত।

চিকিৎসা সমালোচনা।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র সেন গুপ্ত।

শিষ্য। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায় যে, সাধারণের বিশ্বাস, তরুণ জ্বরাদির চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদ মতে ভাল নহে; ডাক্তারি মতেই ভাল। তৎপর ব্রঙ্কাইটীস্ কি নিউমোনিয়ার ন্যায় কোন উপসর্গ থাকিলে আর কথাই নাই! তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা হইতেই পারে না। তাঁহারা বলেন "আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা 'দেওয়ানী' তাহা পুরাতন রোগেই ভাল! আয়ুর্ব্বেদ বহু প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র, তাহার আর নূতন আবিষ্কার নাই; দেশে দিন দিন কত পরিবর্ত্তন হইতেছে, কত নূতন রোগ উৎপন্ন হইতেছে; আয়ুর্ব্বেদ তাহার কি চিকিৎসা করিবে? ব্রঙ্কাইটীস্ নিউমোনিয়া; ডিপথেরিয়া মেনিঞ্জাইটীস প্রভৃতি রোগের ত আয়ুর্ব্বেদে নামই নাই; সে মতে চিকিৎসা আর কি হইবে? নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগতে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ডাক্তারি চিকিৎসা শাস্ত্রে দিন দিন নূতন নূতন চিকিৎসা আবিষ্কার হইতেছে। সুতরাং মৃত্যু সংখ্যা যত অধিকই হউক না কেন ঐ সমস্ত রোগে ডাক্তারি চিকিৎসাই করিতে হইবে।"

গুরু। "এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যাঁহারা এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করেন; তাঁহারা কি বলিতে চাহেন, যে আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন কালে ঐ সমস্ত রোগ ছিল না? অথবা রোগ ছিল; আর্য্য মহর্ষিগণ চিকিৎসা আবিষ্কারে অক্ষম হইয়াছিলেন? প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার কোনটীই নহে, রোগও ছিল, অত্যুৎকৃষ্ট চিকিৎসাও আছে, তবে বহুকাল যাবত বিদেশীয় চিকিৎসা দেশে একাধিপত্য স্থাপন করায়; যেহেতু কোন কোন তরুণরোগের চিকিৎসায় 'আপাত মনোরম্' অতি অল্প সময় মধ্যে উপকার পাওয়া হেতু দেশবাসীগণ বিদেশীয় চিকিৎসার একান্ত পক্ষপাতী হওয়া হেতু; আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার দিন দিন অবনতি ঘটিতে থাকে। যাঁহারা অন্য কোন উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেন না; তাঁহারাই যেমন গুরুমহাশয় হইতেন, সেই প্রকার আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিলে উপার্জ্জনের বিশেষ সুবিধা না থাকায় কোন ভাল ছাত্রই প্রায় আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতেন না। অনন্যগতি ব্যক্তিরই আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসা অবলম্বন হইল। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা দিন দিনই অধনতির চরমসীমায় উপস্থিত হইতে লাগিল। ফলে কোন রোগের চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদ মতে কিরূপ ফল হয়, তাহা সাধারণে একেবারেই ভুলিয়া গেলেন।"

ক্রমে ইঁহাও ঘটিয়াছে যে, রোগের ডাক্তারি নামটী বলিলে, রোগটী কি, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু ঐ রোগের আয়ুর্ব্বেদীয় নাম বলিলে আদৌ বুঝিতেই পারেন না। সুতরাং তাহার চিকিৎসা যে আয়ুর্ব্বেদে আছে কি হইতে পারে, সে ধারণা তিনি কি প্রকারে করিবেন ? এই সমস্ত কারণেই সাধারণের বিশ্বাস ঘটিয়াছে ঐ সমস্ত রোগ আয়ুর্ব্বেদে নাই। তার পর চলিত ভাষায় ডাক্তারগণ যে রোগের যে বাঙ্গালা নাম বলিয়াছিলেন, সাধারণে সেই নাম প্রচলিত হইয়াও কতক শব্দার্থের বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে।"

শিষ্য। "স্পষ্ট বুঝিলাম না ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলুন"

গুরু। "বুঝিলে না ? যেমন আয়ুর্ব্বেদীয় আমবাতের নাম ডাক্তারি গ্রন্থে বাত হইয়াছে। সুতরাং হাঁটু প্রভৃতি গ্রন্থির প্রদাহ বিশিষ্ট রোগ হইলেই 'বাত' হইয়াছে বলিতে হইবে। আমবাত বলিলে ভুল হইল ! আমবাত' বলিলে কি বুঝিবে ? বুঝিবে ডাক্তারগণ যাহাকে আর্টিকেরিয়া বলেন ! সুতরাং গায়ে সুয়োপোকা (বিছা) লাগার মত চাকা চাকা হইয়া ফোলা চাই, ও তাহা চুলকাইবে। কিন্তু সে রোগের নাম যে 'আমবাত' নহে 'শীতপিত্ত' তাহা কেহই বিশ্বাস করিবেন না। এইহেতুও তরুণ রোগের চিকিৎসা প্রায়শঃ ডাক্তারি মতেই করাণ হইয়া থাকে, সেইজন্য যে সমস্ত রোগ তরুণ অবস্থাতেই হয়, আরোগ্য না হয় মৃত্যু ; অর্থাৎ যে সমস্ত রোগের প্রাচীনত্ব বা দেওয়ানী চিকিৎসা নাই, সে সমস্ত রোগ আয়ুর্ব্বেদে নাই বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস ঘটিয়াছে। যেমন ডিপথেরিয়া ক্রুপ মেনিঞ্জাইটীস প্রভৃতি, নূতন অবস্থাতেই হয় আরোগ্য নয় মৃত্যু। প্রাচীনত্ব নাই। সুতরাং ডাক্তারি চিকিৎসাই করান হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে আছে কি না, থাকিলে, কিরূপ চিকিৎসা হইয়া থাকে, তাহার খবরও কেহ নেন না ; সুতরাং তাহার আয়ুর্ব্বেদীয় নাম কি তাহাও জানেন না ; এই প্রকার ক্রমে আয়ুর্ব্বেদে নাই বলিয়াই বিশ্বাস জন্মিয়াছে। রোহিণী বলিলে সাধারণে এখন স্ত্রীলোকের 'রক্ত প্রদর রোগই বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু রোহিনী যে প্রদর নহে, রোহিনী যে ডাক্তারি ডিপথেরিয়া ও ক্রুপ তাহা কেহ জানেন না, বলিলে বোধ হয় বিশ্বাসও করিবেন না। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা যে কি হইতে পারে ; তাহার জ্ঞান কি প্রকারে থাকিবে ?"

শিষ্য। এই সমস্ত রোগাদির বিষয় ক্রমে আলোচিত হইবে। এক্ষণে তরুণ রোগের চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদ কার্য্যকারী কিরূপে, বুঝাইয়া বলুন।"

গুরু। "আহাঃ, তুমি ত জ্বালাইয়া মারিলে ? রোগ যখন প্রাচীন হইয়া সমস্ত শরীর ও যন্ত্রাদি নষ্ট করিয়া ফেলে, তখন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা কার্য্যকারী হইলে ; প্রথম অবস্থায় যখন যন্ত্রাদি ঠিক আছে ; শরীরে বল মাংস আছে ; ব্যারাম মাত্র

শরীরে প্রবেশ করিয়াছে ভাল মতে অধিকার লাভও করিতে পারে নাই; তখন সে স্থলে আয়ুর্ব্বেদ কার্য্যকারী নহে। ইহা কিরূপে সম্ভবে ?"

শিষ্য। "তবে লোকে তরুণ জ্বরের চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদ মতে করায় না কেন ? জ্বর যখন পুরাতন হইয়া প্লীহা প্রভৃতি হয়, তখনই বা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করায় কেন ?

গুরু। "পূর্ব্বেইত বলিয়াছি; আপাত মধুরম্" সকলেই ইচ্ছা করে, শীঘ্র শীঘ্র জ্বর সারিয়া রোগী অন্ন পথ্য করে। সুতরাং এণ্টিফেব্রিণ কি ফেনাসিটিং এই প্রকারের হৃদ্যান্ত্রের অবসাদক ও ঘর্ম্মকারক ঔষধ দিয়া কোন প্রকারে জ্বর ছাড়াইয়া কুইনাইন দিয়া জ্বর বন্ধ করাই উদ্দেশ্য হয়। ইহার ফল যে পরিণাম শুভকর নহে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না, অনেকে বোধ হয় জানিয়াও শীঘ্র আরোগ্য কামনায় করিয়া থাকেন। ফলে অনেকে সারিয়া যায় বটে, কিন্তু আরোগ্যের পর অনেক দিন টনিক খাইতে হয়। নতুবা আবার জ্বর ফিরে। কিন্তু সারিলেও ভাল মতে ক্ষুধা হয় না, আহারে অরুচি হয়। বাহ্য পরিষ্কার হয় না। 'গা' টীশ টীশ করে। সহজে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন হয় না। তার পর কাহারও কাহারও পুনরায় জ্বর হয়। পুনরায় ঐ প্রকার চিকিৎসা হয়; ক্রমে রক্ত শূন্য, কোষ্ঠবদ্ধ, প্লীহা যকৃৎ, শোথ কাস ইত্যাদি উপসর্গ আসিয়া দেখা দেয়; তখন 'ছাই ফেলিতে ভাঙ্গাকুলা' আয়ুর্ব্বেদের আশ্রয় লন। এই প্রকার অবস্থায় আয়ুর্ব্বেদের আশ্রয় লইয়াও অনেকে তরেন। কেহ কেহ মরেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা বুঝেন না যে ঐরূপ অবস্থায় আয়ুর্ব্বেদ কার্য্যকারী হইলে, তরুণ অবস্থায় আয়ুর্ব্বেদ কার্য্যকারী কেন হইবে না। তার পর আরও একটী কারণ আছে, যাহার জন্য লোকে কঠিন রোগে ও তরুণ অবস্থায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করাইতে রাজী হন না। কারণ অনেকের বিশ্বাস আছে, যে ডাক্তারি ঔষধ সমস্ত এক্সাট্রাক্ট হওয়াতে অত্যন্ত শক্তিশালী। কবিরাজদের সব লতা পাতা ছেঁচিয়া বাটিয়া ঔষধ প্রস্তুত করে, তাহার আর শক্তি কি ? কিন্তু তাঁহারা একটু বিচার করিয়া দেখেন না যে, ঈশ্বর আমাদের আবশ্যক হেতু, সমস্ত জীবন্ত বৃক্ষলতা উৎপন্ন করিয়াছেন। কোনটি সুস্থ অবস্থায় ব্যবহারের জন্য কোনটী রুগ্ন অবস্থায় ব্যবহারের জন্য। রোগও যেমন নানাবিধ ভেষজও সেইরূপ নানাবিধ এবং পথ্যও নানাবিধ হইয়াছে।

শিষ্য। "আজ্ঞা হাঁ, কিন্তু সে জন্য সমস্ত গাছ বাটিয়া খাওয়া অপেক্ষা সেই গাছের এক্সাট্রাক্ট খাওয়াত ভাল হইতে পারে ? ছিবরা গুলি রুগ্ন অবস্থায় খাইবেন ? খাই কেন ?

সমালোচনা।

ভক্তের ভগবান্‌।—রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত; এই প্রচলিত বাক্যটি গল্পচ্ছলে সুসজ্জিত করিয়াছেন। পুস্তকের মূল্য বারো আনা। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

গল্পের এক নায়ক রামরূপ, নায়িকা শিব সুন্দরী; দ্বিতীয় নায়ক রাম চরণ, নায়িকা সুরমা। উভয়েই সাধক। রামরূপ সাধনা যোগে সংসারের সমস্ত রমণীকে মাতৃ সম্বোধন করিতেন; রামচরণেরও সেই ভাব। ভগবান্‌ ও ভগবতী বিভিন্ন মূর্ত্তি এরূপ ভেদ তাঁহাদের ছিল না, অন্য লোকদিগকে তাঁহারা কথায় কথায় ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন, ভক্তের চক্ষে ভগবান্‌ প্রত্যক্ষ হন, তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রামরূপ শ্বশুরালয়ে যাইতে যাইতে এক সরোবর সোপানে পরম-যোগীবেশে উপবিষ্ট ছিলেন, রামচন্দ্রে ভক্তিমতি একটি যোগিনী শ্রীরামচরিত্র গীত গাহিতে গাহিতে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হন, রামরূপকে তিনি মূর্ত্তিমান সচ্চিদানন্দ রামরূপ জ্ঞান করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন, যোগিনীটিকে এই গল্পের শিরোমুকুট স্বরূপ বুঝিয়া লওয়া উচিত, আমরা যদি এমন কথা বলি, এই পুস্তক যাঁহারা পাঠ করিবেন, তাঁহারা বোধ হয় আমাদিগকে বিমূঢ় মূর্খ বলিয়া উপহাস করিবেন না। রামরূপ ও রামচরণ যথার্থই ভগবৎ ভক্ত তাহাও আমরা বুঝিয়া লইয়াছি, পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাদের পরমপরিতোষ জন্মিয়াছে। উপসংহার ভাগে ভক্তিযোগে সাধক রামচরণ আমাদের ভগবান্‌ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সাধনার চরম ফল বলিয়া জয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, রামরূপের যোগিনীও বলিয়াছিলেন, যিনি হরি তিনিই কালী তিনিই রাম।

ভক্তের ভগবান্‌, অনেকের মুখেই এই বাক্যটি শুনিতে পাওয়া যায়, বাক্যটি অখণ্ডনীয় সত্য, অধুনা প্রকৃত ভক্তের অভাবে ইহার সার্থকতা বুঝিতে পারা যায় না। লোকের মুখে বাক্য শুনা যায়, কিন্তু আমাদের সাহিত্য সংসারে ঐ বাক্য শিরোনাম দিয়া কেহ এপর্য্যন্ত কোন পুস্তক রচনা করেন নাই—ভাবগ্রাহী রায় সাহেব সেই শূন্য স্থান পূরণ করিলেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে শত সহস্রবার সাধুবাদ অর্পণ করিতেছি।

গল্প সজ্জায় ও ভাষা লালিত্যে পুস্তকখানি প্রশংসার যোগ্য। ভক্তের ভগবান সারগর্ভ নীতিপূর্ণ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।
